ধনুক-ভাঙা পণ

কল্পিত বিষয় ও বাস্তব পরিকল্পনা :- শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়, তবে কেন নয় শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে স্বপ্ন দেখা? কেন নয়, প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া? আর তাই এ প্রয়াস। এখানে স্বপ্নিল গুল, বাস্তবের ছায়ায় সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ পেল। স্বপ্ন-মাখা পণ নয় শুধু, এযে - ধনুক-ভাঙা পণ।

আমাদের দেশের সকল নাগরিকদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও "সাংবিধানিক অধিকার (১৭-ক,খ,গ)"। এই অধিকার, ন্যায়সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়, আর তাই, সরকার বিভিন্ন সময়, নাগরিকদের এই কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসতে চান। যেখানে ১০০,০০০ মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে।

কেমন হয় - যদি!

"শিক্ষা-ই-শক্তি" নামে একটি সরকারি প্রকল্প থাকে।

এই প্রকল্পের বিশেষত্ব হল,

১. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BCS) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাইলে, এক বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতেই হবে। সরকারি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মানুষিক ও নৈতিক ভাবে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম কে সংযুক্ত করার উদ্যোগ। এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুব সমাজের, তারুণ্য কে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমে সংযুক্ত করা।

২. আবেদনকারিকে কি ভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় এর শিক্ষার পরিবেশ আরও উন্নত করা যায়, সে সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ রচনা আবেদন পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

৩. আবেদনকারির নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে হবে।

৪. অন্য আর এক জন আবেদন কারীর সম্পর্কে বলতে হবে, যার সঙ্গে আবেদন কারী যোগাযোগ রাখবেন বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন বিষয়ে।

ধনুক-ভাঙা পণ:- ১

"সমস্যাই হচ্ছে উদ্ভাবনের জন্মস্থান"

এ. হ. (বাকের) এর নিয়োগ ছিলো বগুড়ার সারিকান্দির হুয়াকুয়া গ্রামের MPO ভুক্ত "হুয়াকুয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়" এ। এই বিদ্যালয় ঠিক যমুনা নদীর পারে, বাঁধের উল্টো দিকে (মানে নদীর দিকে)।

জুন মাসের ২০ তারিখে বাকের রওনা হল হুয়াকুয়ার উদ্দেশে। তখন বর্ষা কাল। ও প্রথম ধাক্কা খেলো, এই দেখে যে, চারটা টিনের ঘরের ছাদ মাঠে রাখা এর পাশে কিছু উঁচু নিচু বেঞ্চ স্তুপ করে রাখা। হেড মাস্টার বললেন, চড়ে পানি উঠায় স্কুল ভেঙে এখানে রাখা হয়েছে। প্রতি বছরই এই সময়টায় এই রকম করা হয়। শহরের স্কুলে পড়ে বড় হওয়া বাকের। তার স্কুল দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে আছে। চারদিকে কাদা আর পানি। বুকের ভেতর একটা চাপা ব্যথা অনুভব করলো। আর তখনই দেখতে পেলো ওর পিছনে ১০-১২ টা কচি মুখ, ওদের একজন বলল, এই বেঞ্চ টা আমার ক্লাস এর, আমি বসতাম। ওদের সঙ্গে কথা হলো, সবার পায়ে কাদা আর হাতে পানিতে ভেজা কিছু বই। হেড মাস্টার বললেন ওদের ক জনকে আসতে বলেছিলাম, আপনার সাথে দেখা করতে। স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। বাকের বলল, ভালোই হলো, আমি এদের সাথে কিছুটা সময় কাটাই। ১০-১২ টা, উৎসুক ও কচি মনের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, এই বর্ষা মৌসুমে শুধু স্কুল নয় অনেকের ঘর বাড়ি ও ওখান থেকে উঠায় নিয়ে বাঁধ এর ওপাশে নেয়, এটাই ঘটে প্রতি বছর। এর মাঝে পরিচয় হল নিতাই এর সঙ্গে, একটা হাফ পেন্ট পরে খালি পায়ে খালি গায়ে এসেছে, কোন বই আনেনি। নিতাইকে খুব চঞ্চল মনে হলো বাকেরের। ওকে কাছে ডেকে, ওর গল্প শুনতে ইচ্ছা হলো। প্রথম কথা ছিলো, আমাদের স্কুল কোথায় ছিলো আমি দেখাতে পারবো, দেখবেন? নিতাই এর বয়স কতো হবে ১২-১৩ হবে। ওরা চলল স্কুল দেখতে, প্রায় ৩০ মিনিট এর পথ, কাদা আর পানি। নিতাই যেন মাছের মত কলকলিয়ে পানি ও কাদায় চলছে, থেকে থেকে একটা লাফ দিচ্ছে। এদিকে বাকেরের হাতে জুতা আর প্যান্ট গুটানো। যমুনার পারে দেখা গেল অথৈ ঘোলা পানি, মৃদু স্রোত। নিতাই হাত উঁচিয়ে আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করলো, ঐ যে আমাদের স্কুল। তার বলার ভঙ্গি ও শরীরের ভাষা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেলো, নিতাই তার অন্তর দৃষ্টি থেকে তার প্রিয় স্কুল টাকে দেখতে পাচ্ছে। অনেক কথা হলো নিতাই এর সঙ্গে, জানা হলো ওর বই গুলো ভিজে গেছে তাই আনে নি (এই মিথ্যে কথা টা ও বাকের কে বলেছিল, পরে জানতে পেরেছে, নিতাই ওর বই একটা রাসায়নিক আঠায় ডুবিয়ে রেখেছিলো)।

পরের দুদিন, অলস ভাবে কাটলো, বাঁধ এর শুকনো পার দিয়ে সকাল বিকাল হাটা, বৃষ্টি ছিলো না। তৃতীয় দিনে নিতাই এসে হাজির, সঙ্গে ওর বই। না পড়াশোনা করবার জন্য নয়। ও গাব ও বড়ই (কুল) গাছের আঠা মিশিয়ে, এমন একটা স্বচ্ছ আঠা তৈরী করেছে যে তা বই এর পাতায় লাগায় দিলে পাতা আর পানিতে ভিজে না (জলরোধী) হয়। ওর কথা, ভেজা বই পড়তে ইচ্ছা করে না, তাই তার এ চেষ্টা। বাকের নিতাইকে উৎসাহিত করল, কেননা ও জানে ঐ বয়সে উৎসাহটাই দরকার। যত্ন নিয়ে ওর সব কথা শুনলো। নিতাই এর একটা বড় সমস্যা তা হলো, বইয়ের পাতা ভাজ করলে আঠা গুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়, আর ভাঙ্গা দিয়ে পানি ঢুকে বই ভিজে যায়। বাকেরকে এর সমাধান করে দিতে হবে।

তারপর, শুরু হলো দুজনার গবেষণা আর পরীক্ষা-নীরীক্ষা, বাকের শহর থেকে লেমিনেট (laminate) করে আনলো কিছু বই, তুলনামূলক দেখার জন্য। কেমিস্ট বন্ধু টুটুল এর সঙ্গে আলাপ করে, পলিমার বিকারক (polymar reagent) মিশানো হলো। ঠিক তিন মাসে ওরা সাফল্য পেলো। শুধু তাই না, এই জলরোধী আঠা তৈরি করা সহজ, দামে কম, স্বচ্ছ, কোন আলাদা ওজন নেই, বইয়ের পাতা চুষে নেয় আঠাকে (লেমিনেট এর মত আলাদা স্তর তৈরী করে না) যার ফলে কোন এক জায়গায় আঠা না লাগলে পানি শুধু ঐ জায়গাতে লাগবে।

বর্তমানে বাংলাদেশ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এই "নিতাই আঠা" কে ব্যবহার করে উপকুলিও স্কুল গুলোতে বই দিচ্ছে। বন্যায় আর কোনো বই ভিজে যাবে না। আর নিতাইরা বই নিয়ে খেলা (পড়াশোনার আর এক নাম) করবে মনের সুখে।

সমস্যাকে সফল্যে রূপান্তরিত করে এগিয়ে যাওয়ার নাম ই জীবন।

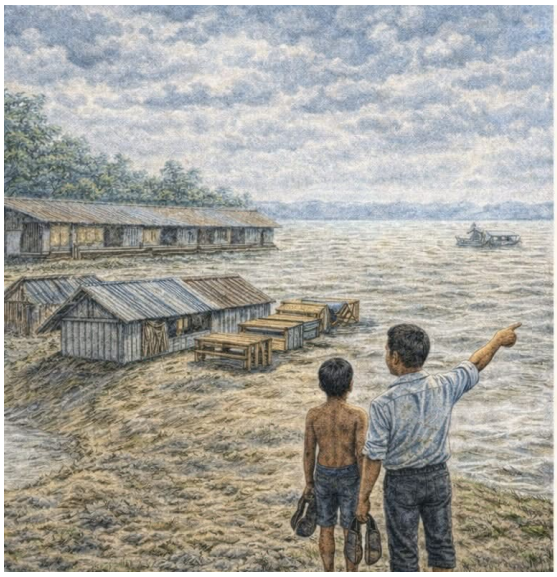

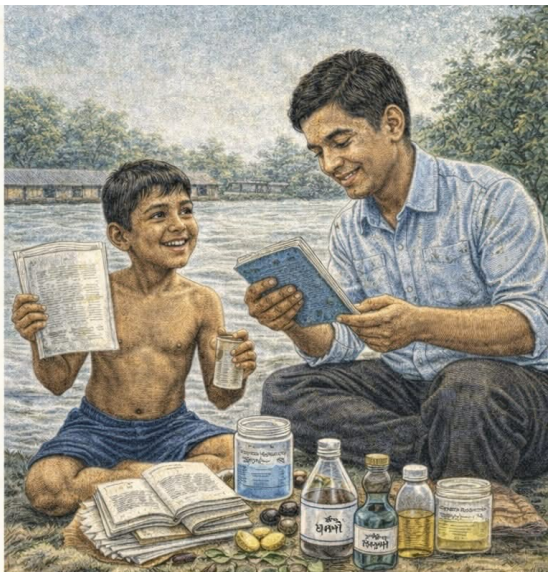

ধনুক-ভাঙা পণ: ৩

“শিক্ষার আগে পুষ্টি - তৃপ্ত মুখেই জাগে ভবিষ্যতের আলো।”

জে. সুলতানার "শিক্ষা-ই-শক্তি" কার্যক্রমে আবেদন পত্রে বলেছিলো মঙ্গা পীড়িত এলাকায় যেতে চায়। মঙ্গা পীড়িত এলাকায় নিয়ে তার অর্থনীতিতে মাস্টার ডিগ্রী প্রোগ্রাম এ থিসিস ছিলো। একটা সময় মঙ্গা (মরা কার্তিক) উত্তরাঞ্চলের মূলত-রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা এই এলাকা গুলোতে প্রকোপ আকার ধারণ করেছিলো। সুলতানার থিসিস তত্ত্বাবধায়ক, এক NGO সঙ্গে কাজ করতেন মঙ্গা পীড়িত জনগোষ্ঠী নিয়ে। সুলতানার থিসিস এর শিরোনাম ছিলো "মঙ্গা পীড়িত এলাকায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ও পুষ্টি"। অনেক গালভরা কথা ছিলো, পরিসংখ্যান ছিলো, সবই ঐ NGO ওর Data থেকে বিশ্লেষণ করে লেখা। দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল, আধুনিক সেচ ব্যাবস্থা এবং উন্নতজাতের ধানের ফলনের কারনে অনেকটা উন্নতি হয়েছে।

নীলফামারী জেলার জলঢাকা প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সুলতানার কার্য ক্ষেত্র। এই বিদ্যালয় মোট ৩৮০ জন্য ছাত্র/ছাত্রী, কিন্তু ২৫০-২৮০ জন স্কুল এ আসে। ৯-১০ ও ১১-১২ ক্লাস এর ছাত্র/ছাত্রীরা স্কুল এ কম আসে, ওরা অন্য কোন কাজে ব্যাস্ত থাকে যা সংসারের সাহায্যে আসে। ১৫ই অক্টোবর (বাংলায় কার্তিক মাস), গ্রীষ্মের ছুটি শেষে স্কুল খুলেছে। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা সুলতানাকে যা শিখাএছে তার জন্য ও একেবারেই প্রস্তুত ছিলো না। দিনটা ছিলো রবিবার, স্কুল এর প্রভাত সমাবেশে চলছিল, হঠাৎ সুলতানার চোখে পড়লো একটা দৈন্যদশা। সব ছাত্র/ছাত্রী দের মধ্যে একটা অপুষ্টি ও মলিনতা, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওদের কাপড় ও চেহারায় ও নীরবতায়। প্রভাত সমাবেশ কালীন জাতীয় সংগীত তখনো সম্পূর্ণ গাওয়া হয়নি, এক তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র মাথা ঘুরে পরে গেলো। শিক্ষকরা ও দফতরী ওকে ধরে কলতলা নিয়ে গেলো। মাথায় পানি দিয়ে, এক কোনায় ছায়ায় বসায়ে রাখলো। সুলতানা পুরো সময়টা ওদের সঙ্গে ছিলো। আসল আঘাত টা পেল যখন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক বললেন, "প্রতিদিন দুই এক জন এরকম ভাবে মাথা ঘুরে পরে, সকাল বেলা না খেয়ে আসে, এখানে মঙ্গা এলাকা, এখন আবার কার্তিক মাস"। খাবার পায় না শিশুরা, সুলতানা ভাবতেও পারেনা। সুলতানা দৌড় গেল ছেলেটার কাছে, ওর নিয়ে আসা দুপুরের খাবার সবটুকু দিলো কুদ্দুস কে (ছেলেটার নাম কুদ্দুস, যার অর্থ পবিত্র ও নির্ভুল)। কোলে নিয়ে নিজ হাতে খাইয়ে দিলো, স্কুল এর কি হচ্ছে সুলতানার কি করণীয়, কোন দিকে খেয়াল নেই। প্রায় এক ঘন্টা পর, কুদ্দুসকে ক্লাস এ দিয়ে, এক নির্জন শ্রেণিকক্ষে গিয়ে বসলো, আর অঝোরে কাঁদলো আধাঘন্টা। শুধু এই ভেবে, ৮ বছরের একটা শিশু খাবারের অভাবে মাথা ঘুরে পড়েগেলো, এ শিশু আমার ছাত্র, ওকে আমি নৈতিকতা শিখাবো! মৌলিক প্রয়োজন টা কি, খাবার না নৈতিকতা (শিক্ষা)? বার বার মনে হলো কুদ্দুস হলো এই স্কুল এর দূত, স্কুল হলো ছাত্র ছাত্রীদের বাসার সংযোজিত অংশ। স্কুলে থাকতে হবে পরিবারের যত্ন ও ভলোবাসা। সুলতানা দুই রাকাত নফল নামাজ পড়লো, মনের শক্তি পাবার জন্য।

সুলতানা একটা "ধনুক-ভাঙা পণ" করে বসলো। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের পুষ্টির যোগান, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।

সে যোগাযোগ করলো নীলফামারী জেলার School Health Clinic এর সঙ্গে, তারা Health Education Officers কে পাঠালো। তৈরী করা হলো প্রতিটা ছাত্র-ছাত্রীর মেডিকেল রেকর্ড, Body Mass Index (BMI) এ দেখা গেলো "যথার্থ ওজনের চেয়ে কম ওজন" প্রায় সবার। সুলতানা তার বন্ধু চোখের ডাক্তার (ডা: প্রমি) কে ডাকলো সবার চোখ পরীক্ষা করবার জন্য। ৩ জন ছাত্র ও ২ জন ছাত্রী কে চশমা দেওয়া হলো। জলঢাকা গ্রামে একটা মডেল হেলথ এডুকেশন ভিলেজের (Model Health Education Villages) বানানোর প্রস্তাব করা হলো। তার জন্য "স্কুল স্বাস্থ্য কমিটি" গঠন করা হলো, সেখানে থাকবে স্কুলের শিক্ষক, স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মী, অভিভাবক, স্থানীয় নেতা, চেয়ারম্যান, সদস্য, মসজিদ এর ইমাম ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি। সুলতানা আর দুই শিক্ষক এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ নিলো, কিছু স্বাস্থ্য সম্পর্কে পোস্টার আনলো, সেগুলো বাঁধাই করে প্রতিটা শ্রেণিকক্ষ এ রাখলো। একটা স্বাস্থ্য সহায়তা কক্ষ নির্ধারণ করা হলো, যেখানে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ক্লাস এবং First Aid এর সব উপাদান ও মৌলিক ঔষধ থাকে।

এবার পরবর্তী ধাপ, পুষ্টিতে স্বনির্ভর বিদালয়। জানা গেলো, পাশের পুকুরটা (প্রতি বছরের বন্যায় ভেসে যায় তাই মাছ চাষ করা হয় না) আর ৭.৫ কাঠা জমি school এর। একটা নকশা তৈরী করা হলো, পুকুরের চারিদিক ঘিরে অভ্যাকেড়ো (avocado) গাছ (৫০ টা), পুকুরের পার উঁচু করা ও সঙ্গে মাছ এর চাষ। ৭.৫ কাঠা জমিতে গরুর খামার। "নীল খামারী", ব্রিটিশদের নীল চাষ হতো এখানে, সেখানথেকে "নীলফামারী" নাম। সাধারণত, জলঢাকার জমি খুবই উর্বর। গরু লালনপালন জন্য চারিদেকে সবুজ আর সবুজ, একদিকে ঘাঘট নদী অন্য দিকে তিস্তা সেচ প্রকল্পর। গরুর জাত নির্বাচনে, সুলতানা পড়াশোনা আরম্ভ করলো। গরুর জাত = গরুর জাত + পরিবেশগত প্রভাব। নীলফামারীর জলঢাকা ইউনিয়নে শীত কালে বেশ ঠান্ডা পড়ে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সহযোগিতায় সুলতানা নির্বাচন করলো জার্সি জাতের গরু। এরা ছোট হয় ও ৫% চর্বিযুক্ত (cream) দিনে ২০-২৩ লিটার দুধ দেয়। জার্সি জাতের গরু গরম ও ঠান্ডা সহ্য করতে পারে, দীর্ঘজীবীও বটে।

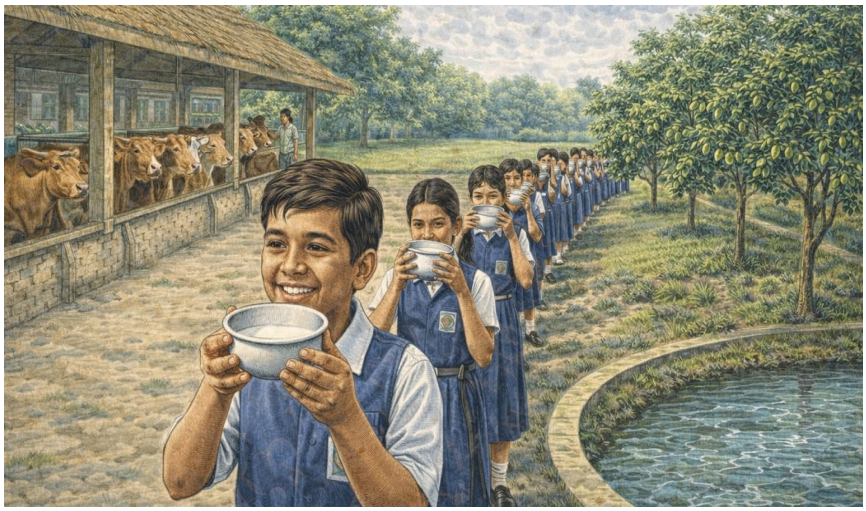

অভ্যাকেড়ো ফল ঢাকায় পাঠানো হয় সুপার মার্কেটগুলোতে বিক্রি করবার জন্য। প্রতিটি ফল সযত্নে স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে কাগজে মোড়া, তাতে লেখা "জলঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গাছের ফল, নীলফামারী, বাংলাদেশ "। পুকুর থেকে যা আয় হয় তা গরুর খামার পরিচর্চায় ব্যায় হয়। ৭.৫ কাঠা জমিতে ৮ টি জার্সি জাতের গরু সঙ্গে বাছুর। ১৫০ লিটারের চেয়ে বেশি দুধ হয় প্রতিদিন। স্কুল এর প্রভাত সমাবেশের পর, প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রী কে ২৫০ ml করে দুধ খেতে হয়, সারিবদ্ধ ভাবে যখন ওরা নিজেদের পাত্রে (স্কুল থেকে দেওয়া, চামুজ ও পাত্র, ছট্ট রুমাল আর রাখবার জন্য চেইন দেওয়া ব্যাগ) দুধ নেয় ও যত্ন সহকারে বসে খায়, তখন সুলতানার যে কি আনন্দ লাগে, আসলে কচি মুখে খাবার তুলে দেবার আনন্দটাই অন্য রকম। মধ্যাহ্ন বিরতিতে, দৈ সঙ্গে চিড়া, মুড়ি, খৈ ও গুড়। সরকার থেকে কিছু সাহায্য পাওয়াতে সবকিছু বেশ গুছিয়ে নেওয়ার গেছে।

ছাত্র/ছাত্রীদের মেডিকেল রেকর্ড প্রতি ৩ মাস পর পর হালনাগাদ করা হয়। সুলতানা তার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পেরেছে, সকলের BMI এখন অনেক ভালো। কেও আর প্রভাত সমাবেশ কালীন মাথা ঘুরে পরে না। বিদ্যালয়ে প্রায় ১০০% ছাত্র/ছাত্রীর উপস্থিতি। লেখাপড়ায়, দেয়াল পত্রিকায়, আর খেলার মাঠের উচ্ছলতায় মুখর জলঢাকা প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ঐযে ছেলেটা, যার নাম কুদ্দুস (পবিত্র ও নির্ভুল), সে এখন ৫ম শ্রেণীতে। রংপুর এর অন্ত জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার, ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। ওকে নিয়ে স্কুল এর শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক এর অনেক আশা।

সুলতানার চিন্তায়, বিদ্যালয় হলো মসজিদ সম-পবিত্র, এখানে নৈতিকতার কথা বলা হয়, এখানে সম-বয়সীরা একই চিন্তায় মগ্ন থাকে। এদের দেখভালের দায়িত্ব সৃষ্টিকর্তার হাতে, এরা ফেরেশতা। আমরা শিক্ষকরা অছিলা মাত্র, তাই চিন্তা চেতনায় সততাই আমাদের আদর্শ।

ধনুক-ভাঙা পণ : ২

“একটি শিশুর স্বপ্ন থেকে শুরু - একটি বিদ্যালয়ের আকাশজোড়া জিজ্ঞাসার উড়ান।”

মনজুরুল আলম এর মনোনয়ন পত্রে ছিল -- আমরা আনন্দের সাথে আপনার সম্পৃক্ততা আশা করছি "শিক্ষা-ই-শক্তি" প্রকল্পে। আপনার স্কাউট মনোভাব এবং তার প্রশিক্ষণ নিশ্চয় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে "বেল তলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়" এ। আমাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঐ বিদ্যালয়ে....ইত্যাদি..

মনজুরুল আলম এর প্রথম দেখায় মন ভরে উঠল, তার বড় কারণ হল এখন শীতের সকাল আর বিদ্যালয়ের মাঠ সবুজে ভরা সঙ্গে শীতের শিশির। ছবির মত, সূর্যের আলো, বড় একটা বট গাছ আর তার ছায়া, বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ গুলোকে যেন মাতৃ স্নেহে ঢেকে রেখেছে। মনজুরের এক সময় এর বন্ধু ও চিএ শিল্পী রফিক এর কথা কেন জানি মনে পরলও। ও বলতো আমাদের দেশটা সুন্দর, কিন্তু এই সুন্দর থেকে বের হয়ে বিশ্ব সুন্দর কেউ দেখা দরকার। সকালের একত্র সারিবদ্ধ আনুষ্ঠানিকতার পর পরিচয় হল অনেকের সঙ্গে, কিন্তু যাকে ভুলবার নয়, সেই চোখ, মনজুরের সকল মন ও চিন্তাকে ধরে রাখল - চাঁদ মিয়া। নামটার সঙ্গে একটা দূরের চাঁদের ভাব আছে, আছে কিছু কথা ও ইশারা। মধ্যবর্তী বিরতি, সবাই মাঠে নেমে এলো, মনজুর খুঁজে পেলো চাঁদকে। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, অনেক কথার এক ফাকে, বুঝে গেল চাঁদ মিয়া চাঁদে যেতে চায়।

শিক্ষক হিসেবে চাঁদ মিয়াকে-তো চাঁদে নিতেই হবে।

কেটে গেল একদিন, নিয়ে এলো এক মাথা চিন্তা, কেমনে চাঁদ মিয়া কে চাঁদে নিবে? সৌরজগতের একটা আদল বানালে কেমন হয়। সকালে উঠে ই এক বড় ইমেইল করলো রফিকুন নবীর (মনজুরের আলোচনার জুড়ি) কাছে - এ ব্যাপারে উপদেশ চেয়ে।

আরম্ভ হল ছোট রড় ফলের বিচির সংগ্রহ। আর তার সঙ্গে এক ৩ মাত্রাযুক্ত দেয়াল পত্রিকার নকশা। সূর্যমুখী ফুলকে রাখা হল সূর্যের স্থানে। প্রথমে একটা স্থির সৌরজগত ও সব আনুপাতিক দূরত্ব ও গ্রহ-নক্ষত্রের পরিমাপ। চাঁদ মিয়ার উৎসাহ দেখে কে? বিশ্বচরাচর যেন নেমে এলো বেল তলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালেয়।

তার ঠিক এক বছর পর ইলেকট্রিক ব্যাটারি চালিত সৌরজগতের আদল, যা বহন যোগ্য ও স্বল্প দামি, উপহার দিল এই বিদ্যালয়। এখন এই সৌরজগতের আদল বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়ে রয়েছে। কত কচি মনের মনন বিকাশ হল, তারা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল ইওরেনাছ আর সব গ্রহকে। মনজুর "বিদ্যালয়ে রাতে থাকা" বলে এক পরিক্রমার সূচনা করল। রাতের আকাশ দেখাল, চিনাল তারাদেরকে, আর ছাত্র ছাত্রীরা চিনল বিজ্ঞানী নিকলাস কপারনিকাস, গলিলিও গলিলী, ইজ্যক নিওটন, এরিসটটল, ওমর খাইআম সহ আরও সবাইকে। মনজুর "আমাদের সৌরজগত" নামে এক পাঠ্য বিষয় নয়, এক "জিজ্ঞাসা বিষয়" এর প্রবর্তন করল। যার প্রথম অনুসন্ধান ছিল, কেন আমরা চাঁদের বিপরীত দিকটা দেখতে পাই না? একই সাথে আরও বড় কিছু হল, সরকার থেকে বেশ শক্তিশালী দূরবীন যন্ত্র দেওয়া হল সব বিদ্যালেয়, যাতে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের মত সৌরজগৎতীক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গুলো পর্যবেক্ষণ করা যায়।

কচি মনে প্রশ্ন উঠলো - আমরা কি এবং কারা? কোথায় সবকিছু, সে যেন এক উন্মুক্ত চিন্তা আর বিশ্বময়ের কাছে নতজানু হওয়া। মনজরুল আলম, এক জন শিক্ষক, সেও বুঝল জ্ঞানের গভীরতা কাকে বলে এবং তা কতটাই-না আনন্দের ও উপভোগের। শুধু এর মাধ্যমেই আমরা মনুষ্যত্বকে অর্জন করি। বিদ্যালয়ের জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ যেন মনুষ্যত্বে হয়।

“মনের আঙ্গিনায় - মনের গভীরে - জ্ঞানকে ধারণ করাই মনুষ্যত্ব”

“মাঠ থেকে নদী - উদ্ভাবনের চাকা ঘুরলেই ভবিষ্যৎ এগিয়ে যায়।”

তাজুল ই. (তাজুল) এর কার্যক্ষেত্র কানসাট উচ্চ বিদ্যালয়, শত বছরের পুরনো (প্রতিষ্ঠিত ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ) এই বিদ্যালয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। আমের রাজধানী কানসাট, একসময় ছিল সমৃদ্ধ নগরী, সর্বত্র ভাঙ্গাচূড়া প্রাচীন কিন্ত নান্দনিক দালানকোঠা আর পশ্চিমে পাগলা নদী। বাংলাদেশ আর ভারত এর সীমান্তের কাছাকাছি। তাজুলের ব্যক্তিগত কিছু চিন্তাধারা আছে, যা খুবই পরিষ্কার ও দৃঢ়, "উদ্ভাবনই পরবর্তী অর্থনীতি"। ওর "শিক্ষা-ই-শক্তি" প্রকল্পের আবেদনে পরিষ্কার করে বলা ছিলো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতেই মানব সমাজের অগ্রগতি, তাই চাই বিদ্যালয়ে উদ্ভাবন শক্তির বীজ বপন করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা অনুশীল ছাত্র/ছাত্রীদের জীবনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকতে হবে। উদ্ভাবন ক্ষমতা থাকতে হবে সেবায়, ব্যবসায়, শিল্পকলা ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে।

তাজুল এর নিয়োগপত্র ছিলো আরও দাবিদার, বলা ছিল, ভবিষ্যতে বিদ্যালয় কার্যক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ করবার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর ও ব্যাবহারিক শিক্ষাকে মূল পাঠ্যক্রমএর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সে ক্ষেত্রে আপনার দিকনির্দেশনা অতি প্রয়োজন। তাজুলের উৎসাহ টাও সেজন্য একটু বেশি। সে বিজ্ঞানের ছাত্র কিন্তু অর্থনীতিতে ওর প্রচুর আগ্রহ। কেননা, উদ্ভাবন উদ্যোক্তা তৈরী করে। তাজুল এটাও জানে, ব্যর্থতার আর উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতা একই সূত্রে গাঁথা।

প্রথম দিনেই তাজুল কানসাট উচ্চ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো দেখে ভালো লাগলো। বিদ্যালয়টির মূল ভবন দোতলা পাকা বিল্ডিং আর বাকি ভবন গুলো একতলা ও পুরোনো। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী সঙ্গে প্রতিটা শ্রেণীর ৩ টি করে শাখা। ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞানের ক্লাস নিবে সে , সঙ্গে ব্যাবহারিক ক্লাস। প্রথম দিনের ক্লাস এ দুটো বেত আর দুটো ব্যাগে কিছু বালি মাটি নিয়ে হাজির। ছাত্র/ছাত্রীরা আতঙ্কিত হলেও ওর মুখে হাসি। এবার বলতে হবে, দেখে বেত দুটোর দৈর্ঘ্য ও হাতে নিয়ে ব্যাগে দুটোর ওজন। ছাত্র/ছাত্রীরা উৎসাহ নিয়ে বলল, ওখান থেকে একটা টেবিল তৈরি করব তাজুল, পরিসংখ্যানগতভাবে দেখালো, গ্রাফ কাগজে X -Y প্লট ও Regression analysis (প্রত্যাগতি বিশ্লেষ) করলো। পরিসংখ্যানগত প্রক্রিয়াগুলির উপস্থাপন করে বিশ্লেষ করলো। পরের ক্লাস এ একটি আম পাতার ক্ষেত্র নির্ণয় করে, গাছে কয়টা পাতা আছে তা নির্ণয় করলো, sampling theory (নমুনা তত্ত্ব) দিয়ে। এমনি ভাবে চললো Eratosthenes measure দিয়ে পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ থেকে Pythagoras theory এর ত্রৈমাতৃক উপস্থাপনা। কিন্ত তাজুল চাইলো, ক্লাস ঘরের বাহিরে নিতে, পদার্থ বিজ্ঞানের অনুশীলন গুলো।

কানসাট উচ্চ বিদ্যালয়ের একটা বড় মাঠ আছে, বিকেলে ছাত্র/ছাত্রীরা খেলতে আসে, বেশ করে সাজিয়েছেন বিদ্যালয়ের শরীরচর্চা বিভাগের শিক্ষক, রফিক স্যার। একদিকে ছেলেরা আর অন্য দিকে মেয়েরা। মাঠের পরিধি ৪০০ মিটার, দাগ কাটা আছে, সঙ্গে দীর্ঘ লাফ ও উচ্চ লাফ দেবার জন্য বালির বিছান। মাঠটা দেখলেই মন ভরে যায়, আর বিকালের হই চই টা উপভোগ করবা মতো। শৈশবের চাঞ্চলতা দেখে তাজুলের মনে পড়লো, লেখাপড়া ও উচ্ছলতা অতপ্রতভাবে ভাবে জড়িত। আর তখনই উপলব্ধি করলো, সকলের দুইটা দক্ষতা থাকতেই হবে,

বাইসাইকেল চালানো আর সাঁতার। শরীরচর্চার শিক্ষক, রফিক স্যার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হল, ক্লাস ৯ম-১০ম এর ছাত্র/ছাত্রীদেরকে পাগলা নদীতে নেওয়া হবে সাঁতারের কিছু সুনির্দিষ্ট শিক্ষা দেওয়ার জন্য। প্রায় সবাই সাঁতার জানে, কিন্তু প্রয়োজনীয় কিছু শিক্ষা থাকা দরকার। যেমন স্কুবা উদ্ধার ডুবুরি, কি ভাবে অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করতে হয়, আতঙ্কিত এবং প্রতিক্রিয়াহীনদের উদ্ধার, জরুরী পরিস্থিতি প্রতিরোধ এবং পূর্বাভাস, ইত্যাদি। রাজশাহী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে দুই জন প্রশিক্ষক এসে সপ্তাহে একদিন করে ৪ সপ্তাহ ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেল সঙ্গে ফায়ার সেফটি ট্রেনিং (অগ্নি প্রতিরোধ, নির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক) প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র পেল সবাই। জোব্বার নামে এক সুঠামদেহি ক্লাস ১০ম এর ছাত্রকে ফায়ার সার্ভিস প্রশিক্ষক এর এতো পছন্দ হয়েছে যে, জোব্বারকে Battalion chief ফায়ার সার্ভিস এর সেবা-পোশাক উপহার দিলো। তাজুলের চিন্তায় ছিলো মানসিক এবং শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জ এর প্রস্তুতি এই কৈশোর বয়সের জন্য খুবই প্রয়োজন। কারণ, কৈশোর এর ধর্মই হলো দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক কাজ করা।

তাজুলের পাগলা নদীর কাছে যেয়ে মনে হলো, জলবিদ্যুৎ (hydroelectric power) কেন নয়? তাজুল রাজশাহী বিশ্ববিদালোয় এর ইলেকট্রিকাল ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের প্রফেসর অমল কৃষ্ণ কর্মকার স্যারকে তাঁর প্রজেক্ট নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলো। রাজশাহী পদ্মা নদীর পারে, গ্রীষ্ম কালে অনেক গরম ও জলীয়বাষ্প থাকে। পদ্মা নদীর চরের ক্ষুদ্র বালির দানা গুলো বাতাসে উড়ে আসে, আর তাই বাতাস ও গরম থাকে, এদিকে গ্রীষ্মের গরমে নদীর জলীয়বাষ্প, তাই বিদ্যালয়ের ক্লাস গুলোতে শীততাপ যন্ত্র লাগানো দরকার। আর তাই চাই বিদ্যুৎ। ৪ মাসের মাথাই জলবিদ্যুৎ এলো কানসাট উচ্চ বিদ্যালয়ে। এটা ছিলো, প্রযুক্তির পথে এক সাফল্য।

তাজুল, ৪ টি বাইসাইকেল আর কিছু যন্ত্র-বাক্স চেয়ে নিলো স্কুলের প্রধান শিক্ষক এর কাছে থেকে। বিকেলে ছাত্ররা সাইকেল নিয়ে মাঠে চালায়, যারা চালাতে পারেনা তারা শেখে। তাজুলের প্রথম কাজটা হলো, প্রতিদিন বাইসাইকেল গুলোর কোন না কোন কিছু খুলে রাখা বা উল্টো করে লাগিয়ে রাখা। ছাত্ররা এসে বাইসাইকেল ঠিক করে, যন্ত্র-বাক্স ওখানেই থাকে। কিছু দিন পর, এমন অবস্থায় দাঁড়ালো যে, ছাত্ররা সম্পূর্ণ বাইসাইকেল খুলে আবার লাগাতে পারে। এবার তাজুল বাইসাইকেলকে ক্লাসে নিয়ে এলো, কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ (Conservation of angular momentums), সাইকেল হইল জাইরোস্কোপ, সাইকেলের স্থায়িত্ব (stability), ভরবেগ, ত্বরণ, বেগ ও অভিকর্ষের কেন্দ্র নিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের সমীকরণ ও ব্যাবহারিক পরীক্ষা নিরীক্ষা। একই সঙ্গে, সাইকেলের চাকা কিভাবে কাজ করে, গিয়ার কিভাবে কাজ করে, ব্রেক কিভাবে কাজ করে ও হ্যান্ডেলবার কীভাবে কাজ করে দেখালো। সাইকেলের চাকার সঙ্গে জেনারেটার ব্যবহার করে কি ভাবে কায়িক শক্তি কে ইলেকট্রিকাল শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। খুব সাধারণ কিছু সাইকেল স্পিডোমিটার, ওডোমিটার, বাইক সেন্সর ব্লুটুথ দিয়ে মোবাইল ফোনের App দিয়ে পাওয়া যায়। তাজুল এখানে সব কিছুতেই সমীকরণ ও গাণিতিক রূপের প্রকাশ দেখালো ছাত্র/ছাত্রী দেরকে।

"বাইসাইকেল চিত্রণ" (Bicycles illustration) বলে ৯ম-১০ম জন্য একটা বিজ্ঞান বই লিখল। এখন বিকালে মাঠে বাইসাইকেল চালাতে যেয়ে ছাত্র/ছাত্রীরা বাইক সেন্সর এর values গুলো App দিয়ে দেখে এবং তা সমীকরণ দিয়ে মিলানোতেই ব্যস্ত থাকে। চাকাকে প্রায়ই সর্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। চাকার ব্যবহার সর্বত্র, তাই এর বৈশিষ্ট্য গুলো জানা প্রয়োজন। সাইকেল হইল জাইরোস্কোপ এখনো কানসাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের খেলা। সুদূর প্রশারী ভাবে দেখলে, এই হইল জাইরোস্কোপ (ঘূর্ণনবীক্ষক) এর সূত্র তেই এই বিশ্বব্রহ্মান্ড। উদ্যোক্তা তৈরী করতে চাইলে, প্রকৃতিকে প্রধান্য দিতে হবে, সঙ্গে থাকতে হবে সহজাত উৎসাহ।

ধনুক-ভাঙা পণ: ৪

“মাঠের মাটিতে আঁকা বাংলাদেশ - আজকের কিশোরের হাতে গড়ে ওঠে আগামীর স্বপ্ন।”

ম. হো (বাবর) এর নিয়োগ শিলখালী উচ্চ বিদ্যালয়, পেকুয়া, কক্সবাজার। এই বিদ্যালয়ের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট হলো, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক। কিছু বয়জেষ্ঠ শিক্ষকের অনুপ্রেরণায় ও সমুদ্র পারের উন্মুক্ততায় এই বিদ্যালয় তার এই স্বীয় বৈশিষ্টকে ধরে রাখতে পেরেছে। বিদ্যালয় এর অনেক শাফল্য, শিক্ষায় ও খেলাধুলায়।বাবর এর নিয়োগ পত্রে এ স্কুল কে বলা ছিল একটা আদর্শ স্কুল। তাই ওর আগ্রহটা ও ছিলো বেশি।

স্কুল এর প্রবেশ দরজায় লেখা "হে প্রভু, আমাকে জ্ঞান দাও", তাই তো পরিপূর্ণ জ্ঞানই তো আমাদের দরকার। বাবর এর মনে পরে গেল, আলবার্ট আইনস্টাইন এর এক উক্তি ”স্কুলে যা শেখানো হয়, তার সবটুকুই ভুলে যাবার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা-ই হলো প্রকৃত শিক্ষা।“ প্রথম নজর পড়লো স্কুল এর বড় মাঠ টার উপর ও স্কুল এর প্রসস্থ দুই ভবন এর প্রতি। স্কুল টাকে বেশ পরিচ্ছন্ন মনে হল। প্রথম দিনে, স্কুলের সকালের সমাবেশ এ সবাই যখন জাতীয় সংগীত গেল, তখন ওর খুব ভালো লাগলো, বাবরের গানের মন, সারাদিন জাতীয় সংগীত গাইলো মনে মনে, অনুভব করল দেশের সাথে একটা স্নিগ্ধ মিল আছে জাতীয় সংগীতের। দেশমাতৃকে জাতীয় সংগীত দিয়ে মুড়ে রাখা যায়, এতো সুন্দর এই সংগীতের মহত্ব ছাত্র/ছাত্রীদের মর্মে অনুধাবন করানো দরকার। এই সংগীতে যেন ভাষাগত সাংস্কৃতি, জন্মগত অধিকার ও ভালোবাসার আবাস স্থল। বাবরের চিন্তা, ছাত্ররা কেন তা জানবেনা? ভালোভাবে দেশকে চেনা খুব দরকার। কিন্তু কি ভাবে? সবচাইতে ভালো হয় যদি নিজ হাতে দেশকে গড়ানোর সুযোগ দেওয়া যায়। বাবর, ১৫ দিন সময় নিয়ে এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করলো। তারপর স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিটিং করে তার অনুমতি নিল। বাবর এর পরিকল্পনা এ রূপ :

১- ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ও ৮ম শ্রেণীকে ৫ x ৫ মিটার করে মাঠের পশ্চিম পাশে জায়গা বরাদ্দ থাকবে। জায়গা গুলো ছায়াময়, পানির নল (পাইপ) ও প্রয়োজনীয় উপকরণ স্কুল থেকে সরবরাহ করা হবে। ছাত্র/ছাত্রীদের কাজ হবে ঐ জায়গায় বাংলাদেশকে উঠস্থাপন করা, একটা ক্ষুদ্র দেশ তৈরী করা। ৮ টি বিভাগ আর ৬৪ টি জেলার সমন্বয়ে আমাদের দেশে। ৫ম থেকে ৮ম শ্রেণী, এই চার বছর। ছোট শ্রেণীতে দেশকে চিনানো মানে, দেশকে আত্মার আত্মীয় করে নেওয়া।

২- ৫ম শ্রেণীর জন্য পাঠ্যসূচি তৈরি করল। যেখানে বাংলাদেশ এর "ভৌগোলিক পরিচয় ও বৈশ্বিক উষ্ণতার" নিয়ে নানা কথা ও দিকনির্দেশনা থাকবে। বাংলাদেশকে সমুদ্রের স্তর থেকে দেখতে হবে। তাই এই ৫ম শ্রেণীর ৫ x ৫ মিটার জায়গাটার পাদদেশে সিমেন্ট দিয়ে ভরা হলো যেন তা সমুদ্রের পানির স্তরকে নির্দেশ করে। দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ সম্পর্ককিত ও ঋতু বৈচিত্রর ধারণা সহ বিশ্বের অবস্থানে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করাই হলো এই শিক্ষাক্রম এর উদ্দেশ্য। কিছু বাংলাদেশের প্রামাণ্যচিত্র (audiovisual) থাকবে, নদীমাতৃক বাংলাদেশের উপস্থাপনায়।

৩- ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে থাকবে "শিল্প এবং যোগাযোগ"। দেশের গুরুতর শিল্প কারখানা গুলোর অবস্থান, উদপাদন নিরীক্ষা, সড়ক, রেল ও জলপথ যোগাযোগ। ছাত্র/ছাত্রী তাদের নির্ধারিত জায়গায় বাংলাদেশ এর গুরুতর শিল্প কারখানা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কে উপস্থাপন করবে। এই পাঠ্যসূচিতে শিল্প কারখানা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যোগাযোগ এর উল্লেখ ও থাকবে।

৪- ৭ম শ্রেণীতে "জনসংখ্যা এবং অর্থনীতি "। ৫ম, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যসূচির উপর ৭ম শ্রেণীর পাঠ্যসূচির রচনা করা হবে। ছাত্র/ছাত্রী পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার যে দেশের অভ্যন্তররীনি অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যার প্রভাব। এই পাঠ্যসূচিতে কিছুটা অঙ্ক শাস্ত্র থাকবে, GDP ও জনগণের গড় আয়ু, স্বাস্থ্য সেবা ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান থাকবে। সব মিলিয়ে ছাত্র/ছাত্রীরা তাদের দেশকে শাজাবে ঐ ৫ x ৫ মিটার জায়গায়। এখানে, সরকার গঠন, সংসদ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন বিষয় থাকবে।

৫- ৮ম শ্রেণীতে "ভবিষ্যতের সুবিধা এবং উন্নতি"। ছাত্র/ছাত্রীরা তাদের মত জানাবে, এই পাঠ্যসূচিতে কোন বাধা ধরা পাঠক্রম নেই। বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব থেকে দেশকে কিভাবে রক্ষা করবে, শিল্প এবং যোগাযোগে কোথায় কি উন্নয়ন দেখতে চায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর জন্য কি করণীয়? ছাত্র/ছাত্রীরা ভবিষ্যত দেশকে কেমন দেখতে চায়। উদ্দেশ্য একটাই, দেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শেখানো। ৮ম শ্রেণী, ফুলে ফলে এক বাংলাদেশ কে উপস্থাপন করবে। সে হবে এক স্বপ্নের বাংলাদেশ।

৬- একটা কাঁচ ঘেরা বক্র জায়গা (বারান্দায় খোলা জায়গায়), যেখানে থাকবে জাতীয় পতাকা ও স্কুলএর প্রতীক (logo), উচু একটা ডেস্ক এ যত্ন সহকারে থাকবে দেশ এর সংবিধান। পাদদেশে লেখা থাকবে, "এই সংবিধান শহীদের রক্তে লিখিত" - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একটা পোস্টার, "বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকবে প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র হবে এদেশের প্রশাসনিক ভিত্তি, জনগণ হবে সকল ক্ষমতার উৎস, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ও ধর্মনিরপেক্ষতা - রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি"।

শিলখালী উচ্চ বিদ্যালয় এর মাঠের পাশে এক শাড়িতে চার বাংলাদেশ। "আমার সোনার বাংলা" জাতীয় সঙ্গীত এর প্রথম ১০ ছত্র কণ্ঠসঙ্গীত এবং প্রথম ৪ ছত্র যন্ত্রসঙ্গীত এর বিধান আছে। বাবরের দৃষ্টিতে ৪ ছত্র যন্ত্রসঙ্গীত যেন ৪ বাংলাদেশএ মৃদু লয়ে সুরিলিত হচ্ছে। কচি মনের মাধুরীতে আঁকা, একদিন এই ছাত্র/ছাত্রীরাই দেশ এর কর্ণধার হবে। অবচেতন মনে যে যত্নের জন্ম নেয়, সেটাইতো ভালোবাসা। অঙ্কুরেই উত্তগামিত হোক কিছু শপথ।

আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি|
চিরদিন তোমার আকাশ,
তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ও মা,

ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে–
মরি হায়, হায় রে
ও মা,
অঘ্রানে তোর ভরা খেতে,
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।।
কী শোভা, কী ছায়া গো,
কী স্নেহ, কী মায়া গো,–
কী আঁচল বিছায়েছ
বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী
আমার কানে লাগে
সুধার মতো-
মা তোর বদন খানি মলিন হলে
আমি নয়ন
ও মায় আমি নয়ন জলে ভাসি
সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি|

“তরঙ্গের মতোই কৈশোর - ভুল, কৌতূহল আর আত্মবিশ্বাসের ছন্দে গড়ে ওঠে ভবিষ্যৎ”

ম. হুসেইন ও ফয়েজুল্লা উচ্চ বিদ্যালয়, বগুড়া, যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, কৈশোর মনস্তত্ত্ব যেখানে হুসেইনের আগ্রহ ও অবদান সেখানে। সে মনোবিজ্ঞানের ছাত্র, বিশেষ ভাবে শিশু-কৈশোর মনস্তত্ত্বের উপর তার আগ্রহ বেশি ও গবেষণাও আছে। মাস্টার ডিগ্রীর গবেষণার শিরোনাম ছিলো "উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান মনোবিকাশ", শুধু তাই নয় হাতে কলমে কাজও আছে, বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলকে নিয়ে। সেখান থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করেই তো গবেষণার কাজ। হুসেইনের গবেষণার উপসংহার টি উপযোগী ও লক্ষ্য-সংক্রান্ত। যা হলো, "শিশুদের অবশ্যই জানতে হবে যে সে একটি অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঘটনা, যা পৃথিবীর শুরু থেকে ছিল না এবং পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত তার মতো আর একটি শিশু আসবে না।" মানব শিশুর এই অনন্যতা হুসেইনের কাছে এক বিস্ময়। এই অদ্বিতীয় মানবকে সযত্নে লালন করতে হবে, যেন কোন ক্রমেই তার স্বকীয়তা বাহিরের প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত না হয় । এই অতুলনীয়তাকে স্বযত্নে গচ্ছিত রাখার দায়িত্ব স্কুলের। বাঁধাধরা পাঠ্যপুস্তক ও সময়ানুবর্তিতা যা সকলের জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য। আর এরই মাঝে কিশোর/কিশোরীর স্বকীয়তায়কে তাদের "ভুলের" মধ্যে ধরে রাখাই হলো স্কুল এর কাজ। কেননা, কিশোর/কিশোরীরা যদি "ভুল" করবার জন্য প্রস্তুত না হয় তবে কখনই সৃজনশীল কিছু করতে পারবে না, যা তাদের নিজস্ব স্বকীয়তার প্রকাশ। তাই সাধারণত স্কুলের গতানুগতিক শিক্ষা ও স্বকীয়তার মাঝে একপ্রকারের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। আর এখানেই ব্যাবহারিক মনস্তত্ত্বের অবস্থান।

ফয়েজুল্লা উচ্চ বিদ্যালয় বগুড়ার উপশহরে করোতোয়া নদীর কোল ঘেসে অবস্থিত। সীমানা প্রাচীর দিকে ঘেরা, প্রশস্ত মাঠ ও আধুনিক বিল্ডিং দিয়ে পরিপূর্ণ একটা বিদ্যালয়। সহশিক্ষার এই বিদ্যালয়ে, সকাল ও বিকালের পাঠক্রমে মোট ১২০০+ ছাত্র/ছাত্রী। গাড় নীল রং এর স্কুল ভূষণে কিশোর/কিশোরীদের উচ্ছাসতায় ভরে থাকে সকাল ও বিকালের উদ্দীপনা। স্কুল ভূষণের ঘাড়ে পেটি ও তাতে স্কুল মনোগ্রাম যেন কঠোর শৃঙ্খলাকে বোঝায়। হুসেইন মনে করে, শিক্ষার একটা বড় অংশ হলো, কৌতূহল এবং সহযোগিতা, সেখানে শৃঙ্খলাবোধ এর উপস্থিতি অনিবার্য।

"শিক্ষা-ই-শক্তি" প্রকল্পের আবেদন পত্রে, হুসেইন উল্লেখ করেছিল কিশোর/কিশোরীর মনস্তত্ত্বের উপর তার গবেষণার কথা। ওর উল্লেখিত বিষয় গুলো ছিলো, ক্লাসে উপস্থিতি, ছাত্র/ছাত্রীদের শৃঙ্খলা, বৈচিত্র্য সচেতনতা, যৌন অসদাচরণ, শিশু নির্যাতন এর মতো প্রয়োজনীও ঘটনার পরিণাম ও সংশোধন নিয়ে প্রস্তাব। দৃঢ় ভাবে উল্লেখ করা ছিলো - আমরা যদি প্রারম্ভিক শিশু বিকাশে মনোবিজ্ঞান প্রয়োগ না করি, তবে আমাদের ভবিষ্যতে বড় ক্ষতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

হুসেইন এর প্রথম দিনটি ছিলো শরৎকালের সকাল, উপরে নীল আকাশ আর সবুজ মাঠে নীল স্কুল ভূষণে ৬০০+ কিশোর/কিশোরীর সকালের সমাবেশ যেন এক অপুরূপ তরঙ্গের সৃজন করেছে। ওর মনে হলো তরঙ্গাই তো সব, ছাত্র/ছাত্রীরা তাদের মনের তরঙ্গে ভেসে বেড়াবে। অনুকূল পরিবেশ হবে, বাধাহীন সন্তরণ। হুসেইন স্কুল এর বারান্দার কিছু অংশের মেঝেতে ও দেয়ালে ত্রিমাতৃক নীল তরঙ্গের ছবি আঁকলো, যার মাধুর্য হলো - সেখান দিয়ে হেঁটে গেলে তরঙ্গের ত্রিমাতৃকতা অনুভব করা যায়। এবং ছাত্র/ছাত্রীদের নীল স্কুল ভূষণ আর নীল তরঙ্গের একটা সময়ের সামঁজস্যবিধান হয়, যা সমলয় ভাবে দেখা দেয়। আর তাই যে আচরণ করছে এবং যে পরিদর্শন করছে, উভয়ই ক্রীড়াকৌতুক আনন্দ পায়। কিশোর/কিশোরীদের মনের প্রসন্নতাই শুধু অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ দিতে পারে। "সৃজনশীল অভিব্যক্তি ও জ্ঞানে আনন্দ জাগ্রত করা শিক্ষকের সর্বোচ্চ শিল্প।"-

আলবার্ট আইনস্টাইন

হুসেইন মনে করে প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীর নিজস্ব একটা গন্ডি থাকবে, এইটাই হলো অন্তস্তল বা মৌলিকতা। ওদের এই স্বার্থপরতা কে সন্মান করতে হবে, যেখানে থেকে উদ্যমিত হবে জীবন। ক্লাস ডেস্ক এর সঙ্গে আধার বা ড্রয়ার আর তাতে প্ল্যাটিকের organizer, সুসজ্জিত ভাবে কলম, পেন্সিল, বই, খাতা ও নিজস্ব জিনিস রাখার ব্যবস্থা। নিজস্বকরণ এই ডেস্ক, ছাত্র/ছাত্রীর নিজের হাতে নাম লেখা। ডেস্ক গুলোতে কোন তালা চাবি নেই, ছাত্র/ছাত্রীরা একে অন্যের একান্ত কে সন্মান করবে। শুধু শ্রেণী শিক্ষক ডেস্ক পরিদর্শন করতে পারবে ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দেবে। এখানেই শুরু হলো ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রথম প্রয়াস। স্কুলে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন মানুষ তৈরি করা যারা নতুন কিছু করতে সক্ষম, অন্য প্রজন্ম যা করে গেছে তার পুনরাবৃত্তি নয়।

আত্মবিশ্বাসীই হলো সফল অগ্রগামীতার পথ প্রদর্শক। হুসেইন মনে করে আত্মবিশ্বাসের বিচ বপন করতে হবে কৈশোরে, নিজের অজান্তে। প্রধান শিক্ষক এর সঙ্গে আলাপ করে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের দিয়ে তাদের এক শ্রেণীর নিচের পাঠদানের ব্যবস্থা করলো। যেমন, ৮ম শ্রেণীর এক ছাত্রী ৭ম শ্রেণীর গণিত এর "পরিমাপ" অধ্যায় এর পাঠদান করালো। এই পাঠদান গুলো নির্দিষ্ট ভাবে গণিত বিষয় থেকে নির্ধারণ করা হলো। গাণিতিক বিষয় কে ব্যাবহারিক রূপ দেবার জন্য। পাঠদান কালে গাণিতিক সমস্যা গুলোর যখন পরিপূর্ণ সমাধান হয় তখন স্বভাবতোই আত্মবিশ্বাস এর জন্ম হয়। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টি কোন থেকে - রোমান দার্শনিক সেনেকা বলেছিলেন, "যখন আমরা শেখাই, আমরা শিখি।" ছাত্ররা যখন অন্য কাউকে একটি বিষয় শেখায়, তখন তারা তাদের নিজেদের তুলনায় বিষয়বস্তু শেখার জন্য অনেক বেশি প্রচেষ্টা করে। একে বলা হয় "Protege Effect"। শেখার সেরা উপায় হল শেখানো। এতে নিঃসন্দেহে বিষয়বস্তু শেখার ক্ষমতার উন্নয়ন, যোগাযোগ দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্বের যোগান দেয়। হুসেইন এর এই পদক্ষেপ ফয়েজুল্লা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝেও বেশ একটা উপলব্ধির সৃষ্টি করেছে। গণিত ও পরিসংখ্যানের শিক্ষক তাহের স্যার এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য ও পরামর্শ দিয়েছিলেন।

হুসেইন মনোবিজ্ঞানের ছাত্র, আর তাই ভালো ভাবেই জানে কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণোদ্যত কতোটা সঙ্কটপূর্ণ। বয়ঃসন্ধিকাল (১০ থেকে ১৯ বছর) হল পাঁচটি মূল ক্ষেত্রে দ্রুত গতির বিকাশের সময়কাল: নৈতিক, সামাজিক, শারীরিক, জ্ঞানীয় এবং মানসিক। হুসেইন চায় এই কঠিন অবস্থায় ছাত্র/ছাত্রীদের সাহায্য করতে। এমন একটা পরিবেশ তৈরী করতে যাতে কৈশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্কে রূপান্তর করতে সাহায্য করবে। এখানে ছাত্র শিক্ষক সবার পূর্ণ অংশগ্রহণ দরকার। এই সমস্যাটাকে হুসেইন শিক্ষকদের অনুকূলে নিয়ে কিছু দিক নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণে উৎসাহিত হলো। কারণ, বয়ঃসন্ধিকালে কিশোররা বড়দের কথা শুনে না, কিন্তু তারা বড়দের অনুকরণ করে। তাই চাই কিশোর/কিশোরীদের সামনে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন। কিশোর/কিশোরীরা জীবন থেকে শিক্ষা নেয়, আর সেই শিক্ষা দিয়েই জীবন তৈরী করে। হুসেইন এই বয়ঃসন্ধিকালের বৈচিত্র কে সম্বোধন করতে বেশ কয়টা পদক্ষেপ নিলো।

শিক্ষক-শিক্ষক বৈচিত্র্য সচেতনতা: নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সবার আছে, তার মাঝেই পরস্পরের সন্মান বোধকে ধরে রাখতে হবে। একজনার আচরণ, বেশভূষা, ধর্ম ও শারীরিক ভঙ্গি অন্যের চেয়ে আলাদা হতেই পারে। একজন আর

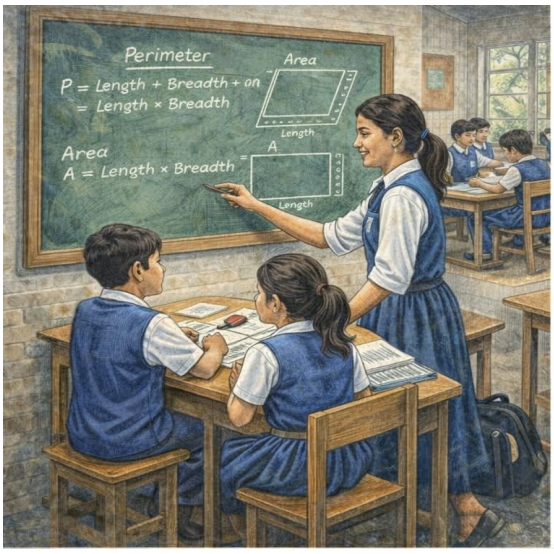

একজনের কাছে সাহায্য চাইতেই পারেন। এই সদাচরণ নিয়ে হুসেইন ২০ মিনিট এর ভিডিও বানালো। যেখানে স্কুল কর্মক্ষেত্রকে উপস্থাপন করা হলো নাটকের মাধ্যমে। শিক্ষক-শিক্ষককে সাহায্য, বিশ্বাস, আলোচনা ও সম্মোধন, শৃঙ্খলা, সোহানুবর্তিতা, প্রশংসা, সহমর্মিতা, মর্ম উপলব্ধি, গুণগ্রহণ, অন্তর্ভুক্ত বা ধারণ করা, বৈষম্যহীনতা, দল গঠন, যৌক্তিক সমালোচনা ও এই সকল এর চর্চা। ২০ মিনিট ভিডিও দেখবার পর, ২০ টা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে শিক্ষকদের। যেখানে থাকবে, জ্ঞানকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি, সমালোচনামূলক যুক্তি, দক্ষতা তীক্ষ্ণ করা, বোঝাপড়া প্রদর্শন করা ও একে অপরের সাথে গঠনমূলকভাবে জড়িত হওয়া। শিক্ষক-শিক্ষক এর আচরণ বিধির একটাই উদ্দেশ্য, ছাত্র/ছাত্রীদের সুউচ্চ নৈতিকতার প্রদর্শন, যা থেকে ওরা শিক্ষা নেবে। হুসেইন এটাও জানে, এই আচরণ বিধি উন্নয়নের কোন শেষ নেই, নেই কোন সারগ্রন্থ। অনেক ক্ষেত্রেই এর উন্নয়ন সম্ভব। এর মাঝে ছাত্র/ছাত্রীদের মনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে স্কুলই যেন তাদের শেষ লেখাপড়ার

অবস্থান না হয়। তাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া দেখাতে হবে।

শিক্ষক-ছাত্র/ছাত্রী বৈচিত্র্য সচেতনতা: শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পর্ককে যত্নশীল সংযোগ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এই সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের স্থিতিস্থাপকতা এবং স্ব-নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা তৈরিতে সহায়তা করে। ব্যর্থতার ঝুঁকিতে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি সুরক্ষামূলক সম্পর্ক। একই সঙ্গে সামাজিক-মানসিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। আবার, এই সম্পর্কে আছে কঠোর সীমানা, স্কুল-প্রদত্ত নির্দেশিকা এবং ছাত্রদের মানসিক চ্যালেঞ্জগুলির উপর কাজ করার জন্য একটি সম্পূর্ণ স্কুল পদ্ধতি। হুসেইন তার অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে বিস্তৃতভাবে সঠিক কিছু নীতিমালা তৈরী করলো। যা ৩৫ মিনিট ভিডিওর মাধ্যমে দেখালো এবং বিষয় গুলো হলো যৌন হয়রানি, যৌন অসদাচরণ, শিশু নির্যাতন ও সংস্কৃতি ও খেলাধুলা কালীন প্রশিক্ষণ (যেহেতু সহশিক্ষা)। কৈশোর ও যৌবনের এই বয়ঃসন্ধিকালে, এ বিষয় গুলো উপেক্ষা করা হবে বোকামি। হুসেইন নিজেকে শিক্ষার্থীদের উপদেষ্টা হিসাবে, প্রতিদিন ১০:৩০-১২:৩০ টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের যে কোন অভিযোগ ও আবদার মীমাংসা করবার জন্য নির্ধারণ করলো। হুসেইন জানে যখন কিশোর/কিশোরীরা গ্রহণযোগ্যতা এবং বন্ধুত্বের সাথে বেড়ে উঠে তখন সে পৃথিবীতে ভালবাসা খুঁজে পেতে শেখে।

হুসেইন জানে, স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের শেখার সময় এবং খেলার সময়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মনোবিজ্ঞানের ছাত্র হওয়াতে, হুসেইন চাইলো আরও উপাত্ত, তাই প্রতি শিক্ষক মাসে এক জন শিক্ষার্থীর সম্পর্কে লিখবে, শিক্ষার্থীর মনোভাব, তার সমস্যা ও সমাধান। হুসেইন, মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, কিশোর/কিশোরীদের সাথেই আমাদের যৌক্তিক জ্ঞান, গাণিতিক জ্ঞান, শারীরিক জ্ঞান এবং আরও অনেক কিছুর বিকাশ অধ্যয়ন করার সর্বোত্তম সুযোগ রয়েছে। মূলত ফয়েজুল্লা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটা পরিবেশ পেল যেখানে সমস্ত শিক্ষার্থীরা স্কুলে সংযুক্ত বোধ করে এবং শিক্ষকেরা তাদের ছাত্র/ছাত্রীদের জানে।

"শিক্ষার পুরো উদ্দেশ্য হল আয়নাকে জানালায় পরিণত করা।"- Sydney J. Harris

"চিন্তাশীল ডিজিটাল নাগরিক তৈরির প্রয়াস"

রু. মির্জা ও আনুহলা উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে যেন একটা বন্ধন। মির্জার শুধু একটাই আশা, এই বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীরা যেন কম্পিউটারে পারদর্শী হয়। Generation Z এর দক্ষতা পরিপূর্ণ ভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া জরুরি। Coding বা programming এই Generation Z এর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা। মির্জার দৃঢ় ধারণা "কম্পিউটার প্রযুক্তি আমাদের জীবনে এতটাই অন্তর্নির্মিত যে এটি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে দরকার এমনকি শিল্পীর চিত্র অংকনেও"। এই প্রযুক্তি অগ্রসর হচ্ছে কল্পনাতিত ভাবে, আর তাই আজ যারা স্কুল এর ছাত্র/ছাত্রী তারা ৫-১০ বছর পর কোন প্রকারের কম্পিউটার প্রযুক্তির সম্মুখীন হবে তা আমরা কেউ জানি না। তাই চাই, কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সত্তয়ার হয়ে সময়ের সাথে থাকা। মির্জা জানে, আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষা কম্পিউটারে সীমাবদ্ধ নয়, যেমনটি জ্যোতির্বিদ্যা দূরবীনে নয়। Machine Learning (ML) আর Cloud Computing ইতিমধ্যে সবার পকেটের মোবাইল ফোনে আর সামাজিক যোগাযোগ ও ইন্টারনেট এ। আগামী প্রজন্মকে কম্পিউটার প্রযুক্তিকে করায়ত্ত করতেই হবে। এই কম্পিউটারের সফটওয়্যার প্রযুক্তি অদৃশ্যে বসে অলক্ষ্যে আমাদের জীবন ও চিন্তাকে শাসন করে যাচ্ছে। তাই চাই কম্পিউটার প্রযুক্তির সম্মুখ ধারণা ও ব্যবহার; এর কোন বিকল্প নেই। আমাদের প্রজন্মকে প্রযোগবিদ্যায় পারদর্শী করতেই হবে। প্রচলিত ও প্রথাগত স্কুল শিক্ষা যা মনুষ্যত্ব অর্জনের সহায়ক, তারই মাঝে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার স্থান করে দিতে হবে সযত্নে। বিদ্যালয়ের ১০-১৯ বছর বয়সের উৎফুল্ল ও অনুসন্ধিৎসুলভ মনকে সফটওয়্যার প্রযুক্তির ছাঁচে গড়তে হবে। কম্পিউটারের প্রসেসিং শক্তিতে ভর করে, প্রোগ্রামিং মনকে সাজাতে হবে, যেখানে Object Oriented প্রোগ্রামিং ধারণা অত্যাবশ্যক। তা হলো, জটিল সমস্যার কারণটি নির্ণয় করা, লক্ষণ নয়। এই (OOP) মানুষের তাত্ত্বিক চিন্তা শক্তির আবিষ্কার, যা কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং এর জন্য বহুল অংশে প্রযোজ্য। এই কঠিন ও সময় উপযোগী পদক্ষেপ মির্জাকে ভাবায়। সে এটাও জানে, ছাত্র/ছাত্রীদেরকে শুধু উৎসাহ দিলেই হবে, open souce software ও hardware সহজলভ্য। কারণ, প্রযুক্তিগত সমতা দিকে পৃথিবী এগুচ্ছে। প্রযুক্তিগত সমতা, যা আর্থ-সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণে শেখার সরঞ্জামগুলির ব্যবহারের কোন বৈষম্য করে না। এই সুযোগটা নিতেই হবে, বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল গুলোতে। তবেই "ডিজিটাল বাংলাদেশ" পরিপূর্ণতা পাবে। চিন্তাশীল, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নাগরিকরাই দেশের পরিবর্তন করতে পারে; এতে কোন সন্দেহ নেই।

"শিক্ষা-ই-শক্তি" প্রকল্পের আবেদন পত্রে, মির্জা উল্লেখ করেছিল কম্পিউটার ও সফটওয়্যার এর কথা। ওর উল্লেখিত বিষয় ছিলো Artificial Intelligence (AI) এর ভবিষ্যত ব্যবহার ও সেই জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। পরিষ্কার ভাবে বলা ছিলো, ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চাকরি তৈরি করবে। সম্ভাবনা রয়েছে যে 2030 সালের মধ্যে AI বেশিরভাগ মানসিক কাজে মানুষের চেয়ে এগিয়ে যাবে কিন্তু এর মানে এই নয় চাকরি কেড়ে নেবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভবিষ্যত হলো, কম কৃত্রিম ও আরও বুদ্ধিমান। আর তাই আমাদের প্রজন্মকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করতে হবে। যা স্কুল থেকে শুরু করা বাঞ্ছনীয়। "শিক্ষা-ই-শক্তি" প্রকল্পের নিয়োগ পত্রে মির্জার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগতম জানিয়ে বলেছিলো, "প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এত দ্রুত এবং গভীরে, তা শুধু আপনার মতো নতুন প্রজন্ম অনুধাবন করতে পারে। আপনার প্রতিটি কার্যকরী পদক্ষেপের সঙ্গে "শিক্ষা-ই-শক্তি" থাকবে।" এই টুকুই মির্জাকে সাহস যুগিয়েছে শতগুণ।

আনুহলা উচ্চ বিদ্যালয় ও আনুহলা সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয় একই জায়গায়, বেশ একটা বিদ্যায়তনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সহশিক্ষার এই বিদ্যালয় ছেলেদের স্কুল পরিধান খয়েরি প্যান্ট সাদা শার্ট, মেয়েদের সাদা পায়জামা ও সবুজ জামা যা সাদা ওড়নায় জড়ানো। মির্জার বিশ্লেষণাত্মক মন, সকালের সারীবদ্ধ সমাবেশ টাকে কেন যানি, row আর column এর matrix মনে হলো, আর এর প্রতিটা cell এ অতি মূল্যবান্ তথ্য যা এই স্কুল প্রাঙ্গণ টা কে একটা super-computer এর রুপ দিয়েছে। কতোটাই না যত্ন করা উচিৎ একএকটা মস্তিষ্ককে; কতোটাই না ভালোবাসা দরকার! কারণ, মস্তিষ্ককে যখন ব্যবহার করা হয় তখন আমাদের খুব ভাল লাগে, আমরা কোনকিছু বোঝা বা উপলব্ধির আনন্দ অনুভব করি। মির্জা জানে, মানব মস্তিষ্ক আমাদের শারীরিক ক্ষমতাকে অতিক্রম করে গাণিতিক সমাধানপদ্ধতি এবং পরিসংখ্যানগত নকশাগুলোর সমন্বয় করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য data model থেকে কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে - মানবের জৈবিক নিউরাল নেটওয়ার্কের গঠন এবং কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে একটি গণনামূলক নকশাই হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। একবার যদি এই গণনামূলক নকশা স্কুল ছাত্র/ছাত্রী দের হাতে দেওয়া যায়, তা হলে ওদের উচ্ছলতা থেকে আরও অনেক মানব-মেশিনের মিথস্ক্রিয়ায় (man-machine interactions) সাফল্য অর্জন করবে।

মির্জা কম্পিউটার বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে সুবিন্যাস করলো।

- ৬ষ্ঠ শ্রেণীর "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" বই এ ৫টি অধ্যায় আছে:

অধ্যায়-১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিচিতি

অধ্যায়-2. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি

অধ্যায়-৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার

অধ্যায়-৪. ওয়ার্ড প্রসেসিং

অধ্যায়-৫. ইন্টারনেট পরিচিতি।

অধ্যায়-৬. "Operating System" নতুন অধ্যায়।

যখন ছাত্র/ছাত্রীরা কম্পিউটারের সামনে বসবে তখন যেন তারা কম্পিউটারের তথ্য আদান প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কে নিজেদের মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে। তাদের যেন পরিষ্কার ধারণা থাকে, ঠিক এই মুহূর্তে কম্পিউটার কোন কাজটা করছে। তাই, Operating System বা কম্পিউটারের চালিকা শক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন OS এর গঠন ও বিন্যাস ও কার্যকরীতা এই

অধ্যায়ে বিস্তৃত হল। মির্জা দেখালো, বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালাতে কম্পিউটারের কতোটা memory, hard disk, CPU, প্রোগ্রাম thread, প্রোগ্রাম priority, সঙ্গে interface, queuing এবং interrupts. মির্জার উদ্দেশ্য হলো কম্পিউটারের জটিলতা ছাত্র/ছাত্রীদের কাছে তুলে ধরে ওদের আগ্রহ জাগানো। পুরোন কম্পিউটার গুলো এনে, একটা কম্পিউটার যাদুঘর বানালো, যাতে ছাত্ররা জানতে পারে কম্পিউটার hardware ও OS এর ক্রমবিকাশ। মির্জা মনে করে এই ক্রমবিকাশ জানা দরকার, তা হলেই শুধু developer হতে পারবে; নতুবা user হয়েই থাকতে হবে। মোবাইল ফোনের Android OS উপর বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা রাখলো, Apps দিয়ে। ছাত্র/ছাত্রীরা কম্পিউটার/মোবাইল পরিচালনার অন্তস্তল ধারণা পেলো।

-৭ম শ্রেণীর "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" বই এ ৫টি অধ্যায়ের:

১. প্রাত্যহিক জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
২. কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি
৩. নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার
৪. ওয়ার্ড প্রসেসিং
৫. শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার।
৬. Web Page Design নতুন অধ্যায়।

এখানে থাকবে হাতে-কলমে HTML মার্কআপ ভাষার ব্যবহার। একই সঙ্গে CSS স্টাইল শীট ভাষা যা HTML মতো মার্কআপ ভাষায় লেখা একটি নথির উপস্থাপনা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই Web Page Design অধ্যায়ের জন্য মির্জা একটা ব্যবহারিক বই লিখলো। যেখানের (replit.com) প্লাটফর্ম কে ব্যবহার করা হয়েছে। Replit হল সফ্টওয়্যার তৈরি এবং শেয়ার করার একটি প্ল্যাটফর্ম। এখানে HTML কোড লিখা যায় এবং ফলাফল দেখা যায়। কীভাবে HTML কোড করতে হয় তা শিখতে replit একটি জায়গা, বিশ্বের অনেক বিদ্যালয় এটা ব্যবহার করে। আনুহলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের সকলের নিজস্ব Web page আছে, সুন্দর design করা। ইন্টারনেট এর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে Web Page Design চিন্তা, ইন্টারনেট ব্যবহারকে আরো উপভোগ্য করে তোলে।

-৮ম শ্রেণীর "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" বই এ ৫টি অধ্যায় হলো:

অধ্যায়-১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব
অধ্যায়-২. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক
অধ্যায়-৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার
অধ্যায়-৪. স্প্রেডশিটের ব্যবহার
অধ্যায়-৫. শিক্ষা ও দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের ব্যবহার।
অধ্যায়-৬. Scratch Programming নতুন অধ্যায়।

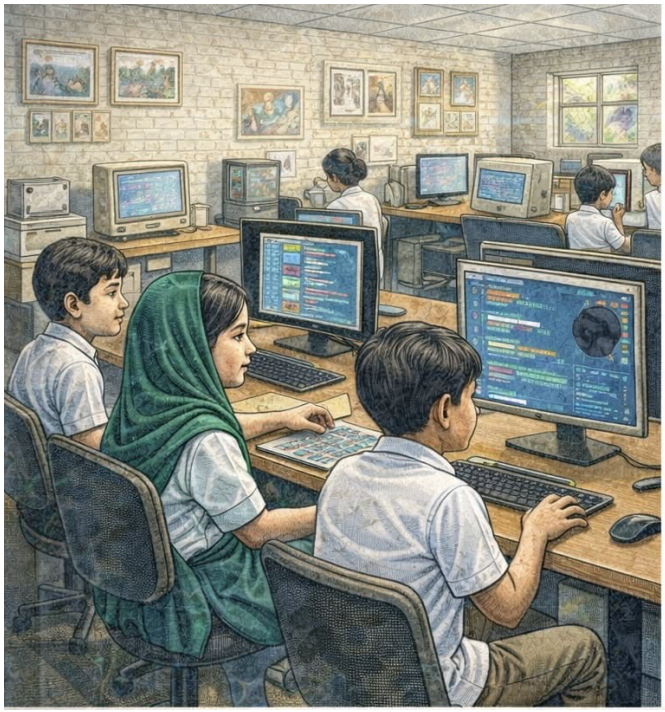

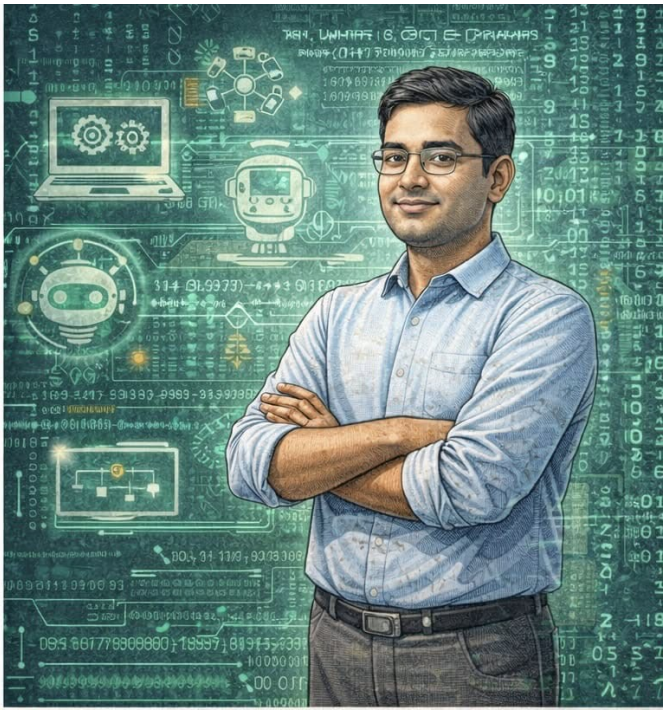

Scratch হল স্কুল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম কোডিং সম্প্রদায় এবং একটি সাধারণ চাক্ষুষ বর্ণনা সহ একটি প্রোগ্রামিং ভাষা যা তরুণদের ডিজিটাল গল্প, খেলা এবং প্রাণবন্ততা তৈরি করার জায়গা। মির্জা এই প্রোগ্রামিং মঞ্চকে স্কুল ছাত্রদের জন্য সৃজনশীল করে গড়ে তুল্লো। ছাত্র/ছাত্রীরা তাদের প্রোগ্রামিং কৌশল ও ছবি দাগানোর অনুশীলন করলো। এই পর্যায়ে মির্জা একটা প্রতিযোগিতার ব্যাবস্থা করলো। তিন দিন ধরে Programing bootcamp হলো, সঙ্গে প্রতিযোগিতা। প্রোগ্রামিং এর প্রথমিক ধারণা ও অনুশীলন কিশোর/কিশোরীদের বিশ্লেষণাত্মক করে তোলে এবং Scratch Programming (MIT এর তৈরী) বেশ উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক।

-৯ম-১০ম শ্রেণীর "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" বই এ ৬টি অধ্যায়:

অধ্যায়-১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আমাদের বাংলাদেশ

অধ্যায়-২. কম্পিউটার এবং কম্পিউটার ব্যবহারকারী নিরাপত্তা

অধ্যায়-৩. আমার শিক্ষা ইন্টারনেট

অধ্যায়-৪. আমার লেখালেখি ও হিসাব

অধ্যায়-৫. মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স

অধ্যায়-৬. ডাটাবেজ-এর ব্যবহার।

অধ্যায়-৭. Machine Learning using Scratch Programming নতুন অধ্যায়।

Machine Learning বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাতে ধারণা দেওয়া হলো,

- Supervised Machine Learning,
- Unsupervised Machine Learning ও
- Self-Supervised Machine Learning এর।

এই অধ্যায়ের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে হাতে-কলমে করবার জন্য মির্জা শুপ্রতিষ্ঠিত কিছু Open Source সুবিধাগুলোকে ব্যবহার করল। (https://machinelearningforkids.co.uk) ও (https://studio.code.org/s/oceans/lessons/1/levels/1)

এই Machine Learning অধ্যায়কে আরো কার্যকরী করবার জন্য, মির্জা কিছু খোলা প্রশ্ন রাখলো, যা এখনো সমাধান হয় নি। যেমন, কীভাবে গাণিতিক সমাধানপদ্ধতি (algorithm) তুলনা করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়? এই প্রশ্নগুলিকে ছাত্রের নিজস্ব শব্দে বিষয়ভিত্তিক তথ্য খুঁজে বের করে ব্যাখ্যামূলক ভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এই পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রারম্ভিক অঙ্ক (algorithm), Neural Network ও Fuzzy Logics সহ বিভিন্ন উপাদান কে সংযুক্ত করা হলো। মির্জার একটাই চাওয়া, ছাত্র/ছাত্রীরা যেন উৎসাহ পায়, অনেক অনেক প্রশ্ন করে জড়িয়ে যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায়। Expert systems, natural language processing, speech recognition and machine vision এই সকলের মধ্য থেকে একটা প্রকল্প করে দেখাতে হবে এবং প্রতিবেদন লিখতে হবে। AI অথবা Machine Learning সম্পর্কে শেখা কিশোর/কিশোরীদের জন্য মজাদার এবং আকর্ষণীয়।

-১০ম শ্রেণী, নবম ও দশম শ্রেণীর একটাই "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" বই। "Programming Techniques" নামে ৮-তম অধ্যায় যোগ করল মির্জা। এই অধ্যায়ে বিষয় গুলো Python ও JavaScript ভাষায় প্রোগ্রামিং।

১. অসংগঠিত প্রোগ্রামিং

২. পদ্ধতিগত প্রোগ্রামিং

৩. মডুলার প্রোগ্রামিং ও

৪. অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (OOP) এর অনুশীলন। এখানে OOP ধারণাকে প্রাধান্য দেওয়া হল। মির্জা এখানেও (replit.com) কে ব্যবহার করলো, এবং শুনির্দিষ্ট ভাবে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে প্রোগ্রামিং মানসিকতার সঙ্গে পরিচয় করালো; "কম্পিউটারের জন্ম হয়েছে এমন সমস্যা সমাধানের জন্য যা আগে ছিল না।"। আনুহলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীরা জানলো, প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে ভুল হলো অভিজ্ঞতার আর এক নাম।

আনুহলা উচ্চ বিদ্যালয়ের কম্পিউটার পরীক্ষাগার (laboratory) কে সাজানো হলো তিনটি স্তরে:

১. স্বতন্ত্র কাজের এলাকা

২. সহযোগিতা এলাকা

৩. সামাজিক এলাকা।

পরীক্ষিত যে, আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রযুক্তিগত উপকরণ গুলিকে যত সীমিত ব্যবহার করা হবে, শিক্ষার মান তত কম হবে। তাই কম্পিউটার পরীক্ষাগারের অবদান শিক্ষার মানের সঙ্গে জড়িত। শেখার অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য মির্জা কম্পিউটার পরীক্ষাগারকে সৃজনশীল ভাবে এই তিনটি স্তরে সমন্বয় করলো। যা খুবই উপকারী ও সকল ধরণের শিক্ষানবিশ কে উপযুক্ত এলাকার সুবিধা দেয়া যায়।

মির্জার চিন্তায় "আমরা প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বকে পরিবর্তন করছি, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার প্রযুক্তি এবং সমাজের সংযোগস্থলে নতুন প্রতিযোগিতার জন্ম দিচ্ছে।" এই প্রতিযোগিতাকে মোকাবেলা করার জন্যই আনুহলা উচ্চ বিদ্যালয়ের এই প্রয়াস।

ধনুক-ভাঙা পণ: ১০

"ভালোবাসা, বিশ্বাস আর মানবতার"

এস. সুলতানা "বৃষ্টি" ও কুষ্টিয়ার চৌরহাস প্রাইমারি স্কুল যেন একই আত্মার দুই রুপ। বৃষ্টির মৌলিকটা হলো, ইসলাম ধর্ম ও মানবতা। মানুষ মাত্রই মানবতার কান্ডারি, আর তাই সর্বশ্রেষ্ঠ এই মানবজাতি। চৌরহাস প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের বয়স ৬-১১ বছর, এ এক পরিষ্কার পারিস্ফুটিত কুসুমের প্রকাশ কাল। সৃষ্টিকর্তার মানবতার আদর্শে গড়া, সরল সহজ সময়। শিশুরা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় নেয়ামত (আশীর্বাদ)। বৃষ্টি বিশ্বাস করে, ৬-১১ বছরের শিশু/কিশোরদের আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানবতায় ভরা মানুষে পরিণত করতে হবে। শিশুরা পরিবারের আমানাহ (বিশ্বাস)। অতএব, সন্তানকে সৎভাবে লালন-পালন করা পরিবার/স্কুলের জন্য ফরজ (কর্তব্য)। শিশুদের পিতা/মাতার জন্য এ এক আশীর্বাদ একই সাথে নৈতিক দায়িত্ব। সন্তানদের তাদের পিতামাতার উপর কিছু অধিকার আছে; তাদের আশ্রয় দেওয়া, খাওয়ানো, বস্ত্র দেওয়া, শিক্ষিত করা, সমর্থন করা, লালন-পালন করা এবং তাদের ভালবাসা পরিবারের দায়িত্ব। বৃষ্টির জীবন-পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আদর্শ, যিনি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ বয়ে এনেছেন। তিনি হাসিমুখে বিশুদ্ধ, মার্জিত ও সুন্দরভাবে কথা বলতেন। শিশুদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সর্বদা মমতাময়ী ও করুণাময়। যা শিক্ষা দেয় বিনয়ীভাব ও ভদ্রতা। ৬-১১ বছরের শিশু/কিশোরদের যদি এই শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়, তবে যৌবনে বিনয়ী হয়ে জীবনের মানে খুঁজে নিতে পারবে। সময়ের সাথে জীবনের নৈতিকতা ক্রমবর্ধমান, তাই প্রয়োজন জীবনের শুরুতেই এমন একটা পরিবেশের সময় উপহার দেওয়া যা আত্মার প্রশান্তিতে ভরপুর থাকবে। ভালোবাসা আর বিশ্বাসের জন্ম দিতে হবে এই বয়সে। ভালোবাসা আর বিশ্বাসের মাধ্যমে শিশু মনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে সংযম, নৈতিকতা আর সহানুভূতিতা যা পরবর্তীতে রুপ নেবে ইসলাম ধর্মে আর মানবিকতায়। স্কুলের শিক্ষাদান তখনি সম্পূর্ণ যখন ছাত্র শিক্ষক এর মাঝে ভালোবাসা আর বিশ্বাসের বন্ধন থাকবে, যা জন্মদিবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আর তাই বৃষ্টির চিন্তায় ছাত্রদের সঙ্গে সময় নিয়ে খেলাধুলা, খেলাধুলার উৎফলতা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরী করে।

"শিক্ষা-ই-শক্তি" প্রকল্পের আবেদন পত্রে, বৃষ্টির সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল শিশু/কিশোরদের উন্নত মন মানুষিকতার প্রতি খেয়াল রেখে স্কুল পাঠ্যক্রম সাজানো। লেভ ভাইগটস্কির মতে, শিশুকে কী বলা হচ্ছে, কীভাবে বলা হচ্ছে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তাদের বিকাশের ক্ষেত্রে। শিশু মনে ধারণা জন্ম নেয় নাম করণের মাধ্যমে, তাই মহান সৃষ্টিকর্তার অনুকূল্যের কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাম দিয়ে ধারণা দিতে হবে। যেখানে থাকবে ভালোবাসা আর বিশ্বাসের অবস্থান। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও প্রশিক্ষণ দেবার কথা বৃষ্টি উল্লেখ করেছিল। শিশুদের বিকাশের পর্যায়ে সামাজিক গঠনবাদ অতি জরুরি, সামাজ থেকে সম্মুখ ধারণা ওদের অর্থ বুঝতে সাহায্য করে। "শিক্ষা-ই-শক্তি" প্রকল্পের নিয়োগ পত্রে বৃষ্টিকে উৎসাহিত করে বলা ছিলো, শিশু/কিশোররা জাতীর ভবিষ্যত, ওদের পরিপূর্ণ বিকাশ ও মানবিক গুনের উপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের ভবিষ্যত। নৈতিক অবক্ষয় রোধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। ধর্মীয় ও নৈতিকতাই হোক আমাদের পথ চলার পাথেও। বৃষ্টির জন্য এই কথা গুলো ছিলো ভীষণ অনুপ্রেরণা মূলক।

প্রথম দিন বৃষ্টি জগতি স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে যখন চৌরহাস প্রাইমারি স্কুল পৌঁছিলো, তখন স্কুলের ছুটির সময়। শিশু কিশোররা তখন স্কুল সদর দরজায় অপেক্ষমান অভিভাবকদের কাছে দৌড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি এতো গুলো শিশুকে এক সঙ্গে দেখে খুবই পুলকিত ও নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করলো। ওর মনের পরিপূর্ণতায় দেখতে পেলো এক ঝাঁক প্রজাপতি। বৃষ্টির সঙ্গে কথা/দেখা হলো স্কুল প্রশাসন ও স্যার ম্যাডাম দের, সব কিছুর মাঝে স্কুল এর পরিবেশটা ওর কাছে আদর আর স্নেহতে ভরা রঙ্গিন মনে হলো, যা একটা প্রাইমারি স্কুল এর জন্য অবশ্যক।

পরের দিন অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ অগ্রহায়ণ মাস। শীতের আগমনী, সকালের সূর্যের ঝিকি-মিকি আর মাঠে শিশুদের কিছির-মিচির, বৃষ্টি এমন একটা স্বপ্ন দেখেছিলো বলে মনে হলো, অলীক কিন্তু পরিচিত এই দৃশ্য। একে অন্যের ঘাড়ে দু-হাত রেখে শরীবদ্ধ ভাবে অ্যাসেম্বলি যেন একটা পবিত্রতাকেই প্রকাশ করছে। ফেরেস্তাদের মতো শিশুরা, হাসিতে আর উচ্ছাসে শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুন্দর্যকে প্রকাশ করছে। ঠিক তখনই, বৃষ্টির এই হাদিসটা মনে পড়লো, "জনৈক ব্যক্তি এক বালকের গালে চপেটাঘাত করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এভাবে গালে চপেটাঘাত করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদমকে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন" (মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হাদিস/২৮৪৬)।

বৃষ্টি মনে করে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বিদ্যালয় বলাটা সমীচীন নয়। কেননা বিদ্যালয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই, প্রাথমিক বিদ্যালয় আদর আর স্নেহে পরিপূর্ণ থাকবে। শিশুরা আল্লাহ তাওয়ালার বড় আশীর্বাদ এবং পরিবারের জন্য বিশ্বাস। বৃষ্টির এই দৃটিভঙ্গি ও জ্ঞান এর কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর নাতি হাসান ও হুসাইন এর জন্য দোয়া করতেন এই বলে যে, "ইয়া আল্লাহ আঁমি হাসান-হুসাইনকে ভালোবাসি আঁপনিও তাঁদেরকে ভালোবাসুন এবং যে তাঁদেরকে ভালোবাসে আঁপনি তাঁদেরকেও ভালোবাসুন।" (মিশকাত, তাহক্বীক্ব সানী ৬১৫৬)। এই দোয়াটায় একটা মুষ্টিমেয় রুপ আছে, আছে আদর আর স্নেহের ছড়াছড়ি ও উষ্ণতা। বৃষ্টি প্রতিদিন সকালে এই দোয়াটাই সকল শিশুদের জন্য আল্লাহ তাওয়ালার কাছে পেশ করে। মনে প্রাণে একটা প্রশান্তি নিয়ে দিন শুরু করে।

বৃষ্টির ২য় শ্রেণীর ক্লাস শিক্ষিকা ও ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর (৬-৮ বছরের শিশুরা) বাংলা বিষয় "আমার বাংলা বই" এর ক্লাস নিবে, প্রতিদিন ৩টা ক্লাস। বৃষ্টি "অভিভাবক আলাপন" বলে একটা খাতা বানালো, যেখানে প্রতিদিনের উল্লেখিত কথা লিখবে শিক্ষক তার শিশু ছাত্র সম্পর্কে যা অভিভাব দেখবে। সপ্তাহের একদিন বৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন অভিভাবকে ৩০ মিনিট এর ক্লাস নিতে বল্লো। অভিভাবক এসে শিশুদের সঙ্গে খেলবে বা ছবি দাগাবে বা কিছু করে দেখাবে। বৃষ্টি মনে করে অভিবাবকদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা খুবই দরকার, এতে স্কুল ও শিক্ষকদের প্রতি অভিবাবকদের আস্থা থাকে, যা কার্যত একটা বড় পরিবারকে উপস্থাপনা করে শিশুদের মনে। শিশুদের আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে ওঠা প্রয়োজন এতে নিজের প্রতি আস্থা জন্ম নেয়। এই নিরাপত্তার মানসিক অনুভূতিই শিশুদের কৌতূহলী করে তোলে। বৃষ্টি জানে, হাঁটু গেড়ে বসে ভালবাসা এবং সহানুভূতি সহ শিশুদের চোখে চোখ রেখে ওদের সঙ্গে আলাপচারিতার কোন বিকল্প নেই। বৃষ্টির একটাই উদ্দেশ্য, সকল শিশুদের নাম ও তাদের প্রয়োজন জানা।

শিক্ষকের উচিত শিশু ছাত্রের সীমাহীন সম্ভাবনাকে প্রতিভাসিত করা। ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান এবং সামাজিক দক্ষতার মাধ্যমে। স্কুল ছাত্ররা নিজ সন্তান তুল্য, ওদের জীবনের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি দেওয়াই হলো স্কুল এর কাজ। আবেগপূর্ণ বন্ধন এবং পারস্পরিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠাতেই বৃষ্টির যত চেষ্টা। "সকালের সরলতা" বলে ২০ মিনিট এর একটা উপদেশ মূলক ব্যাবহারিক দিক শেখানো হয় প্রতিদিন। যেমন, একদিন বলুনে সবার নাম লিখে, নিজের নাম খুঁজে বের করার খেলা। যেখানে, নিজের নাম না খুঁজে অন্যের নাম পেলে তাকে দিয়ে দিলে, অতি সহজেই সমাধান পাওয়া যায়। সহপাঠীদের ভালোবাসা ও সাহায্য করা, গাছে পানি দেওয়া, অবলা জীব জন্তুদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো, নম্রতা, ভদ্রতা, নৈতিকতা ... এই সকলের প্রশিক্ষণ "সকালের সরলতা"য় থাকে। বৃষ্টি "সকালের সরলতা"র বিভিন্ন কার্যক্রমের একটা বই লিখলো, ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর জন্য। যেখানে ইসলাম ধর্মের মূল মন্ত্র নম্রতা, ভদ্রতা, নৈতিকতা স্থান পেয়েছে। এক বছর পরে, বাংলাদেশ সরকার বৃষ্টির এই বই বাংলাদেশ শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করলো। এমনি ছিলো, বৃষ্টির বই এর কথাগুলো, যা জীবন চলবার জন্য অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, “তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক জুড়ে চল যে তোমার সাথে তা নষ্ট করতে চায়, তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং হক কথা বল; যদিও তা নিজের বিরুদ্ধে হয়।” (ইবনে নাজ্জার, সহীহুল জামে ৩৭৬৯ নং)।

বৃষ্টি চায় শিশু মনের গর্ব, তার পরিবার ও সম্প্রদায়কে নিয়ে। আর তাই শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে ও সম্পর্কিত বিষয়বস্তু গুলোকে। শিক্ষার্থীরা স্থানীয় শিল্প, জীবনযাত্রার পরিবেশ এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কাজ সম্পর্কে জানবে। শিশুরা যে অঞ্চলে বসবাস করে সেই অঞ্চলের উন্নয়নে অবদান রেখেছে এমন সব। যা শিশুদের মনে গভীর চাপ ফেলবে, স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য গর্ব এবং স্নেহকে বাড়িয়ে তুলবে। কুষ্টিয়ার তিঁলের খাঁজা, অশোক মিষ্টান্ন ভান্ডার, মৌবনের রসমালাই, কুমারখালীর রমেশের রশগোল্লা, লালন শাহের মাজার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি, প্রথম রেলওয়ে স্টেশন পোড়াদহ রেলওয়ে জংশন, মীর মশাররফ হোসেনের বাসভিটা, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, ইত্যাদি ছিলো স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত করার প্রয়াস। বৃষ্টি জানে নিজেকে চিনতে হলে নিজের পারিপার্শিকে আগে জানতে হবে। শিশুদের মনের গর্ব ওদের সাহস যোগাবে। শিশুর ভাবনা-চিন্তা সামাজিক স্তর থেকে শুরু হয়, আর তাই এই প্রচেষ্টা।

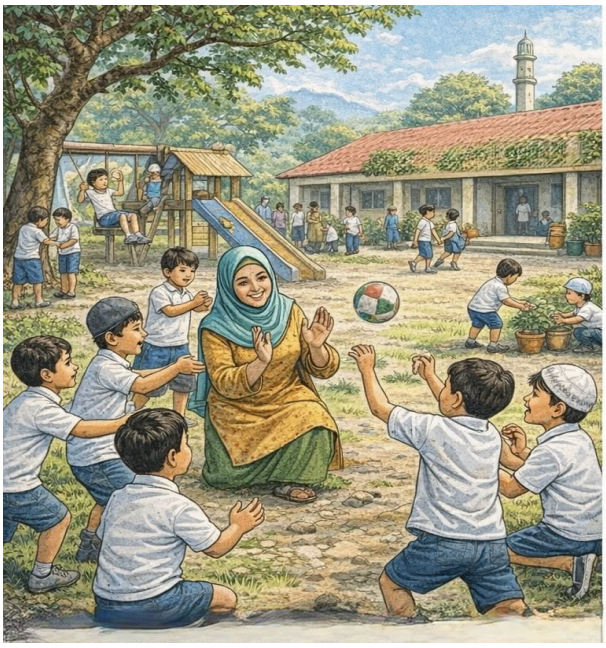

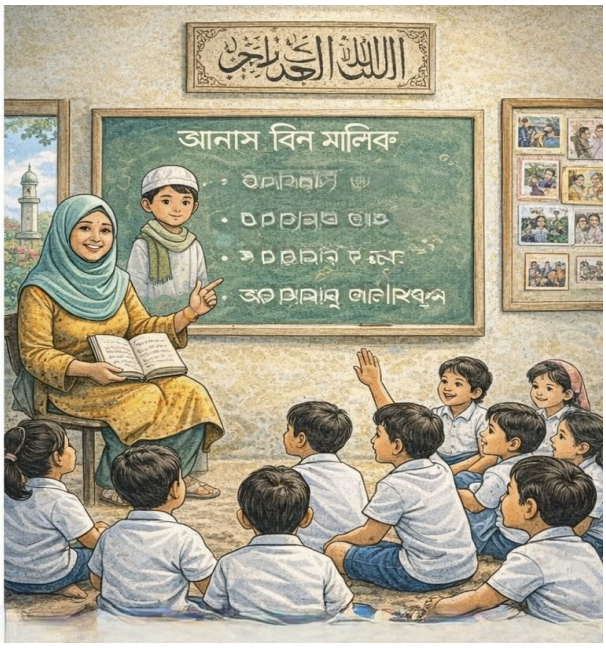

শিশুরা ৩-৭ বয়সসে একটা ব্যক্তিগত স্তর পার করে। যেখানে অহং কেন্দ্রিক ভাষা বা আত্মকথন (Ego-centric Speech) কাজ করে। এই পর্যায়ে শিশুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে কিছু করে। যেমন শিশু খেলা করার সময় নিজেই আপন-মনে জোরে জোরে কথা বলতে বলতে খেলা করতে থাকে। এইভাবে সে খেলাটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বৃষ্টি কয়েকটা বই লিখলো, বিষয় ".... কি ভাবে কাজ করে", মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, TV, কম্পিউটার, চাষবাস, টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। বাংলা ভাষার ৫০০ টি সাধারণ মৌলিক শব্দভান্ডার ব্যবহার করে ছবির মাধ্যমে বড় বড় হরফে। কাজটা অতটা সহজ ছিলো না, কিন্তু শিশুদের উৎসাহ ওকে প্রেরণা যোগায়। কারণ, এই ৩-৭ বয়সসের আত্মকথন সময়টা তে শিশুরা পড়ার সময় জোরে জোরে পড়ে। বৃষ্টি এটাও জানে আত্মকথন এর সঙ্গে শব্দভান্ডারের উপস্থীতি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক হাতিয়ার।

বৃষ্টির এই উদ্যোগ কে Scaffolding (প্রয়োজনীয় সাহায্য) বলে। শিখন ও সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে যে ধরনের সাহায্য প্রদান করা হয়, সেই সাহায্যকেই বলে Scaffolding. Scaffolding শিশুর শিখনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। ভাইগটস্কির মতে, শিশু শিখনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং অভিজ্ঞরা তার সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষক কোনো সমস্যাকে সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া, শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা মজবুত করতে সহায়তা করে। পরবর্তীতে আত্মকথন (Ego-centric Speech) রূপান্তরিত হয় অভ্যন্তরীণ বক্তব্য (Inner Speech)। এই স্তরে চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় নীরব ভাষার মাধ্যমে। এই স্তরে ছাত্ররা উচ্চতর ভাবনা এবং আরো জটিল ধরনের চিন্তা করতে সক্ষম হয়।

শিশুরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শেখে যার মধ্যে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সংলাপ অন্তর্ভুক্ত । এই পারস্পরিক সহযোগিতা, সংলাপে বা সাহায্যে যারা ভূমিকা পালন করে তাঁরা হলেন, শিক্ষক, অভিভাবক, বয়স্ক ব্যক্তি, এমনকি সহপাঠীও হতে পারে। আর তাই চাই যৌথ উদ্যোগ যাতে শিশুরা সক্রিয়ভাবে জড়িত হবে। বৃষ্টি সম্মিলিত ভাবে, আল্লাহ তাওয়ালার কাছে প্রর্থনা, ছবি আঁকা, গল্প বানালো, বাগান করা, রান্না বান্না ও মাঠে খালাধুলার মাধ্যমে স্বতন্ত্র শিশুর প্রতি ভালোবাসা ও সম্পর্কে জড়িয়ে ফেলে নিজেকে। বৃষ্টি জানে, "যে ব্যক্তি (তার সন্তানদের প্রতি) দয়া করে না, তার প্রতি কোন দয়া করা হবে না।", (সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী)।

বৃষ্টি, একদিন ৩য় শ্রেণীতে "আনাস বিন মালিক" এর সঙ্গে সবাইকে পরিচয় করে দিলো। আনাসের যখন ১০ বছর বয়স তখন থেকে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে কেটেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনই আনাস বিন মালিকে অবজ্ঞাভরে কথা বলেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনাসকে শিখিয়ে ছিলেন, যখনই কারো সাথে দেখা হবে তখন আসসালামু ওয়ালাইকুম (আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলতে, যখন বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন আসসালামু ওয়ালাইমুম এবং মধ্য-সকাল নামাজ আদায় করতে। বৃষ্টি মনে করে, প্রতিটি শিশু মহান সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে মূল্যবান এবং তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা বিকাশ করতে সক্ষম করার জন্য ভালবাসা, লালনপালন এবং গুণগত যত্নের সাথে সম্মান পাবার যোগ্য।

বৃষ্টির দৃষ্টিতে, আমরা ভালবাসার মাধ্যমে একটি আন্ত-সংযুক্ত মানবতার সেবা করি। আমরা জানি যে জীবন হল অনুগ্রহের একটি যাত্রা যা আমাদের জীবনকে জাগ্রত এবং পরিপক্ক করার সাথে সাথে আমাদের করুণাময় প্রকৃতির দিকে উন্মুক্ত করে। আর সেখানেই আল্লাহ তাওলার অনুগত্ত শিকার।

ধনুক-ভাঙা পণ - ১২

“নূতন কুঁড়ি”

ন. সুলতানা (আপু) র স্কুল হলো নূতন নূতন কুঁড়ি নার্সারী স্কুল, এই স্কুল এর বৈশিষ্ট হলো চরিত্র ভিত্তিক শিক্ষা (Character Based Education) প্রদান, একেবারে নার্সারি স্কুলের শুশ্রূষা থেক শুরু। আপু বিশ্বাস করে, ২১শ শতাব্দীতে ইন্টারনেট আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) সবকিছু পাল্টিয়ে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও দিবে। শিক্ষার উপকরণ ও বুদ্ধিমত্তা Internet থেকে ধার করে ভবিষ্যতের প্রজন্ম নুতন এক ধারায় চলবে, যা এই মুহূর্তে বলা কঠিন হলেও, এইটা নিশ্চিত। নার্সারির ছাত্ররা আজ থেকে ১৫-২০ বছর পর যে ব্যাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবে, তার জন্যই চরিত্র ভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজন। ইন্টারনেট দ্বারা আমাদের প্রাকৃতিক ক্ষমতাগুলি পরিক্রমে পরিণত হবে এক উদ্দীপিত দিকে, যেখানে আমাদের মাঝে একটি ডিজিটাল স্নায়ুতন্তের জন্ম নিবে যা আমাদের মানবিক দিককে পরিচালিত করবে। AI যুগে মানবিক চরিত্রই হবে মানুষের স্বকীয়তার ভিত্তি।

ইন্টারনেট এর বদৌলতে জ্ঞান ও অজানা তথ্য এখন যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য বই আর শ্রেণীকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শিশু বয়স থেকেই ইন্টারনেটের ব্যবহার ও তার থেকে জ্ঞান অর্জন শুরু হয়ে যায়। অবিভাবকদের বুঝে উঠবার আগেই, কম্পিউটার আধিপত্য স্থাপন করে শিশুর মনে। ছাত্ররা যত উপরে ক্লাসে ওঠে ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহার তাদের হাতে ধরা দেয়। যেখানে শুধু জ্ঞানই নেই, আছে ছদ্মজ্ঞান, আছে copy/past, আছে ChatGPT এর মতো মোক্ষম AI Tools. ভবিষ্যৎ শিক্ষার এই বহুমুখী বৈচিত্র ও আদল, বর্তমান নার্সারি স্কুল পাঠ্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে, বিভিন্ন ভাবে।

ভবিষ্যতের মানুষকে কম্পিউটার টেকনোলজিতে পারদর্শী হতেই হবে। আর এই Computer Technology তাদের হাতে সহজলভ্য করবে জ্ঞানের ভান্ডার। আর জ্ঞানের ভান্ডারের সঙ্গে সঙ্গে আসবে জ্ঞানের অকৃতিত্ব স্বত্ব (Non-accomplish ownership)। Computer Technology জ্ঞানকে সরবরাহ করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমতার আদলে। প্রকারান্তে, এটা অসম্ভব হয়ে পড়বে Human generated আর Computer generated লেখনী ও চিন্তা কে আলাদা করা। বুদ্ধিমত্তা উপস্থাপনের দিক দিয়ে একে অপরের সম্পূরক হবে। এমনকি কম্পিউটারের সঙ্গে ঐক্যতানিক ভাবে চলবে মানব জাতী। একটু লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে, ঠিক এই সময়টাতেও আমরা কম্পিউটারে সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চলছি।

চরিত্র শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, সহানুভূতি, সম্মান এবং দায়িত্বের মতো জীবনের মৌলিক নীতিগুলির গুণাবলী গড়ে তোলা, যাতে ভবিষ্যতের প্রজন্ম পরিপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে। এই অর্থপূর্ণ জীবনযাপন ই পরজন্মের জন্য হবে সোনালী চাওয়া। যা মানুষদের কে কম্পিউটারের থেকে আলাদা করে একটা স্বত্বা দিবে। তাই আপু চায়, নূতন কুঁড়ি নার্সারি স্কুলেই হোক চরিত্র গঠনের গোড়াপত্তন। নূতন কুঁড়ি নার্সারি স্কুলের কার্যক্রম হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্ম-সচেতনতা, স্ব-শৃঙ্খলা, এবং স্ব-অনুপ্রেরণা সম্পর্কে শেখানো।

আপুর চিন্তায়, চরিত্র শিক্ষা কয়েক স্তরে হতে পারে।

- নার্সারির প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের মৌলিক সামাজিক এবং মানসিক দক্ষতা, যেমন ভাগাভাগি, সহযোগিতা এবং সহানুভূতি শেখানোর উপর লক্ষ করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, সম্মান, সততা এবং দায়িত্বের মতো বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে, চারিত্র শিক্ষায় জটিল বিষয়গুলি, যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্ব এবং নৈতিক আচরণ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

আপু, তার এক দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক চিঠিতে এই বিষয়ে বাংলাদেশ এর স্কুল শিক্ষা বোর্ডেকে চিন্তা করবার জন্য অনুরোধ করেছে। এই সময়ে চারিত্রিক শিক্ষার জন্য প্রমিতকরণের অভাব রয়েছে। চরিত্র শিক্ষার ফলাফল হল ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং আত্ম-প্রতিফলনের বিকাশ।

নূতন কুঁড়ি নার্সারি স্কুলের শ্রেণী শিক্ষা অনেকটা এভাবে সাজানো।

১. সেদিন ছিলো শিশুদের মৌলিক সামাজিক দক্ষতা পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকার শেখবার দিন। শিক্ষিকা লিলী আপা সবার জন্য সবার প্রিয় ওরেও "Oreo" বিস্কুট মাঝে ক্রিম দেয়া এনেছেন। অর্ধেক ক্লাসকে একটি করে বিস্কুট দেবার পর বলা হলো, ক্রিম বিস্কুট দুই ভাগ করে পাশের বন্ধুকে দিতে। এতে শিশুরা কিছুটা বিপাকে পড়লো বৈকি। কেননা বিস্কুটের এক দিকে ক্রিম আছে আর এক দিকে শুধুই বিস্কুট। কেউ কেউ ক্রিম সহ বিস্কুট টা পাশের বন্ধুকে দিলো, আবার কেউ উল্টোটা করলো। লিলী আপা, সবাইকে তাদের সামনে রাখা কাগজের থালাতে বিস্কুট রাখতে বল্লেন। এবার আপা, আরও একবার অর্ধেক শিশুদের বিস্কুট দিয়ে একই ভাবে দুভাগ করে পাশের বন্ধুকে দিতে বল্লেন। শিশুরা নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নিলো এবং সবাই একটি করে সম্পূর্ণ বিস্কুট পেল। এটা ছিলো মৌলিক সামাজিক দক্ষতার ভাগাভাগির শিক্ষা। পরের সপ্তাহে এই শিক্ষাটাকে মূল্যায়ন করবার জন্য লিলী আপা আবার যখন একই বিস্কুট শিশুদের দিলো তখন প্রথমে সকল শিশুরা ক্রিম দিকটাই তাদের বন্ধুদের দিলো, কেননা ওরা জানে এতে কোন অসুবিধা হবে না, শেষ মেষ ওরা সকলেই পুরো বিস্কুটিই পাবে। এমনি একটা পরিপূর্ণ উপলব্ধি শিশু মনে দিতে পেরে লিলী আপার খুব ভালো লাগলো। কেননা সমীচীন ভাগাভাগি মানেই অন্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া

এবং পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি সেখান থেকেই আসে। বুঝিয়ে বলা ও প্রয়োগীয় করে দেখালেন লিলী আপা। আপু বিশ্বাস করে - "To BE KIND is MORE important than to be right."

২. সহযোগিতা এবং সহানুভূতি একটি প্রমাণিত মানবিক গুন। শিখা আপার ক্লাস সব সময় মজার হয়, শিশুরাও তা উপভোগ করে। আজ সহযোগিতা এবং সহানুভূতির খেলা ও মূল্যবোধ গড়ার দিন। শিখা আপা পাশাপাশি বসা দুজন কে বললেন পাঞ্জা লড়তে, সময় এক মিনিট। অনক উৎসাহ নিয়ে শিশুরা পাঞ্জা লড়া খেলতে লেগে গেল। কিন্তু এক মিনিট পর দেখা গেল কেউ কাউকে হারাতে পারেনি। তাই সবাই ০-০ পেয়েছে। তারা কেউ চকোলেট পেল না। সবার মন খারাপ। এবার, শিখা আপা একটা মজার বুদ্ধি দিলো। পাঞ্জা লড়বার আগে নিজেদের মধ্যে কথা বলে ঠিক করে নিতে, যে একজন আরেকজনকে ৫ বার হারাবে এবং সে ও অন্যকে ৫ বার হারাবে, এক মিনিটের মধ্যে। ওরা তাই করলো (৫-৫) এবং সবাই ৫ টা করে চকোলেট পেল। নিজেদের ভিতর সহযোগিতা ও সহানুভূতির প্রয়োজনীয়তা অনেক। জ্ঞানের সর্বোচ্চ রূপ হল সহানুভূতি - Bill Bullard.

৩. এলি আপা তার ক্লাস নিয়ে সব সময় ব্যাস্ত থাকেন। আজও ১৬ টা শিশু নিয়ে গোল করে বসে গল্প বল্লেন। এই প্রকার ক্লাসে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে। সকল ছাত্র/ছাত্রীরা এলি আপার খুব কাছাকাছি বসা।

আজকের গল্প হলো কচ্ছপ আর খরগোশের।

-দ্রুত লাফ দেওয়া খরগোশ ঘুমিয়ে যায়, আর ধীর গতির কচ্ছপ জিতে যায়, (কচ্ছপ-১, খরগোশ-০)।

-খরগোশ কচ্ছপকে দৌড় প্রতিযোগিতায় আহ্বান করল। খরগোশ না ঘুমিয়ে দৌড় শেষ করাতে জয়ী হল, (কচ্ছপ-১, খরগোশ-১)।

-কচ্ছপ খরগোশকে আরেকবার দৌড় প্রতিযোগিতার আমন্ত্রন জানালো। দৌড়ের শেষ সীমানার আগে একটি রাস্তায় খাল আছে। কচ্ছপ পানিতে নেমে খাল পার হয়ে জিতে গেল, (কচ্ছপ-২, খরগোশ-১)।

-খরগোশ কচ্ছপকে আরেকটি দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান করলো। এইবার পথে পাহাড় আছে। তাই খরগোশ লাফ দিয়ে পার হলো ও জিতে গেল, (কচ্ছপ-২, খরগোশ-২)।

-কচ্ছপ ও খরগোশ এখন সমান সমান। তাই ওরা আর একবার দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হল। এই রাস্তায় খাল ও পাহাড় আছে। কচ্ছপ দেখলো সে পাহাড়ে পার হতে পারবে না, আর খরগোশ দেখলো সে খাল পার হতে পারবে না। তারা ঠিক করল, প্রতিযোগী হিসেবে নয়, বরংএবারের দৌড়টা তারা দৌড়াবে সহযোগী হিসেবে। খরগোশ কচ্ছপকে পিঠে তুলে পাহাড় পার হলো আর কচ্ছপ খরগোশকে পিঠে নিয়ে খাল পার হলো। এবার তার দু জনই একসাথে জয়ী হল, (কচ্ছপ-৩, খরগোশ-৩)।

আমরা শিখলাম, ব্যক্তিগত দক্ষতা থাকা খুবই ভালো। কিন্তু দলবদ্ধ হয়ে একে অপরের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারলেই আসে সত্যিকারের সাফল্য। এলি আপা শিশুদের দলগত কাজ, সহযোগিতা এবং যোগাযোগের গুরুত্ব শেখালেন, যা তাদের সহপাঠী এবং শিক্ষকদের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। চরিত্র শিক্ষা প্রায়ই ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং আত্ম-প্রতিফলনের কেন্দ্রবিন্দু। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের আত্ম-সচেতনতা, স্ব-শৃঙ্খলা, এবং স্ব-অনুপ্রেরণা সম্পর্কে শেখানো হয়।

৪. মৌরি আপা, খেলাধুলার দেখভাল করেন। একদিন খেলার মাঠে উনি শিশুদের বল্লেন চোখ বন্ধ করে এক পায়ে কে কতক্ষন থাকতে পারবে। সবাই উৎসাহের সঙ্গে চেষ্টা করল কিন্তু কেউই ১০-১৫ সেকেন্ড এর বেশি এক পায়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। এবার মৌরি আপা দুই জন কে হাত ধরে চোখ বন্ধ করে দাঁড়াতে বল্লেন। মাজার ব্যাপার হলো, এতে দুই জনের চোখ বন্ধ কিন্তু দাঁড়ায় থাকতে পারছে লম্বা সময়। একে অপরের প্রয়োজন টা বুঝে তাদের পড়ে যাওয়াটা সামলে নিচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ, দায়িত্ব এবং সহানুভূতি সম্পর্ক শেখায়। মৌরি আপার এই খেলা অনেক জনপ্রিয় হলো, শিশুরা প্রায়ই খেলে। তারা অনুভব করে, অন্যের উপরে নির্ভরতা ও বিশ্বাস। এতে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বিচ বপন হয়।

৫. রোজি আপা শিশুদের একটি আলোচনায় নেতৃত্ব দেন কিভাবে তারা তাদের নিজেদের জীবনে দায়িত্ব বোধ দেখাতে পারে। কিছু শিক্ষার্থী সময়মতো স্কুলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়, ক্লাসের নিয়ম অনুসরণ করে এবং তাদের জিনিসপত্রের যত্ন নেয়ার কথা বলে। রোজি আপা এই ধারণাগুলি বোর্ডে লেখেন এবং ছাত্রদের ভাবতে বলেন যে তারা কীভাবে এই ধারণাগুলি তাদের নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারে। এমনি ভাবে বাস্তব জীবনের সঙ্গে দায়িত্ব ও নিজেদের আনুগত্য শেখানো হয়। রোজি আপা শিশুদের বুঝনোর চেষ্টা করেন, কি ভাবে অন্যের কাজে শ্রদ্ধাশীল হওয়া যায়। সম্মান মানে অন্যদের শ্রদ্ধা করা, তাদের ধারণা শোনা এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। রোজি আপা শিশুদের ক্লাস আলোচনার সময় পালাক্রমে কথা বলতে বলেন এবং ক্লাসকে এমন একটি ভূমিকা পালনের ক্রিয়াকলাপে নেতৃত্ব দেন যা অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি শোনা এবং বোঝার উপর জোর দেয়।

৬. নূতন কুঁড়ি নার্সারি স্কুলের শিশুদের পরিবারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। কারণ, পরিবার চরিত্র-ভিত্তিক শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, শিশুরা স্কুলে যে মূল্যবোধ এবং নীতিগুলি শেখে সেগুলিকে শক্তিশালী করতে এবং সমর্থন করতে সাহায্য করে। পরিবারগুলি জড়িত হতে পারে এমন কিছু উপায়ে যেমন: আদর্শ ভাল আচরণ (শিশুরা উদাহরণের মাধ্যমে শেখে), খোলামেলা যোগাযোগকে উৎসাহিত করা, শিশুদের কাছে এটা পরিষ্কার করে দিতে হবে যে চরিত্র জ্ঞান অর্জনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ, পরিবার থেকে স্কুলের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ, স্কুলের ক্রীড়াসূচিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসাব যোগদান, পারিবারিক ক্রিয়াকলাপে শিশুদের জড়িত করা, যা দয়া এবং সততার মতো মূল্যবোধকে উন্নীত করে, সন্তানের শিক্ষাকে সমর্থন, শিশুদের সাফল্য উদযাপন করা এবং শিশুদের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি এবং উদযাপন করণ।

৭. পরিবার থেকে অনেক গল্প নূতন কুঁড়ি নার্সারি স্কুলের দেয়াল ম্যাগাজিনে স্থান পায়। বিভিন্ন বাস্তব গল্প যা শিশুরা প্রদর্শন করেছে। দেয়াল পত্রিকায় সেই সকল শিশু ও তাদের পরিবারের ছবিও থাকে, যাতে ওরা আরও উৎসাহিত হয় ও অন্যদেরকে উৎসাহিত করে।

আপুর নূতন কুঁড়ি নার্সারি স্কুলের নীতিবাক্য হলো "ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, চরিত্র ভিত্তিক শিক্ষা"।

"অভিব্যক্তির স্বাধীনতায় জন্ম নেয় আত্মবিশ্বাস ও মানবিকতা"

ম.ম.এনাম মনে করে আত্মার অভিব্যক্তি প্রকাশই সবকিছু। এই জগৎ ভাব প্রকাশের জন্যই তৈরি, প্রকৃতির সবকিছুই তাদের অনন্যসাধারণতাকে প্রকাশ করে চলেছে। "চারদিকে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া প্রভৃতি পাখির কলগান, নদীর কুলকুল ধ্বনি, পাতার মর্মর শব্দ, শ্যামল শস্যের ভঙ্গিময় হিলাদুলা..",- পল্লিসাহিত্য, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

ঠিক প্রকৃতির মতো, মানবের আত্মার অভিব্যক্তি প্রকাশ করার জন্য চাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কোনোভাবেই ভীতিকর বা আক্রমণাত্মক বা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ কাম্য নয়। আত্মার অভিব্যক্তি প্রকাশ আত্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করে। মানুষের অভ্যন্তরীণ আত্মা (inner soul) যা চেতনা, প্রজ্ঞা, সমবেদনা এবং আন্তঃসংযুক্ততার অনুভূতির প্রকাশ। ব্যক্তিগত বিকাশ এবং আধ্যাত্মিক বিবর্তনের জন্য অভ্যন্তরীণ আত্মার সাথে সংযোগ করা অপরিহার্য। এনাম বিশ্বাস করে, প্রত্যেক মানুষ তার অভ্যন্তরীণ আত্মার স্বকীয়তা নিয়ে জন্ম নেয়। এই জন্যই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। আর তাই এই আত্মার অভিব্যক্তি তাদের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বড় কিছুর সাথে সুপরিচিত করে।

প্রাইমারি স্কলের কাজ হবে ছাত্রদের অভ্যন্তরীণ আত্মার স্বকীয়তাকে লালন ও পরিস্ফুটিত করার জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখা। এইটা লক্ষণীয় যে শিল্প, সঙ্গীত বা লেখার বা খেলাধুলার মতো সৃজনশীল অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করা যায়। সবার দৃষ্টিকোণ অনন্য এবং এই অনন্যসাধারণ অভ্যন্তরীণ আত্মা ছাত্র/ছাত্রীদের একটি শক্তিশালী অভিব্যক্তি। নিঃসন্দেহে অন্তরাত্মার সাথে সংযুক্ত থাকা মানে নিজের বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের প্রতি সৎ থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ পারিপার্শিক আচরণ করা। অভ্যন্তরীণ আত্মার প্রকাশ গভীরভাবে ব্যক্তিগত এবং স্বতন্ত্র। স্কুল এর গতানুগতিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের সঙ্গে মেলানো কঠিন।

তাই এনাম এর যুক্তিতে ছাত্রদের ব্যক্তিগত ব্যবধান (personal space) দিতে হবে অভ্যন্তরীণ আত্মার বিকাশের জন্য। এই ব্যক্তিগত ব্যবধান হলো এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে ছাত্র/ছাত্রীরা তাদের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। দেয়ালিকা (wall magazine বা দেয়াল পত্রিকা) এই ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারে। এনাম বিভিন্ন ছাত্রের অভ্যন্তরীণ আত্মার অভিব্যক্তির দেয়ালিকা দিয়ে ভরে দিতে চায় টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরের বাইমহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কে। এই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট অনেক, বিদ্যালয়ের দেয়াল গুলোতে বিভিন্ন পাঠ্যতথ্য দিয়ে রঙিন ভাবে উপস্থাপন করা। বাইমহাটি সরকারি প্রাথমিক স্কুল পর পর দুইবার (২০১৮-১৯) জাতীয় শিক্ষা পদক পেয়েছে। ৫০০ ছাত্র/ছাত্রীর দেশসেরা এই প্রতিষ্ঠানটির অনেক সুনাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে— 'ফুল আপনার জন্য ফোটে না', নিশ্চই শিশুদের সৃজনশীলতা এই সমাজের জন্য, মানবতার জন্য অবশ্যক। এনাম জানে, অপরের মঙ্গল বিধানে নিজের চিন্তা ও কর্মের বিস্তারেই মানুষ্য হৃদয়ের বিকাশ ঘটে। প্রকৃত মানুষের ধর্ম নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা নয়, সমাজের জন্য কাজ করা। শিশু কিশোরদের সৃজনশীলতা পাপ মুক্ত, ও স্বচ্ছ। কিন্তু এই অল্প বয়সিদের সৃজনশীলতার ফুল ফোটানোর পরিবেশ ও সুযোগ উপস্থাপন করা স্কুল এর জন্য কষ্টসাধ্য কাজ। রবীন্দ্রনাথের উক্তি, "যে-কাঠ জ্বলেনি তাকে আগুন বলা চলে না।"তাই চাই অভিব্যক্তির পূর্ণ প্রকাশ। শিল্পী পাবলো পিকাসোর বিখ্যাত উক্তি “প্রত্যেক শিশুই এক একজন শিল্পী। সমস্যা হল আমরা বড় হয়ে শিল্পী সত্তাকে হারিয়ে ফেলি"।

শিশুরা যখন ছোট তখন শিল্পের মাধ্যমে সৃজনশীলতা এবং আত্ম-প্রকাশের প্রতি তাদের স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে। বাচ্চাদের প্রায়শই প্রাণবন্ত কল্পনা থাকে এবং তারা প্রাপ্তবয়স্কদের মতো পূর্ব ধারণা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে না, যা তাদের এমন শিল্প তৈরি করতে দেয় যা স্বতঃস্ফূর্ত এবং আনন্দে পরিপূর্ণ। এনাম এর বাইমহাটি সরকারি প্রাথমিক স্কুল যেন একটা রং এর মেলা। স্কুলের দেয়াল পত্রিকা শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা ও ধারণা প্রকাশ করে চলেছে।

দেয়ালিকা গুলোতে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন অংকন, প্রবন্ধ, শিল্পকর্ম, কবিতা আরও অনেক কিছু। দেয়ালিকা নিয়ে স্কুলের শিক্ষকদের সাথে অনেক আলাপ আলোচনার পর এনাম ভাগ করে দিলো এমন ভাবে যে, তিন জন ছাত্র/ছাত্রী একটা দেয়ালিকা করবে A১ (২৩.৪ x ৩৩.১ ইঞ্চি) পাতায়। প্রতি এক মাস পরপর একটি করে দেয়ালিকা। এবং প্রতি এক মাস নতুন দল করে দিবেন ক্লাস শিক্ষক। স্কুল জীবনের এই বহুমুখী খেলাটাই শিশু কিশোরদে মনে উৎসাহের প্রেরণা যোগাবে সারা জীবন। এক মাস প্রদর্শনীতে থাকবে দেয়ালিকা গুলো। তারপর digitize করে স্কুল লাইব্রেরিতে সংগ্রহ করে রাখা হবে যা বিদ্যালয়ের সম্পদ, এবং লাইব্রেরির কম্পিউটারের প্রোগ্রাম অনুসন্ধান করে বের করতে পারবে (ছাত্র/ছাত্রীদের নামে, ক্লাস ও তারিখে অথবা বিষয়ের মাধ্যমে)। দেয়ালিকার মাধ্যমে, ছাত্ররা একটি ব্যক্তিগত ব্যবধান (personal space) পেলো, সৃজনশীলভাবে নিজেদের প্রকাশ করবার জন্য, যা শিক্ষক দ্বারা সম্পাদনা করা হবে কিন্তু মৌলিকতাকে ঠিক রেখে। দেয়ালিকা শিক্ষার্থীদের একে অপরের সাথে সহযোগিতা করার একটি সুযোগও তৈরী করে দিলো, তিন জনের দল দেয়ালিকার জন্য একটি প্রসঙ্গ বিষয় (theme) বা নকশা তৈরি করতে একসাথে কাজ করে। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ প্রদর্শন করে কৃতিত্বের অনুভূতি অনুভব করতে, এবং অন্যদের দেয়ালিকা থেকে দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধারণাগুলি শিখতে পারে। এনামের এই দেয়ালিকা, সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করার জন্য একটি মূল্যবান হাতিয়ার হিসাবে দাঁড়ালো। বাইমহাটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলের দেয়ালিকা শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার সঙ্গে একটি মূল্যবান সংযোজন। দেয়ালিকা গুলো শ্রেণীকক্ষে অবগত বিষয় এবং ধারণাগুলিকে সম্পূরক এবং শক্তিশালী করার জন্য শ্রেণী শিক্ষক "প্রসঙ্গ বিষয় (theme)" নির্ধারণ করে দেন, যা পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের বোধগম্যতাকে গভীর ও সহজ করে। উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয় যে ছাত্র/ছাত্রীরা স্কুলের দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে চিন্তা করতে এবং নতুন এবং ভিন্ন উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করতে উৎসাহিত হয়। একই সাথে, শিক্ষার্থীরা তাদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, যোগাযোগ এবং সহযোগিতার দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে, যা অধ্যয়ন বিষয়ক সাফল্য এবং ব্যক্তিগত বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর। এনাম দেখলো ও জানলো, শিশু ও কিশোর/কিশোরীরা কত সুন্দর ভাবে, রঙের ব্যবহার, সামঞ্জস্যপূর্ণ রঙের প্রসঙ্গ বিষয়

(theme) ব্যবহার করে দেয়ালিকার সুসংহত নকশা তৈরি করে।কেউ বা গাছের পাতা ডালপালা ব্যবহার করে, আবার কেউ কাগজ ভাজ করে Japanese Origami করে ত্রিমাত্রিক (3D) দেয়ালিকা বানায়।শিশুদের লেখা বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঠাসা। যেমন, উন্নয়নমূলক অন্তর্দৃষ্টি: শিশুদের লেখা তাদের জ্ঞানীয় এবং ভাষাগত বিকাশের অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করে। যা, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন।

শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য: শিশুদের অন্তর্দৃষ্টি এই দেয়ালিকা গুলোতে পাওয়া যায়। ওরা কিসের সাথে লড়াই করে এবং তারা কোন বিষয়ে পারদর্শী, শিক্ষকরা স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটাতে লেখার নির্দেশনা দিতে পারেন। মূল্যায়ন: শিশুদের লেখা তাদের ভাষা এবং সাক্ষরতা বিকাশের মূল্যায়নের একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক অন্তর্দৃষ্টি: অবশেষে, শিশুদের লেখা বিশ্লেষণ করা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের অন্তর্দৃষ্টিও প্রদান করতে পারে যেখানে তারা শিখছে এবং বিকাশ করছে। দেয়ালিকা শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করতে পারে, সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা: দেয়ালিকায় শিক্ষার্থীদের লেখা, শিল্পকর্ম এবং অন্যান্য প্রকল্পগুলি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করে।

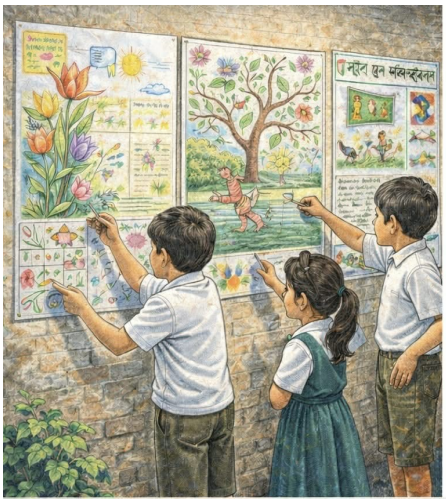

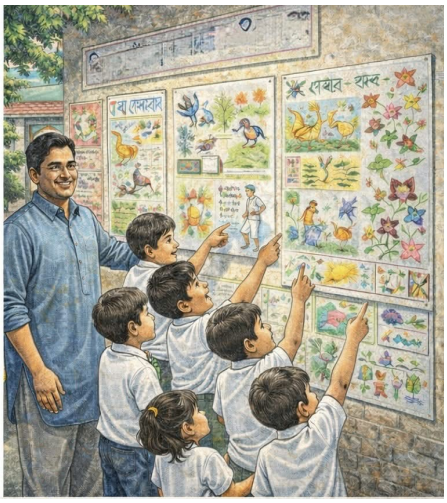

সতীর্থ অনুভূতি তৈরি করা: শিক্ষার্থীদের সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক এবং সংযোগ একটি ইতিবাচক শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ গড়ে তোলে। যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ: শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত করতে পারে। অনুপ্রেরণা: যেহেতু দেয়ালিকা প্রদর্শন করা হয়, তাই শিক্ষার্থীদের উচ্চ-মানের কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে, এবং তারা শেখার প্রক্রিয়ায় মনোযোগী হয়। শেখার প্রচার: দেয়ালিকা গুলো শিক্ষার্থীরা কী শিখছে তার একটি চাক্ষুষ উপস্থাপনা হিসাবে কাজ করে। এনাম এর বাইমহাটি সরকারি প্রাথমিক স্কুল এর দেয়ালিকার প্রসঙ্গ বিষয় (theme) ছিলো অনেকটা এরকম: ১ম শ্রেণী: - আমাদের চারিপাশ। - জাতীয় সংগীত এর আঁকা ছবি। - পাখির রাজ্য। - রঙে রঙে ফাল্গুন। - ফল ও ফুল। - বর্নমালার মালা। এনাম মনে করে দেয়ালিকার প্রসঙ্গ বিষয় গুলো হতে হবে শিশুদের পছন্দের ও শ্রেণির শিক্ষাক্রমের সমানুপাতিক। ২য় শ্রেণী: - গল্পের ছবি। - গাণিতিক চিত্র। - এসো গল্প বলি। - রং এর খেলা। - পানি ও জীবন। এনাম মনে করে, দেয়ালিকার বিষয় হতে হবে এক শ্রেণী উপরের বিষয় গুলো। শিশুরা যেন ভাববার সুযোগ পায় এবং পরের বছর যখন বিষয় গুলো সামনে আসবে তখন নিজের চিন্তার সঙ্গে মিলে দেখতে চেষ্টা করবে। এনাম জানে, সৃজনশীল চিন্তার সঙ্গে বাস্তব চিন্তার মিশ্রণই পরিপূর্ণ শিক্ষা। ৩য় শ্রেণী: - আমার দেশ বাংলাদেশ। - ইতিহাসের পাতা থেকে। - মাতৃভাষা। - অংকের সমাধান। - গাণিতিক চিত্র। - আমারা বিজ্ঞানী। - কত খেলা কত রকম বল। - মহাদেশ ও মহাসাগর। - গল্প ও কবিতা। এনাম চায় ৩য় শ্রেণীর বিজ্ঞানকে লক্ষণীয় করতে। বিজ্ঞানের আগ্রহ অনেকের থাকে। মনে অনেক জিজ্ঞাসা, সৌরজগৎ থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাইরাস নিয়ে। আত্মার অভিব্যক্তি প্রকাশ এই বয়সে দেখা যায়। উৎসাহের সঙ্গে শিক্ষনীয় অডিও ভিজ্যুয়াল কিছু তথ্য শিক্ষক গণ শিশুদের দেবেন। লক্ষনীয় যে শিশুর আগ্রহটি যেন অক্ষুন্ন থাকে।

৪র্থ শ্রেণী: - ষড়ঋতু, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, ও বসন্ত। - ছোট গল্প। - আমার দাদি/নানীর থেকে পাওয়া গল্প। - এসো অংক করি। - এসো মাপ-যোগ করি। - অংকের খেলা। - প্রযুক্তি ও আমরা। - মহাবিশ্ব। - কৌতুক। - আজব ঘটনা। এমনি ভাবে দেয়ালিকার বিষয় সাজানো যেতে পারে, যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কল্পনাকে উৎসাহিত করা হবে। ৫ম শ্রেণী: - কবিতা, ছোট গল্প। - প্রবন্ধ। - শিল্পকর্ম ও ফটোগ্রাফ। - শিক্ষার্থীদের কাজ প্রদর্শন। - স্কুলের গর্ব। - আমার বাংলা বই থেকে বিষয় নেওয়া যেতে পারে। - বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা। - প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনা। - স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা। ৫ম শ্রেণী শিক্ষা জীবনের মাইল-ফলক। এখানে নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীদের প্রতিভা প্রদর্শন করা প্রয়োজন। এই বয়সে, শিক্ষার্থীদের প্রতি বিচারমূলক না হয়ে উৎসাহ মূলক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত করা দরকার। দেয়ালিকার প্রথম কাজ হবে, শিশুদের সৃজনশীলতাকে ধরে রেখে ওদের আত্মার অভিব্যক্তি প্রকাশ এ সহায়তা করা। দেয়ালিকা হবে আনন্দ ও সন্তুষ্টির উৎস। আত্ম-আবিষ্কার হলো নিজস্বতা প্রকাশের মাধ্যমে চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতির অন্বেষণে বিশ্বে অবস্থান সম্পর্কে উপলব্ধির প্রথম ধাপ, যা অভিজ্ঞতার একটি মৌলিক অংশ। দেয়ালিকায় অংশগ্রহণ আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে এবং উচ্চ-মানের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা ও বাঁধাহীন ভাবে উজ্জ্বল করাই উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে দেয়াল পত্রিকা একটি ইতিবাচক এবং আকর্ষক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করবে। বাইমহাটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলের এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশ এর সকল প্রাথমিক স্কুল গুলোতে সঞ্চালন করা যেতে পারে।

ধনুক-ভাঙা পণ: ১৫

“Outdoor learning”

এ টি ম মুকলেস 'কবির'রের স্কুল হলো ঢাকার মুগদাপাড়া প্রাথমিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। কবির সাহিত্যের ছাত্র, মানুষের মন নিয়ে, তাদের চিন্তা ভাবনা নিয়ে কবিরের যত কাজ। স্কুল এর প্রতিটি শ্রেণীতে শিক্ষাদানের সময়, তার একটাই ভাবনা, "The greatest investment a young person can make is in their own education, in their own mind. Because money comes and goes. Relationships come and go. But what you learn once stays with you forever.” - Warren Buffett.

সাহিত্য মনের খোরাক যোগায়, আর বিজ্ঞান মনের জিজ্ঞাসার উত্তর যোগায়। এই মনের সুন্দর্য আর আকাঙ্ক্ষার আবির্ভাব শিশু কিশোরদের জন্য স্বাভাবিক ও অনুপ্রাণিত। কিন্তু শিশু কিশোরদের মনের দূরত্ব ও চাওয়া পাওয়ার বেষ্টনির সীমাবদ্ধতা দূর করবার জন্য চাই উনুপ্রারণা ও সহযোগিতা। কবিরের চিন্তায় এই সীমাবদ্ধতাকে ভাঙতে হবে, উন্মুক্ত করে দিতে হবে মনের পরিধিকে চারিদিক থেকে, যেখানে সেখানে। শিশু কিশোররা খুঁজে পাবে রং রস আর বিস্ময় তাদের মনের জন্য।

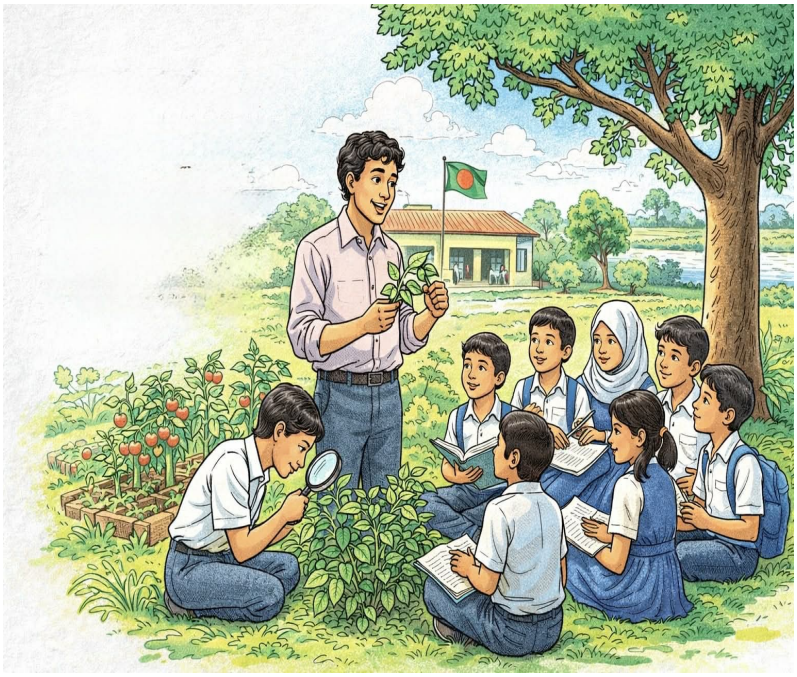

কবির মনে করে, সাহিত্যের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল শৈল্পিক সৃজনশীলতা প্রকাশ করা বিভিন্ন অভিব্যক্তির মাধ্যমে ধারণা এবং আবেগের যোগাযোগ করা যা জীবনের জটিলতাগুলোকে অন্বেষণ করে। বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য মহাবিশ্বর নিয়ন্ত্রিত নীতিগুলোকে উন্মোচন করা।

কবিরের চিন্তায় সাহিত্যর পদ্ধতি হলো, মনের আবেগকে জাগানোর জন্য ভাষা এবং শৈল্পিক উপস্থাপনা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারিক যা পর্যবেক্ষণ, অনুমান গঠন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা, এবং প্রমাণ-ভিত্তিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ।

সাহিত্যের বিষয়বস্তু মানব প্রকৃতি, নৈতিকতা, সমাজ এবং দার্শনিক ধারণাগুলোর অন্বেষণ করে। বিজ্ঞাণের বিষয়বস্তু প্রাকৃতিক পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্ক শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞাণের প্রক্রিয়াগুলি বোঝার চেষ্টা করা।

কবিরের ধারণা, সাহিত্যে বিষয়ভিত্তিক এবং ব্যাখ্যার জন্য উন্মুক্ত। বৈজ্ঞান ও সত্য বস্তুনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।

সাহিত্যকে তার শৈল্পিক যোগ্যতা, সৃজনশীলতা এবং মানসিক প্রভাবের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হয়। বিজ্ঞানকে নির্ভুলতা, বৈধতা এবং বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হয়।

কবিরের সাহিত্য এবং বিজ্ঞান নিয়ে এতো কিছু বিশ্লেষণের কারণ হলো, কিভাবে এই দুই বিষয় শিশু কিশোর মনেকে প্রভাবিত করতে পারে? উভয় ক্ষেত্রই বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে অনন্যভাবে অবদান রাখে এবং মানব সংস্কৃতি ও জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। কবির মনে করে, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানকে স্কুলের গন্ডি থেকে বের করে সহজ সরল খেলার চলে শিশু কিশোর মনে উপস্থাপন করতে হবে। স্কুল থেকে বের করে সমাজে আনতে হবে এই সাহিত্য এবং বিজ্ঞানকে।

কবির কিছু সূচিত বই বানালো:

১. বহিরঙ্গান নিরীক্ষণ (জীবজগৎ): পাখি পরিদর্শন, মাছ পরিদর্শন, পশু পরিদর্শন, ইত্যাদি। সুন্দরভাবে চিত্রিত উদাহরণ সহ পরিচিত এবং জীবনচক্রের তথ্য। এই সূচিত-বই গুলো বহনযোগ্য তথ্যের একটি চমৎকার উৎস এবং শিশু কিশোরদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য আদর্শ। পকেট-আকারের ভাজ করা বহনযোগ্য তথ্যের একটি চমৎকার উৎস এবং ব্যবহারের জন্য আদর্শ।

২. বহিরঙ্গান নিরীক্ষণ (উদ্ভিদ জগৎ): গাছ-পালা পরিদর্শন, জলবায়ু ও ভৌগলিক অবস্থা, মাটি ও উর্বরতা, ইত্যাদি। বায়ু, মাটি এবং পানি - গাছের উপর নির্ভর করে। এই সুন্দর বিশদ নির্দেশিকাটিতে সম্পূর্ণ রঙিন চিত্র সহ সাজানো। ব্যবহারিক তথ্যের একটি আদর্শ, বহনযোগ্য উৎস এবং উদ্ভিদ জগৎ ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য আদর্শ।

৩. স্কুলের বাগান সূচিত বই এ মৌসুমী বাগান কার্যক্রম থেকে শুরু করে জৈব বাগান সমাধান, ভূমির চিন্তাভাবনা এবং পরিবেশগত অনুসন্ধান করবার কথা বলা আছে।

৪. বিজ্ঞানের উপকরণগুলো উপস্থাপনের অনেক ব্যবস্থা আছে। গতিবিদ্যা, মাধ্যাকর্ষণ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া, অংক শাস্ত্র, ইত্যাদি। স্থান-ভিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, নিমগ্ন শিক্ষা, এবং হাতে-কলমে ক্রিয়াকলাপ ও বিজ্ঞান সমালোচনামূলক চিন্তা এই সূচিত-বই গুলোতে উপস্থাপন করা হয়। প্রকৃতি-ভিত্তিক শিক্ষা বা বহিরঙ্গান শিক্ষার জন্য শিশু কিশোরদের সূচিত-বই "কী", "কোথায়", "কখন", "কিভাবে", এবং "কেন" - শিশু কিশোররা খুঁজে বেড়াবে। কবির মনে করে, মূল শিক্ষার সাথে বহিরঙ্গান এবং প্রাকৃতিক উপকরণগুলিকে একীভূত করা প্রয়োজন।

কবির একটা বিধি-বিপরীত কাজ করে বসলো। সে শিক্ষা বোর্ড কে একটা পরিকল্পনা পাঠালো অনুমোদনের জন্য। প্রকল্পটি হল - দেশ এর সব বড় বড় পণ্য বিপনিতে (super market) একটা স্থান থাকবে, যেখানে বিভিন্ন সাহিত্যর ও বিজ্ঞানের উপস্থাপনা ও হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার সুযোগ থাকবে শিশু কিশোরদের জন্য। জাতীকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলবার জন্য চাই পরিকল্পনা ও সাহস। বিপনি বিতান গুলোতে জনসমাবেশ হয় তাই সাহিত্যর ও বিজ্ঞানের প্রাথমিক পরিবেশনা এখানেই দিতে হবে। স্থানীয় স্কুল গুলো পালাক্রমে এই পরিদর্শনের কাজে নিয়োজিত থাকবে। কবির শিক্ষকদের সহায়তায় পরিদর্শনী উপযোগী কিছু কৌতূহলোদ্দীপক উপকরণের রচনা করলো।

যেমন: প্রাকৃতিক ছবির শৈল্পিক বিশ্লেষণ, ছবি থেকে গল্প আবার গল্প থাকে ছবি, কবি সাহিত্যিকদের চেনানো, বিখ্যাত ছবিগুলোর বিশ্লেষণ, ইত্যাদি। বিজ্ঞাননের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রসায়নিক প্রক্রিয়ায় রং পরিবর্তন, গতি বিদ্যা, মাধ্যাকর্ষ, পিরিয়ডিক টেবিল আরও অনেক কিছু। যা শিশু কিশোরদের মনে উৎসাহ জোগাবে ও অভিভাবকদের মাঝে আগ্রহ।

কবিরের চিন্তায়, শিশু কিশোরেরা ফুলের মতো সুন্দর, আর তাই, "Every flower is a soul blossoming in nature." - Gerard De Nerval.

ধনুক-ভাঙা পণ: ১৪

“সৃজনশীল কক্ষ”

এন. হাসান 'ছোট'র কার্যস্থল হলো বরিশাল প্রথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষক ছোট মনে করে শিশু কিশোর শিক্ষানবিশদের কাছে পরিবেশটাই সব কিছু। শিশু কিশোররা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু, উন্মুক্ত পরিবেশ শিশু কিশোরদের মনের স্বাচ্ছন্দতা আনে ঠিকই, কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মন তৈরী করে না। কৌতূহলী মন অন্য রকম, যা প্রতি নিয়তো প্রশ্ন করবে, জিজ্ঞাসু মন অবাক করবে নিজেকে নিজে। এখানেই মানুষের মনের খোরাক। স্কুল থেকেই "জানার কোন শেষ নেই" এই ধারণাটাকে বহন করতে হবে। এই একবিংশ শতাব্দী উদ্ভাবনের শতাব্দী। এখন মানব জাতির মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটছে, যে উদ্ভাবন করতে পারবে সেই এগিয়ে থাকবে। "Innovation is the new economy", software থেকে hardware, AI থেকে ব্যাবহারিক, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে সমাজ কল্যাণ সব কিছুতেই চাই নতুনত্ব। স্কুল থেকে শিশু কিশোরদের কল্পনা প্রবন ও অনুসন্ধানী মনের চর্চা করতে হবে। তাই চাই এমন পরিমণ্ডল যেখানে অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী প্রশিক্ষণ সম্ভব।

এমনি সব চিন্তা থেকে, শিক্ষক ছোটোর মনে হয়, স্কুল এর বাঁধা-ধরা ক্লাসের সময় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়, শিশু-কিশোরদের মনে কল্পনার বলয় ও সম্পর্কিত প্রশ্ন উদ্ভাবনের জন্য সহায়ক নয়। বর্তমান স্কুল এমন একটা পরিবেশের গন্ডিতে অবস্থান করছে, যেখানে ছাত্ররা আত্মরক্ষামূলক বেড়া জালে বন্দি। তারা দুর্বল ও শিক্ষকদের মুখাপেক্ষী, পরাধীন থেকে সব সময় তুষ্ট করতে চায় শিক্ষকদের, নিজেদের উৎসুক ও জিজ্ঞাসু মনোভাবকে প্রকাশের জন্য কোন সুযোগ ও সময় নেই। শিশু কিশোরদের কল্পনা বা মনশ্চক্ষুর কোন স্থান নেই এখানে। শিক্ষকদের নিয়মানুবর্তিতা, ও প্রত্যেনীয়ত পরীক্ষা ছাত্রদের শুধুই নিরাপত্তামূলক আশ্বাসই দেয়, আর কিছুই না। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর চাওয়া হলো, উদ্ভাবনী হওয়া। তাই প্রয়োজন সাধারণ সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিগুলিকে পরিত্যাগ করে নতুন করে ভাবা। শিক্ষক ছোটোর চিন্তায়, এমন একটা পরিবেশ ছাত্রদের দিতে হবে, যেখানে, শিক্ষানবিশরা নিজেদেরকে হারায়ে আবার খুঁজে পাবে। এই নিজেকে হারিয়ে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে একটা আবিষ্কারের গুণগত দিক আছে। শিশু-কিশোরদের শিক্ষার পরিবেশ হবে তেমনি, কেমন হয়, শ্রেণীকক্ষ গুলোকে এক নুতন রুপ দিলে। এক একটা শ্রেণীকক্ষ হবে এক একটা বিষয়ের। সাজানো থাকবে বিষয়এর সব উপাদান দিয়ে। বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক, তাঁর শ্রেণিকক্ষের ভারপ্রাপ্ত থাকবেন। বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল উপাদান দিয়ে সাজানো থাকবে। যেমন:

অংক শ্রেণীকক্ষ (নাম: চমৎকার গনিত),
পরিসংখ্যান শ্রেণীকক্ষ (বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ),
বাংলা শ্রেণীকক্ষ (মাতৃভাষা),
ইংলিশ শ্রেণীকক্ষ (School Blossom),
বিজ্ঞান শ্রেণীকক্ষ (আমরা বিজ্ঞানী),
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শ্রেণীকক্ষ (দেখবো এবার জগৎটাকে),
ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণীকক্ষ (ঈমান ও মানবতা),
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শ্রেণীকক্ষ (ICT),
কৃষি শিক্ষা শ্রেণীকক্ষ (মাটি ও ফলন),
কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা শ্রেণীকক্ষ (এসো জীবন গরী),
চারুও কারুকলা শ্রেণীকক্ষ (কল্পতরু),
শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শ্রেণীকক্ষ (খেলাধুল),
গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শ্রেণীকক্ষ (গুছানো জীবন),
বাংলা সাহিত্য শ্রেণীকক্ষ (নিজেকে চিনি),
হিসাব বিজ্ঞান শ্রেণীকক্ষ (লাভ-ক্ষতি),
অর্থনীতি শ্রেণীকক্ষ (ধনসম্পদ),
ভূগোল শ্রেণীকক্ষ (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ),
পদার্থ বিজ্ঞান শ্রেণীকক্ষ (বল ও শক্তি),
রসায়ন শ্রেণীকক্ষ (Proton Neutron and Electron),
জীববিজ্ঞান শ্রেণীকক্ষ (Deoxyribonucleic Acid (DNA))

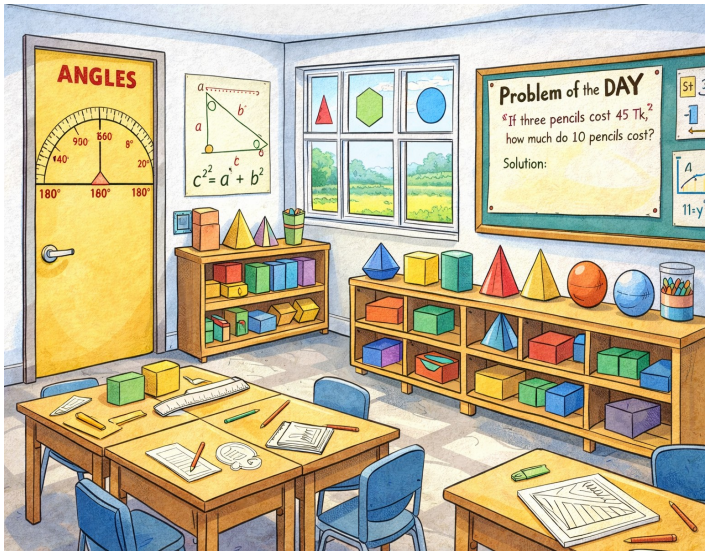

এবং শিক্ষক ছোটোর নিজস্ব শ্রেণীকক্ষ "সৃজনশীল কক্ষ"। যেখানে, কোন কম্পিউটার নেই, দেয়ালে বিভিন্ন চিত্রকলা ও বসার চেয়ার গুলো আরামদায়ক। কোন ছাত্র সৃজনশীল কক্ষে নিজস্ব সময় নিতে পারে। ঐ সময়টায় কেউ ছবি আঁকে , গল্প/কবিতা লেখে, কেউ বা বিজ্ঞান নিয়ে ভাবে কেননা এই সৃজনশীল কক্ষ যে চিন্তান্বিত হওয়ার জন্যই তৈরী। এই সৃজনশীল কক্ষে বসে যত Club এর অধিবেশন, যেমন Robotic Club, Reading Club, Conflict Resolution Club, Debate Club, Coding Club, Language Club, Science Club, Drama Club, Music আর Art Club. প্রতিটা বিষয় ভিত্তিক শ্রেণীকক্ষ থেকে কমপক্ষে একটা ক্লাব থাকতে হবে। এই ক্লাব থাকার উদ্দেশ্য একটাই, ছাত্রের আগ্রহ টাকে নির্দিষ্ট করা। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের ব্যক্তিগত প্রতিভাকে শনাক্ত করা। প্রতিটা ছাত্রের সহজাত ক্ষমতা আছে, কেউ বা বিজ্ঞাণে, কেউবা সাহিত্যে। সহজাত ক্ষমতার প্রয়াস থেকেই উদ্ভাবনের শুরু।

বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকরা তাদের নিজের শ্রেণীকক্ষ সাজালেন, কিছু নির্দেশনা দেওয়া হলো। যেমন, -কিছু হাতে কলমে থাকতে হবে, - কিছু নিজেদের করা কাজ সাথে করে বাসায় নিয়ে যাবে ছাত্ররা, কিছু ধাঁধা ও সমাধান, ছবি বা শব্দ গুচ্ছ সম্পূর্ণ করন, সকল ক্ষেত্রে রং এর ব্যবহার। বিষয় ভিত্তিক শ্রেণীকক্ষ গুলো, এক একটা অধ্যয়নের স্থান যাতে ছাত্ররা উপভোগ করে ও বিষয়ে নিমজ্জিত হয়। শিশু কিশোরেরা যখন একটি নতুন কার্যকলাপ করে তখন তাদের মস্তিষ্ক নতুন একটা দিকনির্ণয় তৈরি হয়। মূলতো ধারণাটি হল, মস্তিষ্ককে পরিশ্রম দ্বারা সৃজনশীল, যুক্তি, প্রতীক, সাক্ষরতা এবং নতুন উপায়ে সমস্যা সমাধানকে একত্রিত করা। শুধু মুখস্থ করার চেয়ে গভীর, দীর্ঘস্থায়ী বোঝাপড়া গড়ে তোলাই এই বিষয় ভিত্তিক শ্রেণিকক্ষের কাজ। এই ভাবেই পাঠ্যক্রমের মধ্যে জ্ঞানের স্তর তৈরি করা প্রয়োজন। কাল্পনিক দৃশ্যকল্পের পরিবর্তে বাস্তব জগতের প্রেক্ষাপটে জ্ঞান আহরণ, শিশু কিশোরদের জন্য অনন্দদায়ক। প্রতিটি পাঠের সাথে বিষয় ভিত্তিক শ্রেণীকক্ষ নতুন করে বাস্তবসম্মত উদ্ভাবনের পথ দেখাবে বলে বিশ্বাস।

শিক্ষক ছোট বিষয় ভিত্তিক শ্রেণীকক্ষ গুলোর নির্দেশিকা তৈরী করলো :

- শিক্ষার্থীরা সারা বছর যে বিষয়বস্তু শিখবে তা স্পষ্টভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে বিষয় অনুসারে উল্লেখ করা হবে। জানার একটা পরিচ্ছন্ন রূপ।
- শিক্ষার্থীরা যে বিষয়বস্তু শিখবে তাতে গভীরতা এবং প্রস্থ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা সম্পর্কিত বিষয় অধ্যয়ন করতে পারে এবং নতুন জ্ঞান তৈরি করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের আরও জ্ঞান তৈরিতে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সংযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত সমর্থন সহ তাদের প্রাথমিক জ্ঞান থেকে আরও জটিল দিকে বা উদ্ভাবনের দিকে উৎসাহিত করা হবে।
- প্রকল্প-ভিত্তিক শিক্ষা (Project-based learning (PBL)), বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকক্ষ গুলোর উদ্দেশ্য।

একই সঙ্গে, ভিন্নধর্মী দুটি শ্রেণীকক্ষ:

প্রতিভাধর এবং প্রতিভাবান ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষ: এই শ্রেণীকক্ষ এমন শিক্ষার্থীদের জন্য যারা শিক্ষাবিদ, শিল্প বা সঙ্গীতের মতো এক বা একাধিক ক্ষেত্রে প্রতিভাধর।

বিশেষ চাহিদার শ্রেণীকক্ষ: এই শ্রেণীকক্ষ শারীরিক অক্ষমতা, মানসিক অক্ষমতা মতো বিভিন্ন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য করা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ, অংক শ্রেণীকক্ষ (চমৎকার গনিত) এভাবে সাজানো যেতে পারে।

গাণিতিক পোস্টার যাতে গাণিতিক ধারণা, সমীকরণ এবং ডায়াগ্রাম বৈশিষ্ট্যযুক্ত থাকবে। এটি শিক্ষার্থীদের বিমূর্ত ধারণাগুলি কল্পনা করতে এবং সেগুলি আরও ভালভাবে বুঝতে সহায়তা করতে পারে। গাণিতিক মডেল যাতে গাণিতিক মডেলগুলি শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শন করা থাকবে, যাতে শিক্ষার্থীদের গাণিতিক ধারণাগুলিকে ত্রিমাত্রায় কল্পনা করতে সহায়তা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, জ্যামিতিক আকারের ছাঁচগুলি ছাত্রদের আয়তন এবং পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের মত ধারণাগুলি বুঝতে সাহায্য করতে পারে। গাণিতিক শিল্প যাতে বোঝানো হবে গাণিত ও একটা শিল্প, যেমন fractals, tessellations এবং অন্যান্য গাণিতিক ছবি, শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শিত হবে। এটি সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করবে এবং শিক্ষার্থীদের গণিতের নান্দনিক সৌন্দর্য বুঝতে সাহায্য করতে পারে। ক্যালকুলেটর এবং প্রযুক্তি যাতে গণিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের ক্যালকুলেটর এবং প্রযুক্তি সমন্বিত পোস্টার শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শিত করা হবে। শিক্ষার্থীদের কাজ শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শিত হবে। সামগ্রিকভাবে, একটি গণিত শ্রেণিকক্ষকে এমনভাবে সাজানো যাবে যা সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করবে এবং শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়ের সাথে জড়িত হতে এবং গাণিতিক ধারণাগুলির গভীরতর বোঝার বিকাশে অনুপ্রাণিত করবে।

শিক্ষক ছোটোর বিশ্লেষণে, জীবন একটি চমৎকার উপহার, যা সময় ও স্থানের মাঝে অবস্থান করে। সময়টি অস্থায়ী এবং স্থানটি ও পরিবর্তনশীল। ছাত্রদের বিদ্যালয়ের সময় ও স্থান হলো বিষয় ভিত্তিক শ্রেণী কক্ষ, ওদের জীবনকে সম্পূর্ণ করবে। "Socratic method of teaching", শিক্ষক ছোটোর খুব প্রিয়। "I cannot teach anybody anything. I can only make them think" - Socrates

ধনুক-ভাঙা পণ: ১৬

"বিজ্ঞান ও জীবনের সমন্বয়"

বিজ্ঞান হলো মানুষের জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। মানুষের জ্ঞান মহান সৃষ্টিকর্তার অনুদান, যা আমাদেরকে করেছে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। তাই সৃষ্টিকর্তার অনুকূল্যের জন্যই আমাদের জ্ঞান চর্চা করা উচিৎ। সেটা হতে পারে পার্থিব অথবা সামাজিক জ্ঞান। পার্থিব জ্ঞান অর্থনৈতিক, সামাজিক জ্ঞান মনুষতান্ত্রিক, এ দুয়ের সংমিশ্রণই হলো, মানুষের মানবিকতা বা পরিপূর্ণ মানুষ। জ্ঞান চর্চার অনুকূল পরিবেশ ও মননশীলতার উন্নয়ন শিশুকাল থেকেই মনের গভীরে ঠাঁই করে নেয়া দরকার। বিজ্ঞান মানুষকে মানসিক বৈভব ও অর্থনৈতিক প্রাচুর্য দেয়। বর্তমান বিশ্বে যে জাতি যত বিজ্ঞানী সে জাতি তত উন্নত। বিজ্ঞানী শব্দটি অনেকটা পার্থিব (জাগতিক) কিন্তু এরই মাঝে লুকিয়ে আছে, সৎ চিন্তার উৎস এবং ব্রহ্মাণ্ডের নিপুণ কারুকার্যের উদঘাটন করে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ করার প্রয়াস। তাই সত্য সাধনাই হলো বিজ্ঞান। মনকে পরিপক্ষ করা, বিশুদ্ধ করার একমাত্র উপায় বিজ্ঞান চর্চা, যেখানে সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতি এসে মিলেমিছে গেছে বিস্ময় আর জিজ্ঞাসায়, যেমন - "মুঠো ফোনের কথা ও ছবি গুলো কেমন করে বাতাসে ভেসে দূরে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে চলেযায়?" আমরা সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতিতে ভর করে আমাদের উন্নত জীবনযাত্রা সাজায়, আমাদের জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে। মনের পরিছন্নতার সঙ্গে সঙ্গে সকল কুসংস্কারকে দূর করে বিজ্ঞান। তাই বিজ্ঞানই জীবন, বিজ্ঞানই কৌতূহল।

এখানে কিশোর/কিশোরীর জীবন চিত্রায়িত হয়েছে ৮ম - ১২তম শ্রেণী পর্যন্ত, বয়সটা আনুমানিক ১৩-১৭ বছর হবে। যা সাজানো আছে বিজ্ঞান ও জীবনের সমন্বয়ে। আশা করি একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান চর্চার উন্মুক্ত বাতাস বাংলাদেশের শিশু কিশোরদের জীবনে ইতিবাচক ভাবে ধরা দেবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক হবে বিজ্ঞানের সাধক, যেখানে সত্যকে অনুধাবন করা যায়।

এই উপাখ্যান উপস্থাপন করার একটাই উদ্দেশ্য, কিশোর কিশোরীদের মনে বিজ্ঞানের একটা জায়গা করে দেওয়া। একটা কথা চালু আছে, ১৭টি সমীকরণ যা পৃথিবীর ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছে। কি এই ১৭টি সমীকরণ, কি আছে এতে, কিভাবেই বা কাজ করে এই সমীকরণগুলো? ধাপে ধাপে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, চিন্তার পরিপক্কতায় ১৭টি সমীকরণকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, সমীকরণের সৌন্দর্য এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর উদ্দেশ্যেই এই উপাখ্যানের রচনা।

১/ অনুসন্ধানী জীবন (৮ম শ্রেণী):

এই ১৩-১৪ বছর বয়সটাই অনুসন্ধানী আর বিস্ময়ে ভরা। অতীত অভিজ্ঞতাহীন এই বয়স জানে না কি ভাবে অনুধাবন কে পর্যবেক্ষণ করতে হয় বিশ্লেষণাত্মক ভাবে। দৃষ্টির বাহিরেও একটা গাণিতিক উপস্থাপনা থাকে, ভৌত জগতের সম-আলোচনামূলক কল্পনা থাকে।

৮ম শ্রেণীর জন্য "বিন্দু", "point" একটা উদাহরণ হতে পারে। বিন্দু হল মাত্রাহীন ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে (3D space) ক্ষুদ্রতম অবস্থান। এতো ক্ষুদ্র যে বিন্দুর কোন আকার নেই, কোন জায়গা দখল করে থাকে না। একটি বিন্দুর অবস্থান ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রের X(দৈর্ঘ্য), Y(প্রস্থ) এবং Z(উচ্চতা) স্থানাঙ্ক দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। কথাটা দাড়ালো, বিন্দু হল মাত্রাহীন, এটির কোন আকার নেই এবং শুধুমাত্র অবস্থান আছে, এইটাই বুঝতে হবে। 4D তে সময়কে চতুর্থ মাত্রা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেমন যখন কোন উপাত্ত (data) সংগ্রহ করা হয় তা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের ত্রিমাত্রিক পৃথিবীতে 4D এর নকশা দাগানো সম্ভব না। ঠিক এমনি ভাবে অংকের মাধ্যমে বহু মাত্রার ক্ষেত্র কল্পনা করা যায়, যা বাস্তবে দেখা সম্ভব নয়। চোখের দেখার বাহিরে, মনের দেখার সক্ষমতায় হলো কল্পনার জগৎ। কল্পনাপ্রসূত মনকে প্রস্তুত করতে হবে ১৩-১৪ বছর বয়সেই, কেননা বিজ্ঞানের দৃষ্টি মনোজগতে।

২/ বিস্মিত জীবন (৯বম শ্রেণী):

লুকিয়ে থাকা বিষয়বস্তুকে সামনে নিয়ে আসাই এই বয়সের ধর্ম। গাণিতিক সমীকরণ গুলোর বাস্তব ব্যবহার, মনোজগত ও বাস্তবতার মধ্যে একটা সেতুবন্ধন তৈরি করে।

যেমন, আকৃতি ও পরিমাপ নিয়ে গণিতের অন্যতম শাখা জ্যামিতি। π (pi) কি কেন ব্যবহৃত হয়? এই গাণিতিক ধ্রুবক টিকে নিয়ে কেন এতো উৎসাহ সবার? ১৪-১৫ বছর বয়সে গাণিতিক ধ্রুবক, সংখ্যা তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করবার দৃষ্টিভঙ্গির দরকার। গাণিতিক ধ্রুবক গুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক ধরনের আধ্যাত্মিকতা, পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণের এক বিস্ময়। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির মাঝে লুকানো ধ্রুবক গুলোর নিগুড়ো পর্যবেক্ষণই বিজ্ঞান। আজকের এই কিশোর, একদিন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি থেকে নতুন এক ধ্রুবক আবিষ্কার করবে, যা দিয়ে উন্মুক্ত হবে নতুন এক সৃষ্টির রহস্য।

৩/ হাতেকলমে জীবন (১০শম শ্রেণী):

মানুষের হাতের শিল্প তাঁর মনকে প্রকাশ করে। চিন্তা ও নকশা একে অপরের সমান্তরাল। ছবি আঁকা থেকে শুরু করে, ইলেকট্রিক বা যান্ত্রিক কিছু করা এই ১৫-১৬ বছর বয়সের ধর্ম। বিজ্ঞান চর্চার প্রথম শর্ত হলো মনশ্চক্ষুতে দেখা আর তা হাতেকলমে উপস্থাপন করা। বিভিন্ন রকম নিজস্ব প্রকল্প এই বয়সে হাতে নিতেই হবে। প্রকল্প গুলোর অনন্য প্রকৃতি হবে ১০শম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য এক খেলাঘর। যেখানে, তাঁদের সাবধানে তৈরি অনুমান (hypotheses) গুলো হতাশাজনক ভাবে ব্যর্থ হবে, আবার সেই "বুদ্ধিমান ব্যর্থতা" দুর্দান্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অভিবাবক ও বিদ্যালয়ের সহায়তায় অতি যত্নের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে ১৫-১৬ বছরের বয়সটা হয়ে উঠবে "আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে", - কাজী নজরুল ইসলাম।

৪/ পর্যবেক্ষণমূলক জীবন (১১তম শ্রেণী):

শিক্ষার্থীদের উপর পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষার প্রভাব অনেক। অনুকরণীয় (benchmarking) কে আদর্শস্বরূপ কল্পনা করে, তা অনুসরণ করা ১৬-১৭ বছরের বয়সের জন্য প্রযোজ্য। বিভিন্ন মনীষীদের জীবন ও কাজ কে পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের অনুসরণ করা ও নিজেকে তাঁদের মাঝে খুঁজে পাওয়া হলো পর্যবেক্ষণমূলক জীবন। পর্যবেক্ষণমূলক জীবন, জীবনের না পাওয়া অভিজ্ঞতা গুলোকে সমন্বয় করে, ক্রমবর্ধমান

(অবিচ্ছিন্ন) ভাবে। উপলব্ধির দরকার জীবনকে সংজ্ঞাইতো করবার জন্য। মহাবিদ্যালয় বিভিন্ন মনীষীদের জীবন ও অবদানকে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উল্লেখ করবে পর্যবেক্ষণমূলক ভাবে।

৫/ চরিত জীবন (১২তম শ্রেণী):

এই পর্যায়ে ছাত্র/ছাত্রীরা গাণিতিক সমীকরণগুলো বুঝতে শিখবে, জানবে সমীকরণগুলোর অবদান ও ব্যবহার ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক। এখানে ১৭ টা সমীকরণ উল্লেখ করা হলো যা ছাত্র/ছাত্রীরা বুঝবে ও বিশ্লেষণ করবে।

১. পিথাগোরাসের উপপাদ্য (The Pythagorean theorem, Pythagoras, 530 BC): জ্যামিতির অন্তর্ভুক্ত সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি বাহু সম্পর্কিত একটি সম্পর্ক।

২. লগারিদম উপপাদ্য (The logarithm and its ইডেন্টিটিস, John Napier, ১৬১০): আনুমানিক বড় সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত অঙ্ক।

৩. ক্যালকুলাস উপপাদ্য (ক্যালকুলেস, Isaac Newton, ১৬৬৮): ক্যালকুলাস হলো অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের গাণিতিক অধ্যয়ন।

৪. নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র (Newton's universal law of গ্রাভিটেশন, Isaac Newton, ১৬৮৭): মহাবিশ্বের যেকোন পদার্থের কণা অন্য একটিকে আকর্ষণ করে যার একটি বল সরাসরি ভরের গুণফল হিসাবে এবং বিপরীতভাবে তাদের মধ্যকার দূরত্বের বর্গ হিসাবে পরিবর্তিত হয়।

৫. জটিল সংখ্যা (Complex numbers, Leonard Euler, ১৭৫০): কাল্পনিক একক i কে বাস্তব সংখ্যাসমূহের সাথে যুক্ত করে জটিল সংখ্যা পাওয়া যায়।

৬. ইউলারের উপপাদ্য (Euler's formula for polyhedra, Leonard Euler, ১৭৫১): গাণিতিক সূত্র যা ত্রিকোণমিতিক ফাংশন এবং জটিল সূচকীয় ফাংশনগুলির মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

৭. স্বাভাবিক বন্টন (The normal distribution, Carl Friedrich Gauss,1810): সাধারণ বণ্টন, যা গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন নামেও পরিচিত। একটি সম্ভাব্য বন্টন যা গড় সম্পর্কিত, দেখায় যে গড় থেকে দূরে থাকা ডেটার তুলনায় গড় কাছাকাছি ডেটা বেশি ঘন ঘন হবে।

৮. তরঙ্গ সমীকরণ (The wave equation, Daniel Bournoulli and Jean D'Alembert, ১৭৪৬): একটি পার্থক্য (differential) সমীকরণ যা তরঙ্গের আচরণকে বর্ণনা করে।

৯. ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম (The Fourier transform, Jean-Baptiste Joseph Fourier, ১৮২৭): তরঙ্গ ও সময়ের সহ অবস্থান।

১০. নেভিয়ার-স্টোকস সমীকরণ (The Navier-Stokes equations, ১৮২২): নেভিয়ার-স্টোকস সমীকরণগুলি গাণিতিকভাবে নিউটনিয়ান তরলগুলির জন্য গতির ভারসাম্য প্রকাশ করে এবং ভর সংরক্ষণের ব্যবহার করে।

১১. ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ (Maxwell's equations, Maxwell, ১৮৬৫): ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ বর্ণনা করে কিভাবে বৈদ্যুতিক চার্জ এবং বৈদ্যুতিক স্রোত বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে।

১২. তাপগতিবিদ্যার মৌলিক সূত্র (Law of thermodynamics, Ludwig Boltzmann, ১৮৭৪): সময়ের সাথে সাথে শক্তি এবং তাপ নষ্ট হয়ে যায়।

১৩. আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (Einstein's theory of relativity, Albert Einstein, ১৯০৫): সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বলে যে ভরের মধ্যে পর্যবেক্ষিত মহাকর্ষীয় প্রভাব স্থানকালের অবস্থানের ফল।

১৪. শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ (The Schrödinger equation, ১৯২৬): শ্রোডিঞ্জার সমীকরণ কোয়ান্টাম বলবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার কাল ও স্থান নির্ভরতা প্রকাশ করে বা তরঙ্গ অপেক্ষকের বর্ণণা দেয়। তিনি ১৯২৬ সালে এই সূত্র প্রকাশ করেন

১৫. শ্যাননের ইনফরমেশন তত্ত্ব (Shannon's information theory, Claude Elwood Shannon, ১৯৪৮): শ্যাননের তত্ত্ব তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত একটি ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমকে সংজ্ঞায়িত করে: ডেটার উৎস, একটি যোগাযোগ চ্যানেল এবং একটি রিসিভার।

১৬. রসদ ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির মডেল (The logistic model for population growth, Robert May, ১৯৭৫): রসদ বৃদ্ধির সঙ্গে সীমিত সংস্থান দ্বারা জনসংখ্যার আকার সর্বাধিকের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে জনসংখ্যার মাথাপিছু বৃদ্ধির হার কমতে থাকে, যা নির্দিষ্ট ক্ষমতা নামে পরিচিত।

১৭. ব্ল্যাক-স্কোলস মডেল (The Black-Scholes Model, Fischer Black and Myron Scholes ১৯৭৩): ব্ল্যাক-স্কোলস মডেল, যা ব্ল্যাক-স্কোলস-মার্টন (BSM) মডেল নামেও পরিচিত, আধুনিক আর্থিক তত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা।

STEM (Science, Technology, Engineering and Math) শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত দেশগুলির সব স্কুলে। গণিত আমাদের আধুনিক বিশ্বের কেন্দ্র বিন্দু। এবং গনিত আমাদের মনের সৃষ্টি। আর তাই গণিতে কিশোরদের আগ্রহ অনেক, আমাদের মনের খোরাক এই গণিত।

17 Equations That Change the World

1.	Pythagora's Theorem	$a^2 + b^2 = c^2$	Pythagoras, 530 BC
2.	Logarithms	$\log xy = \log x + \log y$	John Napier, 1610
3.	Calculus	$\frac{df}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$	Newton, 1668
4.	Law of Gravity	$F = G\frac{m_1 m_2}{d^2}$	Newton, 1687
5.	The Square Root of Minus One	$i^2 = -1$	Euler, 1750
6.	Euler's Formula for Polyhedra	$F - E + V = 2$	Euler, 1750
7.	Normal Distribution	$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	C.F. Gauss, 1810
8.	Wave Equation	$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$	J. d'Almbert, 1746
9.	Fourier Transform	$\hat{f}(\in) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \in} dx$	J.Fourier, 1822
10.	Navier-Stokes Equations	$\rho\left(\frac{\partial v}{\partial t} + v \cdot \nabla v\right) = -\nabla p \quad \nabla \cdot T + f$	C. Navier, G. Stokes, 1845
11.	Maxwell's Equations	$\nabla E = \frac{\rho}{\in_0} \quad \nabla \times E = -\frac{1}{c}\frac{\partial H}{\partial t}$ $\nabla H = 0 \quad \nabla \times H = \frac{1}{c}\frac{\partial E}{\partial t}$	J.C Maxwell, 1865
12.	Second Law of Thermodynamics	$dS \geqslant 0$	L. Boltzmann, 1874
13.	Relativity	$E = mc^2$	Einstein, 1905
14.	Schrodinger's Equation	$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = \hat{H}\Psi$	E. Schrodinger, 1927
15.	Information Theory	$H = -\sum p(x) \log p(x)$	C. Shannon, 1949
16.	Chaos Theory	$x_{t+1} = kx_t(1 - x_t)$	Robert May, 1975
17.	Black-Scholes Equation	$\frac{1}{2}\sigma S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} + \frac{\partial V}{\partial t} - rV = 0$	F. Black, M. Scholes, 1990

ধনুক-ভাঙা পণ: ১৮

“বিশ্ব ভারসাম্যে পৌঁছাতে প্রযুক্তি নয়—বাংলাদেশের আসল চাবিকাঠি ডিজিটাল শিক্ষা ও মানবসম্পদ।”

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে, পৃথিবীর সকল দেশগুলোর মধ্যে একটা "ভারসাম্য" অবস্থান করবে। তার মানে, এমন একটা অবস্থানে দাঁড়াবে যেখানে সকল দেশের মাথাপিছু গড় আয় সমান হবে এবং চাহিদা অনুসারে একে অন্যের পরিপূরক হয়ে একটা ভারসাম্য বযায়ে রাখবে পৃথিবীর অর্থনীতিতে। এই মুহূর্তে আমরা Aliexpress থেকে সকল কিছু কিনতে পারি, Amazon ও আসবে একদিন। জাপান আমেরিকার প্রযুক্তি আমরা অনায়াসে আমাদের দেশে নিয়ে আসতে পারি। কম্পিউটারে যোগাযোগ এবং উন্মুক্ত তথ্য শিক্ষা ও বাজার ব্যবস্থা এই ভরসাম্য পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, এবং ভবিষ্যতে পৃথিবীর অর্থনীতি ভরসাম্য তে চলে আসবে প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত সময়ে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি করে ডিজিটাল প্রযুক্তি, যা আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি দিককে রূপান্তরিত করছে।

বিশ্ব অর্থনীতি “ভারসাম্য”-এর দিকে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেটা স্বয়ংক্রিয় নয় - যারা *মানবসম্পদ, শিক্ষা ও নীতি* দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে, তারাই সেই ভারসাম্যে জায়গা পাবে। বাংলাদেশের ঘাটতি প্রযুক্তিতে নয়, ঘাটতি ডিজিটাল শিক্ষাগত মেরুদণ্ডে।
কম্পিউটার সায়েন্স মানে কী, কেন, কিভাবে—এই বোধ স্কুল–কলেজ স্তরে দুর্বল। ব্যবহারকারী তৈরি হচ্ছে, কিন্তু problem solver / system thinker তৈরি হচ্ছে না।

তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে, বাংলাদেশ কতটা পিছায়ে আছে এবং কিভাবে কত দিন লাগবে বাংলাদেশকে বিশ্বের ভারসাম্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সেই জন্য এই "বেইসের উপপাদ্যটির" (Thomas Bayes, ১৭৬৩) ব্যবহার। এটি একটি গাণিতিক নিয়ম যা কিছু প্রমাণের ভিত্তিতে একটি বিশ্বাসকে কীভাবে হালনাগাদ করতে হয় তা বর্ণনা করে। যা প্রদত্ত ঘটনার শর্তসাপেক্ষ সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। পূর্ববর্তী ফলাফলের সংঘটনের উপর ভিত্তি করে একটি ঘটনা ঘটবে এমন সম্ভাবনা হিসাবে শর্তযুক্ত সম্ভাব্যতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এই বেইসের উপপাদ্য দিয়ে। তাই বাংলাদেশের কম্পিউটার শিক্ষার অবস্থান কোথায় এবং কতো দিন লাগবে বিশ্ব অর্থনীতির ভারসাম্য অবস্থানে আসতে, বর্তমান পরিপেক্ষির স্কুল কলেজ এর কম্পিউটার শিক্ষাক্রম কে ব্যবহার করে, সেটাই দেখার চেষ্টা।

বেইসের উপপাদ্যটির জন্য নকশা করতে, প্রধানত ৫ টি অনুসন্ধান মূলক বিষয়কে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ যে, উপাত্ত (data) গুলো আনুমানিক (প্রত্যক্ষ প্রমাণহীন), তবে কিছু উপাত্ত সংগৃহীত করা হয়েছে, বিভিন্ন স্কুল থেকে। নিচের ছবিতে উপাত্তর টেবিল ও ফলাফল দেওয়া হলো।

১. তথ্য শিক্ষা (বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ): তথ্য শিক্ষণে যদি আধুনিকরণ করা হয় তবে ২৮% অবদান রাখবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষন দরকার।

২. হাতে-কলমে (কম্পিউটার পরীক্ষাগার): আরও কম্পিউটার পরীক্ষাগারের সংখ্যা ও আধুনিকরণ করা হয় তবে ৫৪% অবদান রাখবে। বর্তমানে ২০ টা স্কুল এর মাঝে ১ টা স্কুল এ কম্পিউটার Lab আছে।

৩. সামাজিক (জনগণের অংশগ্রহণ): উল্লেখ্য যে আপামর জনগনের সংশ্লিষ্টতাই সব কিছু তাই ১০০% অবদান রাখবে। এর জন্য, শিক্ষা পাঠ্যক্রম এর বাহিরে, জনগণের জন্য কম্পিউটারের ব্যবহারিক জ্ঞানের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন, বাংলায় আরও কম্পিউটারের কলাম লেখা, নিবিড় প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি।

৪. সরকারের অর্থায়ন ও অংশগ্রহণ: সরকারের প্রশাসনিক আগ্রহ ৮৩% অবদান রাখবে।

৫. আধুনা তথ্য শিক্ষা অভিযোজন: আধুনা তথ্য শিক্ষার প্রয়োজন অনেক, এখন স্কুল গুলোর পাঠ্যক্রমে আধুনা তথ্য শিক্ষা অভিযোজন করা আছে, তবে ভবিষ্যতে চলমান ভাবে থাকতে হবে যা ৫০% অবদান রাখবে।

এই নিবন্ধনটি লিখবার একটাই কারণ, বাংলা ভাষাতে কিছুটা হলেও একটা পরিসংখ্যানগত নকশা উল্লেখ করা। যেখানে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত কম্পিউটার শিক্ষার প্রয়োজনীয় অগ্রগতিকে নির্দেশ করে।

আর একটা বিষয় উল্লেখ করতেই হয়!

ভাষা বাদ দিলে চিন্তা বাদ পড়ে,
চিন্তা বাদ দিলে উদ্ভাবন হয় না!

আধুনিক কম্পিউটার শিক্ষা:

এইটুকু পরিষ্কার যে কম্পিউটার শিক্ষা আর সকল বিজ্ঞান শিক্ষার (পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, অংক শাস্ত্র..) মতো চিরাচরিত ভাবে আধুনিকতায় অগ্রসর হচ্ছে না। যেহেতু কম্পিউটারের আমাদের মতো processing power আছে তাই স্বভাবতই কম্পিউটার শিক্ষা তার রূপ ও আদল বদলাচ্ছে নিজে থেকেই। কারণ একটাই, "কম্পিউটারগুলি অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত, নির্ভুল এবং বোকা। আর মানবজাতি অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন, ভুল যুক্ত, এবং মেধাবী। আর তাই, মানবজাতি+কম্পিউটার মিলে কল্পনার বাইরে শক্তিশালী।" - আলবার্ট আইনস্টাইন। স্বভাবতই, কম্পিউটার শিক্ষাক্রম কে ভিন্ন রূপে শাজাতে হবে। এ নিয়েই এই লেখা।

স্কুল শিক্ষা কার্যক্রমে কিছু ধারণা, কিছু উন্মুক্ত চিন্তা ছাত্রদের মাঝে সঞ্চালনের ব্যবস্থা থাকা দরকার কিশোর/কিশোরীর অনুধাবন করবার জন্য। যেখান থেকে তাঁরা তাঁদের চিন্তার বুনিয়াদ খুঁজেপাবে। যেমন, ১/ মহান সৃষ্টিকর্তার অবস্থান, ২/ মানবজাতির মনবিক গুনাগুন ও ৩/ আধুনিক উন্নয়ন গুলোর ক্রমবর্ধমান অবস্থান। এই সকল ধ্যানধারণা এবং একাগ্র চিন্তা/বিশ্বাস কিশোর/কিশোরীদের চিন্তার পরিপক্কতা আনবে। এই উন্মুক্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার যুগে, স্কুল শিক্ষা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও ভবিষ্যত দিক নির্দেশনায় ফলপ্রসু অপদান রাখবে।

"আধুনিক উন্নয়ন গুলোর ক্রমবর্ধমান অবস্থান", সাধারণ চিন্তায় সহজ হলেও ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক ব্যবসা অবস্থাকে জটিল করেছে। আমরা এমন এক প্রযুক্তিগত যুগে প্রবেশ করতে চলেছি যেখানে কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করবে/করছে সর্বক্ষেত্র থেকে। এর প্রধানত দুইটি কারণ, প্রথমত:- কম্পিউটারের খুবই দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ, যেখানে কম্পিউটার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence - AI) ও প্রচুর উপাত্ত (Big Data) নিয়ে কাজ করছে, দ্বিতীয়ত :- internet এর জন্য মানুষ-মেশিন ও মেশিন-মেশিন যোগাযোগ একটা বৃহদায়তন (সবকিছু সবকিছুর সাথে সংযুক্ত) রূপ নিয়েছে। যেখানে, Internet of Things (IoT), Cloud Computing এর অবস্থান। এই ধারণা গুলোকে নতুন প্রজন্মমের কাছে তুলে ধরতে হবে। নতুন প্রজন্মমের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে আমরা কোন পথে কিভাবে এগোচ্ছি। নতুন নতুন কম্পিউটার যন্ত্রাংশের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাধান পদ্ধতি (Algorithm) এর প্রয়োগ, আধুনিক উন্নয়নকে জটিল ও সাধারনের বোধগম্যর বাহিরে নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রযুক্তিগত বিচ্ছিন্নতা মানব সমাজের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত। কম্পিউটার ব্যবহারকারী বিশাল মানব সমাজ এই উন্নয়নের সুবিধা পাবে ঠিকই তবে তা হবে অনুগ্রহ স্বরূপ মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠান থেকে (এখন যেমন Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon (AMZN), Meta (META-FB), ,..)। তাই এই বছর(২০২৪) থেকেই আমাদের স্কুল পর্যায়ে কম্পিউটার বিষয়ক এই জটিল অবস্থানের পরিষ্কার ধারণা দেওয়া দরকার।

আধুনিক যুগে কম্পিউটার বা উপাত্ত (data) প্রক্রিয়াকরণ আমাদের জীবনের অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের কে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল করে তুলবে এতে কোন সন্দেহ নেই। বলাবাহুল্য যে, বর্তমানেই আমরা ইন্টারনেট এর বদৌলতে, আমাদের উপাত্ত (data) কোথায় কি ভাবে প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে জানি না, আমরা এই ভৌতিক ব্যাপারটাকে গ্রহণযোগ্য করেছি আমাদের অজ্ঞতাকে (বোকামি) কাজের লাগিয়ে। যেমনটি আমরা করে থাকি ক্যালকুলেটরের ফলাফল কে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে। কম্পিউটারের ফলাফলের উপর আমাদের অগাৎ বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence - AI) মানুষের সামর্থ্য এবং সক্ষমতার উর্ধে কাজ করে, আর তাই আমরা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার কাছে পরাধীনতা শিকার করি। স্কুল পর্যায়ে আধুনিক কম্পিউটার শিক্ষায় কিছু ধ্যান ধারণার উপস্থিতি খুবই প্রয়োজন। যেমন, বিগ ডেটা (Big Data), Internet of Things (IoT), কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence - AI) ও Cloud কম্পিউটিং। প্রোগ্রামিং, ওয়ার্ড প্রসেসিং ও স্প্রেড শিট চালানোর দক্ষতা আমাদের স্কুল শিক্ষা কার্যক্রমে আছে, এতে স্কুল ছাত্ররা কম্পিউটারের ব্যবহারিক দিকটাই শুধু জানছে। সামগ্রিকভাবে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বোঝা দরকার, স্কুল পর্যায়ে যদি না জানে তাহলে পরবর্তীতে এই জটিল ও মিশ্রিত কম্পিউটারের পরিমন্ডল কে বোঝা ও অবদান রাখা কঠিন হবে।

তাই ৯ম শ্রেণীতে:

Internet of Things (IoT)

এবং বিগ ডেটা (Big Data),

আর ১০ম শ্রেণীতে:

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence - AI)

এবং Cloud কম্পিউটিং

এর পরিষ্কার ব্যবহারিক a ধারণা দেওয়া খুবই দরকার। ৯ম - ১০ম শ্রেণী আমরা পার করে এসেছি, ও বয়সে হয়তো বিষয়ের গভীরতা থাকে না কিন্তু আকাশকুসুম কল্পনা থাকে! দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্যই এই প্রয়াস।

৯ম শ্রেণীর জন্য, Internet of Things (IoT): ইন্টারনেটের সাথে যন্ত্র এবং সংবেদন (sensor) গুলির সংযোগকে বোঝায়। একটি IoT সিস্টেমে চারটি মৌলিক বিল্ডিং ব্লক রয়েছে: সেন্সর, প্রসেসর, প্রবেশপথ (getway) এবং প্রয়োগ (application)। এই যন্ত্র গুলো উপাদান সংগ্রহ করে (যেমন, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, গতি...) এবং কার্য (সিদ্ধান্ত) সম্পাদন করে। IoT যন্ত্রগুলি ইন্টারনেট সাথে সংযুক্ত থাকে এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে, ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম এবং উপাত্ত সংরক্ষণাগার, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণের জন্য কেন্দ্রীভূত থাকে। মজার ব্যাপার হলো, অর্থপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি বের করতে, প্যাটার্ন শনাক্ত করতে এবং জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে IoT ডিভাইসগুলির দ্বারা সংগৃহীত উপাত্ত (data) প্রক্রিয়া করা হয় এবং বিশ্লেষণ করা হয়। বর্তমানে IoT এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে, smart home, পরিধানযোগ্য

স্বাস্থ্য মনিটর (যেমন smart wrist watch), সংযুক্ত যানবাহন, শিল্প অটোমেশন (Fourth Industrial Revolution, 4IR), এবং পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ জুড়ে এর বিস্তৃত পরিসরে ব্যবহার হচ্ছে এবং আরও হবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে IoT ক্রমবর্ধমানভাবে প্রচলিত হয়ে উঠেছে/উঠবে। ৯ম শ্রেণীতে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা সহ ভবিষ্যতের জন্য উন্মুক্ত চিন্তার পরিবেশ শিক্ষা কার্যক্রমে রাখতে হবে। স্কুলে IoT সম্বন্ধে শেখার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা কীভাবে প্রযুক্তি তাদের চারপাশের বিশ্বকে রূপ দিচ্ছে এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে এবং উদ্ভাবনী সমাধান তৈরির দিক উন্মোচন করবে। সামগ্রিকভাবে, স্কুলে IoT অধ্যয়ন করা শিক্ষার্থীদের মূল্যবান দক্ষতা, জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সাহায্য করবে যা আজকের প্রযুক্তি-চালিত বিশ্বে প্রাসঙ্গিক। বিদ্যালয়ে একটি IoT পরীক্ষাগার থাকবে, কম দামের এখন অনেক IoT device ও যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়। ৯ম শ্রেণির জন্য IoT এর একটা পাঠক্রম তৈরি করা প্রয়োজন ও তা সহজেই করা যাবে।

৯ম শ্রেণীর জন্য, বড় উপাত্ত (Big Data) হলো ব্যক্তি এবং সমাজের দ্বারা উৎপন্ন বিপুল পরিমাণ তথ্য, যেমন ফেইসবুক এর মতো সামাজিক মধ্যম প্রতিদিন ৪ Petabytes (১০^১৫ Bytes), অনলাইন কেনাকাটার, খবর, ডিজিটাল করা বই, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সহ সকল উপাত্ত (প্রতিদিন প্রায় ০.৩৩ Zettabytes(১০^২১ bytes)) সংগ্রহ হয় এবং সময়ের সাথে আকারে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপাত্তগুলো সমাধানপদ্ধতি (algorithm) দ্বারাবিশ্লেষিত হয়, যা এতটাই জটিল যে যা আমাদের ধারণার বাহিরে। যেহেতু উপাত্তর (data) সংগ্রহ দিনদিন বেড়ে চলেছে, সঙ্গে নতুন সমাধানপদ্ধতি (algorithm) যোগ হচ্ছে তাই এই বড় উপাত্তর অবদান আমাদের জন্য এক আশীর্বাদ। বড় উপাত্তগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সিদ্ধান্ত এবং ব্যবসায়িক সমস্যাগুলি সমাধান করতে এবং অন্যান্য উন্নত জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে ব্যবহৃত হয়, যা আধুনিক জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়েছে/হবে। স্কুলের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রদের এই বিশাল উপাত্ত নিয়ে উদাহরণ সহ পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। মানব সমাজ মুষ্টিমেয় ভাবে উপাত্তর পাহাড় গড়ে চলেছে, যা ভবিষ্যতে বহুলাংশে আমাদেরকেই নিয়ন্ত্রণ করবে। এই ধারণাগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। স্কুল কার্যক্রমে ছাত্রদের উপাত্ত সংগ্রহ করতে, সংগঠিত করতে, বোঝাতে এবং যোগাযোগ করতে সক্ষমটা অর্জন করা দরকার। শিক্ষকরা পরিকল্পনা করে অর্থ পূর্ণ এবং কার্যকর উপায়ে শ্রেণীকক্ষে উপাত্ত বিজ্ঞান ও উপাত্ত বিশ্লেষণ আনতে পারেন। পরিসংখ্যান ও সমাধানপদ্ধতি (algorithm) এই পাঠক্রমের অংশ হিসেবে থাকবে।

স্কুলের ১০ম শ্রেণীতে, হাতে-কলমে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence - AI) শিখাতে হবে। কারণ, এটি মানব ইতিহাসের যেকোনো প্রযুক্তিগত বিপ্লবের চেয়ে দ্রুত সময়ে ঘটবে। এই AI শিক্ষাক্রম এর উদ্দেশ্য হবে, মানবকেন্দ্রিক উদ্ভাবন, নৈতিকতা এবং নিয়ন্ত্রক শাসন, চাকরি সৃষ্টি এবং রূপান্তর বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে। প্রজননক্ষম AI (Generative AI) আর বড় ভাষার মডেল (Large Language Models (LLMs) আমাদের জীবনকে বদলে দিয়েছে/দেবে গভীরভাবে। AI সম্পর্কে শিক্ষিত না হওয়া মানে হবে চরম বোকামি, কারণ AI এর ব্যবহার হচ্ছে/হবে।

স্কুলের ১০ম শ্রেণীতে, Cloud কম্পিউটিং এর পরিষ্কার ধারণা দেওয়া দরকার। নতুন প্রজন্মের ক্লাউড কম্পিউটিং শেখা উচিত কারণ এটি আধুনিক প্রযুক্তির অবকাঠামোর মেরুদন্ড হয়ে উঠছে। Cloud Computing (CC) এক প্রকারের সরঞ্জাম এর ব্যাবস্থা যা প্রোগ্রাম এর আবেদন প্রয়োগের জন্য মানব ও ইন্টারনেটের মধ্যে বিনিময়। সামগ্রিকভাবে, পাঠ্যক্রমের মধ্যে ক্লাউড কম্পিউটিং অন্তর্ভুক্ত করা শিক্ষার্থীদের মূল্যবান দক্ষতা এবং জ্ঞান প্রদান করে যা আজকের ডিজিটাল যুগে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

হয়তো বা, আমাদের এই সকল বুঝতে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে, কারণ আমরা স্কুল জীবনে এই বিষয়গুলোর সম্মুখীন হইনি। সিঙ্গাপুর এ সকল ভেবে এক সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে, তা হলো, দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ৪০+ প্রাপ্তবয়স্কদের ভর্তুকিযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, যেখানে AI, IoT, Big Data ও Cloud Computing বিষয়ের উপরে প্রয়োজনীয় দক্ষতায় নাগরিকদের সজ্জিত করবে।

স্কুলে বিভিন্ন বয়সের গ্রুপ এবং শিক্ষাগত স্তরের (৯-১০ শ্রেণী) জন্য তৈরি বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে AI, IoT, Big Data এবং Cloud Computing প্রবর্তন করতে পারে। শিক্ষার সুযোগ প্রদান করতে অনলাইনের শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্ম এবং massive open online course (MOOC), Coursera, Udacity এবং edX-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপসংহারে, একত্রে AI, IoT, Big Data এবং Cloud Computing একটি শক্তিশালী বাস্তুতন্ত্র (ecosystem) গঠন করে, এর সম্মিলিত ব্যবহার সকল শিল্পগুলিকে পুনর্নির্মাণ করবে, সামগ্রিকভাবে ব্যবসা এবং সমাজের জন্য নতুন সম্ভাবনার দার খুলে দিবে। এ বিষয়ে দক্ষ নাগরিক তৈরী করতে হবে স্কুল থেকে।

ধনুক-ভাঙা পণ - ১৯

“উদ্দীপক পাটাতন”

সবুজে শ্যামলে ভরা প্রকৃতি, তার মাঝে বসুন্ধরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বসুন্ধরা মৌজার নামকরণের স্বার্থকতা আছে, এখানের প্রকৃতি যেন শিল্পীর আঁকা এক অপরূপ ছবি। বসুন্ধরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা প্রকৃতির মতো কথা বলে, সবুজের মাঝে মিলে মিশে মন ও মনোনশীলতাকে উন্মুক্ত করে। এখানে স্বরবর্ণ ১১টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯ টি ও সংখ্যা ১০টি দিয়ে গীতিকবিতা রচিত হয় যেখানে থাকে ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতিমণ্ডিত কবিতা ও গান, “ও আমার বাংলা ভাষা”। এই মাতৃভাষার কোনো তুলনা নেই, এখানে মানুষের ঋণ অপরিশোধ্য, এখানেই আমরা স্বতন্ত্র ও স্বশাসিত, জেদী ও প্রচন্ড একগুঁয়ে।

জামিলা খাতুন নামে একজন উৎসাহি শিক্ষিকার নেতৃত্বে এখানে অঙ্ক শেখানো হয়। শিশুদের মন নিয়ে জামিলার যত চিন্তা। তাঁর মূল ভাবনা হলো, “বড় চিন্তা” উত্তেজনা এবং আনন্দ উৎপন্ন করে, “ছোট চিন্তা” ভয় এবং উদ্বেগ তৈরি করে। তাই শিশু মনে চাই বড় চিন্তা যা শিশু কিশোরদের আনন্দ ও উৎসাহ যোগাবে। নিজের মাতৃভাষায় শেখানোর শক্তিতে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন এবং তার ছাত্রদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের সৌন্দর্য দেখাতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। গণিত শিক্ষার ভিত্তিই হলো মাতৃভাষার সঙ্গে বস্তু জগতেরসংযোগ তৈরি। যত কঠিন গাণিতিক উপপাদ্যকে উপস্থাপনা করা হোক না কেন গাণিতিক রূপে, সেই উপপাদ্যয়ের একটা ভাষাগতো বিশ্লেষণ আছে। তাই মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার সংখ্যার আদল মনের অলক্ষে স্থান এই শিশু বয়সেই দিতে হবে।

শিক্ষিকা জামিলার তত্ত্বাবধানে একটা “উদ্দীপক পাটাতন” (Activity Board) আছে। সেটা নকশা করা কাঠের পাটাতন, “সংখ্যা বাগান” বলে এক ফুলের বাগানে বড় আম গাছ থেকে ঝুলানো। পাটাতনে শাটানো আছে অনেক কিছু। বিবেচনায় আছে,

১. বর্ণমালা এবং সংখ্যা: চৌম্বকীয় অক্ষর এবং সংখ্যা।

২. রঙ এবং আকৃতির মিল: বিভিন্ন আকার চেনানো।

৩. জ্ঞানেন্দ্রি সম্বন্ধীয়: বিভিন্ন গঠনবিন্যাস অনুভূত, তুলার বল, পাথর, শিরিষ-কাগজ।

৪. ধাঁধা: সাধারণ আকৃতির ধাঁধা।

৫. অঙ্কন এবং লেখা: চকবোর্ড।

৬. মিথষ্ক্রিয় (interactive) ঘড়ি: একটি কার্ডবোর্ড ঘড়ির ও বালিঘড়ি।

৭. গল্প বলা: ছবি, বই ও গল্পের পাতা।

এমনি আরো এত কি দিয়ে সাজানো এই “উদ্দীপক পাটাতন” (Activity Board) ।

বিভিন্ন প্রকারের আকৃতি ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত, আয়তক্ষেত্রাকার, ষড়ভুজ ও জ্যামিতি আকার গুলোর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যর বিবরণ। আছে ৫০, ১০০, ২০০, ৪০০, ৮০০ ও ১৬০০ গ্রাম, ও ২০, ৫০, ১৩০, ২৭০, ৭৬০ ও ২০০০ গ্রামের ঝুলানো পাইপ তাতে ঢাকের কাঠি দিয়ে আঘাত করে সুর তৈরী করার ব্যবস্থা। এখানে উল্লেখ যে প্রথম সারির পাইপ গুলো পর্যায়ক্রমে দ্বিগুন আর তাই সুর গুলোর মধ্যে একটা সমঞ্জস (একতান - harmony) থাকবে আর দ্বিতীয় সারির পাইপ গুলোর মধ্যে কোন গাণিতিক সম্পর্ক নেই তাই সুর গুলোও হবে বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্নতা (incoherence)।

শিক্ষিকা জামিলা চান অংকের সাথে কিশোর মনের একটা অন্তরঙ্গতা গড়তে। এই সুর ও ওজনের মিলকে বুঝানোর জন্য শিক্ষিকা জামিলা দুই দিনের চার ঘন্টার শ্রেণী অনুশীলন নেন। একই সাথে, মানুষের কণ্ঠস্বর বাতাসের কম্পনের ফলে কি ভাবে শোনা যায় তা দেখানোর জন্য পরিষ্কার পাইপে কিছু স্টাইরোফোম এর গুঁড়ার কম্পন দেখান।

শিক্ষিকা জামিলা মনে করেন মানুষের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক কে শিশু কাল থেকেই চারটি অন্তরিন্দ্রিয়র (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ও চিত্ত) সঙ্গে সম্পূরোক করতে হবে। তাহলেই পরিপূর্ন মানুষ হবে।

“উদ্দীপক পাটাতন” টাতে আরো আছে, সময়ের উপস্থাপন ও সময়দিয়ে যোগ শিখানোর জন্য চারটি “বালিঘড়ি” যা ৫, ১০, ১৫ ও ৩০ সেকেন্ড এর। ছাত্ররা পাটাতনে লাগানো বালিঘড়ি গুলোকে ঘুরায়ে দিয়ে তাদের মধ্যে যোগের সম্পর্ক দেখবে। দোর্ঘ মাপার আন্দাজ পাবার জন্য ২৫০, ৫০০, ৭৫০ ও ১০০০ সেন্টিমিটার এর কাঠি “উদ্দীপক পাটাতন” এ লাগানো আছে। ঠিক মতো ওজন কে অনুভব করার জন্য ১০০, ২০০ .. থেকে ১০০০ গ্রামের দশ টি থলে ঝুলানো আছে। শিক্ষিকা জামিলা চান ছাত্ররা অংক কে শ্বাস টেনে ফুসফুসের ভেতরে নেক, যেমন করে অক্সিজেন নিয়ে আমরা বাঁচি। উদ্দীপক পাটাতনে আছে খাজকাটা গোলাকার সাজসরঁজাম বিভিন্ন আকারের, সেগুলো একে অন্যের সাথে জড়ানো, একটাকে ঘুরালে অন্য গুলিও স্বয়ংক্রিয় ভাবে সক্রিয় হয়। এখানে খাজকাটা চক্রাকার সাজসরঁজামের অনুপাত ও বল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কি ভাবে নেওয়া যাবে সেটা দেখানোর চেষ্টা। এখানে একটি এবাকাস (Abacus, counting frame) রাখা আছে, সঙ্গে কম্পিউটার এর Binary number system কে উপস্থাপন করা আছে মজার ছলে।

রঙিন এই “উদ্দীপক পাটাতন” টি খরগোশ আকৃতির পাঠাতনে বনানো, যা শিশু মনকে আকৃষ্ট করে।

শিশুরা এই “উদ্দীপক পাটাতন” বা Activity Board নিয়ে খেলা করে মনের খুশিতে, এখানে কোন পাঠ্যক্রম নেই । শিক্ষিকা জামিলা শুধু পর্যবেক্ষণ করেন, আর নতুন নতুন উদ্দীপকের যোগান দেন এই পাটাতন। শিক্ষিকা জানেন, দক্ষতা, মনোযোগী, কার্যনির্বাহী, মনে রাখা, ভাষা এবং প্রক্রিয়াকরণের গতি বা সাবলীলতা অর্জনই হলো গনিত। যোগ, বিয়োগ, গুন ও ভাগ হলো গনিতের খাস এক্তিয়ায় ভুক্ত। কিন্তু গণিত শেখা শুরু হয় পরিমাণ, আকার এবং তুলনার ধারণা এবং সংখ্যার প্রতিনিধিত্বকারী শব্দ দিয়ে। তাই তো শিক্ষিকা জামিলার মাতৃভাষার প্রতি এত আগ্রহ, কেননা একমাত্র মাতৃভাষাই হ্রাস করতে পারে শিশু মনের অংক জ্ঞানীয় প্রতিবন্ধকতা।

এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে, শিক্ষিকা জামিলা তার ছাত্রদের স্কুলের বাগানে জড়ো করলেন। বাগানটি রঙিন ফুল এবং গাছপালা দিয়ে ভরা, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো উদ্দীপক পাটাতন, যাতে আজ সংখ্যাগুল নিয়ে কথা হবে। শিশুরা তাদের খাতা-পেন্সিল হাতে নিয়ে মিসেস জামিলাকে সাগ্রহে অনুসরণ করছে, তাদের চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে।

শিক্ষিকা জামিলা শুরু করলেন, "আজ আমরা আমাদের নিজস্ব ভাষায় সংখ্যার জাদু অন্বেষণ করব। আমরা দেখব কিভাবে আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের চারপাশের জগতকে গণনা, করতেন এবং বুঝতেন। এইভাবে আমরা আমাদের ভাষায় '১' লিখি," তিনি উদ্দীপক পাটাতনে হাত রেখে বললেন। শিশুদের মাঝে দেখালেন বিভিন্ন ভাষায় সংখ্যার আদল, বোঝালেন আমাদের সংখ্যার আদল আমাদের ভাষা ও সস্কৃতির অংশ। বাংলা সংখ্যার আকার কয়েক শতাব্দী ধরে বিবর্তিত হয়েছে এবং বাংলা অঞ্চলের আঞ্চলিক লিপি এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলন দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। এই সংখ্যাগুলি বাণিজ্য, জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিত সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হত। এমন কি, ১৮ এবং ১৯ শতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময়, প্রশাসনিক এবং শিক্ষাগত প্রেক্ষাপটে ইংলিশ সংখ্যা (0-9) ব্যবহারের জন্য চাপ ছিল। তা সত্ত্বেও, ঐতিহ্যগত ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা সংখ্যা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

পাঠ চলতে থাকলে শিশুরা আরো আত্মবিশ্বাসী ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা সংখ্যার আদলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে , এমনকি তাদের স্থানীয় সংখ্যা ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব গল্প তৈরি করেছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে গণিত কেবল সংখ্যা এবং সমীকরণ নয়; এটি তাদের সংস্কৃতি, তাদের ইতিহাস এবং তাদের চারপাশের বিশ্ব বোঝার জন্য এক হাতিয়ার। পাঠ শেষে তারা খাতা-পেন্সিল গুছিয়ে নিল, কিন্তু তাদের মন সংখ্যার বিস্ময় এবং তাদের বলা গল্পে ভরে গেল। তারা জানলো যে তাদের মাতৃভাষায় গনিত শেখা মানে তাদের অতীতের সাথে সংযুক্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য ক্ষমতায়িত হওয়া। নিশ্চয়ই, বাচ্চাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে, মাতৃভাষা তাদের সংখ্যার প্রতীকী প্রকৃতি সনাক্ত করতে এবং বুঝতে শেখার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে।

একদিন স্কুল এ একজন দর্শনার্থী এলেন। জনাব মোয়েনুদ্দিন, দূরবর্তী শহরের একজন শিক্ষাবিদ, গণিত শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষিকা জামিলার অনন্য পদ্ধতির কথা শুনেছিলেন। তিনি দেখলেন, শিশুরা যখন উদ্দীপক পাটাতন এর সঙ্গে থাকে তখন তাদের আনন্দ ও উদ্দীপনায় মুখ গুলো আলোকিত হয়ে থাকে।

“এটা অসাধারণ," জনাব মোয়েনুদ্দিন শিক্ষিকা জামিলাকে বললেন। "এই শিশুরা এমন একটি আকর্ষক এবং অর্থপূর্ণ উপায়ে গণিত শিখছে। তারা তাদের ঐতিহ্যের সাথে খুব সংযুক্ত এবং তাদের জ্ঞান নিয়ে গর্বিত।"

শিক্ষিকা জামিলা হাসলেন। "হ্যাঁ, তারা তাই। তাদের মাতৃভাষায় শেখা শুধুমাত্র ধারণাগুলোকে সহজে উপলব্ধি করে না বরং গর্ব ও পরিচয়ের গভীর অনুভূতিও জাগিয়ে তোলে। তারা শুধু গণিত শিখছে না; তারা নিজেদের সম্পর্কে শিখছে।"

শিক্ষক মোয়েনুদ্দিন যা দেখেছিলেন তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তাদের পাঠ্যক্রমের মধ্যে স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার আশায় এই ধারণাটিকে তার নিজের স্কুলে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকে আলিঙ্গান করার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা বিশ্বের আরও গভীর, আরও অর্থপূর্ণ বোঝাপড়ার দারপ্রান্তে অগ্রসর হয়।

এবং তাই, সংখ্যার বাগানটি তার “উদ্দীপক পাটাতন” নিয়ে উন্নতি লাভ করতে থাকে, এমন একটি জায়গা যেখানে সংখ্যা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা একসাথে প্রস্ফুটিত হয়। বসুন্ধরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মনকে লালন করে এবং গ্রামের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য উদযাপন করে।

নিজের সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ বহুমুখী, যার মধ্যে রয়েছে পরিচয়, স্বত্ব, ধারাবাহিকতা, অর্থ এবং সামাজিক সংহতির। একমাত্র নিজস্ব সংস্কৃতিই মানব জীবনের একটি শক্তিশালী এবং স্থায়ী দিক। অঙ্ক নিয়ে যে উৎকণ্ঠা বা ডর তা মাতৃভাষা ব্যাবহারে নিশ্চিত ভাবে দূর হতে পারে, তা সে শিশু কালেই হোক বা উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রীতে হোক। আমাদের বাংলা সংখ্যার আদলের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে হবে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ২০

"শ্রেণিভিত্তিক নয়, বিষয়ভিত্তিক স্বাধীনতা"

সাইদ আর মুগ্ধ ওরা দুই বন্ধু কালক্রমে রাঙ্গামাটির কাউখালী উচ্চ বিদ্যালয় ওদের চাকুরী ক্ষেত্র। সাইদ ইংরেজির শিক্ষক আর মুগ্ধ অর্থনীতির। কাউখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থান পাহাড়ের পাদদেশে, সুন্দর একটা পরিবেশএ, যেখান সবুজ আর ঝুমচাষের জমি, কিছু জমি স্কুল এর উপরের দিকে আর কিছু স্কুল এর নিচের দিকে, স্তরে স্তরে জমিগুলো। ঝুমচাষ (জুমচাষ) পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের জীবন জীবিকার প্রধান অবলম্বন। ঝুমচাষ হল এক ধরনের কৃষি যেখানে প্রাকৃতিক উদ্ভিদকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে চাষের জন্য জমি পরিষ্কার করা হয়। কিছু বছর পর জমিটি অনুর্বর হয়ে আসলে নুতন জমিতে চলে যায়। এই পদ্ধতির বারবার পুনরাবৃত্তি হয়। এখন প্রতি দিন মানুষ বেড়েই চলেছে আর প্রাকৃতিক উদ্ভিদ কাঁটা পড়ছে ঝুম চাষের জন্য এতে প্রাকৃতিক পরিবেশ নস্ট হচ্ছে এবং পাহাড়ধস এই পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য নিত্ত দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

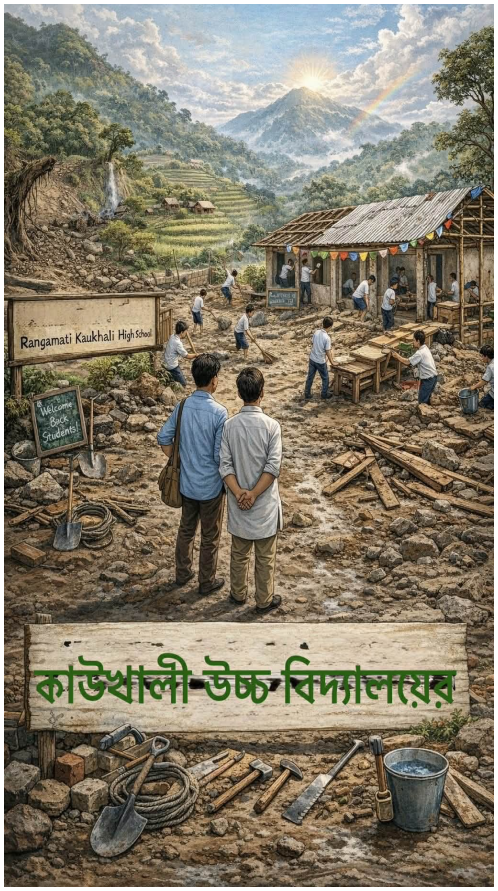

রাঙ্গামাটিতে কয়েকদিন হলো আকাশ মেঘলা, হঠাৎ দমকা হাওয়াসহ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি চলছে। সাইদ আর মুগ্ধর এই প্রথম পাহাড়ে বর্ষা কাল দেখা। পাহাড়ের বিপরীতে কোথাও একটি নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে রাতে, এই শক্তিশালী আলোয় উপত্যকার স্কুলটি পরিষ্কার দেখায়, বৃষ্টির এবং হঠাৎ আলোর ঝলকানির জন্য এটি ছবির মতো দেখায়। এমন একটি দিন এলো, সকালটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, যেন কিছুই ওজন করা যায় না, সবকিছুই হালকা, বাতাস শব্দ বহন করে না এবং সর্বত্র নীরবতার শব্দ। সেই দিন বজ্রঝড় সহ প্রবল বাতাসে বিদ্যালয়টি ধ্বংস হয়ে গেল, বিদ্যালয়ের যত কাঠের টেবিল, চেয়ার, দরজা, জানালা বাতাসের দাপতে উড়ে চলে গেলো। পাহাড়ধস আর ঘূর্ণিঝড় "রেমাল" চিন্ন রেখেগেলো কাউখালী উচ্চ বিদ্যালয়ে এক ধ্বংস লীলার মাধ্যমে। বিদ্যালয়ের স্থাপনা বেশ মজবুত , ছোট ছোট পিলারের শক্ত ভিত্তি রয়েছে, যা সংলগ্ন পাহাড় থেকে আশা ভূমিধস বিদ্যালয়টির কোন কাঠামোগত নস্ট করতে দেয় নি। পরের দিন সাইদ আর মুগ্ধ দেখলো, স্কুলের কক্ষগুলি কাদা এবং ধ্বংসাবশেষে ভরা, ছোট্ট সমতল খেলার মাঠটি গাছের ভাঙা ডাল পালায় পূর্ণ। পাশের বটগাছটি শিকড় থেকে উপরে পড়েছে আর তাই আকাশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবং সূর্যের আলো আছড়ে পড়ছে।

এখন, সাইদ আর মুগ্ধর একটাই চিন্তা এই বিল্ডিং সর্বশ বিদ্যালয়কে পুনগঠিত করতে হবে ছাত্র/ছাত্রীদে প্রয়োজনে, নতুন রূপে নতুন শাজে। এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন স্কুলটি নিজেই বেড়ে উঠবে, বিকাশ অব্যাহত রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ শক্তি থাকবে এবং কোনও অবাঞ্ছিত বাধা রক্ষার জন্য বাইরের শক্তি থাকবে। কাউখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের শক্তি হলো ওর ছাত্র/ছাত্রীরা, ওদের আগ্রহ ও চেতনাতে ভর করে একটা অসম্ভব কে সম্ভব করবার আগ্রহে সাইদ আর মুগ্ধর। কেউ না জানলেও ওরা দুই জন জানে, দেবব্রত সিংহের "তেজ" কবিতাটা কতটা প্রযোজ্য এই রাঙ্গামাটির কাউখালী উচ্চ বিদ্যালয়ে, তাই তো প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীকে শুনিয়েছে মেধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেজ কবিতার আবৃতি।

https://shorturl.at/tYc07

সাইদ আর মুদ্ধর পরিকল্পনায় কাউখালী উচ্চ বিদ্যালয়কে সাজানোর সুযোগ, ওদের যৌবন ওদের দৃষ্টিভঙ্গি আকাশ ছোঁয়া। সবার উপরে, স্কুলের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীরা স্কুল পরিবেশ থেকে জ্ঞান, দক্ষতা, এবং মূল্যবোধ অর্জন করে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকবে। কাউখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের একটা নিজস্ব ধারা আছে, এমনি একটা অভান্তরীণ শক্তি আছে যা শিক্ষাগত উৎকর্ষতাকে আহ্বান করে। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ভিন্ন ভাবে সাজানো হলো বিদ্যালয় কে। সূর্যের ছায়ার সাথে শ্রণীর বিষয় পরিবর্তন হয়, ৬ -ম থেকে ১০-ম, প্রতিটি শ্রণীতে একই বিষয় পড়ানো হয়। সকালের শ্রণীতে ধর্ম ও নৈতিকতা, বাংলা/ইংলিশ (ভাষা), অঙ্ক, ভূগোল .. যেহেতু বিভিন্ন শ্রণীতে একই বিষয় বিভিন্ন স্তরে পড়ানো হচ্ছে, তাই (৬-১০ শ্রণীর) ছাত্ররা তাঁদের ইচ্ছা মতো শ্রণীতে বসতে পারবে (শিক্ষক এর অনুমতি নিয়ে)। যেমন ৬ ম শ্রণীর ছাত্র অঙ্কে ভালো তাই ৯ ম শ্রণীর অঙ্কের শ্রণীতে বসতে পারে, আবার ৮ ম শ্রণীর ছাত্র ৬ ম শ্রণীতে বসতে পারে তার কোন বোঝা বা প্রশ্নকে বুঝে নিতে। এই বিদ্যালয়ে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নেই। সাইদ আর মুদ্ধর এই ছাত্র ভিত্তিক পদ্ধতির উপকারীতা হলো, ছাত্রের ব্যক্তিগত ও পেশাগত প্রস্তুতি ভবিষ্যতের জন্য। শিক্ষার্থীদের নিশ্চই স্বাধীন মনোভাবপণ্য হতে হবে নিজেকে খুঁজে পাবার জন্য। পৃথিবীতে স্বাধীন ও উন্মুক্ত চলাফেরার জন্যই শিক্ষার দরকার। এটা ওরা দু জন্য জানে। প্রতিটি মানুষের চারটি জন্মগত গুণ আছে - আত্মসচেতনতা, বিবেক, স্বাধীন ইচ্ছা এবং সৃজনশীল কল্পনা। এগুলি আমাদের চূড়ান্ত স্বাধীনতা দেয়, আমরা নিজেদের পছন্দে বাঁচি ও প্রতিক্রিয়া করি, এবং "পরিবর্তন করতে শক্ষম হই"।

ধনুক-ভাঙা পণ:- ২১

"অঙ্ক-বিশ্ব"

(গণিতের বিস্তৃত জগৎ)

বগুড়া জিলা স্কুলের গণিত শিক্ষক কুদ্দুস স্যার বরাবরই একটু আলাদা। শুধু বইয়ের অঙ্ক করিয়ে দেওয়াই নয়, গণিতের সৌন্দর্য আর গভীরতা ছাত্রদের চোখের সামনে তুলে ধরাই যেন তাঁর নেশা। তিনি বিশ্বাস করেন, গণিত শুধু সংখ্যা নয়, গণিত হলো মহাবিশ্বের ভাষা!

কিন্তু একটা সমস্যাই তাঁকে কষ্ট দেয় - ছাত্ররা গণিতকে ভয় পায়, ভালোবাসে না। সংখ্যা, সমীকরণ, জ্যামিতি তাদের কাছে কেবল পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করার বিষয়। কুদ্দুস স্যার ভাবলেন, এভাবে আর চলতে পারে না। ছাত্রদের গণিতের মজা, রহস্য আর সৌন্দর্য যদি বোঝানো যায়, তাহলে তারা গণিতকে অনুভব করতে পারবে।

প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে স্কুলের তিনতলায় একটা শ্রেণিকক্ষকে বদলে ফেললেন কুদ্দুস স্যার। নাম দিলেন "অঙ্ক-বিশ্ব"- একটি বিশেষ গণিত প্রদর্শনী কক্ষ, যেখানে গণিত কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, বাস্তবে দেখা যাবে, ছোঁয়া যাবে, অনুভব করা যাবে।

দরজার ঠিক সামনে বড় করে লেখা হলো,

"যারা গণিত বোঝে, তারা প্রকৃতির ভাষা বোঝে।" -গ্যালিলিও গ্যালিলি

ঘরের দেয়ালজুড়ে থাকল জ্যামিতির নানান আকৃতি, পিথাগোরাসের উপপাদ্য, গোলকের আয়তন, স্বর্ণা-নুপাতের (Golden Ratio) সৌন্দর্য, এবং মহাবিশ্বে গণিতের ভূমিকার চিত্র। দরজার পাশে রাখা হলো আন্তর্জাতিক একক (SI Units) এর তালিকা, যেখানে মিটার (m) দৈর্ঘ্যের, কিলোগ্রাম (kg) ভরের, সেকেন্ড (s) সময়ের, মোল (mol) পদার্থের পরিমাণের, অ্যাম্পিয়ার (A) কারেন্টের, জুল (J) শক্তির, কেলভীন (K) তাপমাত্রার পরিমাপের একক হিসেবে দেখানো হলো। কিন্তু শুধু দেয়ালে লেখা থাকলেই তো হবে না! ছাত্রদের জন্য প্রয়োজন চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা।

প্রথম ক্লাস: তরঙ্গের রহস্য:

নবম-দশম শ্রেণির ছাত্রদের নিয়ে কুদ্দুস স্যার অঙ্ক-বিশ্ব কক্ষে প্রথম ক্লাস শুরু করলেন। "তোমরা কি তরঙ্গ দেখতে চাও?"

শ্রেণির সবাই একটু চমকে গেল! তরঙ্গ আবার দেখা যায় নাকি?

"শব্দ এক ধরনের তরঙ্গ, কিন্তু আমরা তো শব্দের তরঙ্গ দেখতে পাই না। তাহলে কি শব্দের তরঙ্গ আদৌ আছে?"

ছাত্ররা ভাবতে লাগল। তারপর কুদ্দুস স্যার একটা কালো বোর্ডের উপর বালি ছিটিয়ে একটা টিউনিং ফর্ক বাজালেন। দেখা গেল, বালির দানা এক বিশেষ নকশায় ছড়িয়ে পড়ল! "দেখলে? শব্দ তরঙ্গের জন্য বালির দানাগুলো এক নির্দিষ্ট প্যাটার্নে সাজিয়ে গেল!" ছাত্ররা অবাক হয়ে গেল। তারা প্রথমবার শব্দের তরঙ্গ দেখতে পেল।

তারপর কুদ্দুস স্যার বললেন, "এই যে তোমাদের প্রিয় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে' এটা শুধু কাব্য নয়, বিজ্ঞানও বটে! সুর, শব্দ, আলো সবই তরঙ্গ!" এরপর তিনি Nikola Tesla-র বিখ্যাত উক্তি বললেন, "If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration."

দ্বিতীয় ক্লাস: গণিত ও শিল্প:

পরের দিন কুদ্দুস স্যার কক্ষে নিয়ে এলেন রঙিন কাগজ। "আজ আমরা গণিত দিয়ে শিল্প তৈরি করব!"

সবাই অবাক! গণিত দিয়ে আবার শিল্প হয় নাকি? কুদ্দুস স্যার দেখালেন, কীভাবে অরিগামি (জাপানি কাগজ ভাঁজের শিল্প) জ্যামিতির উপর নির্ভর করে। এক টুকরো কাগজ থেকে তৈরি হলো নিখুঁত পাঁচ কোনা তারকা, স্বর্ণা-নুপাতের রঙিন নকশা। "তোমরা জানো, প্রকৃতির অনেক কিছুতেই স্বর্ণা-নুপাত (Golden Ratio) থাকে? যেমন, সূর্যমুখীর বীজের বিন্যাস, শামুকের খোলস, এমনকি আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশেও।" শ্রেণির সবাই অবাক হয়ে দেখল, গণিত কেবল সংখ্যা নয়, সৌন্দর্যও হতে পারে।

তৃতীয় ক্লাস: গণিত দিয়ে ওজন মাপা:

কুদ্দুস স্যার টেবিলে রাখলেন দুইটি ওজন, একটি এক কেজি, আরেকটি এক সের (প্রায় ৯৩৩ গ্রাম)। "বল তো, কোনটা এক কেজি?" ছাত্ররা হাত দিয়ে তুলল, কিন্তু বুঝতে পারল না। কুদ্দুস স্যার দেখালেন, কীভাবে বলকের আয়তন ও ঘনত্বের সূত্র ব্যবহার করে ওজন মাপা যায়। "দেখো, গণিত জানলে তোমাকে আর শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করতে হবে না!"

এভাবে অঙ্ক-বিশ্ব কক্ষ ধীরে ধীরে শুধু ক্লাসের একটি অংশ হয়ে উঠল না, বরং গণিতের প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে লাগল। কুদ্দুস স্যার ছাত্রদের শিখিয়ে দিলেন, গণিত শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, এটি আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ।

শ্রেণিকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার সময় এক ছাত্র মুগ্ধ হয়ে বলল, "স্যার, গণিত এত সুন্দর! আগে তো আমরা ভাবতেই পারিনি!"

কুদ্দুস স্যার মৃদু হেসে ভাবলেন, "এটাই তো চেয়েছিলাম, বাছারা!"

অয়নের "অঙ্ক-বিশ্ব" কক্ষের অভিজ্ঞতা:

অয়ন ছিল এক সাধারণ ছাত্র, গণিতের প্রতি ভয় তার চিরকালীন। পরীক্ষার হলে ঢুকলেই মাথা ঘুরতে শুরু করত। কিন্তু একদিন স্কুলের তিন তলায় এক রহস্যময় ঘরের সন্ধান পেল সে "অঙ্ক-বিশ্ব"।

বন্ধুরা বলতো, "ওই ঘরে গেলে নাকি ছাত্ররা অংক ভালোবাসতে শুরু করে!" অয়ন হেসে উড়িয়ে দিল, "একটা ঘর আবার মানুষকে অংক ভালোবাসতে শেখায় নাকি?" কিন্তু কৌতূহল তার মন থেকে যাচ্ছিল না। একদিন, স্কুল ছুটির পর অয়ন সাহস করে দরজাটা ঠেলে "অঙ্ক-বিশ্ব" ঘরে প্রবেশ করলো। হঠাৎ তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। ঘরের দেয়ালজুড়ে লেখা অজস্র গণিতের সূত্র, চিত্র আর ব্যাখ্যা।

• একদিকে বড় বড় করে লেখা পাইথাগোরাসের উপপাদ্য।

• আরেকদিকে ত্রিকোণমিতির সাইন, কোসাইন আর ট্যানজেন্টের মানচিত্র! মজা করে লেখা আছে "সাধু ললিতা অমৃত কলিকাতা ভ্রমনে আসিয়া টাকা লইয়া ভাগিলো"।
• এক কোণে রাখা ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রের কাঠের মডেল।
• ছাদের দিকে তাকাতেই দেখল, বিশাল এক গোলক তৈরি করা। মেঝেতে গ্রাফ কাগজের মতো করে ছক, আর এক দেয়ালে logarithm এর ছক করা।

ঘরটা যেন একটা জীবন্ত গণিতের বই! একটা তাকের উপর লেখা, "গণিত শুধু সংখ্যা নয়, গণিত হলো চিন্তার ভাষা!" অয়ন অবাক হয়ে একটা ত্রিভুজ তুলে নিল। ঠিক তখনই দেওয়ালে লেখা একটা সূত্রের দিকে চোখ পড়ল, "একটি সমকোণী ত্রিভুজে, ক -লম্ব, ব-ভূমি, এবং অ-অতিভুজ হলে - $অ^২ = ক^২ + ব^২$

এই সূত্র তো ক্লাসে পড়েছিল, কিন্তু কখনো বোঝেনি। এবার যখন হাতে পাইথাগোরাসের উপপাদ্য দিয়ে সাজানো ত্রিভুজ ধরে সূত্রটি মিলিয়ে দেখল, তখন হঠাৎই ওর মনে হলো এ তো সুন্দর একটা বাঁধনে গড়া আমাদের চিরচেনা সমকোনী ত্রিভুজ। "এটা তো সত্যি! পাইথাগোরাস ঠিকই বলেছিলেন।" এভাবে একটার পর একটা সূত্র সে দেখতে লাগল, বুঝতে লাগল, অনুভব করতে লাগল। গণিত যে এত সহজ হতে পারে, তা কল্পনাও করেনি সে।

পরীক্ষার দিন এল। অয়ন খাতায় সূত্র লিখতে গিয়ে অনুভব করল, এবার আর মুখস্থ করতে হচ্ছে না। সে সূত্রগুলো অনুভব করছে, ভাবছে, বুঝছে। যে গণিত একসময় তার কাছে বোঝার বাইরে ছিল, সেই গণিত এখন তার কাছে একটা ভাষার মতো স্পষ্ট।

অয়নের গণিতকে ভালোবাসার শুরু। পরীক্ষা শেষে কুদ্দুস স্যার বললেন, "অয়ন, তোমার উত্তরগুলো দেখলাম। তুমি কি গণিত নিয়ে পড়াশোনা করতে চাও?" অয়ন হাসল, বলল, "স্যার, আগে ভাবতাম অংক মানে শুধু যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ। কিন্তু এখন বুঝেছি, অংক মানে চিন্তা করা, বুঝতে শেখা।"

তারপর বন্ধুদের বলল, "তোমরা সবাই একদিন ওই ঘরটায় যেও, সেখানে গিয়ে একবার গণিতকে অনুভব করলেই বুঝবে, গণিত একটা ভাষা, আর ভাষা তো আমরা সবাই শিখতে পারি।" এইভাবেই অয়নের গণিতকে ভালোবাসার যাত্রা শুরু হলো...

এখানেই শেষ নয়, কুদ্দুস স্যার "অঙ্ক-বিশ্ব" কক্ষ কে সাজালেন তাঁর জাদুকরি অভিজ্ঞতা থেকে, "অঙ্ক-বিশ্ব" ঘরটিকে আরও চমকপ্রদ, শিক্ষামূলক এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাপূর্ণ করে তুলনেন, সংযোজন করা হলো,

১. ইন্টারঅ্যাকটিভ (পরস্পর ক্রিয়াশীল) গণিত মডেল ও সরঞ্জাম:

✅ পিথাগোরাস থিয়োরেম বোর্ড - বাস্তব উপায়ে পিথাগোরাসের উপপাদ্য বোঝানোর জন্য খাপ খাওয়ানো বর্গক্ষেত্রের টাইলস।

✅ প্লেন এবং থ্রি-ডি জ্যামিতিক মডেল - শঙ্কু, গম্বুজ, গোলক, পিরামিড, ঘনক, সিলিন্ডার ইত্যাদি মডেল যা ঘোরালে তাদের ছেদ কেমন হয় তা বোঝানো যায়।

✅ ফিবোনাচ্চি সর্পিল এবং স্বর্ণানুপাতের বাস্তব উদাহরণ - সূর্যমুখীর বীজ, শামুকের খোলস বা পাইনকোনের ব্যাবস্থা কেমন করে গণিত অনুসরণ করে তা দেখানোর জন্য।

✅ ম্যাজিক সংখ্যা চক্র (Magic Number Wheel) - একটি চাকা, যেখানে নির্দিষ্ট নিয়মে সংখ্যা সাজিয়ে দিলে অদ্ভুত গণিতের ধাঁধা তৈরি হয়।

২. তরঙ্গ ও স্পন্দন বোঝানোর সরঞ্জাম:

✅ চলমান ট্রফ বোর্ড (Chladni Plate) - কালো বোর্ডে বালি ছিটিয়ে শব্দ তরঙ্গ দেখানোর জন্য।

✅ অ্যামপ্লিটিউড ও ফ্রিকোয়েন্সি বোঝানোর জন্য স্প্রিং ও দোলক - যেখানে দোলকের গতির পরিবর্তনে তরঙ্গের ধারণা বোঝানো হবে।

✅ লেজার ইন্টারফেরেন্স সরঞ্জান - আলোও তরঙ্গ, কীভাবে দুটি আলোর তরঙ্গ পরস্পর হস্তক্ষেপ করে নতুন প্যাটার্ন তৈরি করে তা দেখানোর জন্য এবং বিভিন্ন লেন্স এর প্রতিক্রিয়া।

৩. গণিত ও দৈনন্দিন জীবনের সংযোগ:

✅ গাণিতিক ঘড়ি - সাধারণ সংখ্যা না রেখে গণিতের সমীকরণ দিয়ে তৈরি করা ঘড়ি।

✅ ওজন অনুমান মডেল - কিলোগ্রাম, সের, গ্রাম ইত্যাদি ওজন তুলনা করার জন্য যাতে ছাত্ররা হাতে ধরে পার্থক্য বুঝতে পারে।

✅ গাণিতিক ক্যালেন্ডার - তারিখের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সংখ্যাতত্ত্ব দেখানো (যেমন ২০২৫ একটি মৌলিক সংখ্যা কিনা)।

✅ মুদ্রার গাণিতিক বিন্যাস - বিভিন্ন দেশ ও যুগের মুদ্রা সংগ্রহ যেখানে জ্যামিতি, ও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আছে।

৪. গণিতের ইতিহাস ও মহাবিশ্ব:

✅ বিশ্বখ্যাত গণিতবিদদের পোর্ট্রেট ও আবিষ্কার - যেমন গাউস, ইউক্লিড, পিথাগোরাস, আর্যভট্ট, নিউটন, রামানুজান ইত্যাদির জীবন ও কাজের তথ্য।

✅ তারকা মানচিত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান গণিত - কেপলারের গ্রহীয় গতি সূত্র, নক্ষত্রপথের বিন্যাস এবং তাদের গণিতীয় বৈশিষ্ট্য।

✅ ব্ল্যাক হোল ও আপেক্ষিকতা বোঝানোর জন্য স্পেস-টাইম ফ্যাব্রিক মডেল - যেখানে এক পাতলা কাপড়ের উপর ভর রাখলে কীভাবে বক্রতা তৈরি হয় তা দেখা যাবে।

৫. মজার গণিত ও গেমস:

✅ গণিতীয় ধাঁধা (Math Puzzles & Riddles) - যেমন গণিতীয় কিউব, ম্যাজিক স্কয়ার, সংখ্যার ধাঁধা ইত্যাদি।
✅ পাস্কালের ত্রিভুজ বোর্ড - যেখানে ছাত্ররা নিজেরা নতুন সংখ্যা বসিয়ে এর রহস্য উন্মোচন করতে পারবে।
✅ গণিত কুইজ - যেখানে ছাত্ররা মজার গণিত গেম খেলতে পারবে।
৬. প্রযুক্তি ও ডিজিটাল গণিত:
✅ ডিজিটাল সিমুলেশন টেবিল - যেখানে স্পর্শ করে গণিতীয় ধ্রুবক, পাই (π), স্বর্ণা-নুপাতের মান পরিবর্তন করে পরীক্ষামূলকভাবে গণিত শেখা যাবে।
✅ গণিত বিষয়ক ভিডিও স্ক্রিন - যেখানে গণিতের বিভিন্ন বাস্তব প্রয়োগ (যেমন কোডিং, এনক্রিপশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) নিয়ে অডিও-ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট চলবে।
✅ বঙ্গীয় গাণিতিক ঐতিহ্যের কর্নার - যেখানে বাংলা গণিতের ইতিহাস (বকশী রামনিধি, রাধাচরণ গুহ, জগদীশ বসু, সীতা রামনুজান) তুলে ধরা হবে।
এগুলো যোগ করার ফলে “অঙ্ক-বিশ্ব” শুধু একটি ক্লাসরুম নয়, বরং গণিতকে অনুভব করার, স্পর্শ করার, এবং মজা পাওয়ার এক অসাধারণ স্থান হয়ে উঠলো।

Robotics Corner
Creative Corners

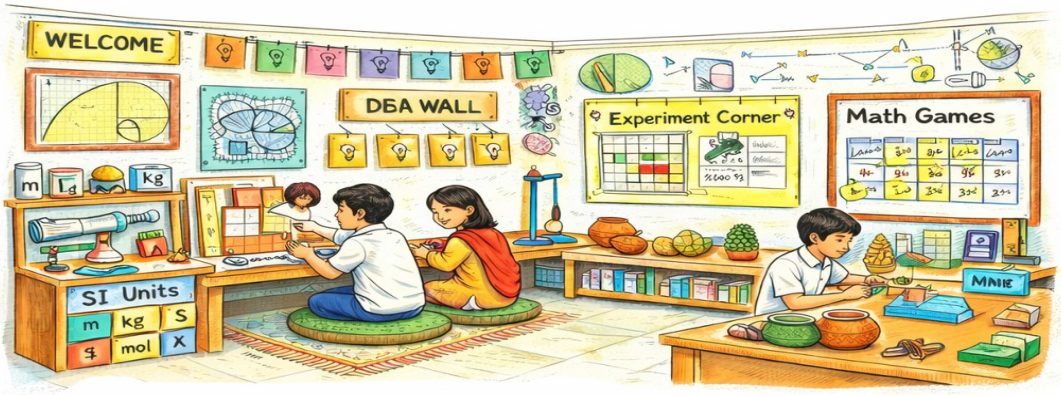

WELCOME
DБA WALL
Experiment Corner
Math Games
m
kg
SI Units
m
kg
s
mol

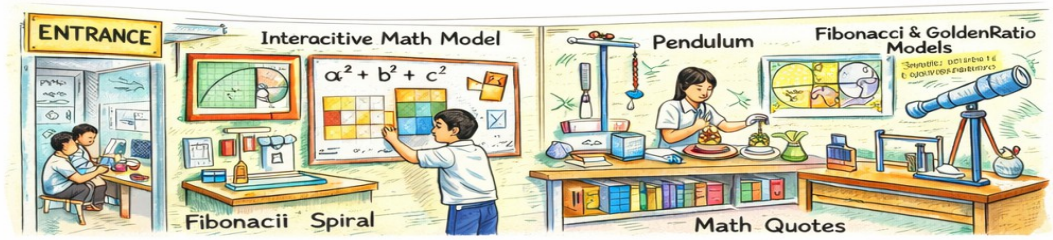

ENTRANCE
Interacitive Math Model
α² + b² + c²
Pendulum
Fibonacci & GoldenRatio Models
Fibonacii Spiral
Math Quotes

ধনুক-ভাঙা পণ - ২২

“সৃজনশীল আশ্রয়”

স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে “মানবিক সৃজনশীলতা” অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা ভবিষ্যতে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বা যেকোনো কম্পিউটার প্রসূত প্রযুক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও আধিপত্য করতে পারে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, “মানবিক সৃজনশীলতা হলো ঈশ্বর-প্রদত্ত গুণ, যা মানুষের মাঝে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা উদ্ভাবন করতে পারে, সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে, এবং ভালো কিছুর দিকে এগিয়ে যেতে পারে”। মানবিক সৃজনশীলতা মূলত মস্তিষ্কের জটিল কার্যক্রম, অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও আবেগের সংমিশ্রণ, যা যান্ত্রিক কম্পিউটার বা algorithms এর অনেক উর্দ্ধে ও বিস্তৃত। এখানে যে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার (AI) সঙ্গে মানবিক সৃজনশীলতার তুলনা করা হলো তা আপাত দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত মনে হলেও আধুনিক বিজ্ঞান এমনি একটি পরিপূরকের দিকেই এগুচ্ছে, এটা নিশ্চিত। তাই আজকের ছাত্ররা ভবিষৎতে এমনি একটা ধারার সঙ্গে যুক্ত হবে যা মানব সমাজ আগে কখনো দেখেনি বা জানেও না। ভবিষৎ হবে AI agents দের, যা প্রায় সকল প্রকার চাকুরীকে বোকাবেলা করবে। এবং এই ধারা আরম্ভ হয়েছে এবং সময়ের সাথে আরও উন্নত ও কার্যকরী হবে।

শরীতপুর স্কুলের ভূগোলএর শিক্ষকের আব্দুল করিম স্যারের চিন্তায়, ছাত্ররা যদি মেধা এবং উদ্যোগের মাধ্যমে নতুন ধারণা তৈরি করতে শিখে, তাহলে তারা AI-কে সহায়ক হিসেবে (AI agents কে) ব্যবহার করে নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে সক্ষম হবে যা তাদের জীবনকে আরো সমৃদ্ধ এবং অর্থপূর্ণ করবে।

এমনি একটা চিন্তা থেকে করিম স্যার অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষা কার্যক্রম ও শ্রেণী কক্ষ (বলা যায় চিন্তার আঁতুড়ঘর) “সৃজনশীল আশ্রয়” এর প্রস্তাব করলেন। করিম স্যার মনে করেন, স্কুলে ছাত্রদের সৃজনশীল চিন্তা, মানবিক সৃষ্টির স্বাধীনতা, এবং নিজস্ব সমাধান তৈরি করার সুযোগ দেয়া গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই “সৃজনশীল আশ্রয়” শিক্ষাক্রমের পরিকল্পনা। “সৃজনশীল আশ্রয়” কেবল একটি শিক্ষাকেন্দ্রিক উদ্যোগ নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সৃজনশীল বিপ্লব। “সৃজনশীল আশ্রয়” টি স্কুলের নিয়মিত সময়সূচির অংশ হিসেবে খোলা থাকবে এবং ছাত্ররা ইচ্ছা করলে যে কোন সময় নির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুসরণ করে ব্যবহার করতে পারবে।

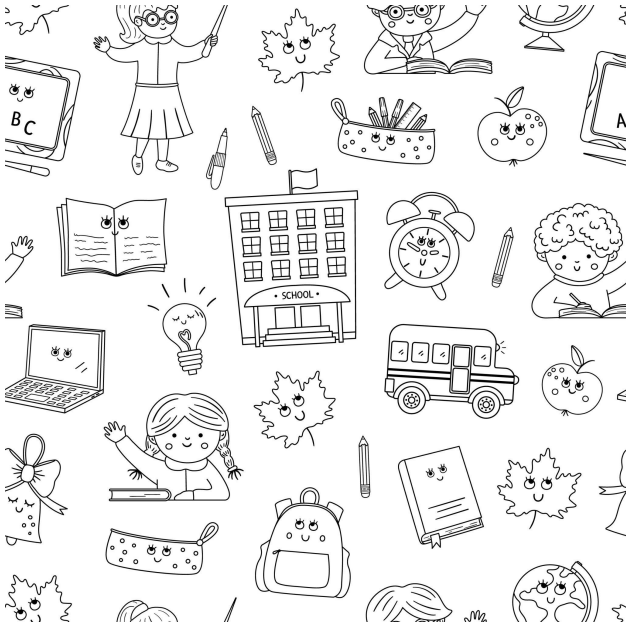

করিম স্যারের “সৃজনশীল আশ্রয়” আর একটা দিক হলো, AI অনেক ক্ষেত্রেই মানবিক শ্রম বা মেধার ব্যবহার কমিয়ে দেয়। AI যদি অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়, তবে তা মানবিক সৃজনশীলতা এবং নিজস্ব অন্তর্নিহিত চিন্তাভাবনা কমিয়ে দিতে পারে। AI ভবিষ্যতের জন্য যতই প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নিয়ে আসুক না কেন, সেটা মানবিক চিন্তা এবং নতুন সৃজনশীল পথ তৈরির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে না।

“সৃজনশীল আশ্রয়” এর আকৃতি ও প্রকৃতি:

- প্রতি সপ্তাহে ২ ঘণ্টা “সৃজনশীল আশ্রয়”,
- প্রোজেক্ট প্রদর্শনী মাসে ১বার,
- মূল্যায়ন নম্বর নয়, পোর্টফোলিও ভিত্তিক,
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ কাঠামো।

একদিন, ঋষি, মায্যা এবং আয্যান - একদল ছাত্র বিশেষ কিছু তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। একটি পুরানো বাংলা লোককাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তারা একটি যান্ত্রিক পুতুল প্রদর্শনীর কাজ শুরু করে। মায্ চিত্রনাট্য লিখলো, আয্যান পুতুলগুলি আঁকতেন, এবং ঋষি প্রযুক্তি প্রেমী, একটি সাধারণ মোটরচালিত মঞ্চ ডিজাইন করেছিলেন। প্রতিদিন বিকেলে, তারা “সৃজনশীল আশ্রয়” জড়ো হত, একে অপরের কাছ থেকে শিখত, সমস্যা সমাধান করত এবং তাদের কাজকে পরিমার্জন করলো। শিক্ষকরা অবাক হলেন এবং সকল শিক্ষার্থীরা উল্লাস প্রকাশ করলো। এটি কেবল একটি পুতুল প্রদর্শনী ছিল না; এটি প্রমাণ ছিল যে সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সঠিক স্থান দেওয়া হলে কী অর্জন করা যেতে পারে!

তাহসান ছোটবেলা থেকেই নতুন কিছু তৈরি করতে ভালোবাসে। বই পড়ে শুধু মুখস্থ করার বদলে সে হাতে-কলমে কাজ করতে চায়। কিন্তু তার স্কুলের সাধারণ ক্লাসরুমে সবকিছু এত নিয়মের মধ্যে চলতো যে সে নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে পারছিল না।

সে ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখত, এমন একটা রোবট বানাবে, যা বৃদ্ধ মানুষদের সাহায্য করতে পারবে। “সৃজনশীল আশ্রয়” সে তার পরিকল্পনা শুরু করল। বন্ধু রিফাত প্রোগ্রামিং জানত, আর মীম ভালো ডিজাইন করতে পারত। তারা নিজেদের বানানো রোবটটিকে এমনভাবে তৈরী করল, যাতে এটি মাটিতে কিছু পড়ে থাকলে সেটি তুলে নিতে পারে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বললেন, “এটাই তো আমাদের চাওয়া ছিল, তোমাদের চিন্তাভাবনাগুলো বাস্তবে রূপ দেওয়া।”

মেহজাবিন ম্যাডাম বাংলা পড়ান, কিন্তু এবার তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, শুধু বইয়ের গল্প নয়, শিক্ষার্থীদের নিজেদের গল্প তৈরি করতে শেখাবেন। তিনি বানালেন “গল্পের গুহা”, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের লেখা গল্প পড়তে পারবে, আলোচনা করতে পারবে, এমনকি কেউ যদি নাটক লিখতে

চায়, তবে সেটার মহড়াও দেওয়া যাবে। অষ্টম শ্রেণির রিমা খুব লাজুক ছিল, কিন্তু এই "গল্পের গুহা" তে এসে সে প্রথমবার তার লেখা কবিতাটা সবার সামনে পড়ল। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনল, আর মেহজাবিন ম্যাডাম বুঝলেন - এটাই আসল শিক্ষা।

জামিল স্যার বিজ্ঞানের, বানালেন "এক্সপেরিমেন্ট স্টেশন" বানালেন, সেখানে রাকিব বানালো সৌরশক্তিতে চলা একটা ছোট গাড়ি। তাহসিন স্যার গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞান পড়ান। "টেক কর্নার" তৈরি করলেন, সপ্তম শ্রেণির ফাহিম বানালো স্যার, অ্যালার্ম সিস্টেম সহ স্মার্ট বাসা। শিক্ষকদের এই পরিবর্তন শিক্ষার্থীদের জন্য এক নতুন দিক খুলে দিলো। এই শিক্ষকরা শুধু পড়াননি, বরং শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন, নতুন কিছু তৈরি করার সাহস দিয়েছেন। স্কুলের শিক্ষক রা এখন পথপ্রদর্শক, যারা নতুন কিছু তৈরি করার অনুপ্রেরণা দেন এবং নেতিবাচক মন্তব্য এড়িয়ে চলেন। "সৃজনশীল আশ্রয়", যা ভবিষৎ গড়ার তীর্থ স্থান।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ছোঁয়া: বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ছোঁয়া এই পরিকল্পনা টি হবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও আধুনিক প্রযুক্তির মিলে "সৃজনশীল আশ্রয়"। এখানে শিক্ষার্থীরা তাদের চিন্তাশক্তি প্রসারিত করতে পারবে, নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে শিখতে পারবে, এবং ভবিষ্যতের জন্য উদ্ভাবনী দক্ষতা গড়ে তুলতে পারবে। এর প্রয়োজন আছে, নিজস্ব সংকৃতির মধ্যে একটা লুকানো অনেপ্রেরণা থাকে, যা সহজে বুঝা যায় না। নিজস্ব সংকৃতির ঐতিহ্য হলো আমাদের অবচেতন মনের গভীরে পরিচালিত পথপ্রদর্শক।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ছোঁয়া, "সৃজনশীল আশ্রয়" দিক গুলো হলো, দেয়ালে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী আলপনা, নকশীকাঁথার নকশা এবং বিভিন্ন বাংলার লোককাহিনীর চিত্র। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্যসহ বিখ্যাত সাহিত্যিকদের উক্তি। একপাশে "আইডিয়া ওয়াল", যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের নতুন আইডিয়া, গল্প বা উদ্ভাবনী চিন্তাগুলো লিখে রাখতে পারবে। বড় বড় জানালা, যাতে প্রাকৃতিক আলো প্রবেশ করতে পারে। বসার জন্য থাকবে মেঝেতে বেতের মোড়া, যাতে শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে বসে কাজ করতে পারে (বাংলার গ্রামীণ পরিবেশের ছোঁয়া থাকবে)।

থাকবে পাট, মাটির পুতুল, নকশীকাঁথা তৈরির সরঞ্জাম, এবং চিত্রাঙ্কনের জন্য রঙ, তুলি ও কাগজ। শিক্ষার্থীরা নিজের হাতে কারুকাজ করে ঐতিহ্যবাহী হাতপাখা, শখের হাঁড়ি, কাঁথা বা পটচিত্র তৈরি করতে পারবে। থাকবে বাংলা সাহিত্যের বিশুদ্ধ বই, গ্রামবাংলার লোককথা, উপন্যাস, শিশুতোষ গল্প ও কবিতা। থাকবে "গল্পের দেয়াল", যেখানে শিক্ষার্থীরা ছোট গল্প বা নতুন আইডিয়া লিখে টাঙাতে পারবে। থাকবে একতারা, বাঁশি, ঢোল, খঞ্জনি, বাউল গানের বই এবং নাটকের স্ক্রিপ্ট। ছোট পরিসরে নাটকের মহড়া দেওয়ার জন্য থাকবে মঞ্চসজ্জার সরঞ্জাম। থাকবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, লোকজ সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনার ছবি ও তথ্য। শিক্ষার্থীরা চাইলে মুক্তিযুদ্ধের নাটক করতে পারবে, কিংবা লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতে পারবে। অতি অবশ্যক, স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তা কর্নার থাকবে, শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব প্রোজেক্ট তৈরি করে উপস্থাপন করতে পারবে। স্থানীয় গ্রামীণ পণ্য, যেমন - পাটের ব্যাগ, মাটির গহনা বা হাতে বানানো সামগ্রী বিক্রির পরিকল্পনা করতে পারবে। মোম বা সাবান কেটে স্কাল্পচার বানানো ও কাদা মাটির মৃৎশিল্প (Pottery & Clay Art) এবং এটি বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে দারুণভাবে সংযোগ স্থাপন করবে।

স্কুলে "সৃজনশীল আশ্রয়" ছাড়া AI এর আগ্রাসন থেকে পরিত্রান বা AI যথাযথ ব্যবহারের নিমিত্তে ভবিষ্যত প্রজন্ম কে গড়ে তোলার আর কোন বিকল্প পথ নেই। এই উদ্যোগটি যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে AI-কে ব্যবহার করে সৃজনশীলতা, মানবিক গুণাবলীর ও সাংস্কৃতিক শেকড় থেকে সত্যিকারের উদ্ভাবক হিসেবে গড়ে তুলবে।

ধনুক-ভাঙা পণ:- ২৪

“চিন্তা ও চর্চা”

স্কুলের ছাত্রদের মাঝে নতুন চিন্তার উদয় বা সৃষ্টিশীল ভাবনার বিকাশ ঘটানো অত্যন্ত জরুরি, কারণ এরাই ভবিষ্যতের উদ্ভাবক, গবেষক, শিল্পী বা নেতার জন্ম দেবে। এমনি একটা চিন্তা সৌরভ স্যারের। “কেন?”,“কীভাবে?” ও “আর যদি এমন হতো?” - এই ধরনের প্রশ্ন চিন্তার উদয় ঘটাতে হবে ছাত্রদের মনে।

সমস্যা দিয়ে ভাবতে শেখানো (Problem-Based Learning) অত্যান্ত জরুরি। যেমন, বাস্তব জীবনের ছোট ছোট সমস্যা দিয়ে চিন্তা করতে দেওয়া (“গ্রামে যদি স্কুলে বিদ্যুৎ না থাকে, কীভাবে ক্লাস চলতে পারে?”, “বৃষ্টির দিনে স্কুলে পানি জমে গেলে কীভাবে সমাধান করা যায়” ইত্যাদি)।

প্রকল্পভিত্তিক কাজ (Project Work), একাধিক বিষয় (বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস) মিশিয়ে প্রকল্প করতে দেওয়া যেতে পারে। যেমন, “নিজের গ্রাম বা পাড়ার মানচিত্র বানানো”, “পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা পোস্টার তৈরি”, ইত্যাদি। অতি প্রয়োজনীয় হলো, যদি কেউ চেষ্টা করে কিন্তু সফল না হয়, তাকে প্রশংসা করা। সৌরভ স্যার জানেন, নতুন চিন্তার জন্ম হয় মুক্ত প্রশ্ন, সম্মানজনক পরিবেশ, বাস্তব সমস্যায় যুক্ত করা আর চেষ্টা করার সুযোগ থেকে। প্রতিটি শিশুর মধ্যে সৃজনশীলতা আছে, শুধু তাকে জায়গা করে দেওয়ার প্রয়োজন।

এমনি চিন্তা থেকে সৌরভ স্যার “চিন্তা ও চর্চা” নামে একটা নতুন শ্রেণীকক্ষ এবং কার্যক্রম প্রস্তাব করলেন।

শ্রেণীকক্ষ - “চিন্তা ও চর্চা” শ্রেণীকক্ষের বৈশিষ্ট হলো এর আকৃতি ও প্রকৃতি, শ্রেণীকক্ষের টেবিল গুলো ত্রিভুজ আকৃতির, এবং টেবিলগুলো একে অন্যের সাথে লাগায়ে বৃত্তাকার একটা শ্রেণীকক্ষ বানানো যায়, যেখানে শিক্ষক মাঝখানটায় থাকবেন এবং সব ছাত্রদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করবেন। এই ধরণের টেবিল ছাত্রদের মধ্যে সহযোগিতা, চোখে চোখ রেখে আলোচনা, দলগত কাজ ও চিন্তার আদান-প্রদান বাড়াতে খুবই প্রয়োজনীয়, একে Fish-eye ক্লাসরুম বলে।

কার্যক্রম - “সমস্যা খুঁজে সমাধান খোঁজো”, (নতুন চিন্তার উদয় ঘটানো, সমস্যা বিশ্লেষণ এবং সমাধান পরিকল্পনা শেখানো, সহমর্মিতা ও বাস্তবজ্ঞান গড়ে তোলা)।

মাস (সপ্তাহে ১টি ক্লাস) মোট ৪ ক্লাস।

সময়: ৫০ মিনিট

ধাপ ১: পরিচয়পর্ব (৫-১০মিনিট) ধাপ ২: দল গঠন (৫ মিনিট) ধাপ ৩: চিন্তা ও পরিকল্পনা (১৫–২০ মিনিট) ধাপ ৪: সমাধান উপস্থাপন (১০-২০ মিনিট) ধাপ ৫: আলোচনা ও উৎসাহ (৫-১০ মিনিট)।

“চিন্তা ও চর্চা” কার্যক্রম এর উদ্দেশ্য হলো, সমস্যা শনাক্ত করা, সহযোগিতা করে কাজ করা, নতুন ধারণা দেওয়া, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলা ও উপস্থাপন ও ছাত্রদের মাঝে স্কুল ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ শেখানো। সৌরভ স্যার একটি “শিক্ষক নির্দেশিকা” বই তৈরী করলেন “চিন্তা ও চর্চা” কার্যক্রমের জন্য। যা ছিলো “ছাত্র-কেন্দ্রিক শিক্ষা” কৌতূহল ও প্রশ্ন থেকে শেখা।

গল্পের নাম: “অর্ণবের প্রশ্ন” ও “প্রশ্নঘণ্টা”

অর্ণব ছিল এক সাধারণ স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ওর চোখে ছিল হাজারটা প্রশ্ন, কিন্তু ক্লাসে সেগুলো জিজ্ঞেস করতে সাহস পেত না। কারণ স্যার-ম্যাডামরা শুধু বইয়ের প্রশ্নগুলোই পড়াতেন, বলতেন: “পরীক্ষায় আসবে, মুখস্থ করো।”

একদিন ক্লাসে সৌরভ স্যার বিজ্ঞান পড়াচ্ছিলেন - “গাছ কিভাবে খাবার তৈরি করে”। স্যার বোর্ডে ছবি এঁকে বললেন: “সূর্যালোক, কার্বন ডাই অক্সাইড, পানি, এই তিনে তৈরি হয় খাবার।”

সবাই চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ অর্ণব হাত তুলল।

সৌরভ স্যার বললেন, “কী অর্ণব?

অর্ণব বলল, “স্যার, তাহলে গাছ কি কখনও না খেয়ে থাকে? যদি মেঘ করে, তখন তো রোদ থাকে না!”

ক্লাস হেসে উঠল। কিন্তু সৌরভ স্যার থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, “তোমার প্রশ্নটা খুবই ভালো। আমি তোমায় উত্তর বলব না, বরং কাল তুমি এবং তোমার বন্ধুরা এটা নিয়ে একটু খোঁজ করে এসো, সবার সামনে বলবে।”

পরদিন অর্ণব ওর তিন বন্ধুকে নিয়ে মুঠোফোন, বই ও লাইব্রেরি ঘেঁটে গবেষণা করল। ওরা জানল, গাছ স্টোমাটা দিয়ে শ্বাস নেয়, খাবার জমায়, এবং সূর্যের অনুপস্থিতিতে খাদ্য উৎপাদন থেমে গেলেও মারা যায় না। ক্লাসে সেদিন ওরা চারজন সবার সামনে দাঁড়িয়ে উপস্থাপন করল। সবাই হাততালি দিল। স্যার বললেন, “আজ থেকে এই ক্লাস শুধু আমার নয় তোমাদেরও। যার মনে প্রশ্ন থাকবে, সে-ই শিখতে পারবে সবচেয়ে বেশি।” সেইদিন থেকে স্কুলে একটা নতুন নিয়ম শুরু হলো “প্রশ্নঘণ্টা”। সপ্তাহে একদিন, পুরো ক্লাস হতো শুধু ছাত্রদের প্রশ্ন নিয়ে। কে কেমন করে বুঝেছে, কে কীভাবে নিজে খুঁজে দেখেছে, তারই ভিত্তিতে হতো শেখা।

অর্ণব এখন শুধু প্রশ্ন করে না, অন্যদেরও শেখায় - শেখার আনন্দে।

ধনুক-ভাঙা পণ:- ২৩

“ঈদের আনন্দ”

গাঁয়ের ছোট্ট প্রাইমারি স্কুল।
ছেলেমেয়েরা সারাদিন হৈচৈ করে, খেলে, শেখে।
কিন্তু আজ স্কুলের আঙিনায় অন্যরকম উৎসাহ। ঈদ আসছে!
শিক্ষক হাসান স্যার ক্লাসে ঢুকে বললেন, “এই ঈদে আমরা সবাই মিলে কিছু আনন্দ ভাগ করে নেবো।”
শিশুরা কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইল। স্যার বোঝালেন, ঈদ শুধু নতুন কাপড় আর মিষ্টি খাওয়ার জন্য নয়, এটা সবাইকে নিয়ে আনন্দ করার দিন।
পরদিন স্কুলের মাঠে বড় আয়োজন। গ্রামের মানুষ, অভিভাবক, শিক্ষক - সবাই মিলে সাজিয়েছে ঈদ উৎসব। বড়রা মিলে পায়েশ আর সেমাই রান্না করলেন। মা-বাবারা নতুন জামা দিলেন সেসব শিশুদের, যাদের কেনার সামর্থ্য নেই।
সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত ছিল ছোট্ট রফিকের জন্য। তার বাবা দিনমজুর, ঈদে নতুন জামা কেনার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু আজ স্কুলের শিক্ষক আর সহপাঠীদের দেওয়া উপহার পেয়ে সে খুশিতে নেচে উঠল।
বিকেলে নাটক আর গান হলো। মা-বাবারা বললেন, “এমন আয়োজন যেন প্রতিবছর হয়!”
হাসান স্যার গর্বিত মনে বললেন, “ঈদ মানে শুধু নিজে খুশি হওয়া নয়, অন্যদের খুশি করাও।”
ঈদের পরদিনও স্কুলমাঠে আনন্দের রেশ রয়ে গেল। কারণ এবার ঈদের প্রকৃত অর্থ সবাই বুঝেছে, সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই আসল আনন্দ।

ধনুক-ভাঙা পণ:- ২৫

“পহেলা বৈশাখের বন্ধুত্ব”

পহেলা বৈশাখ আসছে। রোদ্দুর প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা খুবই উত্তেজিত। সবার মুখে হাসি, স্কুলজুড়ে চলছে রঙ-বেরঙের সাজসজ্জা। শিক্ষকরা ঠিক করেছেন, এ বছর নববর্ষ উপলক্ষে স্কুলে ছোট্ট একটা মেলা হবে। থাকবে পিঠাপুলির স্টল, খেলাধুলা, কবিতা আবৃতি আর নাচগান।

রূপা, মোমিন, শান্ত, ও নিপা, চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিলে একটা ‘বন্ধুত্বের স্টল’ দিতে চাইল। তাদের পরিকল্পনা ছিল, এই স্টলে কেউ এসে যদি কারো জন্য ভালো কিছু বলে বা বন্ধুদের প্রশংসা করে, তাহলে তাকে একটা কাগুজে ফুল উপহার দেওয়া হবে। সেই ফুলে থাকবে একটা ছোট্ট শুভেচ্ছাবার্তা।

শুরুতে সবাই অবাক! মেলায় খেলাধুলা বা খাবার না, বরং বন্ধুত্বের স্টল?

কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, সেই স্টলেই সবচেয়ে বেশি ভিড়! ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে বলছে “আমি আমার বন্ধুর পাশে সবসময় থাকব।” কেউ বলছে “আমার বন্ধুর হাসিটা আমাকে সবসময় খুশি করে তোলে।”

শেষে প্রধান শিক্ষকও এসে সেই স্টলে একটা ফুল নিলেন। তিনি বললেন, “তোমাদের এই ভাবনাটা সত্যিকারের নববর্ষের চেতনা ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, ও সম্প্রীতির প্রতীক।”

আরও ছিলো “নববর্ষ পাঠশালা” নামের একটা ছোট মঞ্চ। তারা গল্প বলল, দেখাল ছবি, আর সবাইকে বলল “নতুন বছর মানে নিজেকে নতুন করে চিনে নেওয়া, একে অপরকে সম্মান করা, আর আমাদের সংস্কৃতিকে ভালোবাসা।”

দিনশেষে সবাই বুঝল, বৈশাখ মানে শুধু আনন্দ না, এটা ভালোবাসা ছড়ানোর সময়, নতুন করে একে অপরকে আপন করে নেওয়ার সময়।

ধনুক-ভাঙা পণ:- ২৬

“পদ্মপুকুরের প্রাণফেরা”

এই internet এর তথ্যবহুল যুগে শিক্ষকদের মূল লক্ষ হলো শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা ও সাহস জোগানো। এমনি একটা চিন্তা করম আলী স্যারের, স্যার আগামী বছর অবসরে যাবেন, তাঁর যৌবন কাল ছিলো internet আর মোবাইল ফোন ছাড়া। বাংলার স্যার করম আলী, তাঁর দূরদর্শীতা অনেক, ভবিষ্যতের প্রজন্মকে তিনি তৈরী করতে চান তথ্য ও যুক্তির প্রধান্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে। বাংলার শিক্ষক হওয়ায় তাঁর যুক্তি, মানুষের মানুষত্ত আর বিবেক নিয়ে অনেক লেখা পড়া ও অনেক প্রবন্ধ ও গল্প তাঁর লেখা। করম স্যারের আধুনিকতার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কথায় ও কাজে সম্পূর্ণ ভাবে ধারণ করেন Gen-Z এর চরিত্র, ষাট উর্ধ্ব বয়সে তাঁর প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা থেকে। করম আলী স্যার জানতেন, ভবিষ্যতের দুনিয়া তথ্যের, যুক্তির ও বাস্তব দক্ষতার। তাই তিনি ভাবলেন, জীবনের শেষ শিক্ষাবছরটি ছাত্রদের একটি প্রকৃত সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে শেখাবেন বাস্তব জীবন থেকেই, বইয়ের পাতা নয়।

পদ্মপুকুর উচ্চ বিদ্যালয় একটি ছোট্ট মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, সুবিল গ্রামের প্রান্তে। স্কুলের লাগোয়া একটি পদ্ম ফুলের পুকুর, পুকুরে বর্ষায় হরেক রং এর ফুল ফোটা শুরু হয়, শরতে অধিক পরিমাণে ফুল ফোটে এবং এর ব্যাপ্তি থাকে হেমন্তকাল অবধি। গোলাপী-লাল (রক্তপদ্ম) ও সাদা (শ্বেতপদ্ম) গুলো স্কুলের পবিত্রতা নিয়ে ফোটে। পদ্মফুল পবিত্র ও সৌন্দর্যের প্রতীক, আর তাই পদ্মপুকুর উচ্চ বিদ্যালয় ও যেন পরিস্ফুটিত হয় পদ্মফুলের সকল গুনাগুনের আলোতে। সুগন্ধিতে স্নিগ্ধ, পদ্ম ফুলের মতোই “পদ্মপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়”। পদ্মপুকুরের পার হলো স্কুল ছাত্রদের গল্প করার জায়গা, ছোট মাছ আর বক ও রঙিন মাছরাঙা পাখিদের আনাগোনা। পুকুরটি কেবল ব্যাঙ এবং গঙ্গাফড়িং জন্য একটি জায়গা ছিল না - এটি ছিল ছাত্রদের বিজ্ঞান পরীক্ষাগার, তাদের চিন্তাভাবনার স্থান এবং জীববৈচিত্র কে কাছ থেকে দেখা। বর্ষায় যখন প্রথম বৃষ্টি নামে, পুকুরের উপর ভেসে ওঠে স্নিগ্ধ গোলাপী ও শুভ্র পদ্মফুলের হাসি। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে এক মায়াবী সুগন্ধ। ছাত্ররা তখন জানে, স্কুলের দিনগুলো হয়ে উঠবে আরো বেশি উজ্জ্বল।

গত বছর গ্রীষ্মের ছুটির পর যখন ছাত্ররা স্কুলে ফিরল, তখন ঘটে গেল অদ্ভুত এক ঘটনা। পুকুরটি পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে। ফাটল ধরেছে নিচে, মাছ নেই, ব্যাঙ নেই, এমনকি পাখিরাও আর আসে না। ছাত্ররা হতবাক; কেউ বলে, “গরমে শুকিয়ে গেছে,” কেউ বলে, “পানি হয়তো অন্যদিকে চলে গেছে”, এই সকল। করম স্যারের এতদিনের চেনা রূপসী পদ্মপুকুর যার নামে স্কুলের নাম “পদ্মপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়”। স্যার মনে অনেক দুঃখ পেলেন এবং একই সাথে প্রতিজ্ঞা করলে, পুকুর শুকিয়ে যাবার কারণ তিনি বের করবেনই এবং তা করবেন স্কুলের ছাত্রদের কে নিয়ে।

এই পুকুর রহস্যের সমাধান খুঁজতে কমল স্যার বেছে নিলেন এক অভিনব উপায়। তিনি বললেন -"কেন পুকুরটি শুকিয়ে গেল, এবং আমরা এটি সম্পর্কে কী করতে পারি?", এই ঘটনাটা আমরা একসাথে বুঝে দেখব। ছাত্ররাই হবে এই সমস্যার অনুসন্ধানকারী। যাকে বলে “সমস্যা-ভিত্তিক শিক্ষণ” (Problem Based Leaning). কমল স্যার সাজালেন তাঁর অনুসন্ধানী দল।

পর্ব ১ - সমস্যার অনুসন্ধান:

ছাত্রছাত্রীরা কয়েকটি দলে ভাগ করা হলো। প্রত্যেকে একেক দিক থেকে ভাবতে শুরু করলো।

ইতিহাস দল: প্রথম দল স্থানীয় প্রবীণদের সাক্ষাৎকার নিলো। জানতে চাইলো তাঁদের অতীত অভিজ্ঞতা, তাঁদের জানা ও বোঝা।

জরিপ দল: দ্বিতীয় দল কাছাকাছি খাল, সুন্দরী নদী আর ড্রেন পরিদর্শন করলো। এই দল কমল স্যারের নির্দেশে গ্রামে চাষের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ গুলোর একটা সম্পূর্ণ সমীক্ষা করলো। যেখানে নলকুপের গভীরতা ও মধ্যবর্তী দূরত্ব ও সক্রিয়তা স্থান পেলো।

আবহাওয়া দল: তৃতীয় দল গত পাঁচ বছরের বৃষ্টিপাতের তথ্য সংগ্রহ করলো সরকারি ওয়েবসাইট থেকে (কমল স্যার এর সাহায্য নিয়ে)।

ভূতাত্ত্বিক দল: চতুর্থ দল পুকুরের পাড় ঘুরে দেখে এবং মাপ যোগ করে পানির যেদিকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে (ঢালু) কিনা দেখলো।

বিকল্প সমাধান: পঞ্চম দল পানির প্রবাহ পরিদর্শন করতে কাছের নদী ও জমিতে পানি দেবার জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ গুলোর পরিবর্তে অন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা তা সমীক্ষা করলো।

বিভিন্ন চিন্তা ছাত্রদের মাথায়, একজন ছাত্র বললো, “নতুন নালার লাইনের কাজ শেষ হয়েছে এই ছুটিতে। হয়তো সেটাই কারণ?” অন্যজন বলে, “আমার ঠাকুরদা বললেন, যখন তারা ছোট ছিলেন, তখন ও এই পুকুর কখনও শুকাত না।” অনেক প্রশ্ন সবার মনে, দীর্ঘ গ্রীষ্মের কারণে কি এটি হল, নাকি ভূগর্ভস্থ পানির স্তর কি আরও নিচে নেমে যাচ্ছে?

পর্ব ২ - তথ্য, বিশ্লেষণ ও প্রস্তাব:

তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিটি দল একটি তত্ত্ব তৈরি করে।

- একটি দল বলে, নতুন ড্রেনেজ পাইপে পুকুরের পানির স্তর নামছে।
- আরেক দল বলে, বৃষ্টিপাত ২০% কমে গেছে। পুকুরে নতুন করে পানি জমার সুযোগ নেই।
- কেউ কেউ প্রস্তাব দেয়, স্কুলের ছাদে জলধারণ ব্যবস্থা তৈরি করলে পুকুরে জল দেওয়া যাবে।

ছাত্ররা তাঁদের অনুমান এবং তদন্ত কে দেখানোর জন্য, পোস্টার এবং স্কুল ও গ্রামের একটি হাতে তৈরি 3D মডেল ব্যবহার করে তাদের ফলাফলের মানচিত্র করলো।

পর্ব ৩ - সমাধান ও প্রয়োগ:

করম স্যারের তত্ত্বাবধানে তারা স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসে এই সমস্যা টি উপস্থাপনা দেয়। গ্রামের লোকজন প্রথমে অবাক, পরে মুগ্ধ।

একটি উত্তরের পরিবর্তে, শিক্ষার্থীরা একাধিক প্রস্তাব তৈরি করেছে:

• স্কুল এর ছাদে বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য ট্যাংক স্থাপন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা কিছুটা সংশোধন, এবং গ্রামের আরও দুটি জায়গায় ছোট জলধারনের প্রস্তাব।

• বর্ষা কালে জলাবদ্ধতা নিষ্কাশন পথ ও পুকুরের ও বিলের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য পঞ্চায়েতের কাছে একটি ১০০ মিটার পাকা নালা ও প্রশাখা নালার প্রস্তাব করলো।

• মূলত পুকুর শুকিয়ে যাবার কারণ ছিলো পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাওয়া। ছাত্ররা এইটা ধরতে পেরেছে একটা ইন্দারার (কুয়ো) পানির গভীরতা দেখে। এর কারণ হলো গভীর ও অগভীর নলকূপের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার।ছাত্রদের সমীক্ষায় দেখা গেলো, গভীর ও অগভীর নলকূপ গুলো ৫০-৬০ মিটার গভীরতায় স্থাপন করা হয়। যদিও সেচ জমির জন্য খুবই প্রয়োজনীয়, দেশের প্রায় ৬৭% জমি সেচের আওতায় এসেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মাবলী আছে, সেচ যন্ত্র যা গভীর ও অগভীর নলকূপের জন্য লাইসেন্স নিতে হয় নিয়মাবলী মেনে। ছাত্ররা দেখলো সুবিল গ্রামের কৃষকেরাও নিয়েছেন, কিন্তু এখানকার ভূগর্ভস্থ মাটির চরিত্র অন্য রকম, একবার ভূগর্ভস্থ হতে পানি নিলে ঐ জাগায় আর বৃষ্টির পানি দিয়ে ভরাট হয় না পরের বার ব্যবহারের জন্য, ওখানে বালি মাটি এসে ভরে যায়। গত ২ বছর ২০% বৃষ্টিও কম হয়েছে, পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, প্রতি বছর এখানে ১.৫ থেকে ২ মিটার নিচে নামছে পানির স্তর। যা জীববৈচিত্রর জন্য হুমকি স্বরূপ।

তাই প্রস্তাব করা হলো, সুবিল গ্রাম থেকে ২০০ মিটার দূরে একটা ছোট হাওর (কখলা হাওর) আছে, যা সুন্দরী নদীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে বর্ষা কালে। ঐ কখলা হাওর থেকে নালা করে আনা হবে এবং বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে সেচের পানির ব্যবস্থা করা হবে। আসল উদ্দেশ্য হলো, সেচের জন্য ভুগর্ভস্থ পানি (Groundwater) ব্যবহার না করে পৃষ্ঠ পানি (Surface water) এর ব্যবহার যাতে ভুগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে না নামে।

পর্ব ৪ - পুনর্জাগরণ ও প্রতিফলন:

পরের বছরের বর্ষায় ধীরে ধীরে পুকুরে পানি জমে গেলো। একদিন সকালবেলা ছাত্ররা দেখলো একটা সাদা বক পুকুরে দাঁড়িয়ে আছে। আর সবাই বললো, “ও আবার ফিরে এসেছে।” ক্লাস ১০ম এর ছাত্রী আফরোজা বললো, “স্যার, আমি এখন বুঝি, প্রকৃতি শুধু বইয়ের বিষয় না; এটা আমাদের জীবনের অংশ।” করম আলী স্যার দেখলেন পুকুরটায় জীবন ফিরে এসেছে। স্যার বললেন, “তোমরা শুধু একটি প্রকল্প করনি। তোমরা একটি সমাজের সমস্যা সমাধান করেছো। এটা শুধু বিজ্ঞান নয়, এটা নাগরিকতা, দায়িত্ববোধ আর ভবিষ্যতের প্রস্তুতি।”

সেই বছর পদ্মাপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্টে লেখা হয়েছিল - “আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বইয়ের পৃষ্ঠা নয়, বাস্তব জীবন থেকেই শিখছে। এই শিশুরা কেবল একটি বিজ্ঞান সমস্যা সমাধান করেনি - তারা একটি সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধান করেছে। এটিই সমস্যার মধ্য দিয়ে শেখার শক্তি।”

“আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পৃথিবী উত্তরাধিকার সূত্রে পাই না; আমরা এটি আমাদের সন্তানদের কাছ থেকে ধার করি।” - আদি আমেরিকান প্রবাদ।

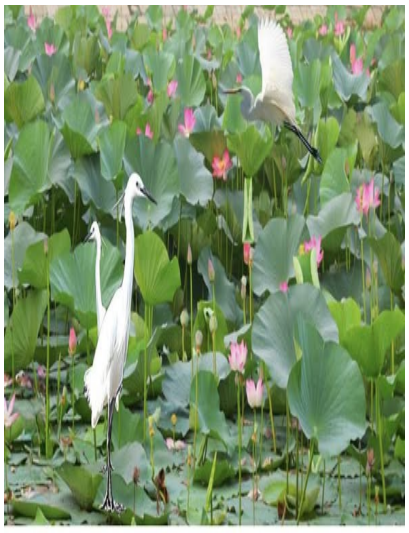

ধনুক-ভাঙা পণ:- ২৭

“AI সহচর হোক, চিন্তার মালিক নয়।”

সেই কালির কলম থেকে বল কলমের পর কম্পিউটারে লেখার আধিপত্য দেখেছেন বদীর স্যার। আর এখন দেখছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ছড়াছড়ি, বর্তমানে অদ্ভুত এক পরিবর্তন মানব জীবনে। শিশুদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)। প্রশ্ন করলেই উত্তর, নির্দেশ করলেই ছবি, বললেই গান, সব সম্ভব এখন ChatGPT, Gemini বা Copilot-এর মাধ্যমে। এই প্রযুক্তির জাদুকরী শক্তি একদিকে যেমন অভিভাবকদের জন্য সহায়ক মনে হচ্ছে, অন্যদিকে তা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষ করে শিশুদের মন হলো অত্যন্ত গ্রহণশীল, নরম, ও দ্রুত অভ্যস্ত হওয়ার উপযোগী। তারা শেখে অনুভব করে, প্রশ্ন করে, ভুল করে, এবং নিজেরা আবিষ্কার করে। কিন্তু যদি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তাদের হাতে ধরিয়ে দেয় এক যন্ত্র, তাহলে তারা কি আর নিজেরা ভাববে? চিন্তা করবে? নিজের ভুল থেকে শিখবে? আমরা যদি শিশুদের হাতে AI তুলে দিই কোনো নৈতিক কাঠামো ছাড়াই, তাহলে আমরা নিজেরাই তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তাশক্তি, কল্পনা ও মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিচ্ছি।

কিন্তু কিভাবে সাজাতে হবে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে, কোন দক্ষতায় পরিপূর্নতা পাবে আজকের স্কুল ছাত্ররা ? এই চিন্তায় অস্থির লতিফপুর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল এর শরীর চর্চার শিক্ষক বদীর স্যার। বদীর স্যার ঠিকই জানেন তীব্র, গভীর, ও ন্যায়সংগত সত্য কথা টি অনেকে বুঝলেও সমাধান অতটা সহজ নয়।

দবীর স্যারের দৃঢ় বিশ্বাস, AI শিশুদের শিক্ষায় ব্যবহার হোক, কিন্তু সেটি হোক নৈতিকতা, মানবিকতা ও কল্পনাশক্তির দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত। চাই:

- AI যেন সহায়ক হয়, নিয়ন্ত্রক নয়।
- AI যেন ভাবনার জায়গা দখল না করে।
- AI যেন শিখায় - কিন্তু শেখার আনন্দ কেড়ে না নেয়।

বদীর স্যার ভালো ভাবেই বুঝেছেন AI যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, “মূল্যবোধ-সমন্বিত যুক্তি” হয়তো AI উপস্থাপন করবে কিন্তু “নৈতিকতার সঙ্গে আবেগঘন - যেখানে ভয়, ভালোবাসা, সহানুভূতি, আশা” উপস্থাপন সম্ভব নয়। AI মানব শিশুদের ক্রমবর্ধমান বিকাশের মূল্যায়ন করতে পারবে না। জানার ও বোঝার আগ্রহকে বাস্তবতার আলোকে AI দেখতে পাবে না, শিশু আর কৈশোরের আগ্রহ ও উদ্দীপ্তনার মতো অনুভূতি কে AI যেন নস্ট না করতে পারে সেটুকুর প্রতি খেয়াল রাখাই আজকের দিনের শিক্ষক ও অভিবাবকের দায়িত্ব। AI এ দুটি জিনিসের অভাব রয়েছে যা মানবদের একেবারে অপরিহার্য:

১. বিচার এবং সহানুভূতি - একটি শিশুর মানসিক অবস্থা, পারিবারিক প্রেক্ষাপট বা সাংস্কৃতিক পটভূমির সূক্ষ্মতা বোঝা।

২. জবাবদিহিতা - AI কীভাবে ব্যবহার করবে তা AI বেছে নেয় না। মানুষ এবং সংস্থাগুলি তা নির্ধারণ করে।

হ্যাঁ, AI কল্পনা এবং নৈতিক বিকাশের মতো মূল্যবোধ রক্ষা করার জন্য তৈরি। আবার নাও, কারণ AI সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিতে পারে না, কারণ AI তে স্বায়ত্তশাসন এবং দায়িত্বের অভাব রয়েছে। AI algorithms গুলো এভাবেই বানানো বা কাজ করে।

বদীর স্যার জানেন, এই বাস্তবতা ভয়ংকর: AI ব্যবহার করে বানানো Apps “মজা” আর “আসক্তি” বিক্রি করছে, শিক্ষা নয়। তারা জানে, “শিশুর মন দ্রুত ধরা যায়, এবং তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।” একবার অভ্যস্ত হলে তারা আজীবনের গ্রাহক হয়ে যাবে।

বদীর স্যার চান এই অশুভ বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে: সেটা আমাদের (শিক্ষক, অভিভাবক, চিন্তাবিদ, নীতিনির্ধারক) থেকেই শুরু করতে হবে। AI কোম্পানি যদি শিশুদের জন্য কিছু বানায়, তা মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষক দ্বারা যাচাইকৃত না হলে নিষিদ্ধ হবে। স্থানীয়ভাবে (বাংলাদেশে) আমরা শিশুবান্ধব, মূল্যবোধসম্মত AI তৈরি করবো। শিশুর ভাবনা উদ্দীপক, বাংলা ভাষাভিত্তিক, কল্পনা ও নীতিশিক্ষা সম্পৃক্ত AI. বদীর স্যার বিশ্বাস করেন স্কুল ছাত্ররা ভবিষ্যতের ভোক্তা বা সরঞ্জাম-ব্যবহারকারী নয়, তাঁরা মানুষ হিসাবে গড়ে উঠবে।

স্কুল ছাত্রদের জন্য এ যুগের বাণী হলো,

“যন্ত্রকে বিশ্বাস করো না, বুঝে ব্যবহার করো।”

“AI শেখো, কিন্তু নিজের বিবেক হারিয়ে নয়।”

“তুমি একজন মানুষ - তোমার চিন্তা, অনুভব ও কল্পনা AI-এর চেয়ে অনেক বড়।”

বদীর স্যার এই বিষয়ে দুটো পোস্টার বানালেন, যা স্কুলএর শ্রণীকক্ষ গুলোতে ও শিক্ষকদের বসার ঘরে ফ্রেম এ বাঁধাই করে রাখা হলো।

বদীর স্যারের কিছু পরিকল্পনা আছে, ভবিষ্যতের শিক্ষার্থীদের পাশে ChatGPT, Gemini, Copilot এর মতো AI সবসময় থাকবে - তারা যখনই চায় তখনই প্রশ্ন করে সমাধান পারে, এমনকি সম্পূর্ণ লেখা ও ছবিও তৈরি করিয়ে নিবে, তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকেও সেই অনুযায়ী মূলগতভাবে রূপান্তর করতে হবে। ভবিষ্যতের উপযোগী শিক্ষার ধরন হবে যেখানে AI সহচর হিসেবে থাকবে, অথচ শিক্ষার্থীর চিন্তা, কল্পনা ও নৈতিকতা হারাবে না:

১. কৃত্রিম নয়, কল্পনাশক্তিনির্ভর শিক্ষা:

শিক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে:

- গল্প লেখা, ছবি আঁকা, নাটক করা
- “যদি এমন হতো...”-ধরনের সৃজনশীল চর্চা
- নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে চিন্তা গড়ার সুযোগ।

২. প্রশ্ন-ভিত্তিক ও অনুসন্ধানমূলক শিক্ষা:

শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে:
• প্রশ্ন করতে
• উত্তর নিয়ে সন্দেহ করতে
• সূত্র খুঁজতে
৩. নৈতিক ও প্রযুক্তিবোধ শিক্ষা:
শুধু AI এর ব্যবহার নয়, শেখাতে হবে:
• AI কী করে কাজ করে
• ভুল কীভাবে করতে পারে
• মানুষের জায়গায় AI কখন ঠিক নয়
৪. সহযোগিতামূলক ও সামাজিক শিক্ষা:
AI একা কাজ করে, কিন্তু সমাজ একা চলে না। শেখাতে হবে:
• দলগত কাজ
• মতভেদে সম্মান
• সমস্যার সমাধানে অংশগ্রহণ
৫. গভীর মননের সময় ও ধৈর্য চর্চা:
AI কম্পিউটারের প্রসেসিং শক্তি ব্যবহার করে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে সময় লাগে। তাই শিক্ষায় থাকতে হবে:
• ধীর পড়াশোনা (slow reading)
• চিন্তা লেখার চর্চা
• মনের গভীরতা খোঁজার সময়
৬. বাস্তব জীবন ও সমস্যা-ভিত্তিক শিক্ষা:
শিক্ষার্থীরা যেন বাস্তব জীবনের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে, এইটা virtual world কে বাস্তব জীবনের সঙ্গে না মিলানোর শিক্ষা।
৭. দার্শনিক এবং অস্তিত্বগত শিক্ষা:
দার্শনিক এবং অস্তিত্ববাদী শিক্ষা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং জীবনের অর্থ অনুসন্ধানের উপর জোর দেয়।
বদীর স্যার চান, ভবিষ্যতের শিক্ষায় AI থাকবে সহচর হিসেবে, নেতা হিসাবে নয়। শিক্ষার্থীরা শিখবে AI-কে নিয়ন্ত্রণ করতে, এমন শিক্ষা চাই যা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করবে, কিন্তু মানবতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে।
তবুও মনে সন্দেহ জাগে,
“মানব জীবনে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে ভালো অথবা সবচেয়ে খারাপ জিনিস হতে পারে AI.” - এলন মাস্ক

ধনুক-ভাঙা পণ:- ২৮

“আমরা নিখুঁত নই, তবে আমরা অনন্য”

বয়ঃসন্ধি, সাধারণত মেয়েদের ক্ষেত্রে ৮ থেকে ১৩ বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে শুরু হয়, একে এড়িয়ে যাবার কোন সুযোগ নেই। স্কুলে তখন ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণী এর ছাত্র ছাত্রী তারা। তখন মানব শিশু আত্মপ্রত্যয় ও অহংকারে মগ্ন থাকে। সমাজ ও নিজের শরীরীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের এ কঠিন প্রতিযোগিতায় নামে এই কৈশোর বয়সের ছাত্ররা। আর তখনই ছাত্রদের চাই একটা দিক নির্দেশনা, যেখানে থাকবে নিজেকে চেনা ও জানার প্রবনতায় নিজেকে আবিষ্কার করা। অনেকটা দার্শনিক সক্রেটিস এর “Know thyself” এর মতো আত্ম-প্রতিফলন এবং নিজের প্রকৃতি এবং সীমাবদ্ধতা বোঝা। কাশীমপুর বিদ্যালয়ের ইংলিশের শিক্ষক বিমল স্যার এমনি চিন্তা করেন। তিনি মনে করেন বয়ঃসন্ধির এই সময়টাকে শিক্ষার্থীরা আত্মপরিচয় ও আত্মবিশ্বাস দিয়ে মুখোমুখি হবে। আর তাই তাঁর এই পরিকল্পনা।

বয়ঃসন্ধি এই সংকটপূর্ন সময়টাতে “আমরা নিখুঁত নই, তবে আমরা অনন্য” (We are not perfect, but we are unique) এই ভাবনাটি শিক্ষার্থীদের আত্মপরিচয়, আত্মবিশ্বাস ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গঠনে সহায়ক হবে। এমন একটা চিন্তাকে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেবার কথা ভাবতে ভাবতে বিমল স্যার একটা ছবি সহ বই এর কথা ভাবলেন। ঘটনা বহুল বইয়ের ছবিতে ছাত্ররা তাদের প্রতিফলন দেখবে ও অনুধাবন করবে তাঁর অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীতা। আর তখনই আসবে, আত্ম-স্বীকারোক্ত - আমি ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নই, কিন্তু আমি কখনোই মিথ্যা, ভান বা মুখোশ পরা আচরণ করবোনা— সবসময় নিজের মতো, খাঁটি ও আন্তরিক থাকবো।

৭ম শ্রেণীর জন্য একটি আলোচনা প্রবন্ধ, “আমরা নিখুঁত নই, তবে আমরা অনন্য”।

সূচনা :

সাফল্যের চেয়ে সন্তুষ্টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের সাফল্য অন্যদের দ্বারা পরিমাপ করা হয় কিন্তু আমাদের সন্তুষ্টি আমাদের মন এবং হৃদয় দ্বারা পরিমাপ করা হয়। আমাদের সফল হতে হলে নিখুঁত হতে হবে না। নিজেকে জানলে নিজের মতো করে সফলতাকে আলিঙ্গান করা যায়। আসল কথা, আমরা কেউ নিখুঁত নই, কিন্তু আমরা এক এক জন এক এবং অদ্বিতীয়।

মূলভাব: নিখুঁত নয়, অনন্যই পরিচয়।

আমরা একেকজন একেকরকম। আমরা ত্রুটিপূর্ণ হতে পারি, কিন্তু আমাদের ভেতরের রঙ, হাসি, ভয়, আর সাহস মিলেই আমাদের অনন্য করে তোলে। তাই এই গল্পটিও একটু অন্যরকম। এখানে কেউ সুপারহিরো না, তবু সবাই নিজেদের মতো করে ‘বিশেষ’। যে কোন অভিযানে ভুল আছে, ভয় আছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় আছে কল্পনা, বন্ধুত্ব আর নিজের প্রতি বিশ্বাস।

Imperfectionism বা “অসম্পূর্ণতাবাদ” একটি দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে জীবনের সীমাবদ্ধতাগুলোকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে অর্থপূর্ণভাবে কাজ করার কথা বলা হয়। আমাদের সময় সীমিত। আমরা কখনই ভবিষ্যৎ জানতে পারব না। পৃথিবীতে কী ঘটছে তা আমরা কেবল সীমিত পরিমাণে বুঝতে পারি। আমাদের সীমাবদ্ধতাগুলি বাস্তব এবং আমাদের সঙ্গে সব সময়।

মানুষ চায় সব কিছু তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে, কিন্তু বাস্তবে তা কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা যদি বুঝতে পারি এটা কখনোই পুরোপুরি সম্ভব নয়, তাহলে নিজেকে ক্ষমা করে দিয়ে জীবন উপভোগ করা সম্ভব।

অনেকেই ভয় পায় যে ধীরে চললে তারা অলস হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, একটু ধীর গতি অনেক বেশি শান্তি ও কার্যকর কাজের সুযোগ তৈরি করে। ধীরে চলা মানেই অলসতা নয়, বরং এটি আরও গভীর ও অর্থপূর্ণ কাজের পথ তৈরি করে।

নিজেকে নিখুঁত করার চেষ্টায় আমরা কাজ করতেই ভয় পাই। কিন্তু যদি বুঝি আমরা সবসময়ই অসম্পূর্ণ, তাহলে সেই ভয়টা অনুপ্রেরণায় পরিণত হতে পারে। জীবনে সব সমস্যার সমাধান নেই, বরং কোনটা বেছে নেব সেটাই মূল বিষয়। যেমন, আতিথেয়তা মানে মানুষকে নিখুঁত ঘরে আমন্ত্রণ জানানো নয়, বরং আমাদের অপূর্ণ জীবনে আমন্ত্রণ জানানো।

জার্মান চিন্তাবিদ হার্টমুট রোসার মতে, অনুরণন (Resonance) হল এমন এক সম্পর্ক যেখানে তোমরা পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারো, নিয়ন্ত্রণ নয় বরং বোঝাপড়ার ভিত্তিতে।

এবার আশা যাক মূল গল্পে, গল্পের নাম,

“অপূর্বদের অসম্পূর্ণ অভিযান”

অপূর্ব শপ্তম শ্রেণির ছাত্র, সব কিছু নিখুঁত করতে চায়, ভাবে সুন্দর আর নিখুঁত একই। সায়মা সহজ-সরল, খোলামেলা মনের বন্ধু, ও জীবনের ছোটখাটো আনন্দে বিশ্বাস করে। মারুফ স্যার: একজন নতুন শিক্ষক, যিনি অসম্পূর্ণতাবাদ (Imperfectionism) এর ধারণা তুলে ধরেন।

ক্লাস প্রজেক্ট: সবাইকে মিলে একটা স্কুল ম্যাগাজিন বানাতে হবে। অপূর্ব সব কাজ নিখুঁত করতে চায়, তাই কোন কিছুই ওর মনের মতো হয় না। অপূর্ব ম্যাগাজিনের ডিজাইন করতে গিয়ে একটি পৃষ্ঠায় ভুল করে ফেলে। ভেবে নেয়, সে পুরো টিমের কাজ নষ্ট করে দিয়েছে। বারবার মুছে আবার লেখে, একসময় ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়ে।

মারুফ স্যার বোঝান: “তুমি যদি সবকিছু ঠিকঠাক করার চেষ্টায় থাকো, কখনোই কাজ শেষ হবে না। বরং যেটা পারো সেটা করো, দেখবে তাতেই সাফল্য আসবে।”

সায়মা বলে: “ভুল হতেই পারে। কিন্তু ভুল মানে তো আমরা কাজ করছি, শিখছি, বড় হচ্ছি।” সায়মা সবাইকে তার বাসায় গ্রুপ মিটিংয়ের জন্য ডাকে। ঘর তেমন গোছানো নয়, খাবার ছিলো খুব সাধারণ। কিন্তু ওর মা হাসিমুখে সবাইকে চা আর মুড়ি দিয়ে আপ্যায়ন করেন।

অপূর্ব বুঝতে পারে, আন্তরিকতা নিখুঁত সাজসজ্জার চেয়ে অনেক বড়। শেষে অপূর্ব ম্যাগাজিনের কাভার পেইজ আঁকে যেটা পুরোপুরি নিখুঁত নয়, কিন্তু তার অনুভব, চিন্তা আর সাহসী চেষ্টার ছাপ ফুটে ওঠে। ম্যাগাজিন সবার প্রশংসা পায়।

মারুফ স্যার বলেন: “জীবন ঠিকমতো চলবে কি না, তার চেয়ে বড় হলো তুমি তোমার সুরে গাইছো কি না। ঠিক এভাবেই জীবনের সঙ্গে সুর মেলে।” জীবন নিখুঁত নয়, বরং অসম্পূর্ণতা মেনে নিয়েই এগিয়ে যাওয়াই জীবন। এই প্রবন্ধ ও কিছু প্রশ্ন বিমল স্যার ছাত্রদের জন্য ঠিক করলেন।

১. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন:

- অপূর্বর সবচেয়ে বড় ভয় কী ছিল? কেন সে এত নিখুঁত হতে চেয়েছিল?
-মারুফ স্যার অপূর্বর চিন্তাকে কীভাবে পাল্টে দিলেন?
- সায়মার বাড়ির পরিবেশ কেমন ছিল? তুমি কীভাবে তা মূল্যায়ন করবে?
- অপূর্বর আঁকা ম্যাগাজিন কভারে কী বিশেষত্ত ছিল? সেটি ত্রুটিপূর্ণ হয়েও কীভাবে সুন্দর ছিল?
- তুমি নিজের জীবনে কোনো ভুল থেকে কিছু শিখেছ? সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার কর।

২. দলগত আলোচনা বিষয়:

- “ভুল করলে কি মানুষ খারাপ হয়?”
- “অতিথেয়তা মানে কি ঘর পরিষ্কার রাখা, না আন্তরিকতা?”
- “সবকিছু নিখুঁত করার চাপে আমরা কী হারিয়ে ফেলি?”

(প্রতিটি আলোচনা শেষে একজন শিক্ষক থাকবেন যিনি আলোচনা সংক্ষেপ করবেন)

৩. ব্যবহারিক কার্যক্রম:

ছাত্ররা ইচ্ছাকৃতভাবে “একটু ভুল” সহ ছোট একটি আঁকা বা লেখা তৈরি করবে, তাদের বোঝানোর জন্য যে ত্রুটিপূর্ণ জিনিসও সুন্দর হতে পারে। একদিন স্কুলে সবাই নিজের লাঞ্চ বা স্ন্যাক্স অন্য বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খাবে, জোর থাকবে আন্তরিকতায়।

প্রত্যেকে নিজের মতো করে গল্প বা ম্যাগাজিনের কভার আঁকবে, নিয়মের বাইরে গিয়ে।শিক্ষক-পরিচালিত আলোচনা গাইড:

প্রতিটি উত্তর বা ভুলকে একধরনের “চেষ্টা” হিসেবে দেখা। ত্রুটিপূর্ণ কাজের প্রশংসা করে তার মেধার দিক তুলে ধরা। শিক্ষার্থীদের ভয় বা লজ্জার অনুভূতিগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে শুনে আলোচনা করা।

ছাত্রদের বয়ঃসন্ধি কালে “আমরা নিখুঁত নই, তবে আমরা অনন্য” এই ভাবধারা তাদেরকে অন্য একটি চিন্তার জগতে নিয়ে যায়। নিজেকে খোঁজা, নিজেকে চেনার যে বয়স তাতে এই পরিবেশগত চিন্তার প্রভাব ইতিবাচক ভাবেই গ্রহণ করেছে ছাত্ররা।

ধনুক-ভাঙা পণ – ৩০

“জাপানি পাঠশালাকে মানদণ্ড”

গাজীপুরের প্রত্যন্ত এক গ্রামের নাম মালঞ্চপুর। এখানকার এক ছোট্ট উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক আবু সাইদ স্যার, যিনি গণিত ও নৈতিক শিক্ষা পড়ান। তিনি অন্য সবার চেয়ে একটু আলাদা। যখন অন্য শিক্ষকরা শুধু পাঠ্যসূচি মেনে চলে, আবু সাইদ স্যার তখন ছাত্রদের চোখে ভবিষ্যতের ছবি আঁকেন - শুধু পরীক্ষায় পাস করাই নয়, বরং একজন দায়িত্ববান, পরিশ্রমী এবং মানসিকভাবে সুস্থ মানুষ হয়ে ওঠার পথ দেখান।

সাইদ স্যার মনে করেন স্কুল শিক্ষার নির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ড বা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ (Benchmarking) থাকবে, তার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে নিজের অবস্থা মূল্যায়ন করা এবং উন্নয়নের জন্য পথ নির্ধারণ করা হবে। শিক্ষায় Benchmarking হলো– নিজের দুর্বলতা চিনে নেওয়ার সাহস, এবং ভালো কিছু থেকে শেখার বিনয়। শিক্ষার মানদণ্ড করতে হলে কিছু শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নির্ধারণ করা যায় যেমন, জাপানের সময়ানুবর্তিতা, ফিনল্যান্ডের শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সিঙ্গাপুরের গণিত শিক্ষা ইত্যাদি। সাইদ স্যার জানেন, Benchmarking এক ধরনের আয়না- যার মাধ্যমে আমরা সহজেই দেখতে পাই কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এবং কোথায় পৌঁছাতে চাই।

সাইদ স্যার ২০২২ এ অনলাইনে এক আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানেই পরিচয় হয় মিজুতো ইয়ামামোতো নামে এক জাপানি স্কুলশিক্ষিকার সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে সাইদ স্যার প্রথম জানলেন জাপানের শিক্ষা-সংস্কৃতি, যেমন:

- প্রতিদিন ছাত্ররা নিজেরা ক্লাসরুম পরিষ্কার করে।
- ছাত্রদের শেখানো হয় ‘হানসেই’ মানে আত্মসমালোচনা, নিজের ভুল স্বীকার করা এবং উন্নত করার ইচ্ছা।
- সময়মতো হাজিরা, নিখুঁত কাজ, এবং দলগত সহযোগিতা - এসবই হলো শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড।

এই গল্পগুলো সাইদ স্যারকে আলোড়িত করে। তিনি ভাবেন, “শুধু বইয়ের বিদ্যা নয়, ভালো মানুষ গড়ার জন্যও আমাদের কিছু বদল আনা দরকার।”

তিনি মিজুতো স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন ইমেইলে, মাঝে মাঝে ভিডিও কলে কথা বলেন। তাঁর সহযোগিতায় গড়ে তোলেন নিজের স্কুলে ছোট একটা পরীক্ষা মূলক পরিকল্পনা - “আমার শ্রেণি, আমার দায়িত্ব” নামে একটি উদ্যোগ।

সপ্তাহে একদিন, ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই ক্লাসঘর পরিস্কার করে, একটা দেয়ালে নিজেদের ভুল ও শেখা বিষয়গুলো লেখে, এবং প্রতিদিন এক মিনিট করে ‘হানসেই’ করে - আত্ম-প্রতিফলন, যেখানে নিজের ভুল নিয়ে নিজের সাথে কথা বলা।

প্রথম দিকে ছাত্ররা হাসাহাসি করে, কেউ কেউ বলে, “স্যার, এগুলো দিয়ে কি হবে?”

কিন্তু ধীরে ধীরে বদল আসে।

রুবিনা, আগে ক্লাসে সময়মতো আসতো না, এখন প্রতিদিন ঘণ্টা বাজার আগেই হাজির।

সিয়াম, যে আগে কোন কাজেই আগ্রহ দেখাতো না - সে এখন নিজেই দায়িত্ব নিয়ে ক্লাসঘরের ফ্যান চালায়, বোর্ড মুছে রাখে।

একদিন এক অভিভাবক এসে বলেন, “স্যার, আমার ছেলে তো বাসায়ও এখন নিজের টেবিল পরিষ্কার করে, বলছে, এটা ‘হানসেই’।”

সাইদ স্যার জানেন, এটা হয়তো সামান্য পদক্ষেপ। কিন্তু মাটিতে ছোট্ট একটা বীজও তো একদিন বড় গাছ হয়ে ওঠে।

মিজুতো স্যার এক চিঠিতে লেখেন,

“Learning is not just a benchmark, it is a character. You are building it.”

(শেখা শুধু মানদণ্ড নয়, এটা চরিত্র গঠনের বিষয়। আপনি সেটা গড়ছেন।)

সাইদ স্যার চুপ করে থাকেন না। নিজের শিক্ষকদের নিয়ে একটা ছোট প্রশিক্ষণ দেন - “শুধু পাঠ নয়, শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের একসাথে যাত্রা”, যেখানে বিষয় গুলো হলো নম্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, এবং দায়বদ্ধতা।

উদ্দেশ্য:

- জাপানি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে প্রাসঙ্গিক অনুশাসন শেখা।
- বাংলাদেশি প্রেক্ষাপটে ছাত্রদের দায়িত্ববোধ ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ।
- শিক্ষকদের ছোট পরিবর্তনের সম্ভাবনার আলোচনা।

তিনি বলেন, “আমরা যদি একটি শ্রেণিকে বদলাতে পারি, একদিন পুরো সমাজ বদলাবে।” বিদ্যালয় সংস্কার, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, এবং ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা - শিক্ষকরা সেই বদলের সূচনা বিন্দু। সাইদ স্যারের লক্ষ, শিক্ষায় মানদণ্ড স্থাপনের দ্বারা উন্নতির পথে চলা।

শিক্ষার আসল Benchmark তখনই সফল হয়, যখন তা শুধু পরীক্ষার খাতায় নয়, কারও আচরণে, দায়িত্ববোধে, কিংবা নীরব এক আত্মপ্রতিফলনের সময়টায় প্রকাশ পায়।

ধনুক-ভাঙা পণ: ৩১

“আলো খুঁজে ফেরে”

নওগাঁ জেলার প্রত্যন্ত এক কোণে অবস্থিত বুড়িরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আনিস স্যার সদ্য যোগ দেওয়া এক তরুণ শিক্ষক, স্পেশাল এডুকেশনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। হাসান এক দৃষ্টিশক্তিহীন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র, যাকে কেউ ঠিকমতো চেনে না, দেখে না।

আনিস স্যারের চোখে প্রতিটি শিশুই এক একটি আলোকবিন্দু। কেউ চোখে দেখে, কেউ হৃদয়ে দেখে। তার বিশ্বাস - প্রতিটি শিশু জন্মায় একটি সম্ভাবনা হয়ে। সেই সম্ভাবনাকে ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলতে দরকার যত্ন, সম্মান আর ভালোবাসা। তিনি বলেন - যে শিক্ষা ভালোবাসাহীন, তা যেন এক চারাগাছকে ছায়া, জল ও মাটি না দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা।

কিন্তু সমাজ কি সবাইকে সমান চোখে দেখে?

এই প্রশ্নটাই তাড়া করে আনিস স্যারকে, যখন তিনি দেখেন - হাসান নামের ছেলেটি সারাদিন এক কোণে বসে থাকে। চোখে আলো নেই, চোখে-মুখে স্পষ্ট এক ধরনের নিস্পৃহতা।

একদিন বর্ষার বেলায় ক্লাসে “বৃষ্টির শব্দ” নিয়ে আলোচনা চলছিল। সকলে কাগজে আঁকে বৃষ্টির ছবি। কেউ শব্দ লিখে, কেউ কবিতা। শুধু হাসান চুপ। স্যার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, - “তুমি কি বৃষ্টি ভালোবাসো?”

হাসান মৃদু হাসে। বলে, - “হাঁ, আমি বৃষ্টির শব্দের গন্ধ পাই।” এই এক বাক্যে যেন খুলে যায় আনিস স্যারের চিন্তার দিগন্ত।

তিনি গড়ে তোলেন “স্পর্শশালা” - একটি শিখনকেন্দ্র যেখানে চোখের বদলে ইন্দ্রিয় দিয়ে শেখা হয়;

- গন্ধ চিনে ফলের নাম,
- মাটির গায়ে ছুঁয়ে আকৃতি বোঝা,
- কণ্ঠ শুনে বন্ধুর নাম,
- ঢাকের তাল শুনে ছন্দ ধরার খেলা।

হাসান ধীরে ধীরে বিকশিত হয় - তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি, সুন্দর উচ্চারণ, গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতা। আর আনিস স্যার আয়োজিত করেন “অদৃশ্য শক্তির দিন” - যেদিন স্কুলের সব শিশু চোখে কাপড় বেঁধে হাসানের জগতে প্রবেশ করে। সেদিন শিশুরা বুঝতে শেখে - চোখ না থাকলেও আলো অনুভব করা যায়।

প্রধান শিক্ষক বলেন, “সব আলো দেখা যায় না... কিছু আলো কেবল হৃদয়ে জ্বলে।”

আনিস স্যার তখন আর শুধু শিক্ষক নন, হয়ে ওঠেন স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি হাসানকে যুক্ত করেন VIPS-DU (Visually Impaired People’s Society, DU)-এর সঙ্গে, দেখান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটাভিত্তিক উচ্চশিক্ষার পথ। তিনিই ব্যবস্থা করেন চট্টগ্রামের জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ইনস্টিটিউটে ভর্তির, যেখানে আছে,

- Braille বই ও পরীক্ষার ব্যবস্থা
- Screen reader (NVDA, JAWS)
- DAISY player, Talking calculator
- Audio বই, ই-বুক, আবাসন ও শিক্ষা ভাতা।

আনিস স্যার বলেন, “একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে যত্ন দেওয়া মানে সহানুভূতি নয়, এটা আমাদের ন্যায়বোধ, সমাজের অন্তর্ভুক্তি এবং মানবিক দায়িত্ব।”

হাসান ধীরে ধীরে এক অদৃশ্য আলো হয়ে উঠেছে। সে আলো চোখে দেখা যায় না, তবে সেটা এমন এক আলো, যা একজন শিক্ষক ছুঁয়ে দিতে পারে, একজন সমাজ আলোকিত পারে।

আমরা তখনই সভ্য সমাজ হয়ে উঠি, যখন আমরা সবচেয়ে দুর্বল শিশুটির হাতটা জোরে ধরে বলি - “তোমারও আলো আছে, আমরা তোমার সঙ্গে হাঁটব।”

ধনুক-ভাঙা পণ: ৩২

“ভাষার স্রোতে হৃদয়ের যাত্রা”

ফুলপুর, ময়মনসিংহ, দিগন্ত মুশতাক বাংলার শিক্ষক, কবি, ভাবুক “শিক্ষা যেন রূপ, গন্ধ ও ছন্দে হৃদয়ের সঙ্গে মিলেমিশে যায়।” ভাষার অন্বেষণে এক শিক্ষক।

ফুলপুর উপজেলার পাহাড়ঘেরা ধলারছড়া গ্রামের মাঝামাঝি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আর সেখানেই নিয়োজিত দিগন্ত মুশতাক - যিনি শুধু শিক্ষক নন, একজন ভাষা-ভাস্কর। শব্দ তার হাতে মাটির মতো; তিনি গড়েন, ছেনি কাটেন, ঘষেমেজে তোলেন আলো।

তিনি বিশ্বাস করেন, ভাষা শুধু যোগাযোগের বাহন নয়, এটি হলো অনুভবের আর্তনাদ, সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি এবং মানবিকতার অলিখিত অনুবাদ। “যা হৃদয় ছোঁয়, তা-ই থেকে যায়” - এমন নীতিতে বিশ্বাস রেখে দিগন্ত চান, তার ছাত্রছাত্রীরা ভাষার মধ্যে সৌন্দর্য, স্পর্শ ও সুর খুঁজে পাক।

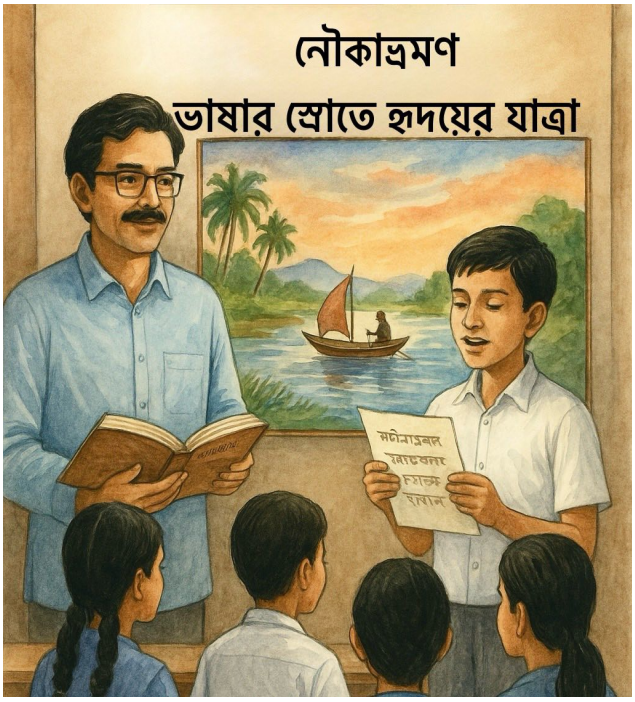

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা নয়, শিল্পচর্চা, নবম-দশম শ্রেণির “রচনা সম্ভার” বইটি দিগন্তর হাতে পড়ে যেন এক হতাশার ঢেউ তোলে, সাদামাটা, নীরস, প্রাণহীন। তিনি ভাবেন, এ বইয়ে নেই সেই উষ্ণতা যা কৈশোরের কল্পনাকে জাগিয়ে তোলে। অথচ এই বয়সেই তো শরৎচন্দ্রের ভাষা, বিভূতিভূষণের চিত্রকল্প, জীবনানন্দের নিঃশব্দতা হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

তাই তিনি পাঠ্যবইয়ের একটি রচনাকে পুনর্জন্ম দেন - “নৌকায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা”। তিনি বলেন, “লিখো, কিন্তু চোখ দিয়ে নয়, লিখো হৃদয়ের কালি দিয়ে।” ছাত্রদের বলেন, “শুধু দেখো না, অনুভব করো। শুধু বলো না, ছুঁয়ে বলো।”

ছাত্রের রচনা: নদীর বুকে এক কল্পলোকের দরজা -

নৌকাভ্রমণ

নদী বাংলা মায়ের চরণছোঁয়া আভরণ, আর নৌকা যেন তার প্রিয় অলঙ্কার। আমার প্রথম নৌকাভ্রমণ একটি নতুন জানালার মতো খুলে দিয়েছিল এক অপরূপ জগৎ - যেখানে আকাশ, পানি, হাওয়া ও গানের মাঝে সময় হারিয়ে যায়।

নৌকায় বসে মনে হয়েছিল, আমি যেন ভেসে যাচ্ছি শুধু পানির উপর নয়, সময়েরও উপর। ঢেউয়ের ছন্দে মনের ভিতর বেজে ওঠে ভাটিয়ালির করুণ রাগ “কে যাবি পাড়ে ওগো তোরা কে, আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে...”

চারদিকে সবুজ গাছ, দূরে তাল-নারকেলের ছায়া, গাঁয়ের মেয়েরা নদীর ধারে বসে কাপড় কাচছে, কোথাও বাচ্চারা ডুবসাঁতার দিচ্ছে। মনে হচ্ছিল, আমি কোনো গল্পের ভিতর ঢুকে গেছি, কোনো পুরনো দিনের চিত্রকল্প, যার প্রতিটি রেখায় লেখা আছে জীবনের কবিতা। নৌকার ভিতর শান্তি, বাইরে বাতাসে তাল পাতায় বাবুই পাখির বাসার দুলুনি। সময় যেন থেমে গেছে, কেবল থেকে যাচ্ছে অনুভব।

দিগন্তর উপলব্ধি: ভাষা যদি হৃদয়ের ঢেউ ছুঁতে পারে...

ছাত্রের রচনার শেষ পাতায় চোখ রাখতেই দিগন্তর মনে এক গভীর আরাধনার ঢেউ ওঠে, এই তো সে চেয়েছিল। একজন ছাত্র অনুভব করুক, ভাষা কেবল লিখবার নয়, এটি যাপন করার, ছুঁয়ে দেখার, আর সুরে গাওয়ার বস্তু।

তিনি বলেন, “নদীর মতোই ভাষাও চলমান, বহমান, গভীর, কখনো শান্ত, কখনো উথাল। আর শিক্ষকের কাজ হলো, ছাত্রের হাতে একখানি নৌকা তুলে দেওয়া যাতে সে নিজেই নিজেকে আবিষ্কার করে, ভেসে যায় নিজস্ব অনুভবের দিকে।”

দিগন্ত ভাবে “আমি আমার ছাত্রদের শুধু পড়াবো না, আমি তাদের স্পর্শ করবো - ভাষার, কল্পনার ও সৌন্দর্যের মাধ্যমে।”

ধনুক-ভাঙা পণ: ৩৩

“স্কুলের ভিতরেই স্কুল নয়”

সুনামগঞ্জের সীমান্তঘেঁষা পাহাড়ের কোলে চা-বাগানবেষ্টিত এক গ্রাম গাজীনগর। ইলিয়াস স্যার সদ্য বদলি হয়ে আসা এক স্বপ্নবাজ তরুণ শিক্ষক, মূল ভাবনা, “জীবনই শ্রেষ্ঠ পাঠ্য, আর শিশুর কৌতূহলই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ সহপাঠী”।

একটা ‘নেই’ দিয়ে শুরু; গাজীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামটা যেন গ্রাম্য নিস্তব্ধতার মাঝে এক ব্যতিক্রমী উচ্চারণ। একখন্ড টিনের চাল, কিছু পাকা দেয়াল, রুটিন ঝুলে থাকা ব্ল্যাকবোর্ড সবই আছে। শুধু নেই প্রাণের উত্তাপ, নেই চোখের দীপ্তি।

ইলিয়াস স্যার প্রথম যেদিন সেখানে পা রাখেন, মনে হয় যেন ঢুকে পড়েছেন এক বোবা ঘরে, যেখানে শিশুরা আসে ঠিকই, কিন্তু বইয়ের পাতায় তারা দেখে না কোনো গল্প, খুঁজে পায় না কোনো সম্পর্ক।

তিনি ভাবেন, “এই বিদ্যালয়টি যেন এক জানালাহীন ঘর, আলো আসার পথটাই বন্ধ।”

শিক্ষার দরজা খুলে দিল প্রকৃতি; একদিন হঠাৎ তিনি ঘোষণা দেন, “আজকের ক্লাস হবে খোলা মাঠে। বই নয়, আমাদের পাঠ্য হবে গাছ, পাতা আর শিশির।”

শুরু হয় এক অদ্ভুত পাঠপর্ব, গণিত শেখে চা-পাতা গোনার ছাঁকনায়, বিজ্ঞান শেখে পিঁপড়া ও পাতার ভাঁজে, ভাষা শেখে নিজের কণ্ঠে, নিজের কথায়, নিজের গল্পে, সংগীত শেখে ঝর্ণার শব্দে, বৃষ্টির টুপটাপে, বাগানের পাতায় পাখির ডাকে।

তিনি বলেন,

“জীবনই হলো পাঠ্যপুস্তক, আর প্রতিটি দিন এক একটি অধ্যায়। চোখ খোলো, কান খোলো, মন খোলো জ্ঞান এমনিতেই তোমার ভিতরে নেমে আসবে।”

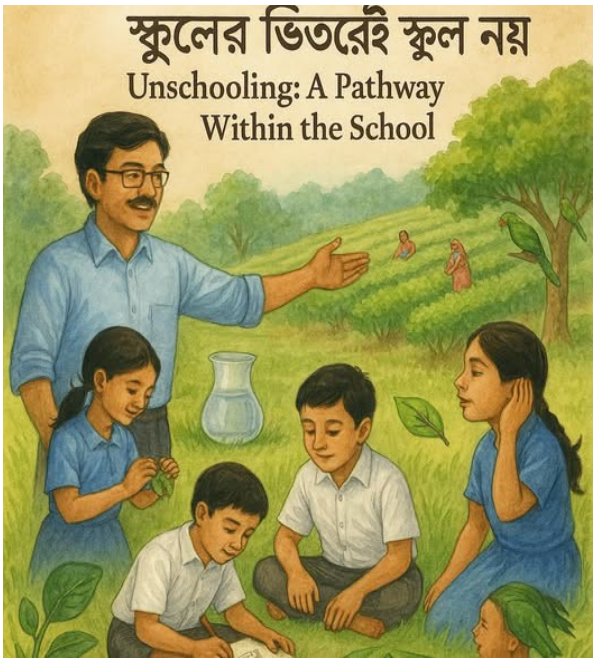

বইয়ের ভয় থেকে জীবনের গল্পে; একসময় যে ছাত্রছাত্রীদের মনে হতো, স্কুল মানেই শাসন আর ক্লান্তি, তারা এখন হাসিমুখে সকালে হাজির হয়। কেউ পাতা নিয়ে সংখ্যার খেলায় মেতে ওঠে, কেউ মাটির নিচের জীবজগৎ খোঁজে, কেউ খাতা না খুলে নদীর ধারে বসে কবিতা লেখে।

রুপালী এক চা-শ্রমিকের কন্যা, যে অভাবের তাড়নায় পড়া ছেড়ে দিয়েছিল, সে আবার ফিরে আসে ক্লাসে। কারণ এখানে আর বইয়ের ভয় নেই, আছে নিজের গল্প বলার স্বাধীনতা।

শিক্ষার পদ্ধতি নয়, দর্শন বদলায়; গ্রামের মানুষ প্রথমে চিন্তিত, “স্কুলে কি আর পড়ানো হয়?”

একদিন মাঠে হয় এক অনন্য প্রদর্শনী।

ছাত্রছাত্রীরা নিজের হাতে বানানো ছাতা দেখায়, নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করে, নিজের চাষ করা গাছের ফুল নিয়ে আসে।

চেয়ারম্যান অবাক হয়ে বলেন, “আজ আমি এক এমন বিদ্যালয় দেখলাম, যেখানে জ্ঞান শুধু পাঠ্যপুস্তকে আটকে নেই, বরং হাতের কাজ আর হৃদয়ের অনুভবে মিলেমিশে আছে।”

Unschooling বুনো নয়, বুননের প্রয়াস!

ইলিয়াস স্যার বলেন, “আমি unschooling করছি না, আমি সেই স্কুলকেই খুঁজে নিচ্ছি, যা শিশুদের অন্তরে জন্ম থেকেই থাকে। শিক্ষা যদি বেঁচে থাকার প্রয়োজনে না আসে, তবে তা কেবল শব্দের খেলা মাত্র।”

এই গল্প কোনো শৃঙ্খলা ভাঙার নয় - এটা শৃঙ্খলার ভেতরেই প্রাণের খোঁজ।

শিশুরা যেন ফুলের মতো, তাদের পানি দিতে হয়, আলো দিতে হয়, কিন্তু ছাঁটা বা বাঁধা নয়।

স্কুলের ভিতরেই হতে পারে এক মুক্ত পাঠশালা, যেখানে পাঠ্য পৃষ্ঠা নয়, শিশুর চোখের দীপ্তি দিয়ে মাপা হয় শিক্ষার সাফল্য।

“আমি আছি তোমার পাশে”

সিরাজগঞ্জ জেলার চরজানাজাত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শামীমা আক্তার এক নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষিকা। হাসান স্যার (সহকারী শিক্ষক), মালেকা আপা (সহকারী), প্রধান শিক্ষক মজিবুর রহমান। শিক্ষা শুধু পাঠ্য শেখানো নয়, একটি সম্পর্ক, একটি প্রত্যয়, এক ধরনের অদৃশ্য (championship) অগ্রাধিকার।

সিরাজগঞ্জের চরজানাজাত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম, আগ্রহও প্রায় নিঃশেষ। অনেকে তো শুধু দুপুরের খাবার আর সরকারি অনুদান পাবে ভেবেই আসে। স্কুলে শিক্ষকরা ক্লান্ত ও নিরুৎসাহিত। প্রধান শিক্ষক মজিবুর রহমান স্যারের মুখেও হতাশার ছাপ - “সরকারের শিক্ষক প্রশিক্ষণ গুলো তো শহরের স্কুল গুলোর জন্য, আমাদের বাস্তবতা আলাদা।” ওনি ঠিকই বলেন।

এই পরিবেশে সদ্য যোগ দিলেন শামীমা আপা, ঢাকায় প্রশিক্ষিত, বিশেষভাবে ‘Inclusive Classroom’ আর ‘Trauma-sensitive Teaching’ মডিউল ফলো করা একজন তরুণী। Inclusive Classroom হলো একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরী করে শিক্ষার্থীর মূল্যবান করা ও তাদেরকে সম্মানিত বোধ করানো। Trauma-sensitive Teaching হলো একটি নিরাপদ এবং যত্নশীল পরিবেশ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের স্ব-কার্যকারিতাকে উদশায়িত করা।

প্রথম দিন থেকেই তাঁর চোখে পড়ে, • ক্লাস থ্রির রবিন শুধু জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়, • রুমানা তার নামও ঠিকভাবে বলতে পারে না, • মুন্না সবকিছুতেই ভয় পায়, • আর নাজমা সবার চেয়ে চুপচাপ, তাকে সবাই বলে “মেঘবালিকা”।

শামীমা আপা শুরু করলেন এক ব্যতিক্রমী উপায়ে। তিনি সবাইকে নাম ধরে ডাকেন। সবার এক একটা “চ্যাম্পিয়ন (অগ্রাধিকার) কার্ড” বানান, • ছাত্রের নাম ও ছবি (ID কার্ড এর ছবির মতো ছবি না, সুন্দর নৈমিত্তিক ছবি)। • একটি ছোটো হৃদয়ের স্ট্যাম্প। • শিক্ষকের স্বাক্ষর ও তারিখ। • নিচে একটি বার্তা: “এই কার্ডটি তুমি যতবার দেখবে, মনে করবে, তুমি পারো!”

চ্যাম্পিয়ন (অগ্রাধিকার) কার্ড এর সঙ্গে আর একটা কার্ড যাতে লেখা আছে (মাসে এই কার্ড গুলো পরিবর্তন করা হয়);

• “তোমার কৌতূহলই তোমার শক্তি - জিজ্ঞেস করো, জানো, শেখো!” • “তুমি জানার পিপাসু, এই আলো তোমাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে।” • “প্রশ্ন করলে ভুল হতেই পারে, তবু প্রশ্ন করাই সাহস!” • “তোমার কল্পনা এই পৃথিবী বদলে দিতে পারে।” • “তুমি যেভাবে ভাবো, কেউ তেমন ভাবে না, তাই তুমি অনন্য।” • “তোমার আঁকা গল্প, তোমার চোখের স্বপ্ন এই ক্লাসের রঙ।” • “তোমার বন্ধুত্বে ক্লাস আরও সুন্দর হয়।” • “তুমি যখন কাউকে সাহায্য করো, তখন তুমি সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন।” • “তোমার ছোট কাজে বড় আনন্দ লুকিয়ে থাকে।” • “তুমি যেভাবে চেষ্টা করো, তাতে বড় জয় অপেক্ষা করছে।” • “চেষ্টা করলেই সাফল্য আসে, আর তুমি তো চেষ্টার অন্য নাম।” • “তুমি যদি নিজেকে বিশ্বাস করো, তুমি পারবে।“

শামীমা আপা বলেন, ”শিশুরা ভালোবাসা ও বিশ্বাস পেলে, তারাই নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে।”

প্রথম কয়েকদিনে বাকি শিক্ষকরা একটু অবাক হন, কেউ কেউ কটাক্ষও করেন, “এত আদিখ্যেতা চলবে না শামীমা আপা।”

কিন্তু ধীরে ধীরে হাসান স্যার ও মালেকা আপাও তাঁকে অনুসরণ করতে থাকেন। তাঁরা একটি মিনি প্রশিক্ষণ সেশন করেন নিজেরা, “সহানুভূতির শ্রেণীকক্ষ কীভাবে গড়ে তোলা যায়”।

একদিন ঘটলো বিস্ময়...

স্কুলের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবিন হঠাৎ মঞ্চে উঠে একটি কবিতা আবৃত্তি করে, কেউ বিশ্বাসই করতে পারছিল না, এই সেই রবিন! মেঘবালিকা নাজমা, যাকে কেউই চেনে না, সে নিজের আঁকা একটি পোস্টার দেয়ালে লাগায়, তাতে লেখা: “শিক্ষক যদি ভালোবাসেন, আমি নিজেকে খুঁজে পাই।”

রুমানা, যে নিজের নাম বলতে ভয় পেত, সে আজ চিঠি লেখে মালেকা আপাকে, “আপা, আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন, তাই আমি এখন ভয় পাই না।”

প্রধান শিক্ষকের ভাবনায় পরিবর্তন এলো,

মজিবুর স্যার একদিন ক্লাসরুমে এসে চুপ করে বসে থাকেন। তিনি শামীমা আপারকে বলেন - “আপা, আপনি আমাদেরও বদলে দিচ্ছেন। এই বদল যেন ”ধনুক ভাঙা পণ“ - সহজ নয়, কিন্তু এখন থামাও যাবে না।”

শিক্ষকদের প্রতিজ্ঞা, স্কুলে এখন একটি নতুন নিয়ম - প্রতিদিন একজন শিক্ষক অন্তত একজন ছাত্রকে “বিশ্বাস বাক্য” বলেন। “তুমি পারো। আমি আছি তোমার পাশে।”

অবহেলিত স্কুলে যেন প্রাণ ফিরে এলো। এটা এক শিক্ষিকার চ্যাম্পিয়ন হওয়া, এবং অন্যদের জাগিয়ে তোলা। শিক্ষা মানে শুধু পাঠ নয়, শিক্ষা মানে ‘আমি আছি তোমার পাশে’ বলার সাহস।

“ভিন্নতা মানে দুর্বলতা নয়”

গাইবান্ধার নিঃশব্দ এক গ্রাম, চরধারারচর। আবিরের স্নায়বিক দুর্বলতায় চলাফেরা ও কথাবার্তায় সমস্যা রয়েছে, কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় ও, রিফাতের Tourette Syndrome নামের এক বিশেষ স্নায়বিক বৈকল্য আছে। শমসের স্যার স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, উদ্ভাবনী মানসিকতা ও মানবিকতা তাঁর চালিকা শক্তি।

শমসের স্যার নতুন বদলি হয়ে এসেছেন ‘চরধারারচর’ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গ্রামের এক কোণায়, প্রাইমারি স্কুলের পাশ ঘেঁষে, জীর্ণ চালার নিচে এক চায়ের দোকান।না, দোকান বলা ভুল হবে। ওটা যেন এক নীরব দৃঢ়তার কুটির। একজন তরুণ - আবির - ঝিম ঝিম দুপুরে টগবগে গরম পানিতে চা ফুটিয়ে দেয়। তার হাঁটুর গাঁটগুলো যেন প্রতি পা ফেলার আগে একেকটা যুদ্ধ লড়ে। তবু প্রতি সকালেই সে দোকান খোলে, চা তৈরি করে, হাত কাপলেও গরম চায়ের কাপ গায়ে না পড়ে ঠিক পৌঁছে যায় ক্রেতার হাতে। তার কথার বদলে আসে একরকম অস্পষ্ট শব্দমালা। গ্রামবাসীরা কেউ তাকে “অক্ষম” ভাবেন, কেউ আবার করুণা করেন। কিন্তু সে করুণা চায় না, সাহায্য চায় না - চায় শুধু সুযোগ ও সম্মান।

শমসের স্যার স্কুলের মাঠ পেরিয়ে যাওয়ার সময় বারবার দাঁড়িয়ে পড়েন সেই ছোট্ট দোকানের পাশে। আবিরের চোখে চোখ রাখেন। প্রথমে জিজ্ঞেস করেন না কিছুই শুধু মানুষটাকে পড়েন এক একটি পৃষ্ঠার মতো। আবিরকে দেখে তাঁর মনে হয় এই ছেলেটা হেরে যায়নি, হাল ছাড়েনি।

একদিন স্কুলের এক ছাত্র আবিরকে দেখিয়ে বলে ওঠে, “স্যার, উনি তো ভালো করে হাঁটতেই পারেন না, তবুও কাজ করেন! আমি তো অল্প পড়েই ক্লান্ত...”। শমসের স্যারের মনে বিদ্যুৎ খেলে যায়। তিনি বুঝলেন শিক্ষা শুধু অঙ্ক কিংবা বানান নয়, শিক্ষা মানে জীবন থেকে শেখা। শমসের স্যার ঠিক করেন স্কুলে “সাহস উৎসব” করবেন। এই উৎসবে ছাত্ররা নিজেদের ছোট ছোট অর্জন জানাবে, কিন্তু প্রতিটি অর্জন হতে হবে নিজের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে যাওয়ার গল্প। এখানে থাকবে বিশেষ অতিথি - আবির।

শুরু হয় প্রস্তুতি। আবির প্রথমে নারাজ, সে তো বক্তৃতা দিতে পারে না। কিন্তু শমসের স্যার তাকে বোঝান, “তোমার প্রতিটি চা-কাপই একেকটা ভাষণ। তুমি শুধু দাঁড়াও, আমি বাকিটা বুঝিয়ে বলব।”

সেদিন স্কুলের মাঠে মাইক হাতে শমসের স্যার যখন আবিরের কথা বললেন, বললেন, “মনের ও শরীরের সাহস একসূত্রে গাঁথা”, “তোমরা দেখছো কাপ কাঁপছে, আমি দেখছি একটা মন নিজেকে জিতিয়ে নিয়ে এগিয়ে আসছে।” ছাত্ররা চোখের পানি ধরে রাখতে পারছিলো না। “তোমরা বলো, কে সবচেয়ে শক্তিমান? যে পড়া মুখস্থ করে শত নম্বর পেল, না যে চলতে না পারলেও থামে না? ওর মনের ভিতর যে সাহস আছে, সেটাই ওর শরীরকে চালায়। আবির দেখিয়েছে মন জাগলে শরীরও সাহসী হয়ে ওঠে।” আবির কোন কথা বলেনি - শুধু চা তৈরি করে শিক্ষকদের সামনে দাঁড়ায়। গরম ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সাহস। ছাত্ররা জানলো “কাজ মানে আত্মমর্যাদা।” এবং ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একটা ছোট অনুদান দিয়ে আবিরের দোকানে ছাউনি তৈরি হয়। আবিরের দোকানে শুধু চা নয়, বিক্রি হয় প্রেরণাও। সীমাবদ্ধতা নয়, সাহসই যদি শিক্ষা হয় - তাহলে প্রতিটি স্কুলেই জন্মাবে একেকজন ‘আবির’।

সাহস উৎসবের পরদিন, ক্লাসে হঠাৎ করেই তৃতীয় শ্রেণির এক ছেলের বিষয়ে শিক্ষকরা আলোচনা করতে থাকেন - নাম তার রিফাত।

ক্লাস চলাকালীন সময়ে হঠাৎ হঠাৎ জোরে চিৎকার করে ওঠে, কখনো হাত নেড়ে দেয়ালে চাপড়ায়। সহপাঠীরা হাসাহাসি করে, কেউ কেউ ভয়ও পায়। প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত বলেছিলেন, “এভাবে চললে তো অন্যরা পড়তেই পারবে না।” শমসের স্যার চুপচাপ রিফাতকে একদিন ছায়াতলায় নিয়ে বসেন। জানেন, ওর এই আচরণ ইচ্ছাকৃত নয় - Tourette Syndrome নামের এক বিশেষ স্নায়বিক বৈকল্য। তিনি দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরে কথা বলেন রিফাতের সঙ্গে, ওর পরিবারের সঙ্গে, আর শেষে স্কুলে আয়োজন করেন একটি ছোট্ট সেশন, নাম দেন “ভিন্নতা মানে দুর্বলতা নয়”।

সেই সেশনে আবিরও ছিল অতিথি। আর ছিল রিফাত, যাকে প্রথমবারের মতো সবাই দেখল সাহসী হিসেবে।

শমসের স্যার বললেন, “তোমরা কি জানো? কখনো কখনো মস্তিষ্ক এমন কিছু করে বসে যা আমাদের ইচ্ছার বাইরে। যেমন, কেউ চোখ টিপে

ফেলে বারবার, কেউ চিৎকার করে। এগুলো রোগ নয়, লজ্জার কিছু নয়, এটা একধরনের অদৃশ্য যুদ্ধ। রিফাত সেই যুদ্ধের সৈনিক। আবিরের যেমন শরীর কথা কম শোনে, তেমনি রিফাতের মন মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু সে পড়তেও চায়, শিখতেও চায়। আমরা কি ওকে সেই সুযোগ দেব না? একবার যখন তুমি বুঝতে পারো যে কারো Tourette Syndrome আছে এবং সে কিছু কিছু সময় তার মনের ও শরীরের সংহতি কাটিয়ে উঠতে পারছে না, তখন তোমার ক্ষোভ দূর হয়ে যায়। তুমি তোমার সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারো, তুমি তাদের প্রতি তোমার অনুভূতি জাগাও। তুমি তাদের আলিঙ্গন করো।“ ছাত্ররা চুপ হয়ে যায়। হঠাৎ পেছন থেকে এক ছাত্র বলে ওঠে - “স্যার, আমি ওর পাশে বসবো। ও চাইলে আমার বইটা ওর সঙ্গেও ভাগ করে নেব।”

আবির আমাদের শিখিয়েছে শরীর দুর্বল হলেও মন জাগ্রত থাকলে সব সম্ভব। আর রিফাত আমাদের শেখাল, ভিন্নতা বোঝার জন্য দরকার হৃদয়ের কান খুলে দেওয়া।

শিক্ষা শুধু পাঠ নয়, একটি মন বোঝা, একটি হাত বাড়িয়ে দেওয়া, একটি ভয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সাহসী হয়ে ওঠা। শিক্ষা শুধু বই পড়া নয় - শিক্ষা মানে কারও কান্নার ভাষা বুঝে হাত বাড়িয়ে দেওয়া, শিক্ষা মানে অন্যের মনকে বুঝে নিজের মন একটু একটু করে বড় করে তোলা। সবচেয়ে বড় শক্তি জ্ঞানে নয়, ভালোবাসায়।

ধনুক-ভাঙা পণ: ৩৬

ধনুক-ভাঙা পণ: ৩৬

“আলো এসেছে ওদের স্কুলেও”

কুড়িগ্রামের চরের স্কুল ‘আলোর পাঠশালা’, একজন শিক্ষকের দূরদৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মিলনে কীভাবে বদলে যেতে পারে একটি অন্ধকার বিদ্যালয়, সহযোগী প্রতিষ্ঠান UNICEF বাংলাদেশ।

চরচিলমারীর দূরের এক চরের নাম বুড়ির চর। বর্ষায় যেখানে নৌকা ছাড়া যাওয়া যায় না, আর শুষ্ক মৌসুমে হাঁটতে হয় মাইলের পর মাইল চরের বালুতে। এই চরেই দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় - “আলোর পাঠশালা”।

স্কুলটির প্রধান শিক্ষক রাশেদা আপা - এই নামটি এখন বুড়ির চরজুড়ে সম্মান, ভালোবাসা আর আশার প্রতিচ্ছবি। তিনি শুধু একজন শিক্ষিকা নন - তিনি এই চরের জন্য একজন সমাজকর্মী, এক নির্মাতা, এক স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি জানেন, এখানে শিক্ষকতার মানে শুধু বই পড়ানো নয় - এর মানে হলো শিশুদের উৎফুল্ল রাখা, স্বপ্ন দেখানো, আর সমাজকে একটু একটু করে বদলে দেওয়া।

রাশেদা আপার জীবন শুরু হয়েছিল অনেকটা এখানকার শিশুদের মতোই - নৌকায় চরে যেতে হতো স্কুলে, বই ছিল না, জুতো ছিল না, কিন্তু ছিল অদম্য ইচ্ছা। কলেজে ওঠার পর শহরে গিয়েছিলেন, ভালো ডিগ্রী করেছেন চাকরিও পেতেন অন্যত্র, কিন্তু ফিরেছিলেন নিজের গ্রামে। বলেছিলেন, “আমার জায়গা যেখানে শিশুরা স্কুলে আসতে ভয় পায়, সেখানে না ফিরলে আমার পড়ালেখার মানে কী?”

স্কুলে প্রথম এসে দেখলেন - স্কুলের ছাত্র উপস্থিতি শতকরা ৩০ শতাংশ, বর্ষায় ক্লাস হয় না, আর অভিভাবকরাও মনে করেন স্কুল মানে একটা আনুষ্ঠানিকতা, শেখা নয়।

রাশেদা আপা শুরু করলেন ঘরে ঘরে যাওয়া। মা-বাবাদের সঙ্গে বসে গল্প করলেন, তাদের ভয় দূর করলেন। মেয়েরা যাতে স্কুলে আসে, তাই নিজের বেতনের একটা অংশ থেকে কয়েকজন মেয়েকে দিলেন খাতা-পেন্সিল।

একদিন রাশেদা আপা একটি প্রশিক্ষণে গিয়েছিলেন জেলা সদরে। সেখানে তিনি জানলেন, UNICEF এর মাধ্যমে সরকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলে সহায়তা দিচ্ছে - বিশেষ করে শিশু বান্ধব পরিবেশ গঠনের জন্য। আপা ভাবেন “আমার স্কুলটা ছোট, কিন্তু এর ভবিষ্যৎ বড় হতে পারে যদি কেউ পাশে দাঁড়ায়।”

একদিন এক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে রাশেদা আপাকে প্রশ্ন করা হলো, “Do you believe education is a local duty or a global responsibility?” তিনি নিজের ভাঙা ইংরেজিতে বলেছিলেন - “We are the garden, but sometimes we need sunlight from outside.” এই কথাই হৃদয় ছুঁয়ে যায় UNICEF বাংলাদেশের প্রতিনিধি মিস ক্লারা’র। ফিরে গিয়ে তিনি বলেন - “These teachers don’t ask for charity, they ask for dignity. Let’s walk with them.”

রাশেদা আপাকে UNICEF এর তরফ থেকে চিঠি দিয়ে “Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSSPB) প্রকল্পে আবেদন করতে উদশায়িত করা হলো। আপার স্কুল সম্পর্কে একটা অন্তর দৃষ্টি আছে, ওনি চান স্কুলটিকে ছাত্র বান্ধব করে গড়ে তুলতে। অনেক পড়াশোনা ও চিন্তা করে আপা সুদূর প্রশারি ও বাস্তব একটি আবেদন করলেন, যা ইউনিসেফের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ও বাংলাদেশের ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে বাংলাদেশে শিশু অধিকার বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়নের কথা বলা আছে, সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে কীভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সংযোগ ঘটানো যায় উল্লেখ আছে। আপার গুছানো এই প্রকল্পের আবেদনটি অনুমোদন পায় আর কয়েক মাস পরে বিস্ময়কর পরিবর্তন শুরু হলো।

- UNICEF-এর সহায়তায় স্কুলে বানানো হলো দুটি নতুন আধুনিক টয়লেট - একটি মেয়ে শিশুদের জন্য, একটি ছেলেদের জন্য।
- বিশুদ্ধ পানির জন্য বসানো হলো টিউবওয়েল।
- সৌরশক্তির প্যানেন বসানো হলো, বসানো হলো অগভীর নলকূপ।
- প্রতিটি ক্লাসরুমে দেওয়া হলো বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড, চার্ট, পোস্টার, এবং একটি করে ছোট পাঠাগার। সঙ্গে ফ্যান ও লাইট।
- শিশুবান্ধব পদ্ধতিতে শেখানোর জন্য রাশেদা আপাসহ আরও দুইজন শিক্ষককে দেওয়া হলো প্রশিক্ষণ।
- কিছু খেলাধুলার সামগ্রী। এবং পরিকল্পিত ঘাসের মাঠ।
- স্কুল ঘিরে ঢোলকলমি গাছের সঙ্গে বাঁশের বেড়া দেওয়া হলো।
- ছোট একটা science lab ও কিছু যন্ত্রপাতি।

দূর থেকে স্কুলকে মনে হতো একটা সবুজ দীপ, পাখিদের আনাগোনা এর ঢোলকলমির হালকা বেগুনি ফুল গুলো এক অপরূপ সুন্দর্য্য দিলো স্কুলকে । একদিন UNICEF-এর লোকেরা এসে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে খেলাও করল। দেয়ালে আঁকা হলো রঙিন ছবি - রোদ, ফুল, পাখি আর বই হাতে একদল স্বপ্নবাজ শিশুদের দেখে ওনার মুগ্ধ।

কিন্তু রাশেদা আপার সবচেয়ে বড় কাজ ছিল, শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করে শেখালেন, শ্রেণিকক্ষ কেবল পাঠদানের নয়, বরং শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রও। তিনি বলতেন - “আমরা যদি নিজেকে শুধুই শিক্ষক না ভেবে একজন নির্মাতা ভাবি, তাহলে প্রতিটি ক্লাস থেকে উঠে আসবে সম্পূর্ণ মানুষ।”

এই গল্পের মধ্যমণি ছাত্র তুহিন। সে আগে প্রায়ই স্কুল ছেড়ে দিত, কিন্তু এখন সে স্কুলে আসে, বই পড়ে বন্ধুদের সঙ্গে। তার চোখে এসেছে আত্মবিশ্বাস, কারণ সে জানে, এখানে তার কথা শোনা হয়, তার আঁকা ছবি দেয়ালে টাঙানো হয়।

রাশেদা আপার ভাবনায়, একটা সহায়তা যদি ঠিক জায়গায় পড়ে, তা শুধু দেয়াল নয়, ভেঙে দিতে পারে চরের দূরত্ব, অভাবের ক্লান্তি, আর তৈরি করতে পারে আগামী দিনের সম্ভাবনার বীজ।

ধনুক-ভাঙা পণ: ৩৭

“আমাদের গ্রন্থাগার, আমাদের পাঠশালা”

মেহেরপুরের খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পারভেজ স্যার - একজন তরুণ শিক্ষক, যার কাছে স্কুল মানেই বই নয়, জীবনের অভিজ্ঞতাকে ছুঁয়ে শেখা, তাঁর ভাবনায়, If you have a garden and a library, you have everything you need. - Marcus Tullius Cicero (106 BC–43 BC). ছাত্রদের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি গ্রন্থাগার, যা শুধু বই নয়, এক একটি জীবন্ত অভিজ্ঞতার জগৎ - তাদের কল্পনা, সিদ্ধান্ত, এবং পাঠ্যক্রমে যুক্ত এক নতুন শিক্ষাবিশ্ব।

কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার ছোট্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পারভেজ স্যার যোগ দিলেন। তিনি “শিক্ষাই শক্তি” প্রকল্পের অধীনে এক বছরের খন্ডিকালীন নিয়োগে এসেছেন, এই এক বছর স্কুল ও বাংলাদেশের শিক্ষা কার্যক্রমে তাঁর অবদান তাঁকে BCS পরীক্ষাতে অংশগ্রহনের জন্য উপযোগী করবে। এই নিয়োগ “বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন” এর পরীক্ষায় বসবার জন্য অবশ্যকীয়। সদ্য বিশ্ববিদালয় থেকে বের হওয়া তরুণ প্রজন্মকে দেশের প্রতি আগ্রহ ও তাঁদের অবদান প্রয়জোন। এমনি একটা প্রকল্প দিয়েই আমাদের মানুষ গড়ার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলো তে “ধনুক-ভাঙা পণ” নিয়ে কাজ করতে হবে। পারভেজ স্যার এই অসম্ভববের আর একজন সম্ভাবনা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমগুলি প্রায়শই নিম্নমানের, শিক্ষাদান, অতিরিক্ত জনাকীর্ণ শ্রেণীকক্ষ এবং ব্যবহারিক দক্ষতার উপর মনোযোগের অভাব - সব মিলে একটা কঠিন অবস্থায় খোকসা উপজেলার ছোট্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদালয়ে চার বছর পড়ে আশা পারভেজ স্যার, শক্তি, সাহস ও চিন্তায় যৌবন তাঁর। তাঁর চোখে এক স্বপ্ন: “শিক্ষা যদি আনন্দের সঙ্গে না মেশে, তবে তা শিশুর আত্মায় পৌঁছায় না।”

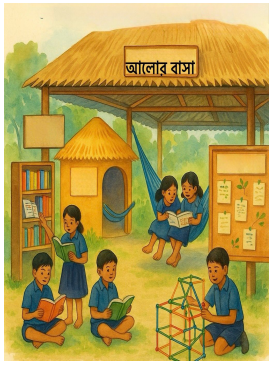

শ্রেণীকক্ষের একগুঁয়ে পরিবেশ থেকে ছাত্রদেরকে বেরকরে সক্রিয় করতে হবে, তিনি শুরু করলেন “শিশুদের নিজস্ব গ্রন্থাগার” তৈরির কাজ। পারভেজ স্যার ভাবলেন প্রথম থেকেই ছাত্রদের এই গ্রন্থাগারের সাথে সংযুক্ত রাখতে হবে। তা হলেই গ্রন্থাগারের নামফলক তৈরি এবং উদ্বোধন অনুষ্ঠান টা স্মৃতি, মালিকানা এবং ছাত্রদের নেতৃত্বের প্রকাশ পাবে যা ছাত্রদের পরিকল্পনায়, ছাত্রদের পরিশ্রমে। কিন্তু পারভেজ স্যার বললেন, “নাম তো দিতে হবে! এমন নাম, যেটা শুনলেই বোঝা যাবে এটা কাদের ঘর।”

প্রস্তাব আসতে থাকল: রাবেয়া বলল, “আলোর বাসা” - যেখানে আলো থাকে, রিফাত বলল, “শব্দবাগান” - শব্দেরা যেখানে ফুল ফোটায়, হানিফ বলল, “স্বপ্নঘর” - বই পড়ে স্বপ্ন দেখার জায়গা, সুমাইয়া বলল, “বইয়ের দোলনা” - কারণ আমরা তো দুলে দুলে পড়ি।

সবাই মিলে ভোট দিল। ফলাফল: নতুন লাইব্রেরির নাম হলো - “আলোর বাসা”।

পরের শনিবার স্কুলে “নামফলক তৈরি উৎসব” হলো। পুরানো কাঠের বোর্ডে সাদা রং করা হলো। রঙতুলি হাতে করে ছাত্রছাত্রীরা “আলোর বাসা” নামটা আঁকলো রঙিন ক্যালিগ্রাফিতে। উদ্বোধনের দিন পুরো স্কুল যেন উৎসবে মেতে উঠল। প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রামের বৃদ্ধ একজন লোক শহীদ আলী দাদু, উদ্বোধনী ফিতে কেটে শহীদ দাদু বললেন, “তোমরা আলোর সন্ধান করো, আমার চোখে সেই আলো আজ ফুটেছে।” সেই মুহূর্তে, “আলোর বাসা” হয়ে উঠল কেবল একটি ঘর নয়, একটি প্রতিশ্রুতি।

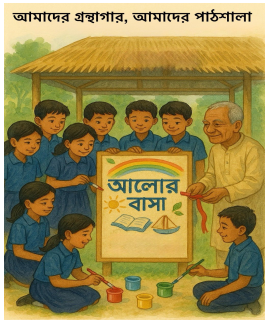

সবাই মুগ্ধ। কেউ ভাবেনি - একটা লাইব্রেরির নামফলক বানানো থেকেও নেতৃত্ব, কল্পনা, সংস্কৃতি আর গর্ব এভাবে জন্ম নিতে পারে।

লাইব্রেরি মানে একটি জীবন্ত ঘর, বাঁশ আর বেতের দোলনা, যেখানে বসে বই পড়া যাবে, টিনের চাল নয়, প্লাস্টিক শিটে খোলা ছাউনি বৃষ্টি হলেও আলো আসে, বাতাস আসে। লাইব্রেরির ভেতর এক কোণায় “স্বপ্নের দোলনা”, যেখানে দুলতে দুলতে শিশুরা বই পড়ে বা নিজের গল্প লেখে। মাটির টবে গাছ, দেয়ালে নিজেদের আঁকা চরিত্র আর কবিতা।

পারভেজ স্যার ছাত্রদের নিয়ে একটি বিশেষ কাজ করলেন - পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি অধ্যায় ভেঙে তারা নিজেরা বানাল “লাইব্রেরি সিলেবাস”। যেমন:-

- “নদী” অধ্যায় পড়লে লাইব্রেরিতে থাকবে “পদ্মা”, “বিষণ্ন নৌকা”, “নদী ও জনপদ” বই।
- “পরিবেশ” অধ্যায়ে থাকবে গাছপালা, বৃষ্টি, পাহাড়ের গল্প।
- “গণিত” এর জন্য থাকবে “ছড়ায় ছড়ায় গাণিতিক খেলা” বই।

এবং প্রতি ক্লাসে থাকবে ১৫ মিনিটের “লাইব্রেরি সংযোগ সময়” পাঠ্যক্রমভিত্তিক - যেখানে মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে গল্প/ছড়া/চিত্র বই পড়া হবে।একজন ছাত্র লাইব্রেরিয়ান, সপ্তাহে রোস্টার অনুযায়ী দায়িত্ব বদলায়।

- ছাত্রদের “বই নির্বাচনী কমিটি” ঠিক করে কোন বই থাকবে, কোনটা বাদ যাবে।
- “ঘরে পড়ো, দুলে পড়ো” নামে শুরু হলো বইঘর নিয়ে বাড়িতে যাওয়া, দোলনায় বসে পড়া। “শব্দজয়” - প্রতিদিন এক নতুন শব্দ ও তার ব্যবহার সবাই শিখে দেয়ালে লিখে রাখে।

“বইবান্ধবতা সপ্তাহ” - যেখানে পিতামাতাদেরও আমন্ত্রণ জানিয়ে শিশুদের প্রিয় বই তারা পড়ে শোনায়।

পারভেজ স্যার বলেন, “আমরা শুধু বই পড়াতে চাই না, আমরা চাই তারা বইয়ের সঙ্গে বাঁচুক। কারণ যারা কল্পনা করতে শেখে, তারাই একদিন পৃথিবী বদলায়।”

ধনুক-ভাঙা পণ - ৩৮

“বইয়ের পাশে সাথী হোক সরঞ্জাম”

(শুধু বই নয়, চাই কালি-কলম, সাদা পাতার স্বপ্ন, তবেই শিক্ষা পূর্ণতা পায়)

সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরের চরজগন্নাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শামীম স্যার এক স্বপ্নদ্রষ্টা তরুণ শিক্ষক, যিনি মনে করেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো আত্মসম্মানের বিচ বপন করা। সরকার বিনামূল্যে বই দেয়, কিন্তু বই কাজে লাগাতে হলে লাগে খাতা, পেনসিল, রং ও মন, কেননা “Writing is drawing, drawing is writing”, লেখার পিছনে চিন্তা থাকে, আর ছবি দাগানোর পিছনে থাকে মনের লেখা।

তখন শীতের সকাল, চরজগন্নাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকালবেলার কুয়াশা এখনো ঘাসের মাথায়। পাখির ডাক আর ছেলেমেয়েদের হাসির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে পাতার মর্মর ধ্বনি। শামীম স্যার ঠিক তখনি এলেন বিদ্যালয়ে, আজ ১ জানুয়ারি “বই উৎসব”। একটা ব্যাস্ততা শিক্ষকদের মধ্যে, বই এসেছে নতুন বছরের, রঙিন ছাপা, কাগজের গন্ধ ও অনেক বই সব শ্রেণীর। বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি (Class I–X) পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক (Textbooks) সরবরাহ করে থাকে। এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা উপকরণ বিতরণ কর্মসূচির একটি গর্বিত উদাহরণ। বই বিতরণ অনুষ্টান হলো সবাই বেশ খুশি। কিন্তু শামীম স্যার লক্ষ করেন - ছাত্রদের বই এর সঙ্গে সম্পর্কটা শুধুই পড়ার, লেখার নয়। কেউ বইয়ের পাতার পাশে আঙুল রেখে পড়ছে, কিন্তু পাশে লেখার কিছু নেই। সরকার থেকে বই দেবার উদ্দেশ্য হলো, “Education for All” লক্ষ্য অর্জন, স্কুলের ছাত্র ঝরে পড়া রোধ এবং সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য কমিয়ে শিক্ষায় সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। যদিও বই বিনামূল্যে দেওয়া হয়, কিন্তু যেসব উপকরণ দরকার বইকে কাজে লাগানোর জন্য, তা পাওয়া যায় না। যেমন, খাতা, পেনসিল, রাবার, রং, স্কেল, চার্ট, ছবি, শিখন খেলনা।

শামীম স্যার ভাবেন, ছাত্রদের হাতে শুধু বই থাকলে তারা শুধু পাঠ্যবই মুখস্থ করবে, শেখার অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীলতা গড়ে উঠবে না। বইয়ের পাশে সাথী হোতে হবে সরঞ্জামকে, এই খাতা, পেন্সিল গুলোই হলো শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ ও চিন্তায় আক্ষরিক উপস্থাপনা। শামীম স্যার মনে করেন, আমরা যদি চাই এই বইগুলো সত্যিকারের কাজে লাগুক, তাহলে আমাদের: খাতা ও লেখার উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে, এবং বইয়ের বিষয়বস্তু অনুযায়ী আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম দিতে হবে।

তিনি ভাবেন, স্কুলের সবার জন্য একই রকমের পেন্সিল বক্স বানালে কেমন হয়। পাশের গ্রামে শীতল পাটি তৈরী করে, শামীম স্যার ওনাদের সাথে দেখা করলেন, বুঝিয়ে বললেন পেন্সিল, কলম রাখবার জন্য দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট পেন্সিল বক্স। ওনাদের বুননের অভিজ্ঞতা ও শামীম স্যারের পরিকল্পনায় সুন্দর একটা পেন্সিল বক্স স্কুলের ২৩০ ছাত্র/ছাত্রীদের কে দেয়া হলো। প্রতিটি পেন্সিল বক্সেই ছিল আলাদা নকশা - একটা আরেকটার মতো নয়, ঠিক যেমন প্রতিটি শিশুই অনন্য। সবার এতো পছন্দ হয়েছে যে, বাংলাদেশের হস্তশিল্পের বড় দোকান আড়ং ও চড়া দামে বিক্রি করলো চরজগন্নাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নিয়ে। আনন্দের কথা হলো, স্কুলের ছাত্ররা পেন্সিল বক্স এর সংগে এক সেটা রংপেন্সিল, একটা কলম ও রাবার বিনা মূল্যে পেলো, আড়ং এর সঙ্গে এমনি একটা চুক্তি করেছিলেন শামীম স্যার।

বক্স ও পেন্সিল তো হলো এবার চাই সাদা কাগজ। সাদা কাগজ চাই ও চাই, কেননা, সাদা ধবধবে পাতার একটা আলাদা আবেদন আছে। সেটা শুধু লেখার উপযোগী নয়, বরং শিশুর মনে পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্যবোধ, ও নতুন শুরুর এক রোমাঞ্চ জাগায়। সাদা কাগজে আলো প্রতিফলনের কারণে লেখা স্পষ্ট হয়, শিশুদের চোখে পড়ে সহজে, শেখায় মনোযোগি থাকে, আঁকাআঁকি বা রঙের কাজে রঙগুলো প্রাণবন্ত লাগে, একটা “তাজা শুরু” বা “নতুন পাতা”-র অনুভূতি দেয়, পরিচ্ছন্নতার মানসিকতাও গড়ে তোলে।

শামীম স্যার ছাত্রদের উদ্ভাবনী ও সম্মানজনক উপায়ে শিক্ষাসামগ্রী নিশ্চিত করার কয়েকটি পথ বের করলেন। ১. শ্রম বিনিময়ে সম্মানসূচক সরবরাহ: “কাজ করো, খাতা নাও” - ছোট ছোট কাজ (স্কুল পরিষ্কার, দেয়ালচিত্র আঁকা, গাছ লাগানো) করলে প্রতিদানে খাতা, পেনসিল দেওয়া হয়। ছাত্ররা বুঝবে - “এই খাতা দান নয়, এটা তাদের অর্জন।” ২. Local Currency Token System (“শিক্ষা টোকেন”) - ভালো ব্যবহার, ক্লাসে অংশগ্রহণ, সময়মতো হাজিরা, সহপাঠীকে সাহায্য করলে তারা “শিক্ষা টোকেন” পাবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক টোকেন জমলে তারা খাতা, রঙ, বা অন্য সরঞ্জাম কিনতে পারে স্কুলের নিজস্ব “শিক্ষা হাট” থেকে। ৩. Recycling for Learning - পুরানো কাগজ, খালি বোতল, চালের বস্তা এইসব পুনর্ব্যবহারযোগ্য জিনিস আনলে, শিশুরা বিনিময়ে পাবে খাতা, রং-পেন্সিল। ৪. অভিভাবক - অভিভাবক যদি তার সন্তানের জন্য স্কুলে সরবরাহ করেন প্রয়োজনীয় উপকরণ। ৫. সহযোগিতায় তৈরি - শিক্ষার্থীরাই নিজের খাতা তৈরি করে (পুরনো কাগজ, কাপড় দিয়ে কভার)। শিক্ষক শিখিয়ে দেন কিভাবে তৈরি করতে হবে, এতে তৈরি হয় ownership & craftsmanship.

“বইয়ের পাশে সাথী হোক সরঞ্জাম”, বই বিনামূল্যে এবং এককালীন, কিন্তু পেন্সিল, কালি কলম, রং ও কাগজের দরকার অফুরন্ত (যেন ছাত্রদের ভাবতে না হয়, মনের আনন্দে ব্যবহার করতে পারে)। চরজগন্নাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শামীম স্যারের এই আয়োজন সরকারের দেওয়া বই এর সঙ্গে মিলে মিশে সৃজনশীল শিক্ষার পরিবেশ উপস্থাপন করেছে। যেখানে অভাব আছে, সেখানেই উদ্ভাবন জন্ম নেয়। আর যেখানে সম্মান আছে, সেখানেই শিক্ষা সত্যিকারের রূপ পায়। শিক্ষার পথকে যদি আমরা সম্মান, অংশগ্রহণ এবং উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত করি, তবে প্রতিটি বই হয়ে উঠতে পারে সম্ভাবনার দরজা, আর প্রতিটি ছাত্র হয়ে উঠতে পারে নিজের ভাগ্য নির্মাতা।

“শেখা শেখার জন্য (Learn to Learn)”

বানিয়াবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জামালপুর জেলার পাহাড়ঘেরা এক গ্রামীণ অঁচল। তানভীর স্যার বিজ্ঞানমনস্ক তরুণ শিক্ষক, যার বিশ্বাস, শিক্ষা মানে কেবল তথ্য দেওয়া নয়, শেখার কৌশল শেখানো। একবিংশ শতাব্দীর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে হলে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন “Learn to Learn” দক্ষতা, যেখানে মুখস্থ বিদ্যা নয়, গুরুত্ব পাবে প্রশ্ন তোলা, অনুসন্ধান, ও নিজের মত করে পথ খোঁজার ক্ষমতা।

হালকা কুয়াশার এক শীতের সকাল। সূর্যের সোনালি আলো তখনো ঠিকমতো নামেনি পাহাড় ছুঁয়ে; ছায়া-আলোয় মিশে আছে গ্রামের স্কুলের উঠোন। বানিয়াবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দায় একজন তরুণ শিক্ষক রঙিন কাগজ আর কয়েকটি বই নিয়ে বসে আছেন সদ্য বদলি হয়ে আসা তানভীর স্যার। শহরের এক স্কুলে STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) কোর্স করানো এই শিক্ষক এখন পাহাড়ের কোলে নতুন কিছু গড়ার স্বপ্ন দেখেন।

তাঁর চোখে শিক্ষা মানে শুধুই বিষয় শেখানো নয়, বরং শেখার কৌশল শেখানো। তিনি বলেন, “যদি কোনো ছাত্রের মধ্যে জানার কৌতূহল জাগানো যায়, তবে সে জীবনভর শিখে যাবে। আর এটাই শিক্ষার চূড়ান্ত সাফল্য।”

বিদ্যালয়ের পুরনো পাঠ্যবইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে স্যারের কপালে ভাঁজ পড়ে “‘ফসিল কী?’ বা ‘নদী কীভাবে গঠিত হয়?’ এইসব উত্তর মুখস্থ করিয়ে কী হবে, যদি তারা নিজেরা জানতে না শেখে?”

তাই তিনি বললেন, “আমরা বিষয় নয়, শেখাবো কীভাবে জানতে হয়। গুগল বা ChatGPT দিয়ে খোঁজা নয়, তথ্য যাচাই করতে শিখাতে হবে। মুখস্থ না, চাই সমস্যার সমাধান।”

কারণ একবিংশ শতাব্দীর চাকরির বাজার বদলে যাচ্ছে প্রতিদিন। আজকের শিশু কী ধরনের কাজের মুখোমুখি হবে দশ বছর পর, কেউই জানে না। তাই চাই “শেখা শেখার দক্ষতা।”

“শেখা শেখার জন্য - ল্যাব”

তানভীর স্যার স্কুলের একটি পুরনো, পরিত্যক্ত ঘরকে রূপ দিলেন এক বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রে “শেখা শেখার জন্য ল্যাব”। এখানে পাঠ্যবইয়ের বদলে থাকবে বাস্তব সমস্যা, এবং শিক্ষক হবে কৌতূহলের সহযাত্রী।

তিনি বলেন, “যদি শিশু নিজেই প্রশ্ন তুলতে শেখে, তবে সে নিজের পথ নিজেই খুঁজে নেবে। এটাই ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি।”

তবে শেখার জন্য চাই একটি প্রস্তুত মন। আর সেই প্রস্তুতি আসে কেবল তখনই, যখন শরীর ও মন দুটোই সমানভাবে সুস্থ ও সক্রিয়।

শেখা আসলে কেবল মস্তিষ্কের নয়, হৃদয়েরও ব্যাপার। ক্লান্ত, অপুষ্ট, বা ঘুম-বঞ্চিত শরীরে শেখার আগ্রহ জন্মায় না। ভয়, হতাশা, কিংবা আত্মবিশ্বাসের অভাব শিক্ষার পথে দেয় দেয়াল তুলে। তাই শেখার আগে দরকার নিরাপদ পরিবেশ, সুস্থ শরীর, আর উৎসাহিত মন।

“শেখা ও সুস্বাস্থ্যের মিলনস্থল”

বিদ্যালয় যেন হয়ে ওঠে শেখা ও সুস্বাস্থ্যের এক মিলনস্থল, এই লক্ষ্যেই তানভীর স্যার চালু করলেন কিছু নতুন নিয়ম,

- দিনের শুরু ‘মনোযোগ-মুহূর্ত’: সকলেই একসঙ্গে ২ মিনিট চুপচাপ চোখ বন্ধ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন করে— মনের স্থিরতা আনার জন্য।
- টিফিনে ফল ও বাদাম: শিশুদের পুষ্টির গুরুত্ব বোঝাতে প্রাত্যহিক উদ্যোগ।
- প্রতিদিন ২০ মিনিট খেলাধুলা: যেন দেহের সঙ্গে মনেরও মুক্তি ঘটে।
- “আজ আমি কী শিখব?” বোর্ড: শিশুরা নিজের ইচ্ছেমতো শিখতে চাওয়ার বিষয়গুলো সেখানে লিখে দেয়. শেখা হয় নিজস্ব ও প্রাসঙ্গিক।

শেখার শক্তি তখনই আসে, যখন পরিবেশ কৌতূহল জাগায়, মন খোলা থাকে, আর দেহ প্রস্তুত থাকে। “Whole Child Approach” বা “সম্পূর্ণ শিশু দৃষ্টিভঙ্গি” আমাদের শেখায় শিক্ষা মানে শুধু পরীক্ষায় পাস করানো নয়, বরং একটি শিশুর মানসিক, সামাজিক ও শারীরিক বিকাশের প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া।

একজন শিশু যখন নিজের শরীর-মন নিয়ে প্রস্তুত, তখন সে শিখে আর শেখে কীভাবে শিখতে হয়। সেই “learn to learn” ক্ষমতাই তাকে তৈরি করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য, প্রযুক্তিনির্ভর জগতের জন্য, এবং এক নতুন পৃথিবীর নাগরিক হয়ে উঠার জন্য।

ধনুক-ভাঙা পণ – ৪০

“প্রতিদিন এক ঘণ্টার চর্চা”

বরিশালের হাওরঘেরা গ্রাম কলসকাঠি। ফিরোজ স্যার, সেই শিক্ষক, যিনি শিশুদের ভেতরে লুকানো আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভাকে জাগাতে চান ভালোবাসা ও ধৈর্যের আলোয়। প্রতিদিন এক ঘণ্টা শেখা মন দিয়ে, নিজস্বভাবে, আর তিনটি ভিন্ন কৌশলে এই চর্চাই গড়ে তোলে অদৃশ্য পাথরে লেখা ভবিষ্যৎ।

হাওরের বুক চিরে দাঁড়িয়ে থাকা কলসকাঠি স্কুলটি যেন এক ভাসমান স্বপ্ন। বর্ষায় জলে ডুবে থাকা গ্রাম, হাঁসের পাল ভেসে চলে স্কুলপথে, আর ছোট ছোট পা গলা পানি ঠেলে পৌঁছে যায় সেই টিনশেড ক্লাসঘরে। ভাঙা বেঞ্চ, লিকচিকে দেয়াল, কিন্তু ভিতরে তপ্ত চোখ সেখানে থাকে জানার আগ্রহ, সাহস, এবং জীবনের জন্য এক কাঙাল পিপাসা।

সেই আগুনেই ঘি ঢালেন ফিরোজ স্যার। তিনি বলেন: “প্রতিদিন এক ঘণ্টা সময় নিজের স্বপ্নকে দাও। তিন বছর পরে তুমি নিজেকে চিনবে। পাঁচ বছর পরে তুমি পথ দেখাবে। আর সাত বছর পরে তুমি হয়ে উঠবে এমন কিছু, যা দেশ তোমার নামের আগে মাথা নত করবে।”

তাঁর পাঠশালায় শেখা মানে বই মুখস্থ নয়, জীবনের ছায়া ধরে শেখা।

কিছু হৃদয়ভরা গল্প, কিছু এক ঘণ্টার অলৌকিক রূপান্তর:

১. তানিম - বাজারে বাবার সঙ্গে মাছ বিক্রি করা ছেলেটি।

ফিরোজ স্যার বলেন, “প্রতিদিন এক ঘণ্টা হিসাব রাখো, আমি শেখাব কীভাবে সংখ্যা তোমার বন্ধু হয়।” তিন বছর পর তানিম জেতে ব্যবসায়িক গণনার প্রতিযোগিতায়। সাত বছর পর, সে হাওরের সবচেয়ে তরুণ উদ্যোক্তা।

২. রূপা - যার জীবন ভোরের হাঁস-মুরগি, দুপুরে ছোট ভাই, আর সন্ধ্যায় কলসভরা। সেই কলসের ‘ধুপ ধুপ’ শব্দ দিয়েই সে গান লেখে “কলসের গান”। স্যার রূপার ভাষাকে ছন্দে বেঁধে দিলেন। সাত বছর পর, রূপা হলো বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী।

৩. রায়হান - যে কথা বলে না, শুধু চুপচাপ নোট লেখে, “আজ রোদের দিক পাল্টেছে...” এই নিঃশব্দ নোট থেকেই জন্ম নেয় “হাওরের দিনলিপি”। সাত বছর পর, সে দেশের পত্রিকায় ছাপা হওয়া তরুণ লেখক।

৪. ইমরান - যে বই দেখে বিরক্ত হয়, কিন্তু ভাঙা ফ্যান খুলে চমকে ওঠে! এক ঘণ্টা করে হাতে পেন, ঘড়ি, সুইচ দিলে, সে বানিয়ে ফেলে “স্কুল বিজ্ঞান ক্লাব”। সাত বছর পর, সে একজন কারিগরি উদ্যোক্তা।

৫. শারমিন - ঈশ্বরের রহস্য তার চোখে ঘুরে বেড়ায় আয়াত, সূর্য, নদী, মৌসুম সব মিলে। প্রতিদিন এক ঘণ্টা সে লেখে “নৈতিক প্রশ্নের খাতা”। সাত বছর পর, সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘নৈতিক বিজ্ঞান’ নিয়ে গবেষণা করে।

৬. রোহান - নদীতে ভেসে গেছে ঘর, স্কুল এসে বসে থাকে স্তব্ধ হয়ে। স্যার তাকে বলেন, “লিখো তোমার গল্প, ভাসমান ডায়েরি।” সে লেখে, গড়ে তোলে “ভাসমান পাঠশালা”। সাত বছর পর, সে একটি জাতীয় শিক্ষানবিস প্রকল্পের মুখ।

৭. জারা - অঙ্কের আপেল খেয়ে ফেলে পিঁপড়া, কমার জায়গায় বসে পাখি! তার আঁকা “সূর্যর দোকান” আর “রঙপাখির ক্লাসরুম” এখন অ্যানিমেটেড সিরিজ। জারা হয়ে ওঠে শিশু-চিত্রনাট্যকার।

৮. রশিদ - দৃষ্টিহীন, কিন্তু শোনে হৃদয় দিয়ে। চকের শব্দে বোঝে প্রশ্ন, বাতাসে খুঁজে নেয় জ্ঞান। “শব্দের ক্যালকুলেটর” বানিয়ে সে শেখায় শ্রবণভিত্তিক শিক্ষার ক্ষমতা। সাত বছর পর, রশিদ একজন সাউন্ড ডিজাইনার।

৯. সিয়াম - যে বলে “কেন আমরা সবসময় চুপ থাকি?” ফিরোজ স্যার গড়ে তোলেন “কেন ক্লাব”। সিয়াম হয় প্রশ্নপাগল এক অধিকারকর্মী। তার বই “কেন”-এর উত্তর খুঁজি আমি।

১০. দাদুর পাঠশালা - ৭৫ বছর বয়সী আব্দুল খালেক দাদু। আকাশ দেখে বলেন বৃষ্টি আসছে, নদী দেখে বলেন ধান হবে কেমন। ফিরোজ স্যারের ছাত্ররা দাদুর কাছ থেকে শেখে— জীবন নিজেই শ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক। সাত বছর পর, তারা লেখে “বইয়ের বাইরের শিক্ষা”।

প্রতিদিন এক ঘণ্টা, এই ছোট চর্চা থেকেই জন্ম নেয় বড় গল্প, বড় মানুষ, বড় দেশ।

শেখা মানে শুধু প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ নয়, শেখা মানে নিজের ভেতরকার শক্তিকে জাগিয়ে তোলা, যেমনটা ফিরোজ স্যার করেছিলেন একজন আলোকদাতা, একজন শিল্পী, একজন শিক্ষক।

ধনুক-ভাঙা পণ – ৪২

“স্বপ্ন নয়, অভ্যাসই ভবিষ্যৎ গড়ে।”

বরিশালের হিজলা উপজেলায়, মেঘনার ধারে এক ছোট্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। নিয়মিত স্কুলে আসে কিছু নিষ্পাপ মুখ। নতুন যোগ দিয়েছেন এক শিক্ষক - আফরোজ স্যার। শহর থেকে গ্রামে আসা তাঁর প্রথম বদলি। আফরোজ স্যারের মনোভাব স্পষ্ট “অধিকাংশ মানুষ ব্যর্থ হয়, কারণ তারা খুব তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দেয়।” এই বিশ্বাস থেকেই শুরু হয় তাঁর যাত্রা।

গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় টি খুব সুন্দর, সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত, স্কুলের ঘর ও শিক্ষকরা বেশ পরিপাটি ও বন্ধুভাবাপন্ন। ছাত্রদের মাঝেও তার ছাপ আছে, তারা উৎফুল্ল ও একানিষ্ঠ। তবে, ছাত্রদের মাঝে স্বপ্ন আছে, কিন্তু অভ্যাস নেই। ছাত্রদের মাঝে ওনি চাইলেন কিছুটা বেতিক্রম আনতে।

আফরোজ স্যার ছাত্রদের বললেন, “সফলতা ডিগ্রি বা সার্টিফিকেটে নয়, সফলতা তৈরি হয় ভালো অভ্যাস, শৃঙ্খলা আর দায়িত্ববোধ থেকে। এটাই গড়ে তোলে একজন মানুষকে। আজ থেকে আমরা সবাই একটি করে অভ্যাস গড়ে তুলবে - ছোট হোক, কিন্তু নিয়মিত হবে। রুটিন করে ২১ দিনের চর্চা করতে হবে।”

শৃঙ্খলা ও দায়িত্বের অভ্যাস,

১. সাদিয়া: প্রতিদিন স্কুলে ঢোকার আগে বাগানে পড়ে থাকা একটা ময়লা কুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলে।

২. রহিম: প্রতিদিন ক্লাসের শেষে চেয়ার-টেবিল গুছিয়ে রাখে ও ব্ল্যাকবোর্ড মুছে দেয়।

৩. জাহানারা: প্রতিদিন ছোট ভাইকে একটি শব্দ শেখায় – বাংলা/ইংরেজি।

অধ্যয়নমূলক অভ্যাস,

৪. ফারহান: প্রতিদিন একটি নতুন শব্দ মুখস্থ করে ও পরদিন ক্লাসে সবার সামনে বলে।

৫. রূপা: প্রতিদিন একটি করে লাইব্রেরি বই পড়ে, তারপর তার ছোট্ট সারাংশ ডায়েরিতে লেখে।

সৃজনশীল অভ্যাস,

৬. তামান্না: প্রতিদিন স্কুলের একটা জিনিস আঁকে, জামগাছ, স্কুলবাড়ি, শিক্ষক, ঘড়ি।

৭. মাহিন: প্রতিদিন বিকেলে নিজে একটি কবিতার লাইন লেখে ২১ দিনে সে ২১ লাইন দিয়ে একটি কবিতা তৈরি করে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মনোসংযোগের অভ্যাস,

৮. সোহেল: প্রতিদিন ৫ মিনিট চুপচাপ বসে থাকে, কোনো কথা বলে না, শুধু নিজের চিন্তা গুছিয়ে নেয়।

৯. নিশাত: প্রতিদিন একটা ভালো কাজের কথা লিখে রাখে, যা সে নিজে করেছে বা অন্য কাউকে করতে দেখেছে।

সামাজিক অভ্যাস,

১০. রফিক: প্রতিদিন শ্রেণী শিক্ষকে এক গোছা ফুল দেয়।

১১. নওরিন: প্রতিদিন সকালে একজন সহপাঠীকে শুভ সকাল বলে এবং তার সকল খবর নেয়।

আফরোজ স্যার বোর্ডে বড় করে লিখলেন,

- সাদিয়া শিখেছে যত্ন নিতে
- জাহানারা শিখেছে দায়িত্ব নিতে
- তামান্না শিখেছে নিজের মনের ছবি আঁকতে
- সোহেল শিখেছে নিজের ভেতরের ভাবনা ধরতে।

এভাবেই গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে উঠলো “অভ্যাস গড়ে তোলার ল্যাব”। পরীক্ষায় ফল প্রকাশের সময় দেখা গেল, পঞ্চম শ্রেণির প্রায় ৮০% শিক্ষার্থী তাদের পূর্ববর্তী ফলাফলের তুলনায় দ্বিগুণ উন্নতি করেছে। শুধু নম্বরে নয়, মনেও।

আফরোজ স্যারের গল্প সেই কঠিন কিন্তু বাস্তব সত্যটিই শেখায়—Consistency is the quiet power that moves mountains.

ধনুক-ভাঙা পণ – ৪৩

“মানসিক দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক মনোভাব”

ঢাকার এক স্বনামধন্য বিদ্যালয়। রাজধানীর পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা, এবং শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিই এখানে কিছুটা আলাদা। এই স্কুলে রয়েছে একটি বিশেষ বিষয় “স্নানস্তত্ত্ব ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা”, আর সেই পাঠের দায়িত্বে আছেন নাফিস স্যার। এমন শিক্ষক ও বিষয় দেশের আর কোনো স্কুলে নেই। স্কুলটির মূল দর্শন একটাই, ছাত্ররা যেন নিজের ভেতরের আলো জ্বালাতে শেখে, নিজের পথে নিজেই এগিয়ে চলে।

একদিন ক্লাসে নাফিস স্যার এসে বললেন, “আজ আমরা কথা বলবো নিজেদের সঙ্গে। হ্যাঁ, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, চোখে চোখ রেখে, নিজের সাথেই।” সবাই একটু অবাক। স্যার বোঝালেন, “যে যেমন নিজের কথা ভাবে, সে তেমনই হয়ে ওঠে।” স্যার বললেন, “অন্যরা তোমাকে নিয়ে কী ভাবছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তুমি নিজেকে কী ভাবছো সেটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। নিজেকে ছোট ভাবলে, জীবনও ছোট হয়ে যায়।”

আত্মবিশ্বাস আর সংশয়ের দূরত্ব মাপতে স্যার একটা ছোট্ট কৌশল চালালেন। বললেন, “আমার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রের ছবি আমি এই বাক্সে রেখেছি। চলো, একে একে সবাই দেখে এসো।” ছাত্ররা বিস্ময়ে বাক্সের ভেতর উঁকি দিলো এবং অবাক হয়ে হেসে উঠলো। ভেতরে ছিলো একটা আয়না। নিজেকেই দেখে তারা বুঝল “স্যারের প্রিয় ছাত্র তো আমি!”

একেকজনের মুখে আত্মবিশ্বাসের আলো জ্বলে উঠল।

স্কুলে স্যার একটি নতুন কার্যক্রম চালু করলেন - “বিশ্বাস বোর্ড (Believe Board)”, যেখানে সবাই প্রতিদিন একটা করে নিজেদের জন্য ইতিবাচক বাক্য লিখবে। ইতিবাচক আত্ম-কথা বলতে বোঝায় নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ চিন্তাভাবনাকে উৎসাহব্যঞ্জক এবং নিশ্চিতকারী চিন্তাভাবনা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা। নবম-দশম শ্রেনীর ছাত্রদের বলিষ্ঠ চিন্তাভাবনা নাফিস স্যারকে অবাক করে দিলো, “আমি আমার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম।" "আমি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার যোগ্য।" "আমি শক্তিশালী এবং স্থিতিস্থাপক।" "আমি একজন ভালো মানুষ।" ...

সপ্তাহ শেষে যখন সবাই মিলে তাদের বাক্যগুলো পড়ছিল, তখন চারপাশে এক অদ্ভুত নীরব জোয়ার - আত্মবিশ্বাসের শব্দেরা যেন একে একে সব ছাত্র-ছাত্রীদের বুক জুড়ে ভেসে বেড়াছিলো। ছাত্ররা বুঝলো, নিজের ভিতরে একজন বন্ধু থাকে, তার কথা শুনলে জীবন বদলায়।

একবার কি হলো, রিমি: দশম শ্রেণির ছাত্রী, গান ভালো গায় কিন্তু মঞ্চে উঠলে ভয় পায়। সিনথিয়া: রিমির সহপাঠী ও বন্ধু।

স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান আসছে। নাফিস স্যার সবাইকে বললেন, “এইবার যারা আগে কখনো গান করেনি, তারাই অংশ নেবে। ভয়টাকে উপেক্ষা করো।” রিমির গলা সুন্দর, স্কুলে অনেকেই জানে। কিন্তু সে নিজে কখনো বিশ্বাসই করেনি যে তার কণ্ঠটা “মঞ্চের উপযোগী”। সে সব সময় মনে করত, “যদি ভুল করি?”, “যদি সবাই হাসে?”, “আমি পারব না...”।

সিনথিয়া একদিন বলল, “রিমি, নিজের সাথে একটু অন্যভাবে কথা বল, আমি ভয় পাই, কিন্তু আমি থামছি না। আমি একটু একটু করে সাহসী হচ্ছি। আমি গান পছন্দ করি, ভয়টা থাকলেও গানটা আমার।” রিমি চুপ করে ছিল। তারপর রাতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে করে বলল, “আমি পারি... আমি ভয় পেয়েও এগিয়ে যেতে পারি।”

অনুষ্ঠনের দিন। মাইক্রোফোন হাতে কাঁপা কাঁপা গলায় প্রথম লাইনটি গাইল রিমি। তারপর ধীরে ধীরে কণ্ঠ স্থির হল, চোখের ভেতর দৃঢ়তা এল। গানের শেষে করতালি শুনে সে ভাবল, “আমি এটি মোকাবেলা করেছি। আমি গর্বিত।”

শিক্ষার্থীদের দিয়ে দুটি দেয়াল চিত্র বানানো হলো যেখানে লেখা থাকবে: “ভালো কথা বলো নিজের সাথে - কারণ তুমি শুনছো!” ও “ভয় পাবে, এটা ঠিক। তবু ভয়কে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে।” নাফিস স্যারের বিশ্বাস: শিক্ষার শুরুটা হয় আত্মবিশ্বাস দিয়ে, আর আত্মবিশ্বাসের শুরু হয় নিজের সঙ্গে ইতিবাচক কথা বলে। যদি তুমি নিজের সঙ্গে মমতা না দেখাও, নিজের দিকে একটুখানি ভালোবাসার চোখে না তাকাও - তাহলে পৃথিবীর চোখে নিজের মুল্যই বা কীভাবে তুলে ধরবে?

(এই “মানসিক দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক মনোভাব” শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও আত্মহত্যা প্রতিরোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সহায়ক। এটি সাহস জোগায়, আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে এবং প্রতিটি কণ্ঠকে বলে —‘ তুমি একা নও, তুমি যথেষ্ট।’)

“আমার সময়, আমার শক্তি”

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্ত ঘেঁষা এক ছোট্ট গ্রামে, নবম শ্রেণির ছাত্র আজহার। গরিব ঘরের ছেলে, সকালে স্কুল, বিকেলে বাবার সঙ্গে বাজারে হেলপার হিসেবে কাজ করে। তার বন্ধুরা মোবাইলে গেম খেলে, ফেসবুকে স্ক্রল করে, কিন্তু আজহারের ফোনও নেই, সময়ও নেই। তার সময় মানে - কাজ, পড়া, ঘুম।

একদিন ক্লাসে বাংলা স্যার ‘মূল্যবান জিনিস’ নিয়ে রচনা লেখার জন্য বলেন। সবাই লিখে- টাকা, স্বর্ণ, বাসা, মোবাইল... কিন্তু আজহার ছোট করে লেখে, “সময়- এটাই সবচেয়ে দামী। কারণ আমি এটাকেই খরচ করে বাঁচি।”

স্যার বিস্মিত হন। পরদিন আজহারকে ডাকেন, “তুমি এ কথা কোথা থেকে শিখলে?”

আজহার মাথা নিচু করে বলে, “স্যার, আমার সময় নষ্ট করার সুযোগই নাই। যা পাই, তাই দিয়ে বাঁচি।”

বাংলার স্যারের আয়োজনে স্কুলে এক বিশেষ কর্মশালা হয় ‘আমার সময়, আমার শক্তি’ নামে। সেখানকার অতিথি বললেন. “সময়ের ব্যবস্থাপনা তোমাদের আত্মবিশ্বাসকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাদের দক্ষ করে তুলতে পারে।”

তিনি ছেলেমেয়েদের বোঝান, টাকা হারালে ফেরত পাওয়া যায়, জিনিস হারালে কেনা যায়, কিন্তু সময়? একবার গেলে আর ফেরে না।

বাংলার স্যার, ছাত্রদের বুঝানোর জন্য, সবাইকে ৮৬,৪০০ টাকা কল্পনায় দেন।

প্রশ্ন করেন, “যদি বলি প্রতিদিন এই টাকা তোমার অ্যাকাউন্টে জমা হবে, কিন্তু দিনের শেষে উধাও হয়ে যাবে, তুমি কী করবে?”

সবাই বলে - “ব্যবহার করব, জমাব, কাজে লাগাব!”!“প্রতিদিন আমাদের হাতে ৮৬,৪০০ সেকেন্ড থাকে। তুমি সেটা কীভাবে খরচ করো, সেটাই তোমার জীবন ঠিক করে।”

বাংলা স্যার বোর্ডে বড় করে লেখেন. “সময় হলো একমাত্র সম্পদ, যা আমরা খরচ করি, কিন্তু ফেরত পাই না।”

স্যার একটা “সময় জার্নাল” (Time Journal) বানালেন নাম দেয়, “বর্তমানের দিনলিপি”।

একদিন স্কুলে “সময় বিষয়ক গল্প লেখার প্রতিযোগিতা” হয়, সেখানে আজহার লেখে, “আমার অতীত আমাকে শিক্ষা দেয়, ভবিষ্যৎ আমাকে স্বপ্ন দেখায়, কিন্তু বর্তমান - আমি এখন যা করব, তাই ভবিষ্যৎ গড়বে।”

স্যার সময় ব্যবস্থাপনার আলোকে গড়িমসির (Procrastination) ভয়াবহতা তুলে ধরেন। “আজ না হয় পড়লাম না, কাল পড়ব।” “নোটগুলো পরে গুছিয়ে নেব।” “সময় তো অনেক আছে!” এসব চিন্তা বাদ দিতে হবে।

স্যার বললেন “কালক্ষেপণ হলো সময়ের চোর”, এমন কি, “সহজ কাজ স্থগিত রাখলে তা কঠিন হয়ে যায় এবং কঠিন কাজ স্থগিত রাখলে তা অসম্ভব হয়ে পড়ে।” - জর্জ এইচ. লরিমার। স্যার বিলম্বের চেয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেওয়ার গুরুত্বের উপর জোর দেয়, কারণ যে কোন কাজ যত বেশি সময় ধরে সমাধান না করা হবে, তত বেশি কঠিন এবং ব্যয়বহুল হবে।

একদিন স্যার জীবন-দক্ষতা (Life Skills) বিষয়ে একটি ক্লাস নেন। তিনি আলোচনা করেন, সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতার নিয়ে, যেখানে,

১. লক্ষ্য নির্ধারণ,
২. মনোযোগ দেওয়া,
৩. সংগঠিত করা,
৪. অগ্রাধিকার দেওয়া,
৫. যোগাযোগ করা এবং
৬. প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতার বিষয় নিয়ে বুঝান।

“The Three Questions” by Leo Tolstoy, এর গল্প দিয়ে স্যার বুঝানোর চেষ্টা করেন। যেখানে,

১. ঠিক এই মুহূর্তটাই সেরা সময়।
২. যার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে, সে-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
৩. ভালোকাজে দেরি মানেই দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া।

স্কুলের ছাত্ররা বুঝলো,

Procrastination kills possibilities.

জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল হচ্ছে “পরে করব” এই ভাবনা। সঠিক সময় হল এখন, সঠিক মানুষ হল যে সামনে আছে, আর সঠিক কাজ হল ভালোকাজে এগিয়ে যাওয়া—তা যত ছোটই হোক না কেন। স্কুলের বারান্দায় একটি নতুন পোস্টার টাঙানো হয়,

পরে করব - এই কথাটাই সম্ভাবনার দরজায় তালা লাগায়।

সঠিক সময় হলো - এখন।

সঠিক মানুষ হলো - যার সঙ্গে আছো।

সঠিক কাজ হলো - যা ভালো, তা এখনই করা।

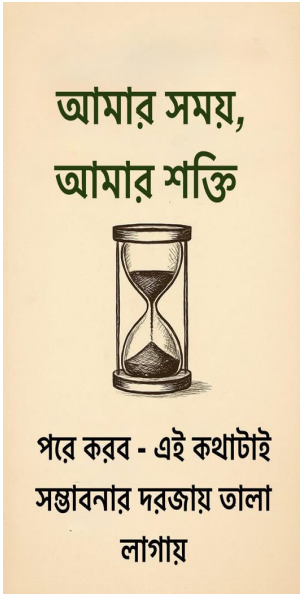

“একটি হাসি, একটি দয়া— এও সদকা।”

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার আলীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ওবায়দুল স্যার দ্বীনি ও দুনিয়ার জ্ঞানে আলোকিত, মমতাময়ী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক শিক্ষক।

সকালবেলায় ক্লাসে ঢুকে ওবায়দুল স্যার বললেন, “আজ আমরা শিখবো জীবনের একটি অতিপ্রয়োজনীয় সত্য, যা ইসলাম শুধু বলে না, বরং আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্মে তার প্রতিফলন চায়।”

স্যার হাদিস পড়লেন: “তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজের জন্য যা চাও, তা-ই তোমার ভাইয়ের জন্য চাও।”

শ্রেণিকক্ষে নিস্তব্ধতা। কিছু চোখে কৌতূহল, কিছু মুখে দ্বিধা। স্যার বললেন, “নম্রতা ছাড়া সাফল্য অহংকারে রূপ নেয়, আর দয়া ছাড়া সাফল্য হয়ে পড়ে শূন্য ও নিষ্প্রাণ। কুরআনেও বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন না তাকে, যে দাম্ভিক ও অহংকারী।’ (সুরা নিসা, আয়াত ৩৬)”

তিনি বুঝতেন, শ্রেণি সাতের শিক্ষার্থীদের কাছে এই সবকিছু একটু দূরবর্তী মনে হতে পারে। কিন্তু যদি এই বয়সেই হৃদয়ে সহানুভূতির বীজ বপন করা যায়, তা একদিন মহীরুহ হয়ে উঠবে। পরদিন ওবায়দুল স্যার এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিলেন। একটি ছোট বাক্স বানিয়ে বললেন—

“এটি হবে আমাদের ‘রহমত বাক্স’। এখানে যার যা আছে, সে গোপনে রাখতে পারবে, খেজুর, ফল, ছোট উপহার কিংবা দোয়ার পত্র। কোনো নাম নয়, কোনো ঘোষণা নয়। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।”

দিন কয়েকের মধ্যে সেই বাক্সের ভার বেড়ে উঠল, শুধু দান নয়, দোয়ার চিঠিতে।

- “আল্লাহ্ যেন আপনাকে জান্নাত দেন।”
- “যিনি আমার জন্য পানি রেখেছেন, তাঁর প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন।”

একটি চিঠিতে লেখা ছিল, “স্যার, আমি এখন বুঝি ইসলাম শুধু নামাজ বা রোজা নয়। ইসলাম মানে কারো মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা।”

ওবায়দুল স্যার মৃদু হেসে বললেন, “ইসলাম তো তাই-ই বলে ‘পৃথিবীর সৃষ্টির প্রতি দয়া করো, আকাশের মালিক তোমার প্রতি দয়া করবেন।’” (তিরমিজি)

প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁর “আখলাক ও আখিরাহ” ক্লাস যেন শুধু পড়া নয় - একটা নৈতিক জাগরণ।

সেদিন হাদিস ছিল: “তোমার ভাইয়ের মুখে হাসি ফোটানোও সদকা।” (তিরমিজি)

স্যার বললেন - “সদকা মানে শুধু টাকা নয়। কোনো কিছুর বিনিময়ে নয় নীরবে, গোপনে দান করাই ঈমানের সৌন্দর্য। এমনকি বাম হাতও যেন না জানে, ডান হাত কী দান করল - এই দানকারীই কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে।”

একজন ছাত্র বলল, “স্যার, আমি আজ বুঝলাম ইসলাম মানে শুধু ইবাদত নয়, একজন মানুষের চোখে ভালোবাসা এনে দেওয়াও ঈমান।”

ওবায়দুল স্যার শুরু করলেন এক বিশেষ আয়োজন ‘দয়া সপ্তাহ’।

সপ্তাহজুড়ে শিশুরা শুধু মানুষের প্রতি নয়, আল্লাহর সব সৃষ্টির প্রতিও দয়া দেখাতে শেখে,

- স্কুলের ছাদের ফুলগাছে পানি দেয়,
- পেছনের মাঠে পাখিদের জন্য খাবার রাখে,
- আশপাশের গৃহহীন বিড়ালদের জন্য খাবার-বাটি তৈরি করে,
- কেউ কেউ নিজের হাতে গাছের পরিচিতি-পত্র বানায়।

একদিন এক ছাত্র চুপচাপ এসে বলল, “স্যার, আমি আগে ভাবতাম শুধু গরীব মানুষকে সাহায্য করলেই ইসলাম পালন হয়। এখন বুঝি— প্রতিটি প্রাণীর সেবা করা মানেই ঈমান।”

ওবায়দুল স্যার সবার সামনে বললেন, “একটি গাছে পানি দেওয়া মানে এক দয়ালু হৃদয়ের চাষ করা। একটি অবলা প্রাণীকে স্নেহ দেওয়া মানে আল্লাহর একটি সৃষ্টিকে সম্মান জানানো। নিঃস্বার্থ সহানুভূতি একটি নীরব ইবাদত। কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানুষের হৃদয় জয়ের চেষ্টায় নিরব সেবা।”

মানব জীবনের উদ্দেশ্য হলো সেবা করা, করুণা প্রদর্শন করা এবং অন্যদের সাহায্য করার ইচ্ছাশক্তি প্রদর্শন করা। আর এই মনোভাবই - একজন শিশুকে পরিণত করে সত্যিকারের মানুষে।

“স্বপ্ন আর বাস্তবতার মাঝখানে যে সেতু - তার নাম কর্ম।”

নেত্রকোনার দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, রুবেল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র, স্বপ্নদ্রষ্টা। হাবিব স্যার সদ্য বদলি হয়ে আসা এক চিন্তাশীল শিক্ষক।

স্কুল ছাত্রদের কল্পনা এবং কল্পনার সাথে তাদের সম্পৃক্ততা তাদের জ্ঞান বিকাশের বড় অংশ। একটি স্কুল ছাত্রের জ্ঞানীয় বিকাশ, কল্পনাকে বাস্তবতা থেকে আলাদা করে এবং বিমূর্ত চিন্তাভাবনায় জড়িত হওয়ার ক্ষমতা শৈশব জুড়ে অগ্রসর হয় পরিপূর্ণতার দিকে।

হাবিব স্যার জানেন, প্রত্যেক ছাত্রের চোখেই ভবিষ্যৎ লেখা থাকে। এ তার নিজস্ব ভবিষ্যৎ। প্রতিটা মানব শিশুর মধ্যে সৃজনশীলতা আছে, আছে তার নিজস্বতা। যখন সে স্কুলের ছাত্র (৬-১৬ বছর বয়স) তখনি তার সৃজনশীলতা স্বপ্ন রূপে ধরা দিতে থাকে। তা হতে পারে গানে, নাচে, ছবি আঁকানোতে, বিজ্ঞানে বা লেখায় ..। এই স্বপ্ন তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আসে, নিজের অজান্তে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে মানব সমাজে অবদান রাখাতে চায়। ছাত্রের এই স্বপ্নের কুঁড়ি টাকে পরিস্ফুটিত করার মহান দায়িত্ব স্কুলের (বলা যেতে পারে এক মাত্র দায়িত্ব)।

রুবেলদের বাড়ি পাহাড়ের গায়ে। বিদ্যুৎ নেই, পানির সংকট, স্কুলে যাওয়ার পথে ঝিরি পেরিয়ে আসতে হয়। তার সবচেয়ে প্রিয় কাজ, চুপচাপ আকাশ দেখা। সে ভাবে, “আমি একদিন আকাশে ওড়াব, বড় কিছু বানাব।”

হাসান স্যার ক্লাসে এসে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কে কী হতে চাও?”

সবাই কিছু না কিছু বলল। কিন্তু রুবেল চুপ।

স্যার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি কিছু বললে না কেন, রুবেল?”

সে ধীরে বলল, “স্বপ্ন অনেক দেখি স্যার, কিন্তু জানি না ওগুলো আসলেই হয় কি না।”

হাসান স্যার বোর্ডে একটি লাইন লিখলেন, “স্বপ্ন আর বাস্তবতার মাঝে যে দূরত্ব, তার নাম কর্ম।”

তারপর ব্যাখ্যা করলেন, “স্বপ্ন হলো মানচিত্র। বাস্তবতা হলো গন্তব্য। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে হলে পায়ে হেঁটে যেতে হয়, সেই হাঁটার নামই হলো কর্ম।”

রুবেলের পথচলা:

হাসান স্যার তাকে দিয়ে বানান একটি ছোট পাখার প্রোজেক্ট, বাতাসে ঘোরে।

সে নিজেকে নিজে বলে - “আমি এখনো রকেট বানাইনি। কিন্তু আমি হাঁটছি। আমি জানি, আমার স্বপ্নের দিকে আমি এক ধাপ এগিয়েছি।”

হাসান স্যার বলেন, “স্বপ্ন তো অনেকেই দেখে। কিন্তু কেউ কেউ বাস্তবে পৌঁছায়, কারণ তারা হাঁটে। মনে রেখো, পা না চালালে গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না। স্বপ্ন আর বাস্তবতার মাঝখানে যে দূরত্ব, তার নাম কর্ম।”

সায়রা কাঁথা সেলাই করে মার সঙ্গে। তার ভালোলাগে বিমূর্ত চিত্রকলা শুচ সুতায় দেখাদেয় নকশিকাথায়। সে কাপড়ের ভাঁজে ভবিষ্যতের গল্প খোঁজে। সে ছবি আঁকে না, কবিতা লেখে না - সে ভাবনার সৌন্দর্যে বাঁচে।

একদিন রূপা ম্যাডাম ক্লাসে এসে একটি লাইন বোর্ডে লেখেন, “ভবিষ্যৎ তাদেরই, যারা তাদের স্বপ্নের সৌন্দর্যে বিশ্বাস করে।” - এলেনর রুজভেল্ট।

ম্যাডাম বলেন, “সবাই স্বপ্ন দেখে না। কেউ কেউ শুধু ভয় দেখে, আমার হবে না, পারবো না। কিন্তু যারা নিজের স্বপ্নের সৌন্দর্য দেখতে পারে, তারাই সত্যি একদিন ভবিষ্যৎ গড়ে।”

একদিন স্কুলে “মুক্ত কল্পনা” প্রতিযোগিতা হয়। সবাই ছবি আঁকে ফুল, পাখি, বাড়ি।

সায়রা দেয় ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, যেখানে সূচ ও সুতো দিয়ে সে বানিয়েছে এক স্কুলঘর, ছোট খোলা জানালা, বই হাতে এক শিশু, আর পাশে বসা একজন হাসিমুখ শিক্ষক।

রূপা ম্যাডাম টুকরোটা হাতে নিয়ে বলেন, “এটি শুধু কাঁথার নকশা নয়। এটি একটি ভবিষ্যতের ছবি, যা কেউ স্বপ্ন দেখেছে, এবং বিশ্বাস করেছে। তোমার স্বপ্নটা যদি চোখ বন্ধ করলেই হাসি এনে দেয়, তবে জেনে রাখো তুমি ভবিষ্যতের দিকে হাঁটছো। কারণ ভবিষ্যৎ তাদেরই, যারা তাদের স্বপ্নের সৌন্দর্যে বিশ্বাস করে।”

হাবিব স্যার আর রূপা ম্যাডাম ছাত্রদের স্বপ্নতে গতি দিতে চান, তাঁরা ভাবেন এইতো সময় স্বপ্নের সৌন্দর্যে দেখার আর স্বপ্নকে বাস্তবে কর্ম দিয়ে এগিয়ে নেয়ার। ছাত্রদের এই পরিষ্কার ও পরিছন্ন স্বপ্ন সৃষ্টি কর্তার অবদান মানুষের মাঝে। এই শিশুদের নিঃশব্দ স্বপ্নের মধ্যেই এক নতুন সমাজ গড়ে উঠছে। আর যাঁরা সেই স্বপ্নগুলোতে আলো জ্বালান, তাঁরা শিক্ষক। রূপা ম্যাডাম আর হাবিব স্যারের মতো শিক্ষক।

“হাত দিয়ে শেখা - মন দিয়ে বোঝা, হৃদয় দিয়ে গড়া শিক্ষা।”

সাভারের কাঠালবাগান ঘেরা প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা একটুখানি স্কুল - নাম তার কাঠালবাগান সরকারি বিদ্যালয়। চারপাশে কাঁঠাল গাছ, সজীবতা আর নিঃশব্দ এক সম্ভাবনা। এই স্কুলেই একদিন যোগ দিলেন এক ব্যতিক্রমী শিক্ষক রেজওয়ান স্যার। তার ভালোই জানা আছে কাঠের (carpenter) কাজ, বাবার ওয়ার্কশপে হাতেখড়ি। তখনি তিনি বুঝেছেন, “হাতে-কলমে না শিখলে, শিখা হয় না!” বইয়ের পাতায় যত জ্ঞানই থাক, তা যদি হাত ছুঁয়ে না দেখে, চোখ দিয়ে না মাপে, নিজের হাতে কিছু না গড়ে, তবে সে জ্ঞান কাগজে লেখা থাকে, মনে গেঁথে যায় না।

ছাত্ররা শুধু শুনে নয়, স্পর্শ করে, গন্ধ নেয়, গড়ে তুলে, ভুল করে, আবার ঠিক করে - এই প্রক্রিয়ায় শেখে। হাত দিয়ে মাপা মানেই মস্তিষ্কে বোঝা, করাত চালানো মানেই জ্যামিতির রেখা আঁকা, হাতুড়ির শব্দ মানেই ছন্দে তৈরি আত্মবিশ্বাস। শেখা তখনই সত্য হয়, যখন মন, মাথা আর হাত - এই তিনের সমন্বয় ঘটে। 'গ'ঠন, 'গ'ড়ন আর 'গ'তি এই তিন “গ” তৈরি করে “জীবন্ত শিক্ষা”, যেখানে আছে “সৃষ্টি সুখের আনন্দ।”

রেজওয়ান স্যার কাঠালবাগান সরকারি বিদ্যালয়ের পাশেই পেলেন ঝরে পরে যাওয়া এ কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি। ঝড়ে পড়ে যাওয়া সেই কাঠালগাছের গুঁড়ি দেখে রেজওয়ান স্যারের চোখ চকচক করে উঠল। তাঁর প্রিয় কাঠ - সোনালি-বাদামি কাঁঠাল কাঠ, যার ঘ্রাণে তিনি শৈশবের বাবার ওয়ার্কশপ খুঁজে পান। পলিশ করলে যার গায়ে ফুটে ওঠে একটি নিঃশব্দ সৌন্দর্য।

স্যার প্রথান শিক্ষককে বোঝালেন,

“কাঠের কাজ মানে শুধু হাতুড়ি বা করাত নয় - এটা একটা ভাষা। নকশা তার ব্যাকরণ, কাঠের গন্ধ তার ছন্দ। আমরা যদি এটা ঠিকভাবে শেখাতে পারি, তাহলে এটা হবে গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প আর জীবনের এক মিলিত পাঠ।” তাঁর প্রধান যুক্তি হলো, যে হাত দিয়ে কাজ করে সে শ্রমিক; যে হাত এবং মস্তিষ্ক দিয়ে কাজ করে সে কারিগর; কিন্তু যে তার হাত, মস্তিষ্ক এবং হৃদয় দিয়ে কাজ করে সে একজন শিল্পী। তাই চাই “কাঠের কাজ” নামে একটি সুপরিকল্পিত পাঠ্যবিষয়, কাঠের কাজ হবে ক্লাসের মতো বিষয়:

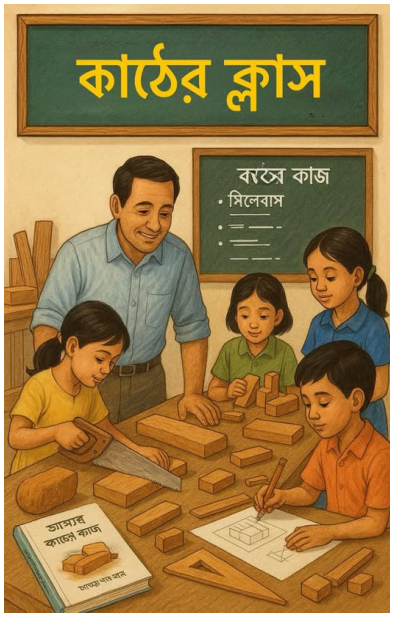

• প্রতি সপ্তাহে ২টি ক্লাস • নির্দিষ্ট সিলেবাস: STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). যেখানে, পরিমাপ, কাঠের ধরন, সরঞ্জামের পরিচিতি, নিরাপত্তা জ্ঞান, নকশা আঁকা (২ D থেকে ৩ D তে নেওয়া), কাটা, জোড়া লাগানো, পলিশ, মূল্যায়ন ও বাজার মূল্য সঙ্গে পূর্ণ ডকুমেন্টেশন। ছোট ছোট প্রজেক্ট যা কিছু তৈরী ও প্রদর্শন “আমার কাঠের কাজ: শিখি, গড়ি, ভাবি” করবে। স্কুলে “কাঠের কাজ” ক্লাস শুরু হওয়ার তৃতীয় সপ্তাহেই রেজওয়ান স্যারের চোখে পড়ে শাওন নামের এক ছাত্র - সপ্তম শ্রেণির। আগেও সে ক্লাসে বসে থাকত, কিন্তু মুখ খুলত না, খাতায় দুই লাইন লেখার পর দৃষ্টি ঘোরাত জানালার বাইরের গাছে। রেজওয়ান স্যার তাকে “সহকারী ডিজাইন লিডার” বানিয়ে দিলেন নকশা ক্লাসে তার কাজ হলো অন্যদের কাঠের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও কোণ মাপা, তার পর কতো ঘন সেন্টিমিটার (cubic centimeter) কাঠ হলো তা বের করা, দেখানো ও সাহায্য করা। এখানে অংকের ব্যবহার আছে, দেখা ও অংকের মিল খোঁজার ব্যাপার আছে।

চার সপ্তাহের মাথায় শাওন নিজ হাতে একটা ছোট তিন-কৌণিক বইয়ের স্ট্যান্ড বানিয়ে ফেলল। স্ট্যান্ডের নিচে নিজের নাম খোদাই করে লিখল “শাওনের সৃষ্টি”। অন্যদিকে পঞ্চম শ্রেণির নীলা, যে আগে কোনো প্রশ্ন করত না, “বোকা মেয়ে” বলেই সবাই ডাকে। সে নিঃশব্দে একটা কাঠের ফলকে আঁকল একটা পাখি নিজের মতো। কেউ শেখায়নি, কিন্তু রঙের ছাপ আর কাঠের রেখায় ফুটে উঠল তার ভাবনা।

স্যার যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি পাখির নকশা বানালে কেন?” নীলা বলল, “পাখি উড়ে যায়... আমি ওদের মতো হতে চাই।” তার নকশার সুন্দর্য্য, ঘষে পালিশ সব মিলিয়ে কাঠের দেয়াল ঝুলন্ত শিল্প হয়ে উঠল, তখন পুরো স্কুল চুপচাপ তাকিয়ে রইল।

যাদের আমরা ‘চুপচাপ’ ভাবি, তাদের মনেই জমে থাকে সবচেয়ে উজ্জ্বল গল্প। শুধু প্রয়োজন, কাঠের গন্ধে, হাতের ঘামে, আর শিক্ষকের সাহচর্যে তাকে জাগিয়ে তোলার। এটা শুধু শিক্ষার কৌশল নয়, এটা একধরনের মানবিক আহ্বান। স্কুলে “কাঠের ক্লাস” চালু হওয়ার পর অন্য শিক্ষকরা অবাক হয়ে দেখেন, গণিতে দুর্বল বাচ্চা এখন জ্যামিতিতে এ সাবলীল, আর যে চুপচাপ থাকত সে এখন নিজের project present করছে। একই ভাবে “কাঠের ক্লাস” সরবরাহ করতে থাকলো সব জ্যামিতিক আকৃতি আর পদার্থ বিদ্যার সকল উদহারণের কাঠামো, যেমন গতি বিদ্যার জন্য বিভিন্ন কোণের রেল ও পরিমাপ। শিক্ষার নতুন ধারা যেখানে documentation, planning, teamwork আর craftsmanship একসাথে চলে।

যখনি কিছু বানানো হয়, তখন তার উদ্যোক্তা (entrepreneurship) টাকে সঙ্গে রাখলে জীবন চলার শিক্ষা পরিপূর্ণ হয়। কাঠ আর মেধা মিলে ব্যবসা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠার তো গড়াই যায়। শাওনের স্ট্যান্ড মেলায় কেউ ৪০ টাকা দাম দিতে চায় শুনে সে বলল, “আমি আরো ভালোটা বানাবো” - এভাবেই উদ্যোক্তার বীজও বোপন হয় “কাঠের ক্লাস” থেকে। কাঁঠাল কাঠের গন্ধে জেগে উঠেছে এক নতুন পাঠ্যভিত্তিক স্বপ্ন একটা বই, একটা ক্লাস, আর একটা জাতিকে হাতে-কলমে শিক্ষার পথে নিয়ে যাওয়ার গল্প। জাতীয় ফল কাঁঠালের কাঠ দিয়ে তৈরি সেই স্বপ্ন, যেখানে আছে দাদুর হাতের কাঠের বাক্স, দাদির কাঠের পীড়ার গল্প, আর প্রতিটি শিশুর নিজের হাতে গড়া ভবিষ্যতের কাঠামো।

“চোখে চোখ পড়লেই শিক্ষা শুরু হয়।”

রাজশাহীর গোদাগাড়ির সীমান্তঘেঁষা এক সরকারি বিদ্যালয়। পেছনের বেঞ্চের ছাত্র, রাফি মাঠে নামলেই যেন তার মধ্যে জেগে ওঠে একজন দলনেতা, পেছনের বেঞ্চের ছাত্র, শাওন ছবি আঁকে নিঃশব্দে, কিন্তু বন্ধুদের ব্যাগে মাঝে মাঝে চুপিচুপি কার্টুন এঁকে রাখে, পেছনের বেঞ্চের ছাত্র, অপু সারাদিন হাসে, গান গায়, আর সবকিছুর মধ্যে রস খুঁজে নেয়।

ফিরোজ স্যার, যিনি বলেন, “প্রতিটি শিশু আলাদা, প্রতিটি সৃষ্টিশীলতা মূল্যবান”।

রাফি, শাওন ও অপু ওরা তিনজন ক্লাসে সবসময় পেছনের বেঞ্চে বসে।অন্যরা ভাবে অমনোযোগী ও দুষ্ট। কিন্তু তারা জানে, ওদের বন্ধুত্বের ভিত শক্ত - পেছনের সারির ছাত্রদের বন্ধুত্ব বরাবরই একটু অন্যরকম হয় - ওরা একে অপরকে মনখোলা আড্ডায়, খেলাধুলায়, সহানুভূতিতে ও দুষ্টুমিতে খুঁজে পায়। এই সম্পর্ক একধরনের অবলম্বন, যা তাদের সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, যদিও বাইরে থেকে সেটা অনেকে খেয়ালই করেন না।

যখন রাফি বকুনি খায় অঙ্ক না পারায়, তখন শাওন তাকে বলে, “দোস্ত, তোর পায়ের জোরে গোল হয়। অঙ্কের ভুল হয় হোক।” অপু মাঝে মাঝে গান গেয়ে ওদের মন ভালো করে দেয় - “দোস্তরে হারাইলে বুঝি মন কয়… ” বন্ধুর সঙ্গে থাকাই যেন ওদের প্রয়োজনীয় আনন্দ। অনেক টা এমন, ওরা ওদের সঙ্গে থাকার জন্যই একটু জোরে হাসে, একটু কম কাঁদে ও আর অনেক বেশি খুশি থাকে।

ফিরোজ স্যার একসময়ে পেছনের বেঞ্চের ছাত্র ছিলেন। তিনি খুব ভালো করেই জানেন সামনের বেঞ্চে বসা ভালো ছাত্ররাই ভবিষ্যতে শিক্ষক হন, তাঁরা পেছনের বেঞ্চ (Back Bencher) এর ছাত্রদের বুঝতেই চান না, এনিয়ে স্কুলের শিক্ষকদের ঘরে অন্য সব শিক্ষকদের সাথে ফিরোজ স্যারের অনেক কথা হয়েছে। স্যার জানেন, সামনের বেঞ্চাররা কেবল শিক্ষকদেরই পছন্দ, পিছনের বেঞ্চাররা পুরো ক্লাসেরই পছন্দ।

“The best brains of the nation may be found on the last benches of the classroom.” - Abdul Kalam

প্রতিদিনের মতো স্কুলের ঘণ্টা বাজে। রাফি, শাওন, অপু - এই তিনজন পেছনের বেঞ্চে বসে। কারও হাতে পেনসিল নেই, কারও খাতা ছেঁড়া, কেউ পেছনের পাতা দিয়ে ছবি আঁকে। বইয়ের বাঁধাধরা নিয়মে ওদের মন হাঁপিয়ে ওঠে।

একদিন ফিরোজ স্যার বললেন, “আজ থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার হবে - পেছনের সারির দিন”।

সেদিন রাফিকে বলা হলো তার প্রিয় খেলাটা বোঝাতে - “তুমি বুঝিয়ে দাও, গোল করার সময় তুমি কীভাবে শূন্যে বলটাকে মাপো?” রাফি বোর্ডে গিয়ে এমনভাবে বল ব্যাকস্পিন, গতিবেগ, আর শরীরের ভঙ্গি বোঝায় - ক্লাসে সবাই হা করে তাকায়। পরের সপ্তাহে শাওন বোঝায় তার আঁকা ছবিতে কীভাবে গল্প বলা যায়। অপু একদিন গ্রামের লোকসংগীত গেয়ে শোনায় - ক্লাস নিঃশব্দ।

একদিন ক্লাসে ফিরোজ স্যার সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় ভয় কী?” রাফি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। বলল, “আমার সবচেয়ে বড় ভয়, আমি বুঝি কোনোদিনই ভালো ছাত্র হতে পারবো না। কারণ আমি খেলার নিয়ম জানি, ফ্রি-কিক নিতে পারি, কিন্তু ভাষার ব্যাকরণের কুল কিনারা পাই না, মাথা ঘোরে।”

ফিরোজ স্যার ভাবেন, ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ করে পেছনের সারিতে বসা, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে না ফেলা, বারবার ব্যর্থতা দেখলেও স্বপ্ন ছাড়তে না চাওয়া, শিক্ষার্থীদের জন্য ভীষণ শক্তিশালী অনুপ্রেরণা হতে পারে।

“সফলতা মানে, এক ব্যর্থতা থেকে আরেক ব্যর্থতায় যাওয়া, কিন্তু উৎসাহ হারানো নয়।” - উইনস্টন চার্চিলের।

তারপর স্যার রাফিকে জিজ্ঞেস করলেন,

“গতবারের অঙ্ক পরীক্ষায় কত পেয়েছিলে?”

রাফি কুণ্ঠিত স্বরে বলল, “ষোল…”

“এইবার চেষ্টা করেছ?”

“হ্যাঁ স্যার, কিন্তু আবার ভুল করেছি।”

“ভালো! কারণ যারা চেষ্টা না করে হাল ছেড়ে দেয়, তারা মরে যায় ভিতরে ভিতরে। কিন্তু যারা ভুল করেও চেষ্টা করে যায়, তারাই একদিন সঠিক উত্তর পায়।”

পরিবর্তনের শুরু, সেই দিনের পর ফিরোজ স্যার প্রতিদিন ক্লাস শুরু করতেন পেছনের সারি দিয়ে। তিনি রাফিকে ছোট ছোট দায়িত্ব দেন - বোর্ডে প্রশ্ন লেখা, ক্লাসের টুল গোনা, খাতা বিলানো।

দিন যায়…

রাফি আবার ভুল করে।

আবার।

আবারও।

কিন্তু এবার সে হারে না। কারণ সে জানে,

“আমি চেষ্টা করছি মানেই আমি চলছি।”

একদিন স্যার ক্লাসে বললেন,

“আজকের ‘সপ্তাহ সেরা সমস্যার সমাধানকারী’ হলো - রাফি!”

সবাই হতবাক।

ফলাফল বের হলে দেখা গেল, রাফি এবার ক্লাসে ষষ্ঠ!
স্যার বলেন,
“তুমি সামনে না বসেও সামনে চলে এসেছো— নিজের চেষ্টা দিয়েতুমি প্রমাণ করেছো, ‘পেছনের সারি’ মানে ‘পেছনে পড়ে থাকা’ নয়।”

ফিরোজ স্যার জানেন অনেক কিছুই করতে হবে, যেমন,
- পেছনের সারির ছাত্রদের বিষয়বস্তুতে গভীর অনাগ্রহ,
- চোখে চোখ রেখে পড়ানো না হওয়া,
- ক্লাসরুম ডিজাইনের সীমাবদ্ধতা,
- এবং এর উত্তরণে গঠনমূলক, সমতা-ভিত্তিক ক্লাসরুম সংস্কার।
ক্লাসে শুধু ক্লাসের সামনের সারির কয়েকজনই প্রশ্ন করে, চোখে চোখ রাখে, বাকিরা যেন প্রাচীন দেয়ালের পেছনে আটকে থাকা মুখ। তাদের চোখে চোখ রেখেও কিছু বলা হয় না, কিছুটা দূরত্ব কিছুটা না চেনার জগৎ, ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে।
ফিরোজ স্যার স্কুলে নিয়ে এলেন একটি চাকা-ওয়ালা চেয়ার। বসে ঘুরে ঘুরে পড়াতে লাগলেন, ক্লাসের মাঝখানে গিয়ে বললেন,
“আজ আমি আর শিক্ষক নই, আমি একজন সহশিক্ষার্থী। চোখে চোখ রেখে শেখা হবে আজ।”
এক সপ্তাহ পর স্যার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসালেন এক আলোচনায় - “তোমরা নিজেরা কেমন ক্লাসরুম চাও?” শাওন বলল,
“যেখানে সবাই চোখে চোখে বসতে পারি।”
রাফি বলল,
“একটা গোল জায়গা, মাঝখানে আপনি থাকবেন, আমরা ঘিরে।”
স্কুলের মাঠের পাশে খালি একটি ঘরে তৈরি হলো “ফিশ আই ক্লাসরুম” - যেখানে সবাই সমান উচ্চতায়, সমান গুরুত্বে। যেখানে নেই কোন Back Bencher.
একদিন গনিত ক্লাসে অপু হঠাৎ প্রশ্ন করলো,
“স্যার, ৩/৪ এর মানে কি এমন কিছু, যেখানে আছে চার ভাগের তিন ভাগ, যাকে ০.৭৫ ও বলা যাবে?”
স্যার অবাক হয়ে হাসলেন -
এই ছেলেটাই আগে খাতা ছিঁড়ে খেলত ক্লাসে।
এখন চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করছে!
শিক্ষা তখনই সঞ্চারিত হয়, যখন চোখে চোখ পড়ে, হৃদয়ে হৃদয় ছোঁয়।
চাকা-ওয়ালা শিক্ষক চেয়ারে বসে ক্লাস নেওয়া মানে শুধু সুবিধা নয় - এটা শিক্ষকতার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।
“Fish-eye” ক্লাসরুম শুধু ডিজাইন নয়, এটা এক সৃজনশীল আন্দোলন - যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী দাঁড়ায় সমান রূপরেখায়।

ধনুক-ভাঙা পণ – ৪৯

“যেখানে জীবনই পাঠ্যবই।”

কুড়িগ্রামের প্রত্যন্ত চরাঞ্চল, চরপদ্মা সরকারি বিদ্যালয় - টিনের ছাউনি দেওয়া আধাপাকা, জরাজীর্ণ এক বিদ্যালয়। সুমন স্যার - সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত এক তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষাগত গবেষক। স্থানীয় জনগণ কৃষক, রাজমিস্ত্রী, মাঝি, হোমিও ডাক্তার, ইমাম, নারী উন্নয়নকর্মী।

সুমন স্যার যখন চরপদ্মা সরকারি বিদ্যালয়ে যোগ দিলেন, তখনই বুঝতে পারলেন, এখানে ঘাটতি কেবল শিক্ষকসংখ্যার নয়, বরং শিশুদের শেখার আগ্রহেও ঘাটতি রয়েছে। নেই নিরাপদ পরিবেশ, নেই পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোনো জানালা। শ্রেণিকক্ষে নেই টেবিল-চেয়ার, নেই লাইব্রেরি, খেলার মাঠ তো দূরের কথা। বর্ষার দিনে স্কুল বন্ধ, শীতের সকালে কুয়াশা ঢেকে দেয় গলার স্বর।

তাঁর চোখে ভেসে ওঠে একটি দৃঢ় বিশ্বাস, “শিক্ষায় কোনো আপোষ চলে না। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো যতই দুর্বল হোক না কেন, পাঠদানের গুণগত মান কখনো দুর্বল হতে পারে না।“

সুমন স্যার B.Ed এবং M.Ed ডিগ্রি অর্জন করেছেন। শিক্ষাগত গবেষণার মাধ্যমে তিনি শিখেছেন কিভাবে শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতা আকর্ষণীয়, মানবিক ও বাস্তবজীবনভিত্তিক করা যায়। তাঁর বিশ্বাস, “নিরাপদ পরিবেশ ও চ্যালেঞ্জিং পাঠক্রম মানেই বিদেশি বই বা দালানকোঠা নয় বরং তা গড়ে ওঠে হৃদয় দিয়ে, গড়ে ওঠে সমাজের অংশগ্রহণে।”

তাঁর স্বপ্নের রূপরেখা ছিল পাঁচটি স্তম্ভে গঠিত:

১. প্রাসঙ্গিক ও চ্যালেঞ্জিং পাঠক্রম – যা ছাত্রদের কৌতূহল জাগাবে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। ২. জীবনদক্ষতা শেখানো – সমস্যা সমাধান, যোগাযোগ ও সহযোগিতার মনোভাব গঠনে কার্যকর হবে। ৩. উচ্চ প্রত্যাশা জাগানো – যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখে। ৪. সহনশীলতা ও সহমর্মিতা শেখানো – ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচয় ঘটিয়ে। ৫. সহ-কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ – ক্লাব, খেলা, শিল্পকলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

প্রথম উদ্যোগ হিসেবে তিনি চালু করলেন “সকালের সুর” প্রতিদিন সকালে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি গোল বৃত্তে বসে হাত ধরাধরি করে বলে, “আমি নিরাপদ। আমি প্রিয়। আমি শেখার জন্য এসেছি।” যদি কেউ দেরি করে আসে, তাকে শাস্তি দেওয়া হয় না বরং জড়িয়ে ধরে বলা হয়: “আজকের দিনটা হোক তোমার সেরা!” সপ্তাহে একদিন পালিত হয় “প্রশ্ন দিবস”, যেখানে শিক্ষকের ভূমিকা নেয় শিক্ষার্থীরা। তাদের সরল কিন্তু গভীর প্রশ্নে জেগে ওঠে ভাবনার দরজা: • “স্যার, পাখি কাঁদে না কেন?” • “আমরা এত গরিব কেন?” • “আপনি কেন আমাদের এত ভালোবাসেন?”

সুমন স্যার উত্তর দেন কখনো গল্পে, কখনো কবিতায়, আবার কখনো হাতে-কলমে কাজে। এক পিতা এসে বললেন, “স্যার, আগে আমার ছেলে স্কুলে যেতে চাইত না। এখন সে সকালে নিজে উঠে বলে আমি মানুষ হবো, সুমন স্যারের মতো।”

এক শুক্রবার সুমন স্যার ডেকে আনলেন গ্রামের ইমাম, মাতব্বর, মা-বোনেরা, দোকানদার, মাঝি ও তরুণদের। তিনি বললেন, “এই স্কুল আপনাদেরও। আপনারা না থাকলে শিক্ষার আলো এখানেই ঝিমিয়ে পড়বে।” তাঁর আহ্বানে গৃহীত হয় তিনটি প্রতিজ্ঞা:

১. প্রত্যেক অভিভাবক অন্তত মাসে একদিন স্কুলে আসবেন।

২. প্রতিটি পেশাজীবী ব্যক্তি বছরে অন্তত একদিন স্কুলে এসে নিজের কাজ শেখাবেন।

৩. গ্রামের লোকজন নিজের হাতে স্কুলের রং ও দেয়াল লিখন করবেন।

গ্রামের বিভিন্ন পেশাজীবী এলেন শিক্ষকের ভূমিকায়,

• কামার মাস্টার শিখালেন লোহার কাজ।
• দর্জি খালা দেখালেন জামা সেলাই।
• মুদি শেখালেন লাভ-ক্ষতির হিসেব।
• চাষি ভাই বুঝালেন গাছের যত্ন।

এইভাবেই জন্ম নেয় ‘জীবন পাঠ্যক্রম’, যেখানে বইয়ের পাশাপাশি শেখানো হয় বাস্তব জীবন।

সুমন স্যারের পরামর্শে গঠিত হলো “শিশু সুরক্ষা কমিটি” যারা নিশ্চিত করে,

• কোনো শিশু ঝরে না পড়ে,
• কেউ হেনস্তার শিকার না হয়,
• কেউ যেন সংসারের কাজে বাধ্য হয়ে স্কুল না ছাড়ে।

স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এক কৃষক দাঁড়িয়ে বললেন, “স্যার, আমরা অঙ্ক জানি না, ইংরেজিও বুঝি না। কিন্তু এখন আমরা বুঝি - আমাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্ব আমাদেরও।”

যেখানে প্রতিটি চেষ্টা স্বীকৃতি পায়, যেখানে ভুল শেখার সিঁড়ি হয়, সেখানে গড়ে ওঠে আত্মবিশ্বাসী শিক্ষার্থী। আর সেই সিঁড়ির প্রথম ধাপ গড়ে দেন একজন শিক্ষক ভালোবাসা, কল্পনা ও সাহসে ভর করে।

ধনুক ভাঙা পণ – ৫০

“ঘামে লেখা পাঠশালা”

বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে কেরানীগঞ্জ শহরের জিঞ্জিরার উপকণ্ঠে, চারিদিকে কারখানা আর লোহালক্করের মাঝে গড়ে ওঠা অস্থায়ী বিদ্যালয় সরকারি ও NGO এর উদ্যোগে। পূর্ব জিঞ্জিরা বিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয় সন্ধ্যায় (ঠিক মাগরিবের নামাজের পর) চলে দুই থেকে তিন ঘন্টা। শামসুল স্যার একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, যিনি বিশ্বাস করেন “জীবনের যে স্তরেই থাকুক, প্রতিটি শিশু শিক্ষার অধিকার রাখে।”

মেহেদী, ১৩-১৪ বছরের একটি মুখ, শিশুশ্রমিক, যার ভেতর পুড়ে-পুড়ে বেড়ে ওঠে স্বপ্ন।

এই জিঞ্জিরায় তৈরী হয় সবকিছু (made in Jinjira) বলে একটা বহুল প্রচলিত কথা আছে। এখানে বিভিন্ন প্রকার কারখানায় বিভিন্ন প্রকারের শ্রম লাগে, অভিজ্ঞ থেকে নবিস সব ধরণের। ছোট খাটো কাজের জন্য এখানে শিশুশ্রম খুবই প্রচলিত। আর তাই পূর্ব জিঞ্জিরা বিদ্যালয়ের সময় হলো, যখন কারখানা গুলো বন্ধ হয় তখন কারখানাগুলোর শিশু কর্মীরা স্কুলের সময় পায়। যে বয়সে তাদের বিদ্যালয়ে থাকার কথা সে বয়সে তারা কায়িক পরিশ্রম করে। অথচ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজে শিশুদের নিয়োগ বেআইনি। এখানে আইন নয়, চলে শুধু অভাবের বিধান। “পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি” - সুকান্তের কবিতার মতো, এখানে ক্ষুধা সবকিছু গদ্যময় করে তোলে।

শামসুল স্যার সবকিছু বুঝেশুনে চিন্তা করলেন, কিভাবে শ্রমজীবী শিশুদের পরিশ্রম, বাস্তব অভিজ্ঞতা, কায়িক মেধাকে লেখাপড়ার পাঠ্যক্রমে অর্থপূর্ণভাবে যুক্ত করা যায়? এরা কবিতার লাইন জানে না, কিন্তু জানে রিকশার চেন কতটা ঢিলা রাখলে চলে ভালো; এরা জানে না ইতিহাসের সাল, কিন্তু জানে কিভাবে দিনে তিনবার হিসেব করে চাল কিনে মা - কে দিয়ে আসতে হয়। এদের বিদ্যালয় শহরের কোচিং নির্ভর বিদ্যালয় নয়, এ যেন “ঘামে লেখা পাঠশালা”।

মেহেদীর দিন শুরু হয় ভোরবেলা - ছোট্ট হাতে কাঠের বাক্স ঠেলতে ঠেলতে সে গুদামে যায়, আবার সেই বাক্স ভরে কারখানায় দেয়। দুপুরে খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়, তারপর সন্ধ্যার আলো যখন ম্লান হতে শুরু করে, ঠিক তখনি এক এক করে আসতে থাকে ছোট ছোট পা - ধুলামাখা, ক্লান্ত, কিন্তু আশায় উজ্জ্বল মেহেদীরা। মেহেদী দেখে একটা দৃষ্টি, যেখানে গলির শেষ প্রান্তে দেখা যায় নিজের ছোট্ট একটা দোকান, নাম হবে “মেহেদী স্টোর”, যেখানে থাকবে বইয়ের তাক, ছেলেমেয়েদের খেলনা আর খুচরো বিস্কুট।

একজনের চোখে আছে চিমনি থেকে নেমে আসা ধোঁয়া, আরেকজনের হাতে কাঁচের টুকরো। কেউ সারাদিন বাসনের দোকানে কড়া ঘষে, কেউ রিকশাওয়ালার সাথে বোঝা টানে। তবু তারা আসে - এই স্কুলঘরে। শিক্ষক শামসুল স্যার মেহেদীকে প্রতিদিন লক্ষ্য করেন- এই ছেলেটি সব কিছু মনে রাখে, কিন্তু কাগজে লিখতে গেলেই যেন হোঁচট খায়। গাণিতিক প্রশ্ন সে মুখে করে ফেলতে পারে, কিন্তু কলম ধরলে ভয় পায়। স্যার ঠিক জানেন, পড়া বা বলা কল্পনাশক্তি থেকে আসে, অন্যদিকে লেখা আসে আত্ম-প্রকাশ থেকে। কলমে যে ভয় এটা আর কিছুই না আত্মবিশ্বাসের অভাব। সারাদিন বড় দের মাঝে থাকে, সমবয়সিদের সাথে খেলার সময় নেই। আত্ম-অবমূল্যায়নে ভুগছে শ্রমজীবী শিশুরা।

একদিন স্যার জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি বক্সের ওজন কিভাবে বুঝো?” মেহেদী হেসে বলল, “স্যার, আমি বুঝি কোন বাক্স ভারী, কোনটা হালকা। তুলতে গেলেই বোঝা যায়। দুটো হাত আর একটা ঘাড় থাকলেই যথেষ্ট।”

সেদিন থেকে স্যার স্কুলে নতুন কিছু শুরু করলেন, শ্রমজীবী ছাত্রদের অভিজ্ঞতা দিয়ে লেখা হয় পাঠ। • অঙ্কের ক্লাসে বাক্সের ওজন নিয়ে হয় গাণিতিক সমস্যা (৫ কেজি হলে কয়টি বাক্সে ২৫ কেজি হবে?), • বাংলা ক্লাসে রচনা লেখা হয় “আমার একটি কাজের দিন”, • বিজ্ঞান ক্লাসে আলোচনা হয়- “লিভার পদ্ধতি কিভাবে কাজ করে”, “ট্রলি কিভাবে বানানো যাবে”, • ইতিহাস ক্লাসে তারা লেখে বন্দর শ্রমিকদের ইতিহাস, যারা কখনও ব্রিটিশ আমলে ছিলেন কুলি, এখন দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি।

এভাবেই মেহেদী, আর তার মতো আরও ৯ জন ছেলেমেয়ে স্কুলে শুধু পাঠ শিখছে না - তারা নিজেদের জীবনের পরিশ্রমকে শিক্ষায় রূপান্তরিত করছে। একদিন একটা বিশেষ অনুশীলন হলো, “তোমার প্রতিদিনের কাজ থেকে তুমি কী শিখো?” মেহেদী লিখল, “আমি শিখি ভার বহন করতে হয় একা নয়, একসাথে। যেমন দুইজনে একটা ভারী বাক্স সহজে তোলা যায়।”

তিনি জানতেন, এই ছেলেরা শুধু স্কুলে আসে না - এরা প্রতিদিন জীবন থেকে পড়ে আসে। “শ্রম শুধু দেহের পরিশ্রম নয়, তা এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাও। দরকার শুধু সেই ঘামকে ভাষা দেওয়া, সেই ক্লান্তিকে জ্ঞান রূপে রূপান্তর করার সাহস।” শামসুল স্যার ভাবেন, শিশু শ্রম ও শিক্ষার দ্বন্দ্বের মাঝে মানবিকতা, কষ্ট আর সম্ভাবনার এক সূক্ষ্ম বুনন গেঁথে দিতে হবে। তাই স্যার শুরু করলেন এক নতুন উদ্যোগ “জীবন আর পাঠশালা জুড়ে থাকুক হাত ধরাধরি করে”।

দোকানদার, গার্মেন্টস মালিক, এলাকার লোকদের নিয়ে বৈঠক - “ওদের আমরা বদলাতে পারব না, কিন্তু শিক্ষা থেকে ছিটকে যেন না যায়, এটা নিশ্চিত করতে পারি।” চুক্তি হলো - দিনে ৬ ঘণ্টা কাজ করবে, তবে সন্ধ্যার ২ ঘণ্টা স্কুলে আসতে পারবে।

মাসের শেষে সবাই পাবে একখানা “জীবনপাঠ রিপোর্ট” - যেখানে লেখা থাকবে কী শিখল, কত বার স্কুলে এলো, কেমন ভাবছে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ছয় মাস পর এক বিশেষ দিন - মেহেদী তার মা’র হাতে নিজের বানানো একটা হিসাবের খাতা ধরিয়ে দিল। সেখানে ছিল:

• মজুরি • খরচ • সঞ্চয়• আর নিচে একটা ছোট্ট লক্ষ্য: “দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে দোকান দেব।”

সেদিন শামসুল স্যার চোখ মুছলেন, আর আকাশে উঠতে থাকা সন্ধ্যাতারাটির দিকে চেয়ে বললেন - “যদি শিক্ষা শিশুশ্রমকে পুরোপুরি থামাতে না পারে, অন্তত এমন হোক যে শিক্ষা তার সঙ্গে হাঁটুক - ধীরে হলেও, একদিন সে শিশুটিকে মুক্ত করবে।”

“স্বাস্থ্য শেখালে, ভবিষ্যৎ সুস্থ হয়।”

ঠাকুরগাঁও জেলার সীমান্তঘেঁষা একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় – রহিমপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। ডা. ইমতিয়াজ হাবিব এম,বি;বি,এস, বাংলাদেশ সরকারের “শিক্ষাই শক্তি” প্রকল্পে একটি নিয়ম চালু আছে, BCS পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হলে, আবেদনকারীর বিদ্যালয়ে কমপক্ষে এক বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো:

1. মেধাবী তরুণদের প্রাথমিক শিক্ষায় সম্পৃক্ত করা।
2. শুধু বিষয়ভিত্তিক নয়, বরং সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা।
3. নতুন প্রজন্মকে জানানো যে, শিক্ষা মানে শুধু পাস করা নয়, বরং মানুষ গড়া।

এই প্রেক্ষিতে, গল্পের চরিত্র – ডা. ইমতিয়াজ হাবিব – একজন সদ্য M,B;B,S পাশ করা তরুণ চিকিৎসক। তার লক্ষ্য বি.সি.এস স্বাস্থ্য ক্যাডার, কিন্তু তার আগে তাকে পূরণ করতে হবে এই শিক্ষকের দায়িত্ব। তিনি শুধু দায়িত্বপালন নয়, স্বপ্নে ও কৌশলে এই সময়টাকে কাজে লাগাতে চান।

ডা. ইমতিয়াজ হাবিব স্যারের পাঠদান শুরু হয় একটু ব্যতিক্রমীভাবে –

- প্রতিদিনের শুরুতে ১ মিনিট স্বাস্থ্য-অনুশীলন: শ্বাস-প্রশ্বাস, চোখ বন্ধ করে স্থির হওয়া।
- সপ্তাহে একদিন হয় “জীবনের পাঠ” – যেখানে তিনি পড়ান,
- কীভাবে হাত ধুতে হয়,
- কীভাবে ছোটখাটো চোটের প্রাথমিক চিকিৎসা করা যায়,
- কেন টিকাদান দরকার,
- শিশুরা কী খেলে শক্তি পায়, কী খেলে অসুস্থ হয়।

ইমতিয়াজ স্যার বোঝান, “আজ থেকে তোমরা শুধু বিজ্ঞান শিখবে না, নিজেদের শরীর, মন, অভ্যাস, খাদ্য আর ঘুম নিয়েও জানতে শিখবে। তোমরা কি জানো, স্কুলের পরীক্ষার মতোই শরীরেরও পরীক্ষা দরকার। যেটা হবে – তোমাদের স্বাস্থ্যকার্ড।”

তিনি শুরু করেন এক অভিনব উদ্যোগ,“স্বাস্থ্যকার্ড”।

এই কার্ডে থাকবে:

- উচ্চতা ও ওজন
- রক্তের গ্রুপ
- চোখ ও দাঁতের পরীক্ষা
- ব্লাড প্রেসার ও হিমোগ্লোবিন লেভেল
- খাবার ও ঘুমের অভ্যাস
- ঋতু পরিবর্তনের সময়কার অসুস্থতার হিসাব
- নিজস্ব “হেলথ নোট” – যেখানে ছাত্রছাত্রীরা নিজের শরীর সম্পর্কে নিজের অনুভব লিখবে।
- ডাক্তার স্যারের লেখা উপদেশ।

ঠাকুরগাঁও জেলার “স্কুল স্বাস্থ্য কেন্দ্র” থেকে দল এসে সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গেলেন, X ray করা হলো, চোখ ও কান পরীক্ষা করা হলো। ডা. ইমতিয়াজ স্যার সঙ্গে থেকে সব করালেন, যাদের টিকা দেওয়া ছিলো না তাদের টিকার ব্যবস্থা করা হলো। রহিমপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে একটা স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরী হলো।

রাফিদ প্রতিবার পরীক্ষা এলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে – জ্বর, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা। স্যার লক্ষ্য করেন, তার ওজন বয়স অনুযায়ী অনেক কম, এবং সে সকালে নাস্তা খায় না। স্যার নিজে ছোট একটি খাবার চার্ট করে দেয় - “ভাত + ডাল + একটা ডিম” প্রতিদিন সকালে, আর রাতে এ গ্লাস দুধ এবং বাবা-মাকে ডেকে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেন।

স্যার ছাত্রদের বুঝাতে গেলেন, “সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো স্বাস্থ্য” আর তখনি মনে পড়লো একটা “স্ফিটনেস ক্লাব” করলে কেমন হয়! ছাত্ররা নিশ্চই আনন্দ পাবে, উপকারেও আসবে। ইমতিয়াজ স্যার স্কুলের একটি পুরনো স্টোররুম পরিষ্কার করে বানালেন ছোট একটা “ফিটনেস ক্লাব”, পুরনো সাইক্লিং মেশিন, স্কিপিং রোপ, হালকা ডাম্বেল দিয়ে।

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত এবং বসন্ত। প্রতিটি ঋতু দুই মাস ধরে চলে এবং প্রকৃতির উপর এর বিশেষ প্রভাব। তাই ঋতুর পরিবর্তনের সচেতনতা ছাত্রদের জানা দরকার।

তিনি ক্লাসে বোঝান -

- “বর্ষায় জ্বর হবে যদি পা ভিজে স্কুলে আসো, তাই কিভাবে পা শুকনো রাখতে হয় তা শেখো।”
- “শীতে সকালের প্রথম উষ্ণ গরম পানি খাও—না হলে কাশি-বুকে বসে যাবে।”
- সংক্রামক রোগ গুলো নিয়ে ভালো ভাবে বুঝালেন। COVID-19 নিয়ে কতো কথা বললেন ছাত্রদের।

এই সকল বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে স্কুলের নোটিস বোর্ডে ঝুলানো হয় “ঋতুচক্র ও স্বাস্থ্য” পোস্টার।

আলোচনাচক্র “স্বাস্থ্য কথন”, প্রতি মাসে একবার: মেয়েদের জন্য “নারী স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা” সেশন। ছেলেদের জন্য “খাদ্য, ঘুম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ” নিয়ে আলোচনা।

এর মধ্যে এক ছাত্রের কণ্ঠস্বরে পুরুষালি স্বর এসেছে, সবাই এ নিয়ে বেশ বলা বলি ও হাসা হাসি করছে। এ সুযোগে স্যার ছাত্রদের বুঝালেন, বয়ঃসন্ধির সময় ১১ থেকে সাড়ে ১৪ বছর বয়সের মধ্যে, ছেলেদের কণ্ঠস্বর পুরুষালি স্বরে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। হরমোনের পরিবর্তনের কারণে কণ্ঠস্বর ঘন এবং লম্বা হতে শুরু করে, যার ফলে এই কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয়। ডাক্তার স্যার কণ্ঠনালীর ছবি দেখালেন, শব্দ আমরা কিভাবে মুখে বলি এবং তা তরঙ্গ হয়ে বাতাসে ভেসে আমাদের কানে আসে তা বুঝালেন। ছাত্রদের উদসাহর যেন শেষ নেই।

স্বাস্থ চেতনা পাবার পর ছাত্ররা তাদের ইচ্ছা মতো স্বাস্থ নিয়ে বিভিন্ন সহায়ক গ্রুপ গড়ে তোলে। যেমন, শিখা ও তার বন্ধুরা “স্বাস্থ্য বন্ধু”, “প্রতিদিনের স্বাস্থ্য”, কতো ধাপ হাঁটা হলো, দিনে কতো কেলোরি আমাদের প্রয়জোন হয়, কতো গ্লাস পানি পান করলো ইত্যাদির একটা চার্ট করে দেখা। স্কুলের পাশের মাঠে বানানো হয় “হেলথ রুট” – ১০ মিনিট হাঁটা/দৌড়।

এক বছরের শেষে:

স্কুলে এক আলো ঝলমলে দিন – স্বাস্থ্য প্রদর্শনী, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা নিজের স্বাস্থ্যকার্ড দেখায়, স্বাস্থ্য পোস্টার টাঙায়, আর নিজেদের লেখা “স্বাস্থ্য কবিতা” পড়ে শোনায়।

রাফিদ দাঁড়িয়ে বলে – ‘“স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল" - সুস্থ শরীর ও মন ছাড়া জীবন ধারণের অন্যান্য বিষয়গুলো উপভোগ করা কঠিন। শারীরিক অসুস্থতা দৈনন্দিন কাজকর্মকে ব্যাহত করে এবং মানসিক কষ্ট সৃষ্টি করে।‘

ডা. ইমতিয়াজ স্কুলে চালু করেন একটি ছোট প্রকল্প – স্বাস্থ্যবাড়ি, যেখানে সপ্তাহে একদিন গ্রামের মা-বোনদের জন্য ছোট স্বাস্থ্যশিক্ষা ক্লাস নেন তিনি। এতে শিক্ষকতা ছাড়াও গ্রামের মানুষ তাকে ভালোবাসায় জড়িয়ে ফেলে।

এক বছরের শেষে, তিনি BCS পরীক্ষার জন্য ঢাকায় ফিরে যান। স্কুলের দেয়ালে তার হাতে আঁকা বাক্যটি রয়ে যায়: “স্বাস্থ্যই শিক্ষা, আর শিক্ষা মানেই ভবিষ্যতের জীবনচর্চা।

ধনুক ভাঙা পণ – ৫২

“স্কুল - বিশ্বাস শেখার জায়গা।”

জেনেভা ক্যাম্প, ঢাকার মোহাম্মদপুরে ঘিঞ্জি গলি আর ইটের দেয়ালের মাঝখানে বসবাস করে হাজার হাজার মানুষ, যাদের অনেকেই নাগরিক অধিকারের প্রান্তিক রেখাতেও জায়গা পায় না। সেই জেনেভা ক্যাম্পের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে একটি ছোট্ট স্কুল নাম “আলোপথ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র”, বড় সাইনবোর্ড নেই, তবু ভেতরে আছে শত শত শিশুর চাপা কৌতূহল, চেপে রাখা স্বপ্ন আর ক্লান্ত মায়েদের প্রার্থনা।

এই স্কুলেই একদিন নতুন শিক্ষক হয়ে যোগ দিলেন দেলোয়ার স্যার।

প্রথম দিনেই তিনি বুঝলেন, এই স্কুলে কোনো পাঠ্যপুস্তকই যথেষ্ট নয়। এখানে দরকার এক নতুন পাঠ্যক্রম ভরসার, ভালোবাসার, এবং মানসিক মুক্তির।

ক্লাসরুমে ঢুকে যখন বখাটে ছাত্রটা প্রশ্ন করলো “স্যার, আপনি থাকবেন কয়দিন?”

দেলোয়ার স্যার হেসে উত্তর দিলেন, “ততদিন থাকবো, যতদিন তোমাদের বিশ্বাস না জাগে যে পড়ালেখা করেও জীবন বদলানো যায়।”

পাঠ্যবইয়ের বাইরেও তিনি ক্লাসে নিয়ে এলেন ছবির খাতা, রঙ, গাছের পাতা, পাথর, চটের থলে, পুরনো ম্যাগাজিন। তিনি জানতেন, শিশুরা তখনই শেখে, যখন শেখাটা তাদের হৃদয়ের কথা বলে।

একবার এক মেয়ে সাবিনা, ক্লাসে বললো, “স্যার, আমি বড় হয়ে পোশাক ডিজাইনার হতে চাই।”

তখন থেকেই দেলোয়ার স্যার তার জন্য কাগজে জামার ডিজাইন আঁকতে শিখিয়ে দিলেন। অন্যরা বলতো, “স্যার, এটা কি পড়ালেখা?”

স্যার মুচকি হেসে বলতেন, “এটাই তো জীবনের অ আ ক খ।”

ধীরে ধীরে তিনি একটা নতুন নিয়ম চালু করেন - প্রতিদিন স্কুল শেষে যারা চায়, তারা থেকে যেতে পারে “ইচ্ছেমতো শেখা ক্লাস” এ। প্রথমে ২ জন, তারপর ৬ জন, পরে ২০ জন। খোলা আকাশের নিচে, বোর্ডে চক ঘষে ঘষে তিনি শিখিয়েছেন গুন, ভাগ, গল্পের গণিত। মাঝেমাঝে শিখিয়েছেন “নামে নয়, কাজে বড় হওয়া যায়”। পঞ্চম শ্রেণির এই “ইচ্ছেমতো শেখা ক্লাস” শিক্ষার পরিবেশ কে করলো উদার ও ছাত্র বান্ধব। ‘ইচ্ছেমতো শেখা ক্লাস’ ধীরে ধীরে হয়ে উঠলো ‘জীবন শেখা ক্লাস’।

দেলোয়ার স্যার শিক্ষার্থীদের দিয়ে একদিন একটি স্মৃতিচারণার দেয়াল বানালেন, যার এক পাশে ছাত্ররা লিখলো তাদের শৈশবের দুঃখের গল্প, অন্য পাশে তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

তিন্নি লিখলো: “আমার বাবা রাতে কাজ করে। আমি চাই বাবাকে আর রাতে না কাজ করতে হয়।”

রাশেদ লিখলো: “আমি একদিন স্কুলে পড়াবো, যেমন দেলোয়ার স্যার পড়ান।”

স্যার শুধু পড়াতেন না, তিনি শোনাতেন গল্প এপিজে আব্দুল কালাম, মালালা ইউসুফজাই, নেলসন ম্যান্ডেলা, এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের গল্প।

এক বছর পর জেনেভা ক্যাম্পের সেই স্কুলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেলো - একটা ছোট পাঠশালা, যার ফলাফলে চমকে উঠেছে মোহাম্মদপুর শিক্ষা অফিস। ৮০% ছাত্রছাত্রী পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

সাবিনা, যে আঁকতো জামার ডিজাইন, এখন সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাশেদ এখন ছোটদের পড়ায় স্যারের অনুরোধে স্কুল ছুটির পর।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের এক শিক্ষাপ্রশাসক স্কুল পরিদর্শনে এসে বললেন,

“এটা কি এনজিওর প্রজেক্ট?”

দেলোয়ার স্যার মাথা নেড়ে বললেন,

“না স্যার, এটা স্বপ্নের প্রজেক্ট।”

একটি সন্ধ্যায় আকাশে বেলুন ওড়ানো হলো প্রতিটি বেলুনে একটি করে স্বপ্নের কাগজ। কেউ লিখেছে, ‘আমি ডাক্তার হবো’, কেউ লিখেছে ‘আমি আবৃত্তিকার হবো’, আর কেউ লিখেছে ‘আমি দেলোয়ার স্যার হবো।’”

তারপর, স্যারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ছেলে। রাশেদ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, “স্যার, আপনি যখন চলে যাবেন, তখন এই ক্লাসটা কি থেমে যাবে?”

দেলোয়ার স্যার চোখে জল নিয়ে বলেন,

“না রে, আমি তো তোমাদের মাঝেই থেকে যাবো তোমাদের সাহস আর স্বপ্নের ভেতর।”

“সময় নয়, আলোই ঠিক করে— কোথায় স্কুল।”

দরাপপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাওরপাড়, সুনামগঞ্জ, দরাপপুর হাওরঘেরা গ্রাম, যেখানে বর্ষায় পানি আর শীতে পাখিরা আসে অতিথি হয়ে। এই গ্রামের বুকে দাঁড়িয়ে আছে দরাপপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৯৩৬ সালে স্থানীয় মানুষদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা এক শিক্ষার বাতিঘর। স্কুল বলতে এখন একটি বিল্ডিং, চারটি কক্ষ, তার তিনটি ক্লাসরুম, একটি অফিস। শিক্ষক মাত্র দুইজন।

এই প্রান্তিক স্কুলেই যোগ দেন তরুণ শিক্ষক ফিরোজ স্যার। আগেই বুঝেছিলেন, দরকার বইয়ের বাইরে গিয়ে শিক্ষাকে ছুঁয়ে দেখা, সময়ে বাঁধা না থেকে সময়কে প্রশস্ত করে নেওয়া।

হাওরের বাস্তবতা হলো, এখানকার শিশুরা নিয়মিত স্কুলে আসে ঠিকই। বই পায়, টিফিন পায়, উপস্থিতিও ভালো। কিন্তু পড়া মনে থাকে না। কারণ? বাসায় নেই আলো, নেই পড়ার পরিবেশ, নেই সহায়তা। মা-বাবা অধিকাংশই নিরক্ষর। সন্ধ্যায় হাওরের শিশুরা হয় কাজ করে নয়তো অলস বসে থাকে।

ফিরোজ স্যার ভাবলেন “শুধু সকালে চার ঘণ্টা নয়, স্কুল হোক সময়ের বাইরে এক আশ্রয়।”

একদিন স্কুল শেষে বললেন, “যাদের সন্ধ্যায় সময় থাকে, আসো আমার সঙ্গে, গল্প করবো, অংক কষবো।”

প্রথমে এল পাঁচজন, পরে বেড়ে দাঁড়াল পনেরো।

হারিকেনের আলোয় ক্লাস চলতে লাগল, একজন পড়ছে “সেলিনা খাতুনের মুক্তিযুদ্ধের গল্প”, অন্যজন জানছে “সমুদ্রের পানি লবণাক্ত কেন?” কেউ অঙ্ক শেখে, কেউ বাংলা গল্প লেখে।

ফিরোজ স্যার বললেন,

“এখানে ভুল করা যায়, হাসা যায়, প্রশ্ন করা যায়। এটাই আমাদের ‘দ্বিতীয় স্কুল’।”

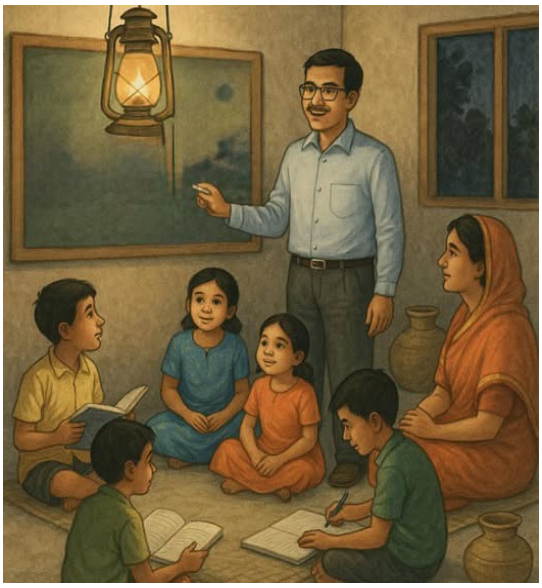

এই সন্ধ্যার স্কুলে শুধু শিশুরাই নয়, ধীরে ধীরে অভিভাবকেরাও আসতে শুরু করলেন।

- একজন মা বসে দেখছেন তার মেয়ে কবিতা পড়ছে।
- এক বাবা এসে নিজের হাতে স্কুলের বারান্দায় হারিকেন ঝুলিয়ে দিলেন।
- কয়েকজন মা বললেন, “আমরাও সপ্তাহে একদিন পড়তে চাই।”

ফিরোজ স্যার চালু করলেন ‘মা-মাঠ ক্লাস’ যেখানে মায়েরা বসে শেখে বর্ণ, সংখ্যা, এমনকি স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সহজ পাঠ।

ছাত্রদের দিয়েই তৈরি হলো একটি ছোট পাঠাগার। পুরনো খাতা আর ব্যবহৃত বই দিয়ে, তারা বানাল “আমার গল্পঘর”।

- প্রতিদিন একজন ছাত্র গল্প পড়ে শোনায় অন্যদের,
- শনিবার বিকেলে হয় ‘বাবা-মেয়ের অংক মেলা’, যেখানে বাবারা এসে মেয়ে বা ছেলেকে গাণিতিক খেলায় সাহায্য করে।

গ্রামের লোকজন নিজেরাই বলল, “এই বিকেলের স্কুল তো আমাদের, আমাদের ভবিষ্যতের।”

কেউ হারিকেন দিল, কেউ পুরোনো তক্তা এনে বসার বেঞ্চ বানিয়ে দিল, কেউ এক কলসি পানি রাখল ক্লাসের পাশে। সম্প্রদায়ের শক্তি অনুভূত হলো সন্ধ্যা স্কুলে।

ফিরোজ স্যার বলেন, “শুধু সকাল নয়, শেখার ঘড়ি যদি সন্ধ্যাতেও বাজে, তাহলে শিশুরা শুধু পাস করবে না - তারা বাঁচবে। শিক্ষার আলো সময়কে বড় করে দেয়, আর সেই আলো জ্বালাতে সবাই মিলে হাত ধরলেই সম্ভব।”

শিক্ষা শুধু সময়সূচিতে বাঁধা নয়—যেখানে ভালোবাসা, প্রশ্ন, আর স্বপ্ন থাকে, সেখানেই স্কুল। আর শিক্ষক একা নন, যদি বাবা-মা আর সমাজ এগিয়ে আসে— তবে শিক্ষার আলো কখনও নিভে না।

“যেখানে গল্প জাগে, সেখানেই শিক্ষা।”

ময়মনসিংহের ধোবাউড়ার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষক শামসুন্নাহার ম্যাডাম।

ধোবাউড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনেক সমস্যা, সেই সকল দাবি আদায়ের জন্য মানববন্ধন ও স্মরকলিপি দেওয়া হচ্ছে, ধোবাউড়ার উপজেলা অফিস এ। এরি মাঝে শামসুন্নাহার ম্যাডাম এর এই স্কুল এ আগমন। ম্যাডাম চৌকস ছাত্রী ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির দর্শন বিভাগে। প্রাইমারি স্কুল ছাত্ররা সব ৬-১১ বছরের, ম্যাডাম জানেন এই বয়সেই শক্ত ও পরিকল্পিত বীজ বোপন করতে হবে, আত্মীবিশ্বাস ও আত্মসম্মান দিয়ে।

স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির মেয়েটির নাম সুলতানা। মুখে দারুণ গল্প, কোথায় কি হলো, কে কাকে অনুসরণ করে, কে ভালো কে খারাপ, পটর পটর করেই যায়। কিন্তু যখন পড়তে বা লিখতে বলা হয়, সে চুপ করে বসে থাকে। ম্যাডাম দেখলেন সুলতানা নিয়মিত পিছিয়ে পড়ছে, পড়ায় এবং লেখায়। ওর কথায় ও কাজে অনেক তফাত, কোথায় যেন একটা অমিল ওর মাঝে। অভিব্যক্তিতে যেন একটা জড়তা, নিজের ভিতরের আত্মবিশ্বাসে সেই আস্থাটা যেন নেই।

শামসুন্নাহার ম্যাডাম একদিন ক্লাসে বললেন, “আজ থেকে ব্যাকরণ নয়, শুধু গল্প বলো। চোখ বন্ধ করে তোমার দেখা স্বপ্ন, শোনা গল্প, বা মায়ের মুখে শোনা কাহিনি বলো।”

সুলতানা প্রথমে দ্বিধায় পড়ে। তারপর একদিন কাঁপা গলায় বলে, “একটা রঙিন পাখি ছিল...সে উড়তে পারতো না, কিন্তু গাইতে পারতো...”

এই “পাখির গান” গল্পের মূলভাব হলো, পাখির গান আনন্দের, স্বাধীনতার এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতীক। পাখিদের গাণের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করে ও তাদের সহজাত ক্ষমতাকে তুলে ধরে, কোনও নির্দিষ্ট কারণ বা শ্রোতার প্রয়োজন ছাড়াই। এই গল্পের শেষে ছিলো - পাখির গান আমাদের মনের কোলাহল থামিয়ে দেয়, শান্ত এবং শান্তিপূর্ণতায় ভরেদেয়।

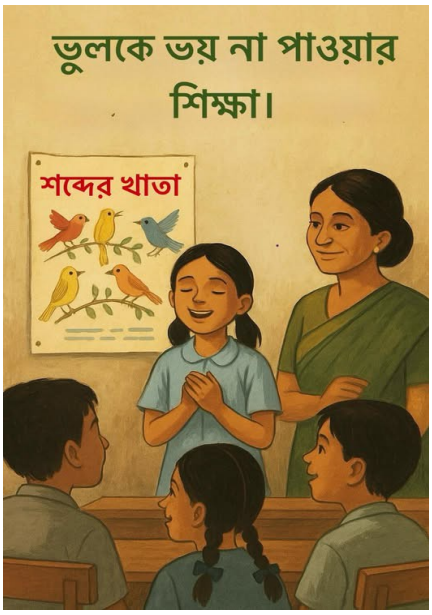

সেই গল্প শুনে পুরো ক্লাস স্তব্ধ। ম্যাডামের উদশাহে সুলতানা গল্প টা লিখলো, “পাখির গান” গল্প। তারপর সে গল্প স্কুলের দেয়ালে লিখে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, কিছু রঙিন পাখির ছবি সহ। দলে দলে বাচ্চারা আসছে সেই “পাখির গান” পড়তে।

এরপর থেকে সুলতানা শুধু গল্প লেখে না, স্কুলের ‘শব্দের খাতা’ নামে একটি ছোট গল্পের দেয়ালপত্রিকাও চালায় - পঞ্চম শ্রেণির দেয়ালপত্রিকা, যেখানে ভুল বানান চলবে, কিন্তু ভুল অনুভব নয়। রুবেল নামে এ ছাত্রের একটি ছোট গল্প লেখা ছিলো, “আমি আজ স্বপ্নে একটা নদী দেখেছি, নদীটি হাসে, কথা বলে, আমার গল্প চায়।”

শামসুন্নাহার ম্যাডাম দেখলেন ক্লাস এর অনেকেই সঠিক ব্যাকরণ জানে না, শব্দ উচ্চারণেও ভুল করে। তখন তিনি প্রতিটি শিশুকে নিজস্ব কণ্ঠে কথা বলার, গল্প বলার, এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভুল করতে দেওয়ার সুযোগ দেন। এর ফলে শিশুরা নিজের অভিব্যক্তির শক্তি আবিষ্কার করে ও আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়।

ম্যাডাম ভুলকে ভয় না পেতে শেখান, এবং শিক্ষার্থীর অভিব্যক্তিকে ভাষা শেখার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন। বাংলা ব্যাকরণ না জেনেও সুলতানার কণ্ঠ হয়ে ওঠে সাহিত্যের পাখি। যা ত্রুটিবিহীন নিখুঁত নয় কিন্তু সাহস ও সৃজনশীলতাতে ভরপুর। প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির শক্তিই আসল শক্তি, এ নিয়েই আমাদের জন্ম। ১০-১১ বছরের প্রফুল্লতা ও আত্মবিশ্বাস একদিন কাজে আসবেই আসবে।

সুলতানা ম্যাডাম জানেন, "সৃজনশীল অভিব্যক্তি এবং জ্ঞানের মধ্যে আনন্দ জাগিয়ে তোলাই শিক্ষকের সর্বোচ্চ শিল্প"।

ধনুক ভাঙা পণ - ৫৫

“ভালো কথা থেকেই শুরু হয় ভালো সমাজ।”

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর মডেল প্রাইমারি স্কুল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের প্রতিবেশী হবিগঞ্জের এই দুই গ্রাম একে ওপরের সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, দেশীয় অস্ত্র, লাঠিসোটা নিয়ে পরস্পরের প্রতি ধেয়ে যায়। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সংঘর্ষ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বছরের পর বছর ধরে নানা সামাজিক টানাপোড়েনে এই অঞ্চলে পারস্পরিক অবিশ্বাস আর কুসংস্কার বেড়েছে। ক্ষুদ্র ঘটনাও অনেক সময় বড় সংঘর্ষে রূপ নেয় - যেন সহনশীলতা হারিয়ে গেছে।

আনোয়ার স্যার আসলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর মডেল প্রাইমারি স্কুলে। একটা এলাকার লোকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে বৈরি ভাবাপন্ন থাকে তার প্রভাব যে শিশু কিশোরদের উপর আসবে সেটাই তো স্বাভাবিক। নাসিরনগর মডেল প্রাইমারি স্কুলের পরিবেশটা খুবই রুক্ষ। ছাত্রদের মাঝে মারামারি লেগেই থাকত। কেউ কাউকে শ্রদ্ধা করে কথা বলে না, গালিগালাজ ও কুভাষা যেন স্বাভাবিক। মেয়েরা প্রায়ই কাঁদত - অশালীন কথার শিকার হয়ে। স্যার কল্পনাতেও ভাবেননি স্কুলের এমন পরিবেশ হতে পারে।

আনোয়ার স্যার কিছু পরিকল্পনা নিয়ে এগুলেন।প্রথম দিনেই একটা কালো বোর্ডে লিখলেন - “ভালো কথা, ভালো মন, ভালো স্কুল।”

প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করে ঠিক করলেন একটা নতুন বিষয়ে শিক্ষা, নাম “নৈতিক চরিত্র গঠন”। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায়, ব্যবহারে, সাংস্কৃতিক রীতিনীতিতে সব কিছুতেই এই “নৈতিক চরিত্র গঠন” এর মিশ্রণ থাকবে যেখানে সৌজন্যবোধই প্রথম প্রকাশ পাবে। অংক, বাংলা বা ইংলিশ সব আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠগুলিতে নীতিগত আচরণ, শ্রদ্ধা এবং সামাজিক দায়িত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো । দায়িত্ব এবং সহযোগিতা শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিন কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমেও শেখে তাই শ্রেণীকক্ষ এবং স্কুল পরিষ্কার করা বাধ্যতামূলককরা হলো। ভাষার ভদ্রতার উপর জোর ও সৌজন্যমূলক আচরণকে মূল্যায়ন করা হবে, “ভদ্রতার ফুল” নামে একটি কাগজের পদক দিয়ে, যা শিক্ষকরা নিজেরাই বানাবেন তাঁদের নিজেদের চিন্তার সুন্দর্য ও ভালোবাসা দিয়ে।

এর মাধ্যমে শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক ও কাছে আশার সুযোগ হলো।

নাসিরনগর মডেল প্রাইমারি স্কুলের জন্য এই “নৈতিক চরিত্র গঠন” পাঠ্যক্রমটিতে:-

১. শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, সততা।
২. প্রতিদিনের আচরণ পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষা।
৩. ভাষার সৌজন্য (ধন্যবাদ, সালাম, কৃতজ্ঞতা)।
৪. শিক্ষক-শিক্ষকের প্রশিক্ষণ।
৫. অভিভাবকদের অংশগ্রহণ।

শ্রদ্ধাশীল এবং বিবেচ্য আচরণ শেখানোর জন্য একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা গেলো নাসিরনগর মডেল প্রাইমারি স্কুলে। উলেখ যে বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যাবস্থায় বিভিন্ন ধর্ম শিখার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষা কে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যেমন “ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা”, পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। কিন্তু তেমন কোন দিকনির্দেশনা ও প্রয়োগ নেই। তারপর আনোয়ার স্যার শুরু করলেন “নৈতিক চরিত্র গঠন” বিষয়ে শিক্ষা। প্রতিদিন সকালে সবাই দাঁড়িয়ে বলবে: “আমি আজ নম্র হবো। সহানুভূতিশীল হবো। কাউকে কষ্ট দেবো না।”

তিনি ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে ছোট ছোট দৃশ্য অভিনয় করতেন -

১. কীভাবে কেউ অন্যের কথা মন দিয়ে শোনে,
২. কারো ভুল হলে সে কীভাবে সংশোধন পায়, অপমান নয়।
৩. কি ভাবে অন্যের চোখে চোখ রেখে কথা শুনতে হয়।
৪. ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ শুধু মুখে নয়, হৃদয় থেকে করবে হয়।

যারা সুন্দর ব্যবহার করত, তারা পেত “ভদ্রতার ফুল”। এই কাগজের ফুল যেন শিশুদের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত এক কোমল অভ্যাসের চিহ্ন। দশটি রঙিন পাঁপড়ি মিলে যে থোকা বানায়, সেটিই যেন সৌজন্যের রাজমুকুট।

এক সময় দেখা গেল, মেয়েরা নিরাপদ বোধ করছে। শিক্ষার্থীরা নিজেরা একে অন্যকে থামিয়ে বলছে, - “এভাবে কথা বলো না ভাই, আনোয়ার স্যার বলেছেন—মিষ্টি কথায় শান্তি থাকে।”

গ্রামের মানুষেরাও খেয়াল করলেন—এই স্কুলে একটা শান্ত সৌন্দর্য এসেছে। শিক্ষকের সম্মান বেড়েছে ও ছাত্রদের স্বভাবে একট মসৃণতা এসেছে যা ওদের আচার ব্যবহারে ফুটে উঠে।

শিক্ষক গণ নৈতিকতা, ভদ্রতা ও সামাজিক বোধ শেখান ঠিক ততটাই গুরুত্ব দিয়ে যতটা গণিত বা ইংরেজি শেখান। ছাত্রদের শুধু ভালো রেজাল্ট নয়, “ভালো মানুষ” হতে শেখান।

আদবকায়দা নয়, বরং মানবিকতাই হলো চরিত্র গঠনের অস্ত্র, তেমনি আনোয়ার স্যার দেখালেন - একটি স্কুলে যদি আচরণ ও সহানুভূতির চর্চা হয়, তবে পড়াশোনাও আরও ফলপ্রসূ হয়।

ধনুক ভাঙা পণ - ৫৬

“যে নিয়ম নিজের, সেই নিয়মই শৃঙ্খলা।”

লোহালিয়া ইউনিয়ন সেকেন্ডারি স্কুল, পটুয়াখালী। লোহালিয়া নদী যেন প্রতিদিন স্কুলটার পাশে দিয়ে চুপিচুপি কানে কানে কিছু বলে যায়। পাখিদের কলরব আর হালকা হাওয়ায় ভেসে থাকা নোনা গন্ধে ভরে থাকে চারপাশ। কিন্তু স্কুলের ভেতর? সেখানে ছিল অদ্ভুত এক বিশৃঙ্খলার নৌকা, যা কিনা পালছেঁড়া, দিশাহীন।

বেল বাজে, তবু কেউ আসে না ঠিকমতো ক্লাসে। লাইব্রেরির বই যেন একবার গেলে আর ফেরে না, টিফিনের পর বারান্দা যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে যায়। ছোটখাটো নিয়মগুলো যেন হারিয়ে গিয়েছে বিশৃঙ্খলার ধুলোকণায়।

রওশন আরা ম্যাডাম জানতেন, নিয়ম চাপিয়ে দিলে কেউ মানে না। কিন্তু যদি নিয়ম আসে ছাত্রদের নিজের হাত দিয়ে, তবে তারা তাকে বুকে আগলে রাখে আপন নিয়ম, নিজের নিয়ম।

সেদিন, খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বললেন, “আজ থেকে আমি না, তোমরাই বানাবে নিয়ম। স্কুলটা তোমার, নিয়মও তোমার হওয়া উচিত, তাই না?”

ক্লাস যেন কিছুক্ষণ চুপ হয়ে গেল। এরপর শুরু হলো আলোড়ন। তিনটি দলে ভাগ হয়ে গেল সবাই,

* শ্রেণিকক্ষের নিয়ম,
* টিফিন সময়ের নিয়ম,
* আচরণবিধি ।

কতগুলো মধুর, বাস্তব আর সুন্দর প্রস্তাব এল তাদের কাছ থেকে,

- “বেল বাজলে তিন মিনিটের মধ্যে ক্লাসে ঢুকতে হবে।”
- “টিফিন শেষে নিজের প্লেট গুছিয়ে রাখবো।”
- “কে কোন বই নিচ্ছে, সেটা দেয়াল খাতার পাতায় লিখবো।”

শুধু প্রস্তাব নয়, তারা নিজেই তা বড় কাগজে লিখে টাঙাল স্কুলের করিডোরে। নিচে লেখা থাকলো, “নিয়ম আমরা বানিয়েছি। তাই আমরা মানি।”

এরপর থেকেই বদলে গেল হাওয়া। শিক্ষক কিছু বলার আগেই বন্ধুরাই একে অন্যকে মনে করিয়ে দেয়। কেউ একদিন বই ফেরত দিতে দেরি করল, পাশ থেকে একজন হাসিমুখে বলে উঠল,

- “এটা তো আমাদেরই নিয়ম, ভুলে গেছ?”

স্কুলে এক নতুন সংস্কৃতি জন্ম নিল, যাকে রওশন আরা ম্যাডাম বললেন, “ছাত্র-মালিকানা সংস্কৃতি”।

শুধু নিয়ম নয়, শৃঙ্খলা নয়, এটা ছিল নাগরিকতা শেখানোর সূচনা।!তাঁর এই দর্শনে শিক্ষার্থীরা বুঝলো, নিয়ম মানা মানে শাস্তির ভয় নয়, বরং গর্বের দায়িত্ব।

স্কুল যেন হয়ে উঠল একেকটা শিক্ষার্থীর নিজের ঘর, যেখানে সে নিজেই ঘর গোছায়, নিয়ম বানায়, শিখে আর শেখায়।

রওশন আরা ম্যাডাম শিখিয়ে দিলেন,

- নিয়ম তৈরি করা কেবল শিক্ষক বা প্রশাসকের কাজ নয়।
- নিয়ম মানা তখনই হয় যখন তা নিজস্ব মনে হয়।
- শৃঙ্খলার সবচেয়ে বড় শিক্ষক - নিজস্ব দায়িত্ববোধ।

এই গল্পটি “ownership of learning and behavior”-এর এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

যেখানে শিখিয়ে দেওয়া নয়, বরং শেখার মালিকানা তুলে দেওয়া হয় শিক্ষার্থীর হাতে।

সেই নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুলটাতে একদিন যদি আপনি যান, দেখবেন দেওয়ালে টাঙানো একটি পোস্টার:

“নিয়ম আমরা বানিয়েছি। তাই আমরা মানি।”

...আর তার নিচে হেসে দাঁড়িয়ে থাকে লোহালিয়ার শিক্ষার্থীরা— নিজেরাই নিজের শিক্ষা ও চরিত্রের প্রকৃত নায়ক।

ধনুক ভাঙা পণ - ৫৭

“শিক্ষক যখন বলেন ‘আমি ভুল’, তখনই শিক্ষা শুরু হয়।”

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সিরাজ স্যার, গনিতের ভাবুক শিক্ষক। একদিন গণিত ক্লাসে সিরাজ স্যার সরল অংকের BODMAS বোঝাতে গিয়ে একটা সংখ্যা ভুল লিখে ফেলেন। টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের ছোট্ট একটা স্কুলের নীরবতা ভেঙে রিফাত নামের চুপচাপ ছেলেটা হাত তুলে বলল ‘স্যার, এটা ১৮ না হয়ে ১৩ হবে।’

স্যার কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে আবার হিসেব করে দেখলেন - সত্যিই ভুল। সবাই চুপ। কেউ কেউ চোখ টিপে হাসছে।

স্যার হঠাৎ বোর্ডে বড় করে লিখলেন - “আজ আমি ভুল করেছি। ধন্যবাদ, রিফাত।”

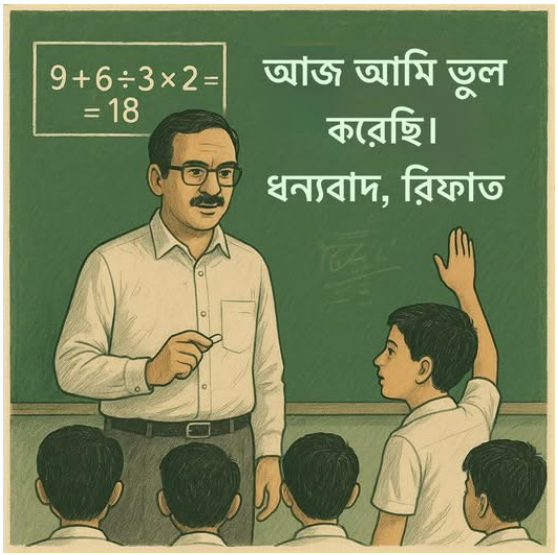

তিনি ঘুরে বললেন, “শিক্ষকও মানুষ। কিন্তু ভুল মানতে না পারলে শিখতে শেখানো যায় না।”, আরও বুঝালেন, ভুল জীবনের একটি বাস্তবতা। ভুলের প্রতিক্রিয়াই গুরুত্বপূর্ণ!

তারপর থেকে ক্লাসে নতুন নিয়ম চালু হলো, যে কেউ যদি শিক্ষকের ভুল ধরায়, তাকে বলা হবে “জ্ঞানবন্ধু” এবং সেইদিন তার নাম থাকবে বোর্ডে। শিক্ষকরা ইচ্ছা করে ভুল করেন, কেউ কেউ প্রথমে “ভুল ধরার” চর্চাকে মজা করে নেয়। কিন্তু ধীরে ধীরে বোঝে, এখানে কাউকে ছোট করা নয় - বরং শেখার উৎসাহ দেওয়াই উদ্দেশ্য।

পরবর্তী মাসগুলোতে দেখা গেল, ছাত্রছাত্রীরা শুধু মুখস্থ না করে গভীরভাবে ভাবতে শিখছে।মজার ব্যাপার হলো, “ছাত্ররা নিশ্চিত যে তারা অনেক বিষয়ে ভুল, যদিও তারা ঠিক নিশ্চিত নয় যে তারা কোন বিষয়ে ভুল!” এই ভাবনাটাই শেখার পরিবেশ তৈরী করে, আর তাই ছাত্ররা প্রশ্ন করে, বিকল্প ব্যাখ্যা দেয়, বিতর্ক করে। ক্লাসে একটা ভয়মুক্ত পরিবেশ তৈরি হয় যেখানে আলোচনা এবং বিতর্কের জন্য নিজেকে প্রকাশ করা যায়। কারণ তারা জানে, "আমাদের ভুল স্বীকার করতে কখনোই লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। এটা কেবল প্রমাণ করে যে আমরা গতকালের চেয়ে আজ বেশি জ্ঞানী।" - জোনাথন সুইফট।

শিক্ষকদের জন্য নেতৃত্ব মানে সবসময় ঠিক হওয়া নয়, বরং শেখার পথ খুলে দেওয়া। একজন শিক্ষকের “আমি ভুল ছিলাম” বলাকে শিক্ষা সংস্কৃতির অংশ বানায়, তেমনি সিরাজ স্যার ভুল স্বীকার করে শিক্ষার্থীদের মনে ভয় নয়, সাহস জাগিয়ে তুলেছেন।

“মানবিক শিক্ষকতা” বা “ভুল করার সাহস”, এটি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের “power dynamics” ভাঙে এবং শিক্ষক - শিক্ষার্থী সম্পর্ককে আরও বিশ্বস্ত ও সমতার ভিত্তি গড়ে তোলে। একমাত্র তখনি শিক্ষক এর সেই আশা পূরণ হতে পারে, “শিক্ষকের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থী যেন শিক্ষককে ছাড়িয়ে যায়।”

ধনুক ভাঙা পণ - ৫৮

“মেয়ের পড়া শুরু হয় মায়ের বিশ্বাস থেকে।”

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার এক গ্রামীণ স্কুল। শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। রিনা ম্যাডাম যখন প্রথম স্কুলে পা রাখলেন, তিনি দেখলেন, ইতিহাস আর নতুনত্ব একসাথে দাঁড়িয়ে আছে: ১৯১৬ সালে স্থাপিত পুরনো স্কুলটির এখন ৫ তলা দালান, ১৩০০ শিক্ষার্থী, আর সকালের সমাবেশে গাঢ় নীল পোশাকে শিশুরা যেন এক জীবন্ত সমুদ্র। স্কুলটি ১৯৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব এবং ২০০৬ সালে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির জন্য জাতীয় পুরস্কার লাভ করে।

কিন্তু এই ২০২৫ তে এসে রিনা ম্যাডাম লক্ষ্য করলেন, তার ক্লাসে তিনজন মেয়ে নিয়মিত অনুপস্থিত থাকছে। জিজ্ঞেস করলে জানা যায়, বাড়ির কাজে মা ডাকলেই তারা স্কুল বাদ দেয়। স্কুল যদি সমাজের অংশ হয়, তবে পরিবারকে বাইরে রেখে কিছুই বদলায় না।

একদিন তিনি স্কুল ছুটির পরে নিজে সেই তিন পরিবারের বাড়ি গেলেন। শিক্ষার্থীর পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষায় যুক্ত করাই উদ্দেশ্য। শুরুতে প্রতিটি অভিভাবকের সঙ্গে বাড়ি গিয়ে দেখা করলেন। ব্যক্তিগত ফোন নম্বর অভিভাবকদের দিলেন যাতে দরকারে রাতে যোগাযোগ করা যায়। মাদের সঙ্গে পিঁড়িতে বসে কথা বললেন, “আপনার মেয়ে শুধু আমার ছাত্রী না, সে আপনার ভবিষ্যৎও।”

মায়েরা বললেন, “ম্যাডাম, আমরা তো বুঝিই না ও কী শিখছে। আমাদের তো কেউ কিছু বলেও না শেখায়ও না।”

সেই দিন থেকেই রিনা ম্যাডাম চালু করলেন “মায়েদের শ্রেণি” - মাসে দুইবার সন্ধ্যায় স্কুলে ছোট একটা আড্ডা, যার নাম হলো: “মেয়ে যেটা শিখে, মা জানবে সেটা।”

তিনি সহজ ভাষায় বোঝাতেন, মেয়ের অংক মানে শুধু সংখ্যা নয়, তা বাজার হিসাবের উপকারে লাগবে। কল্পকাহিনি মানে শুধু গল্প নয়, মেয়ের কল্পনা শক্তিকে ছুঁয়ে দেখা। মায়েরা হাসত, কখনো কাঁদত আর মনের মাঝে দেখতো মেয়ের ভবিষ্যৎ।

একদিন এক মা বললেন, “ম্যাডাম, ছোটবেলায় কেউ আমায় গল্প শোনায়নি। এখন মেয়ের গল্প শুনে আমি নতুন জীবন পাই।”

একদিন “মায়েদের শ্রেণি” শেষে রিনা ম্যাডাম সবাইকে একটা ছোট্ট খাতা আর একটি খাম দিলেন।

বললেন, “আজ আপনারা মেয়েকে একটি চিঠি লিখবেন। ভুলভাল লিখলেও চলবে। শুধু বলবেন, আপনি ওকে ভালোবাসেন, ওর পড়া নিয়ে আপনি গর্ব করেন, আর আপনার নিজের ছোটবেলার স্বপ্ন কী ছিল।”

মায়েরা চুপ। কেউ কোনোদিন চিঠি লেখেনি, তাও নিজের মেয়েকে!

কেউ আঁচলে চোখ মুছে বললেন, “আমি কি লিখে বলতে পারব—আমি ছোটবেলায় ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম?”

“আমি চাই, আমার মেয়ে যেন আমার মতো না হয়, বই ফেলে চুল বাঁধতে না শেখে।”

চিঠিগুলো মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পরদিন।

স্কুলের ছায়ায় বসে মেয়েরা পড়ে, মা কী লিখেছে। কারও চোখ ভেজে, কেউ হেসে ওঠে।

তারপর এক সপ্তাহ পরে “মেয়েদের পালা”।

মেয়েরা সেই চিঠির উত্তরে নিজেদের পছন্দের গল্প বেছে নেয়, কেউ পড়ে ‘চাঁদের বুড়ির দেশে’

কেউ পড়ে এক সাহসী মেয়ে যে একা নদী পার হয়ে স্কুলে যায়।

মায়ের কোলে মাথা রেখে মেয়ে পড়ে, “এই গল্পটা তোমার জন্য, মা। তুমি বলেছিলে, তুমি একদিন কিছু হতে চেয়েছিলে। এখন তুমি আমার মা, এই জন্যই আমি বড় হবো।”

সেই সন্ধ্যা, সেই পাতা ওল্টানো মুহূর্ত, যেন বিদ্যালয় আর বাড়ির মাঝে সেতু তৈরি করল—ভালোবাসার, ভাষার, ভবিষ্যতের।

এই অভিভাবক সভা ধীরে ধীরে শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠল। ছাত্রীরা আরও নিয়মিত হতে লাগল, আর মায়েরা গর্ব করে বলল—“ আমার মেয়েও স্কুলে যায়, আমিও!”

স্কুল থেকে পরিবারের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলে শিক্ষার গতি বদলে দিলেন রিনা ম্যাডাম, তিনি শুধু শিক্ষিকা নন, হলেন মায়েদের ভরসার নাম। তিনি প্রমাণ করলেন, একজন মায়ের মন জয় করা মানে, একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা।

এই নারীশিক্ষা, মাতৃত্ব, ও প্রজন্মান্তরের আলোকিত শিক্ষা পথের একটি নম্র কিন্তু গভীর আলেখ্য।

ধনুক ভাঙা পণ – ৫৯

“সব মেধা পরীক্ষায় ধরা পড়ে না।”

নদীর ধারে এক পুরনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্রেণিকক্ষ সাত। নদীমাতৃক বাংলাদেশের একটি অখ্যাত হাইস্কুল। বাইরে থেকে দেখতে সাধারণ টিনের ছাউনি, কাঠের জানালায় ছোপ ছোপ রোদ। বৃষ্টির দিনে ছাতা খুলে ক্লাস করতে হয়। লাইব্রেরির এক কোণে পড়ে থাকা একটি নষ্ট হারমোনিয়াম যেন স্কুলটির আত্মার মতো - চুপচাপ, ধুলোমাখা, তবু গল্প বলে।

এই স্কুলেই পড়ে রাফি। সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। চুপচাপ, অন্যমনস্ক। তার দৃষ্টি জানালার বাইরে, দূরে কোথাও, যেখানে শব্দেরা রঙ হয়, আর যন্ত্রেরা কথা বলে। তার মন বইয়ের পাতায় থাকে না। বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক সবই তার কাছে অদ্ভুত। সে ভাবে, “ভাষা তো আমরা প্রতিদিনই ব্যবহার করি, তাহলে আবার কেন আলাদা করে পড়তে হবে?” সহপাঠীরা বলে, “ওরে পাগল! তোর মাথায় তো পাখির বাসা।” শিক্ষকরা হাল ছেড়ে দিয়েছেন, ফলাফলে সে প্রায়ই সবার নিচে।

তবু প্রতিদিন দুপুরে সে হারমোনিয়ামের কাছে যায়। খুলে দেখে কী-বোর্ড, পঁচা কাঠের পাটাতন, ছিঁড়ে যাওয়া ফুস্কুড়ি। সে বোঝার চেষ্টা করে “এই যন্ত্রটি কিভাবে শব্দ করে? সা রে গা মা পা মানে কী?” হয়তো সে খোঁজে এমন কিছু, যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়।

একদিন নতুন বিজ্ঞান শিক্ষক ফারহান স্যার হঠাৎ দেখে ফেলেন রাফিকে হারমোনিয়ামের কাঠ খুলছে, তার দিয়ে সংযোগ করছে, এক ভাঙা রেডিওর সার্কিট বসানোর চেষ্টা করছে।

- “তুমি কী করছো এখানে?”
- “স্যার... আমি শব্দটা বেরোয় কীভাবে সেটা দেখছিলাম। একটা স্পিকার বসিয়ে দেখছিলাম...”
- “তুমি এসব কোথায় শিখলে?”
- “ইউটিউবে দেখি। আর বাবার রেডিও খুলে দেখি।”

ফারহান স্যার চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তাঁর চোখে যেন এক আশ্চর্য আলোর রেখা খেলে যায়। তিনি বুঝলেন এই ছেলেটা নিয়মের কাঠামোয় আটকে পড়া কোনো মেধা নয়, সে খোঁজে নিজের পথে, নিজের ভাষায়। বইয়ের পাতা নয়, যন্ত্র খোলার ভেতরের প্যাঁচে তার জীবনতৃষ্ণা।

তিনি লাইব্রেরিতে নিয়ে এলেন “How Things Work” বইটি, সঙ্গে ছোটদের জন্য লেখা “আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল” ও অন্য সব বিজ্ঞানীদের গল্প। রাফির চোখ জ্বলে উঠল, যেন বই নয়, সে এক যন্ত্রঘর খুঁজে পেয়েছে।

পরের সপ্তাহে ফারহান স্যার আয়োজন করলেন “কল্পনা ও কারিগরি” সপ্তাহ। বললেন, “রাফি, হারমোনিয়ামটা ঠিক করো। কিন্তু ঠিক করো নিজের মতো করে নতুন কিছু বানাও।”

রাফি দিনরাত পরিশ্রম করে এক যন্ত্র বানালো। হারমোনিয়ামের কাঠে পাতলো ধাতব পাত, রেডিওর সার্কিট দিয়ে বানালো এক নতুন প্রকারের সাউন্ড রেসপন্স সিস্টেম স্পর্শ করলেই সুর বাজে। নাম দিল “তড়িৎস্বর”।

প্রদর্শনীর দিন স্কুলে হৈচৈ। সবাই চমকে গেল, এই সেই রাফি? যে সব বিষয়ে ফেল করে? জেলা প্রশাসক নিজে এলেন। বিস্ময়ে তাকিয়ে বললেন, - “এই ছেলেটা একদিন এমন কিছু করবে, যা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারি না।” - “তুমি তো বিজ্ঞান বইয়ের বাইরেও বিজ্ঞান খুঁজে পেয়েছো, রাফি। এই ভালোবাসাটাই তোমার শক্তি।”

ফারহান স্যার মৃদু হেসে বললেন, “প্রতিটি শিশুর মধ্যেই কোনো না কোনো হারমোনিয়াম লুকিয়ে থাকে। কিছু ভাঙা, কিছু বিকল। আমাদের কাজ শুধু সেই সুর খুঁজে বের করা।” একেকটা ছাত্র একেকটা সম্ভাবনার খাম। কেউ পাঠ্যবইয়ের পাতায় ফুটে ওঠে, কেউ শব্দ আর যন্ত্রে গান তোলে। আমরা যদি কেবল পরীক্ষা নম্বর দিয়ে তাদের বিচার করি, তবে হারিয়ে ফেলি সেই “তড়িৎস্বর” যা বদলে দিতে পারে সময়কে, সমাজকে, এমনকি ভবিষ্যতকে।

“প্রযুক্তি যখন তুলির সঙ্গী হয়।”

নাটোর জেলার বাঁশঝাড় ঘেরা উপসহরে একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। লিজা, অষ্টম শ্রেণির এক বুদ্ধিমান কন্যাশিশু। রুমানা ম্যাডাম চারু ও কারুকলার নবনিযুক্ত শিক্ষিকা।

স্কুলে ঢুকতে বাঁশঝাড় পেরোতে হয়। দুপুরবেলা বাতাসে বাঁশের পাতাগুলো যখন সোঁ সোঁ শব্দ করে, মনে হয় কারও মন খালি হয়ে যাচ্ছে। এই স্কুলেই পড়ে লিজা, চোখ কান খোলা বুদ্ধিমান ছাত্রী ও প্রচণ্ড কৌতূহলী।

রুমানা ম্যাডাম একদিন তার খাতার ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে পেলেন জীবনের আরেক ভাষা, চোখ বড় করে তিনি দেখলেন,

• এক পৃষ্ঠা জুড়ে পুকুরঘাটে কাপড় ধোয়া মায়ের রূপরেখা,

• এক মেয়ে যে জানালার পাশে বই পড়ে,

• আরও একটি, যেখানে একটি মেয়েশিশু খড়ের গাদার পাশে বসে কোনো কিছু ‘ডিজাইন’ করছে, পাশে মোবাইলের চিহ্ন!

- “লিজা, এটা কী?”

- “আমি… মাঝে মাঝে নিজেই ডিজাইন করি ম্যাডাম। মোবাইলে একটা অ্যাপ আছে, ‘AutoDraw’ নামে। খুব সহজ। আমি দেখেছি কেউ কেউ এতে পুতুলের জামা ডিজাইন করে।”

- “তুমি আর কি কি পারো?”

- “পারি ম্যাডাম, এক খালামণির ফোনে মাঝে মাঝে Canva চালাই। আমি লে-আউট, পোস্টার বানাতেও শিখেছি।”

রুমানা ম্যাডামের চোখ জ্বলজ্বল করছিল।

তাঁর মনে হলো লিজা কেবল একজন শিল্পী নয়, সে এক টেকনোলজি-বান্ধব শিল্পী। মনে পরে গেল, হিলারি ক্লিনটন বলতেন, নারীরা বিশ্বের সবচেয়ে বড় অব্যবহৃত প্রতিভার ভাণ্ডার।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, এ বছর চারুকলার বার্ষিক প্রদর্শনীর নাম হবে, “চিত্রে গল্প, গল্পে জীবন এবং প্রযুক্তির ছোঁয়া”

শুধু আঁকা নয়, ডিজিটাল রূপান্তরও শেখানো হবে। লিজা হয়ে উঠলো দলের মূল সংগঠক।

সে স্ক্যান করতে শেখালো, ডিজিটাল পোস্টার বানালো। শুধু কি তাই, ছবি তৈরির পর, কালার ব্যালান্স পরীক্ষা, ফটো কোয়ালিটি যেমন Light and Shadow, Perspective ও Depth of Field এই সকল ও শেখালো।

প্রদর্শনীতে তিনটি ছবির -

• একটি মা, যিনি শাক কেটে বিক্রি করেন আর সন্ধ্যায় নিজের মেয়েকে মোবাইলের ছোট্ট পর্দায় “অঙ্ক শেখার ভিডিও” দেখান।

• একটি কিশোরী, যার স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে বিয়ের জন্য, কিন্তু সে গোপনে কম্পিউটার শেখার কোচিং-এ যাচ্ছে।

• আরেকটি মেয়ে, যে YouTube দেখে নিজেই পুতুল বানানো শিখেছে এবং স্থানীয় হাটে বিক্রি করে।

সবাই স্তব্ধ। শুধু শিল্প নয়, এই মেয়েরা প্রযুক্তির সহায়তায় “নির্বাক গল্পকে বলিয়ে তোলে”। লিজার ছবিগুলো জাতীয় পর্যায়ে পাঠানো হলো তবে এবার শুধু আঁকা নয়, সাথে তার ডিজিটাল স্টোরিবোর্ড ও।

বিজয়ীর নাম এলো, লিজা আক্তার, ডিজিটাল চারু ও গল্পকার।

মঞ্চে উঠে সে প্রথমবার বলল - “প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা মেয়েরাও আঁকতে পারি, গড়তে পারি, এবং নিজের কণ্ঠ তৈরি করতে পারি।”

সব শিশু একভাবে কথা বলে না। কেউ আঁকে, কেউ ছবিকে পরিস্ফুটিত করে, কেউ ডিজিটাল মাধ্যমে জীবনের গল্প বলে। প্রতিটি কন্যাশিশুর ভেতরেও প্রযুক্তিপ্রীতির বীজ থাকে, শুধু দরকার একজন শিক্ষকের চোখ, এবং একজন ম্যাডামের সাহস।

ধনুক ভাঙা পণ – ৬১

“প্রতিভার ভাষা এক নয়”

প্রতিটা শিশু তাঁর মার কাছে অনন্য ও নিঃশর্ত ভালোবাসার পাত্র। আমরা সকলেই কল্পনা, বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি, আধ্যাত্মিকতা, এবং শারীরিক ও ইন্দ্রিয়গত সচেতনতার অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করি। প্রয়োজন শিক্ষার পরিবেশ এমন করা যেখানে প্রতিটি শিশুর স্বতন্ত্র প্রতিভা স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রকৃত আবেগ দ্বারা আবিষ্কৃত হবে। মানব সম্প্রদায় প্রতিভার বৈচিত্র্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। স্কুল শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। I have never let my schooling interfere with my education," Mark Twain

১. ক্লাসের মাঝে, বন্ধদের সঙ্গে যার অট্টহাসি সবচেয়ে বেশি শোনা যায়, তাঁর নাম সোহেল।সে সবসময় কৌতুক করে, শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে ক্লাসে উঠে নকল শিক্ষক সাজে, এমনকি ছাত্রীদের নকল করেও হাসায়। শিক্ষকরা বিরক্ত,

- “তুই পড়াশোনার কিছু বুঝিস? এইসব ভাঁড়ামি করে কি হবে জীবনে?”

আবেদ স্যার - যিনি শহর থেকে বদলি হয়ে এসেছেন। প্রথম দিনেই লক্ষ্য করলেন, সবাই হাসছে সোহেল তাদের মধ্যমনি।

সেদিন থেকে স্যার তার দিকে আলাদাভাবে নজর দিতে থাকলেন। একদিন বললেন,

- “আমরা একটা নাটক করবো। গ্রাম বাঁচানোর গল্প, তোমার চরিত্র হবে প্রধান নায়ক।”

সোহেল ভয়ে জিজ্ঞেস করল,

- “আমি? আমি তো ক্লাসে হাসাই শুধু!”
- “এই যে তুমি হাসাও, সেটা অভিনয়ের শক্তি। তুমি পারবে, আমি জানি।”

শুরু হলো প্রস্তুতি। সোহেল প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত। সংলাপ ভুলে যায়, কাঁপে। কিন্তু আবেদ স্যার একদিন রিহার্সালে বললেন -

- “যদি কেউ তোমার প্রতিভাকে দেখতে পায়, তাহলে তোমার ভয় পাওয়ার দরকার নেই।”

শেষমেশ নাটক হলো, সোহেলের অভিনয় এমন ছিল যেন সে জন্মসূত্রে অভিনেতা। তার কণ্ঠ, অভিব্যক্তি, সংলাপে একটুও নাড়চাড় হয়নি। দর্শক দাঁড়িয়ে করতালি দিলো।

পরে সেদিন সোহেলের মা বললেন -

- “স্যার, আমার ছেলেটা যে অভিনয়ের দিয়ে এমন একটা বলিস্ট বক্তব্য তুলে ধরে সবাইকে অবাক করে দিতে পারবে, কখনো ভাবিনি।”

আমরা অনেক সময় একজন ছাত্রের আচরণ দেখে তাকে ‘ভাঁড়’, ‘অসভ্য’ বা ‘বখাটে’ বলে ফেলি। কিন্তু সেই আচরণের পিছনে হয়তো লুকিয়ে থাকে নিজের সত্তাকে প্রকাশ করার একমাত্র ভাষা।

শিক্ষক যদি দেখেন, যদি বুঝেন- তবেই সেই শিশুটি নিজের অর্থ তৈরির গুরুত্ব খুঁজে পায়।

২. নাম তার তৃষা, শিক্ষকদের চোখে সে ‘উগ্র’, সহপাঠীদের কাছে ‘ঝগড়ুটে’। কেউ কিছু বললেই প্রতিবাদ করে, প্রশ্ন তোলে, এমনকি শিক্ষকের কথাও মাঝেমধ্যে থামিয়ে দিয়ে বলে,

- “আপনার যুক্তিটা ঠিক না স্যার, আমি অন্যভাবে ভাবছি।”

ক্লাসে কেউ তাকে সহজে পছন্দ করে না।

স্কুলে বদলি হয়ে এলেন রেজওয়ান স্যার, একজন নবীন শিক্ষক, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে এসেছেন, গ্রামের জন্য কিছু করার তাগিদে। তিনিও প্রথমে চমকে গিয়েছিলেন তৃষার আচরণে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি বুঝলেন—তৃষার কথাগুলোতে যুক্তি আছে, তার প্রশ্নগুলো নিছক বিরক্ত করার জন্য নয়, বরং গভীর চিন্তার প্রকাশ।

একদিন স্যার ক্লাসে বললেন - “আমরা একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা করবো। বিষয়: ‘স্কুলে শুধু নম্বর নয়, চিন্তা করা শেখাতে হবে।’ তৃষা, তুমি পক্ষে থাকবে।”

তৃষা অবাক। “আমি? কিন্তু সবাই তো বলে আমি উল্টা কথা বলি…”

স্যার হেসে বললেন, “এই উল্টো কথাগুলোই তো নেতৃত্বের বীজ। ঠিক ব্যবহার করলে তুমি অন্যদের চিন্তায় আলো ফেলতে পারো।”

প্রস্তুতি শুরু হলো। তৃষা প্রথমে লজ্জায় চুপ, কিন্তু রেজওয়ান স্যারের উৎসাহে সে যুক্তি খুঁজতে লাগল, পত্রিকা পড়তে লাগল, অনলাইনে ভিডিও দেখে নিজে নিজে পয়েন্ট তৈরি করতে শিখল।

বিতর্কের দিন সে দাঁড়িয়ে বলল, “আমাকে সবাই বলে ‘উগ্র’। কিন্তু আমি যদি না বলি, না প্রশ্ন করি, তাহলে ভুলটা কে ধরবে? স্কুলে যদি প্রশ্ন করাই না শেখানো হয়, তবে ভবিষ্যতের নেতা তৈরি হবে কীভাবে?”

তৃষা দেখালো, নেতৃত্ব, প্রতিবাদ আর যুক্তির এক অভূতপূর্ব শক্তি। এক শিক্ষক ফিসফিসিয়ে বললেন - “মেয়েটার কথা শুনে কেমন মনে হচ্ছে, এ যেন ছোটখাটো এক নেত্রী।” প্রতিযোগিতা শেষে তৃষা পুরস্কার পেল না, কিন্তু দর্শক আর শিক্ষকরা একজনে আরেকজনের দিকে তাকিয়ে বলল - “এই মেয়েকে এতদিন আমরা বুঝতেই পারিনি।”

রেজওয়ান স্যার আস্তে করে বললেন - “উগ্রতা নয়, ওর মধ্যে আছে স্বতন্ত্রতা। আজ না হলেও, কাল সে আলো দিতেই পারবে।”

সব শিশু মসৃণ ভাষায় কথা বলে না, কেউ প্রতিবাদ করে, কেউ হাসায়, কেউ চুপ থাকে। কিন্তু যদি একজন শিক্ষক সেই ভিন্নতাকে সম্ভাবনা হিসেবে দেখেন—তবে সেই শিশুর মুখেই জেগে উঠতে পারে নেতৃত্ব, শিল্প বা পরিবর্তনের আগুন।

৩. হাসিব—চুপচাপ, কারও সঙ্গে বেশি মেশে না। ক্লাসে প্রশ্ন করে না, খেলাধুলাতেও নেই, অনেক সময় জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে।
শিক্ষকেরা বলেন - "ও অলস, কিছুতেই মনোযোগ নেই।" বন্ধুরা তাকে ডাকে, "ঘুমকাতুরে"।
তবে একটা জিনিস সে সবসময় করে, খাতার পেছনে ছবি আঁকে। খড়ের গাদা, স্কুলের বারান্দা, মাঠে বসা পাখি, এমনকি শিক্ষকের মুখের একেবারে নিখুঁত অভিব্যক্তিও সে এঁকে ফেলে অবলীলায়। কিন্তু কেউ কখনো তার দিকে গুরুত্ব দেয়নি।
একদিন স্কুলে এলেন ফারহানা ম্যাম - শহর থেকে বদলি হয়ে আসা একজন চারুকলা অনুরাগী শিক্ষিকা। ক্লাসে ঢুকেই তিনি লক্ষ্য করলেন হাসিবের বইয়ের পেছনের স্কেচ।
- "এইটা কি তুমি একেছ?"
- "জ্বি ম্যাম... সময় পেলে আঁকি।"
তিনি শুরু করলেন 'চিত্র-গল্প' নামের এক প্রজেক্ট। ছাত্ররা নিজস্ব গ্রামের গল্প বলবে ছবি দিয়ে। সবাই প্রথমে দ্বিধায়, তবে ম্যাম হাসিবকে বললেন - "তুমি পুরো ক্লাসের জন্য পটচিত্র তৈরি করবে, আমরা সবাই তোমার গল্পের চরিত্র হবো।"
হাসিব প্রথমে ভয় পায়। এত বড় দায়িত্ব! কিন্তু ম্যামের অনুপ্রেরণায় সে একেবারে ডুবে যায় কাজে। প্রতিদিন স্কুল ছুটির পর সে দেয়ালে আঁকে, পানির হ্যান্ডপাম্প, নারকেল গাছ, মাঠে দাঁড়ানো শিক্ষকের মুখ - সব।
এক মাস পর, স্কুল প্রাঙ্গণে উন্মোচন হয় দেয়ালজুড়ে আঁকা "আমাদের গ্রাম" নামের এক বিশাল চিত্রগল্প। দেখে সবার চোখ কপালে।
এক শিক্ষক বলেন - "এই ছেলেটা যে এত কিছু দেখতে পারে, আমরা কেউ জানতাম না।"
ওর মা এসে বললেন - "আমার ছেলেটা কথা বলে না ঠিকই, কিন্তু দেয়ালে সে নিজের ভাষায় পুরো পৃথিবী এঁকে ফেলেছে!"
ফারহানা ম্যাম মৃদু হেসে বললেন - "সবাই কথা বলে না, কেউ কেউ আঁকে। কেউ কেউ দেখে, বোঝে, আর সেখানেই থাকে সৃষ্টির সম্ভাবনা।"
প্রত্যেক ছাত্রের প্রকাশের ভাষা এক নয়। কেউ মুখে বলে, কেউ প্রশ্ন করে, কেউ হাসায়, আর কেউ নিজের সত্তা প্রকাশ করে রংতুলিতে বা নীরবতায়। শিক্ষক যদি সেই ভাষা বুঝতে পারেন, তবে "অলস" ছেলেও হয়ে উঠতে পারে একটি বিদ্যালয়ের শিল্পী-আত্মা।

৪. বিদ্যালয়ে যে কয়জন শিক্ষক আছেন, তার মধ্যে একজনই বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহী মোবারক স্যার। কিন্তু ছাত্ররা মোটেই বিজ্ঞানমনা নয়, তাদের কাছে বিজ্ঞান মানে পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করা। তবে এক ছাত্র আছে - রাকিব। সে কারও সঙ্গে খেলাধুলা করে না, গ্রুপে কথা বলে না, সবসময় একা বসে থাকে। শিক্ষকরা বলেন,

- "ওর মাঝে কোনো সামাজিকতা নেই!"
মোবারক স্যার একদিন লক্ষ্য করলেন স্কুলের পেছনের ভাঙা পানির কলটা রাকিব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। তিনি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,
- "তুমি এটা নিয়ে কী করছো?"
রাকিব ধীরে বলল,
- "স্যার, কলটা যেভাবে চুঁইয়ে পড়ে, আমি ভাবছিলাম এর থেকে পানি সংরক্ষণের যন্ত্র বানানো যায় কিনা।"
মোবারক স্যার অভিভূত। তিনি বুঝলেন এই 'অসামাজিক' ছেলে আসলে গভীর পর্যবেক্ষক। তার কৌতূহলকে দমন না করে উৎসাহ দিলে বিস্ময়কর কিছু ঘটতে পারে।
স্যার ঘোষণা দিলেন, "আমরা একটা ক্ষুদে আবিষ্কার মেলা করবো। যার যা মাথায় আছে, সেটা বানিয়ে আনবে। সাহায্য চাইলে আমি আছি।"
সবার আগে রাকিব এগিয়ে এল। পুরনো বোতল, পলিথিন, একটি ভাঙা কলের অংশ দিয়ে সে বানাল, একটি বৃষ্টির পানি জমিয়ে রাখার ছোট্ট স্বয়ংক্রিয় মডেল।
নাম দিলো "বৃষ্টিধরা"।
প্রদর্শনীর দিন রাকিব কথা কম বলল, কিন্তু তার মডেল দেখে সবাই থমকে গেল। এমনকি উপজেলা শিক্ষা অফিসার পর্যন্ত এসে বললেন. "এটা তো একটা বাস্তব সমস্যার সমাধান! এই ভাবনাটা একদম মৌলিক!"
পরে এক শিক্ষিকা বললেন, "আমরা যাকে বলতাম 'অসামাজিক', সে যে এমন চিন্তায় ডুবে থাকে, বুঝতেই পারিনি।"
মোবারক স্যার মুচকি হেসে বললেন, "সবাই যে একইভাবে বন্ধুত্ব বা অনুভব করে না। কেউ কেউ চিন্তার সঙ্গেই বন্ধুত্ব করে।"
শিক্ষক যদি সেই দৃষ্টিকে গুরুত্ব দেন, তবে একদিন সেই ছাত্রই সমাজের জন্য নতুন ভাবনার দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

৫. আলম - পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। লেখাপড়ায় খুবই দুর্বল। বারবার বানান ভুল করে, গুণ-ভাগে আটকে যায়, এমনকি নিজের নাম লিখতেও ভুল হয়। শিক্ষকরা ক্লাসে তার খাতা দেখে মাথা নাড়েন, "তোর মাথায় কিছু ঢোকে না রে?"
কিন্তু কেউ জানে না, আলমের একটা নিজস্ব জগৎ আছে। সে ভাঙা কলম, রঙচিটে কাঠি, পুরনো বোতল দিয়ে বানিয়ে ফেলে গাড়ি, মাছ ধরার যন্ত্র, এমনকি ছোট্ট ফ্যানও।
এই স্কুলে নতুন এসেছেন কিরণ স্যার, একজন কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষক, যিনি শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন, ছাত্রদের হাতে-কলমে শেখাতে ভালোবাসেন। একদিন কিরণ স্যার টিফিনের সময় দেখলেন - আলম খবরের কাগজ, জুতার ফিতা আর প্লাস্টিক দিয়ে একটা "ঘূর্ণি" বানাচ্ছে। স্যার থমকে দাঁড়িয়ে বললেন - "তুমি এটা কেমন করে করলে?"
আলম মাথা নিচু করে বলল - "ভাবছিলাম বাতাসে ঘুরবে কিনা..."
সেদিন স্যার বুঝলেন, এই ছেলেটি পড়ায় নয়, কিন্তু কাজের মধ্যে চিন্তা করে। সেই থেকেই শুরু হয় 'হাতের কাজ দিয়ে সমস্যা সমাধান' প্রজেক্ট। কিরণ স্যার ঘোষণা দিলেন - "আমরা সবাই মিলে এমন কিছু বানাবো, যাতে স্কুলের ময়লা এক জায়গায় জমে, বাতাসে না উড়ে যায়।"
ছাত্ররা দ্বিধায়। কেবল আলম উত্তেজিত। সে দৌড়ে এল, বলল - "স্যার, বাঁশ আর পুরনো লোহার জিনিস দিয়ে একটা ঘূর্ণি ঝুড়ি বানাতে পারি।"
সারাদিন সে কাজ করল - বন্ধুরা তাকিয়ে রইল। পরদিন সকলে দেখল, স্কুলের এক কোণায় দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত ঘূর্ণায়মান ময়লার ঝুড়ি - দেখতেও সুন্দর, কাজেও দারুণ কারণ বাতাস উঠলেই ঝুড়ির মুখটা ঘুরে উল্টো দিকে হয়।
এক শিক্ষক অবাক হয়ে বললেন, "এই কাজ তো শহরের বড় ছেলেরাও পারে না!"
পরে একজন ছাত্র এসে কানে কানে বলল - "আলম আসলে বোকা না, এই যে তিন ভাগের (কাগজ, প্লাস্টিক আর কাঁচ) ময়লাকে আলাদা করার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সঙ্গে বাতাসের গতি পথকে অনুসরণ ও সহজ ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ওর হাতেই কিছু একটা ম্যাজিক আছে।"
কিরণ স্যার মৃদু হেসে বললেন, "হাত দিয়ে যে ভাবে, সে বোকার হদ্দ নয়। সে এক অন্যরকম বুদ্ধিমান।"
শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেই প্রতিভা ধরা পড়ে না। কেউ হয়তো গণিত পারে না, বানান ভুল করে, কিন্তু তার হাতে আছে নির্মাণের ক্ষমতা— যা দিয়ে সে সমাজ বদলে দিতে পারে। শিক্ষক যদি সেই হাতে ভরসা রাখেন, তবে সেখানেই তৈরি হতে পারে এক নতুন দিক।

৬. তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী লাবনী - চুপচাপ, শান্ত, কিন্তু খুবই আবেগপ্রবণ। কেউ কড়া কথা বললেই চোখে পানি এসে যায়, একটু জোরে ধমক দিলেই সে এক কোণে গিয়ে বসে থাকে।
শিক্ষকরা বলেন - "ও এত আবেগী, কিছুতেই চাপ নিতে পারবে না।"
বন্ধুরা ঠাট্টা করে - "ও আবার কাঁদছে! কাঁদনেপটু!"
কিন্তু কেউ জানে না, লাবনী রাতে তার নানুর কাছে শিখে সুর করে গান গায়, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, কখনো লালন। তার কণ্ঠে যেন নদীর ঢেউ, ভাঙা হৃদয়ের কথা।

একদিন স্কুলে এলেন রীতা ম্যাডাম, একজন সংগীতপ্রেমী শিক্ষিকা, যিনি আগে ঢাকায় শিশুদের নিয়ে গান শেখাতেন। প্রথম দিনেই শুনলেন, টিফিনের সময় কেউ টেবিলের নিচে বসে গুনগুন করে গান গাইছে।
তিনি এগিয়ে গিয়ে দেখলেন লাবনী। মেয়েটি থমকে গিয়েছিল, ভয় পেয়েছিল।
রীতা ম্যাডাম আস্তে বললেন - "তোমার গলায় আছে আত্মা।"
সেদিন থেকেই শুরু হলো গানচর্চা ক্লাস। রীতা ম্যাডাম বললেন - "আমরা একটা স্কুলের নিজস্ব গান তৈরি করবো 'আমাদের স্কুল, আমাদের স্বপ্ন'। এই গান গাইবে লাবনী।"
প্রথমে কেউ বিশ্বাস করেনি 'ও তো গাইতে গিয়ে কাঁদবে'।
কিন্তু যেদিন গানের রেকর্ডিং হলো, সবাই স্তব্ধ।
লাবনীর কণ্ঠে ছিল নিজের মাটি, স্কুল, শিক্ষক, স্বপ্ন, কষ্ট সবকিছুর মিশ্র অনুভব।
এক শিক্ষিকা চোখ মুছলেন, বললেন - "এই মেয়ের কান্না ওর দুর্বলতা না, ওর গানেই লুকিয়ে ছিল সেই কান্নার শক্তি।"
গানের ভিডিও হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ফেসবুকে। কেউ লিখল - "এই শিশুর কণ্ঠে গ্রাম বাংলার হাহাকার আর ভালোবাসা একসাথে বাজছে।"
রীতা ম্যাডাম মৃদু হাসলেন, "যাকে আমরা কাঁদনেপটু বলি, সে-ই হয়তো সবচেয়ে বেশি অনুভব করতে জানে। সেই অনুভবই একদিন সবাইকে ছুঁয়ে দেয়।"
সব আবেগ দুর্বলতা নয়। অনেক শিশুর ভেতরেই থাকে এমন এক কোমল অনুভব, যা হয়তো পাঠ্যবইয়ের পাতায় ধরা পড়ে না। কিন্তু যদি সেই আবেগকে জায়গা দেওয়া হয় গান, কবিতা, সৃজনশীলতায় তবে সে-ই হয়ে উঠতে পারে আশেপাশের পৃথিবীর জন্য এক গভীর আলো।

“সব জ্ঞান বইয়ে থাকে না - কিছু জ্ঞান পাহাড় জানে।”

খাগড়াছড়ির এক পাহাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলটা খুবই সাধারণ, দুই রুম, বাঁশের বেড়া, টিনের ছাউনি। চারপাশে সবুজ গাছপালা, ঝর্ণার শব্দ মিশে থাকে পাখির কিচিরমিচিরে। সেখানে পড়ে লালরাম চাকমা, চুপচাপ, শান্ত, কিছুটা ‘বোকা বোকা’ বলেই সবাই মনে করে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির (চাকমা ভাষার) পাঠ্যপুস্তক ওর খুব পছন্দ; বাংলা ঠিকঠাক পড়ে না, অঙ্কের প্রশ্নে চুপ করে থাকে। শহর থেকে আসা অফিসাররা দেখে বলেন “এই ছেলেটা বড়জোর ঝুমচাষ শিখবে, পড়াশোনার কিছু হবে না।”

কিন্তু লালরাম চাকমার ভাষায় বোর্ড ও গল্পের বইগুলো (অতিথি পাখি, দুলেই কুমারী, কাক হরিণের বন্ধু, কুনো ব্যাঙ ও টুন্টুনি, শিয়ালের বুদ্ধি, শ্রীফল, লাল পোকার গল্প, টিং টং-এর কান্ড, বর্গরাজা ও ত্রিভুজরানি, ফুল ফোটার আনন্দ) সব পড়ে শেষ। বারবার যে বইটা সে পড়ে ও অনুভব করে, সেটা হলো “ফুল ফোটার আনন্দ” এখানে আছে প্রকৃতি, বীজ থেকে চারাগাছ ও গাছের বেড়ে ওঠা এবং ফুল ফোটার আনন্দ। তার এই নিজস্ব ভাষাভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিপ্রায় প্রশংসার দাবি রাখে। মানুষ তার পূর্বপ্রজন্মের সংস্কৃতি ও পরিবেশের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়।

জাহান স্যার, একজন তরুণ শিক্ষক, যিনি ঢাকা থেকে স্বেচ্ছায় এই পাহাড়ি স্কুলে এসেছেন। উদ্দেশ্য চাকমা উপজাতিকে জানা, তাদের সংস্কৃতি বোঝা। আর তাই স্যার চাকমা ভাষা শিখে এসেছেন।

লালরামের সঙ্গে জাহান স্যারের পরিচয়টাও বেশ নাটকীয়। একদিন স্কুলের শিক্ষা সফরে তিনি ছাত্রদের “রিছাং ঝর্ণা” দেখাতে নিয়ে যান, যা খাগড়াছড়ি শহর থেকে প্রায় ১০ কিমি দূরে। ওখানে গিয়ে স্যারের পায়ে দুইটি জোঁক কামড়ে ধরেছিল; স্যার ছাড়াতে পারছিলেন না। তখন লালরাম এক ধরনের তামাকজাতীয় গাছের পাতা দিয়ে জোঁক ছাড়ায়। স্যার তখন জানলেন, লালরাম সব গাছ-গাছালি চেনে এবং সেগুলোর উপকার সম্পর্কেও জানে। কোন গাছের পাতা দিয়ে জ্বর কমে, কোন পাখির ডাক শুনলে বৃষ্টি আসে, কোন পোকা জমিতে বিষ ছড়ায় না, এসব সে জানে। এমনকি চোখ বন্ধ করেও বলে দিতে পারে, জলপথের নিচে পাথর না বালি।

একদিন, পরিবেশ ও বিজ্ঞান সপ্তাহে জাহান স্যার বললেন “এবার আমরা পাঠ্যবই নয়, পাহাড়ের প্রকৃতি দিয়ে শিখব। গাইড হবে লালরাম।”

সে প্রথমে ভয়ে পেছিয়ে যায়। কিন্তু স্যার তাকে বললেন, “যে জানে কোন গাছের শেকড় কত গভীরে, সে প্রকৃতির শিক্ষক।”

শুরু হলো প্রকৃতিচর্চা। লালরাম শিশুদের নিয়ে গেল ঝর্ণার পাড়ে। দেখাল শীতলতা ধরে রাখা পাথর, বনজ গাছের ডাল দিয়ে পানি বিশুদ্ধ করার উপায়, ঝুপড়ির পাশে থাকা পাতার রস দিয়ে কীভাবে ক্ষত সারানো যায়। একজন শিক্ষার্থী, যাকে পরিবার ও সমাজ ‘দুর্বল’ বলে ধরে নিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির প্রতি গভীর সংযোগ ও পারিপার্শ্বিকতা পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা তাকে করে তোলে একজন ব্যতিক্রমী শিখন-নেতা।

সপ্তাহ শেষে আয়োজন হলো ‘আমার জানা, আমার স্কুল’ নামের এক মেলা।

সেখানে লালরাম করল একটি স্টল, জাহান স্যারের উৎসাহে। সেখানে ছিল শুধু বনের উপাদান দিয়ে বানানো জিনিস, ঘরোয়া চিকিৎসা ও তার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ডায়েরি।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এসে বললেন, “এই ছেলেটা তো ভবিষ্যতের পরিবেশবিদ। তোমরা তাকে আগে শুধু ছাত্র ভেবেছিলে; আমি দেখি সে এক শিক্ষক।”

জাহান স্যার জানেন, শিক্ষা মানে শুধু বই মুখস্থ নয়, জগৎকে বোঝা, দেখার চোখ থাকা এবং জীবনের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলা। যাদের আমরা “দুর্বল” বলি, অনেক সময় তারা এমন কিছু জানে যা শহরের মানুষ বই পড়ে খুঁজে পায় না। একজন শিক্ষকই পারে সেই জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিয়ে আলোয় আনতে।

“Intelligence is diverse, dynamic, and distinct.” - Ken Robinson.

“প্রতিভা অঙ্গের ওপর নির্ভর করে না।”

মেহেরপুর জেলার এক প্রত্যন্ত স্কুল। মাঠে কেউ দৌড়ায়, কেউ খেলে, কেউ চেনা নিয়মে বইয়ের অক্ষর কপিতে তুলে। কিন্তু একটি ছেলে দূরে বসে থাকে। তার দুটো হাতই নেই, জন্ম থেকেই। নাম সাকিব। সাকিবের জন্মের আগের গল্পটা এমন,

সাকিব - আমি পৃথিবীতে যেয়ে কেমন করে থাকবো, এখানে এই বেহেস্তে কতো ভালো আছি!

সৃষ্টিকর্তা - আমি তোমার জন্য পৃথিবীতে একজন ফেরেস্তা পাঠিয়েছি, সে তোমার সব দেখাশুনা করবে, তোমাকে গান শুনায়ে ঘুম পাড়াবে। সে তোমার জন্য তাঁর জীবনও দিয়ে দিবে। সাকিব - কিন্তু আমি সেই ফেরেস্তাকে চিনবো কেমন করে? সৃষ্টিকর্তা - তুমি তাকে “মা” বলে ডাকবে। হ্যা সাকিবের মা তার দুনিয়া, ওনার জন্যই আজ সে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। সাকিবের মার ভালোবাসা আর সাহসের রূপ এক। তিনি চান সাকিবকে একজন ভালো জীবন যোদ্ধা হিসাবে গড়ে তুলতে। সাকিব কখনো মুখ দিয়ে কলম ধরে আবার কখনো পায়ের আঙ্গুল দিয়ে। কিন্তু কেউ গুরুত্ব দেয় না। তার কপিতেও শুধু আঁচড়, কখনো স্পষ্ট অক্ষর নয়। স্কুল এ সে করুনার পাত্র, সবাই চায় সাহায্য করতে, (ঠিক এই জায়গাতেই ভুলটা করে সবাই)। সে রোজ স্কুলে আসে, কেউ না বললেও আসে, কিসের যেন একটা টান আর ক্লাসে নতুন নতুন বিষয়ের কথা ও আলোচনা।

একদিন, স্কুলে নতুন শিক্ষক আসেন জিন্নাত স্যার। খুব সাধারণ পোশাক, চোখে চশমা, কিন্তু অসাধারণ মন। তার মনে আছে এক বিস্তৃত মনন, আছে বাস্তবতাকে আলিঙ্গান করার সাহস। জিন্নাত স্যার লক্ষ্য করলেন, সাকিব রোজ ক্লাস এ এসে যত্ন সহকারে সব কথা শুনে, তার কাছের এক বন্ধু সজীব ওর সাথে থাকে কথা বলে ও ক্লাস এর বিষয় নিয়ে আলাপ করে। কিছুটা আলাদা কিছুটা অন্য রকম। জিন্নাত স্যার অত্যান্ত মেধাবী, উনি জানেন, শারীরিক প্রতিবন্ধিকতা মানুষকে সফল হতে বাধা দেয় না - বৈষম্যই আমাদের প্রধান বাধা। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিবন্ধিতা মানব জীবনের একটি স্বাভাবিক অংশ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমান অধিকার, সুযোগ এবং সম্মান পাওয়ার যোগ্য। স্যার এইটাও জানেন, সাধরনের জন্য এইটা বোঝা কঠিন যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য কতটা। প্রতিবন্ধীরা একে অপরের থেকে পৃথক, তেমনি আমাদের লক্ষ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও আলাদা ও বৈচিত্র্যময়। চাই সবার জন্য সমান সুযোগ।

জিন্নাত স্যার চান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, স্যার চান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার বন্ধ। তাঁরা দুর্বল জনগোষ্ঠী নয়, দুর্বল ভাবার এই চরিত্রায়ন ভালোর চেয়ে ক্ষতিই বেশি করে।যখন তাঁরা সাধারণ কাজ করে তখন তাঁদের অসাধারণ বলা বা অনুপ্রেরণাদায়ক বলা বন্ধ করা দরকার। জিন্নাত স্যার সাকিবের পাশে গিয়ে শান্ত গলায় বললেন, ‘তুমি কি লিখতে পারো না?’ - ‘পারি স্যার, পায়ে। একটু সময় লাগে শুধু...’ স্যার বললেন, ‘তাহলে একটা গল্প লেখো, যেটা শুধু তুমি-ই লিখতে পারো।’ সাকিব তার পায়ের আঙুল দিয়ে লিখল ‘চিন্তায় আকাশ ছুঁই।’ গল্পটা যেন একটা জীবন্ত আয়না, যেখানে সীমাবদ্ধতার ভিতর থেকেও উদ্ভাসিত হয় অজস্র সম্ভাবনার রেখা। মুখ দিয়ে কলম ধরা, পা দিয়ে ছবি আঁকা, আর হৃদয়ে আগুনের মত জ্বলে ওঠা এক শিল্পী মন, সাকিব ছিল এক অনন্য পথিক, যে সব ‘সাধারণ’ ধারণা ভেঙে সামনে এগোয় “চিন্তায় আকাশ ছুঁই।”

গল্পটি ছোট করে বললে এমন হয়, এক ছোট ছেলে ছিল যার জন্মের পর থেকে হাত ছিল না। সে বিশ্বে চলাফেরা করার জন্য তার নিজস্ব অনন্য উপায় খুঁজে পেয়েছিল। সে খেলনা তোলা থেকে শুরু করে কম্পিউটার কীবোর্ড চালানো পর্যন্ত আশ্চর্যজনক দক্ষতার সাথে করতো পা ব্যবহার করে। চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ওর সাফল্যের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে চাইত না যে তার শারীরিক পার্থক্য তার স্বপ্নকে সীমাবদ্ধ করে দিক। সে লক্ষ্য করত যে তার চারপাশের পৃথিবী কীভাবে হাতওয়ালা মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু পরাজিত বোধ করার পরিবর্তে, সে খাপ খাইয়ে নিতে এবং সমাধান খুঁজে বের করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। সে ঘন্টার পর ঘন্টা অনুশীলন করত, তার নড়াচড়া পরিমার্জন করত এবং তার পা এবং মুখ ব্যবহার করে কাজ সম্পন্ন করার নতুন উপায় আবিষ্কার করত। সে লেখা এবং আঁকার জন্য মুখের লাঠি ব্যবহার করতে শিখেছিল এবং পা ব্যবহার করতো সুনিপুণ ভাবে। তার অধ্যবসায় তার চারপাশের সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। সে যত বড় হতে থাকে, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ততই বৃদ্ধি পায়। সে একজন সফল শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখে, সে নিজেকে নিবেদিতপ্রাণ করে ছবি আঁকার চর্চা করে, তার পায়ের আঙ্গুলের মাঝে ব্রাশ ধরে এবং তার আবেগ ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে সুন্দর শিল্পকর্ম তৈরি করে। তার শিল্প এবং তার সাহসী মনোভাবের মাধ্যমে, নিজের জন্য একটি সফল জীবন গড়ে তোলে।উপসংহার: ইতিবাচক মানসিকতার মাধ্যমে, যে কেউ যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও অসাধারণ কিছু অর্জন করতে পারে। সবার কাছে আবেদন, মানুষ যেন কেবল কারো সীমাবদ্ধতার উপর ভিত্তি করে অনুমান বা বিচার করা থেকে বিরত থাকে। প্রতিটি ব্যক্তির সাথে শ্রদ্ধা, বোধগম্যতা এবং খোলা মনের সাথে যোগাযোগ করা গুরুত্বপূর্ণ।

গল্পটি পড়ার পর স্কুলে পুরনো চিন্তা ভাবনা ভেঙে পড়ে, “এই ছেলে তো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন না, সে আমাদের সবচেয়ে বিশেষ আশীর্বাদ!”

জেলা থেকে একজন এডুকেশন অফিসার এসে বললেন, “সাকিব, তোমার লেখা দিয়ে আমি আমাদের পাঠ্যবই বদলাবো।”

শারীরিক সীমাবদ্ধতা মানেই প্রতিভাহীনতা নয়। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সহানুভূতিশীল শিক্ষক যদি বলেন “তুমি পারো” তাহলে ছাত্রের সক্ষমতা তার সীমাবদ্ধতার বাইরে জন্ম নেয়, আর তখনি ছাত্রের ভেতরের আলো চারপাশ আলোকিত করে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ৬৪

“প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে”

নরসিংদীর এক শান্ত গ্রাম। মাঝখানে চলে গেছে পুরনো রেললাইন, তার ধারেই গ্রামের প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রেলকলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানে পড়ান রাশেদা ম্যাডাম। গলায় কোমলতা, চোখে দৃঢ়তা, আর মনে বিশ্বাস, “শিক্ষা বদলায় জীবন, যদি তাকে জীবনের মতো করে ধরা যায়।”

তার ক্লাস থ্রির ছাত্রী মিমি, একজন হাসিখুশি, প্রাণবন্ত শিশু। কবিতা বলতে ভালোবাসে, শব্দে শব্দে রঙ ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু স্কুল শেষে সে খেলার মাঠে যায় না। সোজা বাড়ি ফেরে, কারণ সে একজন শিক্ষক, এবং তার একমাত্র ছাত্রী তারই দাদি, শাহেদা বেগম, বয়স ৬৯।

শাহেদা বেগম কখনো স্কুলে যাননি। নাম লিখতে কষ্ট হয়, চিঠি পড়তে পারেন না। শুধু ছেলের ছবিগুলো বারবার দেখেন, আর মোবাইলের মেসেজ শোনেন নাতনির মুখে।

এক সন্ধ্যায় দাদি হাসতে হাসতে বললেন, “মিমি, জানিস? কেউ যখন শেখা বন্ধ করে দেয়, তখন সে বুড়ো হয়ে যায়, সে বিশ হোক বা আশি! কিন্তু কেউ যদি শিখতেই থাকে, সে তো চিরকাল তরুণই থেকে যায়।”

তারপর চুপ করে থেকে বললেন, “মিমি, আমি নিজেই যদি একদিন পড়তে পারতাম…”

মিমি অবাক হয়ে তাকায়। তারপর উচ্ছ্বসিত গলায় বলে “তুমি চাইছো দাদি? তাহলে আজই চল রাশেদা ম্যাডামের কাছে!”

পরদিন সকালে মিমি রাশেদা ম্যাডামের কাছে দাদিকে নিয়ে এলো। স্কুল তখনো শুরু হয়নি। বারান্দার বেঞ্চে বসে দাদি সংকোচে বললেন “এই বয়সে স্কুলে আসতে চাই… ভুল করলাম না তো?”

রাশেদা ম্যাডাম এক মুহূর্ত চুপ থাকলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন “তুমি ঠিক পথেই এসেছো, খালা। এই স্কুল শুধু ছোটদের জন্য নয়, এই স্কুল শেখার জন্য। আর শেখার তো বয়স হয় না।”

তিনি আরও বলেন “এমনভাবে বাঁচো যেন আগামীকালই মারা যাবে, আর এমনভাবে শিখো যেন চিরকাল বাঁচবে।”

তিনি সবাইকে ডেকে বললেন “আমরা আজ থেকে একটা নতুন অধ্যায় শুরু করব। ক্লাসে থাকবেন একজন নতুন ছাত্রী, শাহেদা খালা। আর ওঁর শিক্ষক হবেন মিমি।”

শুরু হলো এক অভিনব শিক্ষা-যাত্রা, দাদি ও নাতনির।

স্কুলে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থী হিসেবে দাদি অ আ ক খ শেখেন। সন্ধ্যায় বাসায় বসে দাদি হাত ধরে লেখেন নিজের নাম ‘শা হে দা’। মাঝে মাঝে ভুল হয়, কিন্তু মিমি ধৈর্য ধরে শুধরে দেয়।

একদিন মিমি অসুস্থ হয়ে স্কুলে যেতে পারল না। সেই দিন ছিল বার্ষিক কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান। রাশেদা ম্যাডাম ঘোষণা দিলেন, “আজ মিমির জায়গায় কেউ স্বেচ্ছায় কবিতা পড়বে?”

হঠাৎ সবাই অবাক হয়ে দেখে, দাদি উঠে দাঁড়ালেন। একটু কাঁপা গলায়, একটু লজ্জায়, কিন্তু আত্মবিশ্বাসে ভরা। সামনে এসে বললেন “আমি অ আ ক খ শিখেছি তোমাদের সঙ্গে,

এখন আমি মনের কথা লিখতে পারি রঙে রঙে।

আমি শুধু দাদি নই, আমি এক নতুন ছাত্রী,

শেখার শুরু কখনো নয় দেরি।”

এক মুহূর্ত স্তব্ধতা, তারপর করতালিতে কেঁপে ওঠে ক্লাসরুম। রাশেদা ম্যাডামের চোখে জল, তৃপ্তির, ভালোবাসার।

এরপর…

রাশেদা ম্যাডাম স্কুলের এক সভায় ঘোষণা দিলেন ‘দাদি-নাতি শিক্ষা সন্ধ্যা’ শুরু হচ্ছে। সন্ধ্যায় স্কুলের বারান্দায় শিশু ও প্রাপ্তবয়স্করা একসাথে বসবে। ছোটরা শেখাবে, বড়রা শিখবে। রেলকলি স্কুল হয়ে উঠল গ্রামের আলো জ্বালানো কেন্দ্র। দাদি এখন শুধু একজন শিক্ষার্থী নন, একজন অনুপ্রেরণা। আর রাশেদা ম্যাডাম? তিনি সেই শিক্ষিকা, যিনি বিশ্বাস করেন, শিক্ষার আসল রূপ হলো শেখার ইচ্ছাকে সম্মান জানানো। বয়স সেখানে কোনো বাধা নয়। কারণ জীবন, যতদিন আছে, ততদিন সে শেখায়।

বড় করে দেখলে, শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাস স্থানান্তরিত হয়, যা ধারাবাহিকতা ও সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। একটি সমাজের আত্মা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে এইভাবেই প্রবাহিত হয়।

“অক্ষর নয়, অভিজ্ঞতাও জ্ঞান।”

সুনামগঞ্জের এক হাওরপারের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। খড়খুটো আর কাঠ জ্বালিয়ে রান্না হয় স্কুলের মধ্যাহ্ন ভোজন। সেখানে প্রতিদিন হাসিমুখে ঘাম ঝরিয়ে সবার জন্য কাজ করেন আল্লাদী খালা - স্কুলের রান্নাবান্নার দায়িত্বে থাকা এক মধ্যবয়সী নারী। তিনি, সবার খুব প্রিয় খালা, খালার সব চিন্তা কেবল একটিই, কীভাবে তিনি তাঁর সন্তানসম ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুস্বাদু, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার তৈরি করবেন।

আল্লাদী খালা পড়তে লিখতে পারেন না। কিন্তু চাল, ডাল, আলু, সবকিছুর নিখুঁত হিসেব জানেন, অনুপাতিক হারে। প্রথমে, প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে নেন সেই দিনের ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বমোট উপস্থিতি। যদি ৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকলে তিনি নিখুঁতভাবে বুঝে যান কত বাটি চাল লাগবে, কয়টি আলু দিলে মাপে হবে আর মসলা, ডিম, মাছ, মুরগি বা মাংসের পরিমান। এমন কি সেদিনের জন্য এতটা জ্বালানি কাঠ লাগবে তাও। আসল হিসাব হলো কতটা সময় লাগবে রান্না প্রস্তুত হতে, এমন একটা উষ্ণ গরম খাবার দিতে হবে, ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীরা যেন আনন্দ করে খায়, আল্লাদী খালা দূরে দাঁড়ায়ে তা প্রাণ ভরে উপভোগ করেন। ছাত্র যখন আরাম করে তাদের মধ্যাহ্ন ভোজ উপভোগ করে, তখন খালার মনে এক তৃপ্তি বাসা বাধে। মনের অজান্তে তিনি জানেন, যার স্বাস্থ্য ভালো আছে, তার আশা আছে; আর যার আশা আছে, তার সবকিছু আছে।

“Health and education are always issues.” - Helen Clark

শরিফ, ক্লাস ফাইভের মেধাবী ছাত্র, সে পড়াশোনায় মনোযোগী ও শিক্ষকদের প্রিয়। কিন্তু ক্লাস পরীক্ষায় হঠাৎ গণিতে ফেল করে। গনিতের শিক্ষক বলেন, সবই তো ঠিক ছিলো কিন্তু সরল অংকের BODMAS নিয়ম ভুল করলে কেন! অনেক করে অনুশীলন করবে। শরিফের মন খাপ, মুখ গোমড়া, কারও সঙ্গে কথা বলে না। বন্ধুরাও বেশ চিন্তায়, সে বোধহয় হাল ছেড়ে দিচ্ছে।

আল্লাদী খালা লক্ষ্য করলেন মধ্যাহ্ন ভোজের সময় শরিফের মন উদাসীন ও অন্য দিনের মতো কোন উদশাহ নেই।

জিজ্ঞেস করলেন,

- “কিরে শরিফ, হাসিস না কেন?”
- “আমার মনে হয় আমি গণিতে আর পারবো না খালা...”
- “তুই পারবি না মানে কী? তোকে আমি একদিন রান্নার হিসাব শেখাবো, দেখিস, তুই আবার রাজা হবি গণিতে।”

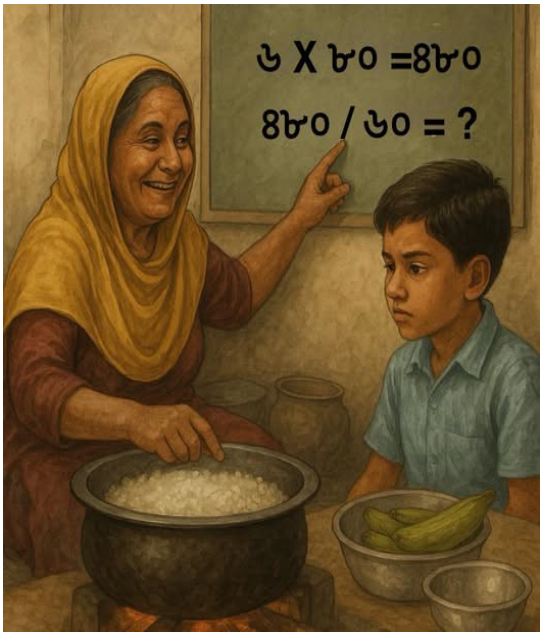

সেদিন থেকে খালা শরিফকে রান্নাঘরে পাশে বসান।

- “দেখ, চাল ৩ মুঠোতে হয় ১ বাটি, যদি ৮০ জন হয় তাহলে কত কাপ লাগবে বলতো?”
- “এ কাঁদি কাঁচকলায় যদি ৬০ টি কলা থাকে, একটি কলাকে কয় ভাগ করলে সবাই ৬ টুকরো করে পাবে?”

শরিফ ধীরে ধীরে দেখতে শিখল, গণিত শুধু কাগজে নয়, হাড়ির ভেতরেও আছে। আল্লাদী খালা কতো সহজেই তা দেখালো। এই বাস্তবতা ছিলো শরিফের জন্য সাহস ও উপলব্ধি যে শিক্ষা কেবল শ্রেণিকক্ষে ঘটে না, আমাদের চারপাশের মানুষদের মধ্যেও আছে।

এরপরের পরীক্ষায় শরিফ শুধু পাশ করে না, বরং পুরো ক্লাসে রান্না সংক্রান্ত এক গণনাভিত্তিক প্রজেক্ট করে - “খাবারে গণিত: একটি হাওর বিদ্যালয়ের রান্নাঘরের গল্প”

জেলা পর্যায়ের শিক্ষা মেলায় তার প্রজেক্ট দেখে অবাক হয়ে যান অনেক শিক্ষক। প্রশ্ন করেন, “এই ভাবনাগুলো কোথা থেকে এল?”

শরিফ মুচকি হেসে বলল, “আল্লাদী খালার হাড়ি থেকে।”

এরপর স্কুলে চালু হয় নতুন এক বিষয় “জীবন থেকে গণিত”।

যেখানে সবাই কখনো রাঁধুনির কাছ থেকে, কখনো কৃষকের কাছ থেকে, কখনো বাজারের দোকানি থেকে শিখে, সংখ্যা কেবল বইয়ের বিষয় নয়, জীবনের ভাষা।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানেই শিক্ষার শেষ নয়। অনেক সময় স্কুলের বাইরের মানুষ, যাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কখনো ছাত্র ভাবেনি, তাঁরাই হয়ে ওঠেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। কোনো শিশু যখন হাল ছেড়ে দেয়, তখন এক ‘অশিক্ষিত’ খালার জ্ঞানও তার জীবন ঘুরিয়ে দিতে পারে।

পৃথিবী ও আকাশ, বন ও মাঠ, হ্রদ ও নদী, পাহাড় ও সমুদ্র, চমৎকার স্কুল শিক্ষক, এবং আমারা বই থেকে যা শিখতে পারি তার চেয়েও বেশি কিছু শেখায়।

“মানুষের উপস্থিতি কখনো অতিরিক্ত নয় - অপরিহার্য।”

জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার একটি আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২০৩৫ সাল, বাংলাদেশের অনেক গ্রামেই এখন হাই-স্পিড ইন্টারনেট, সৌরচালিত ক্লাসরুম, আর প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে একটি করে স্মার্টল্যাপটপ। উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে প্রযুক্তিগত সমতার কারণ হলো বিশ্বাব্যাপী প্রযুক্তিগত ব্যাবসা ও বাংলাদেশের আগ্রহ প্রযুক্তির প্রতি। এই স্কুলেও তেমনই, এখানে ক্লাস নেয় AI সহায়ক, ভার্চুয়াল শিক্ষক, রোবোটিক সহকারী।

কিন্তু এই স্কুলে একজন মানুষিক শিক্ষক রয়েছেন, যাঁর নাম আসমানী ম্যাডাম, ৫৬ বছর বয়সী এক নারী যিনি এখনো হাতে খড়ি দিয়ে মমতার সঙ্গে শেখান, চোখের ভাষায় বোঝেন ছাত্রের মন, আর গল্পে গল্পে শেখান গণিত, বিজ্ঞান, আর জীবন।

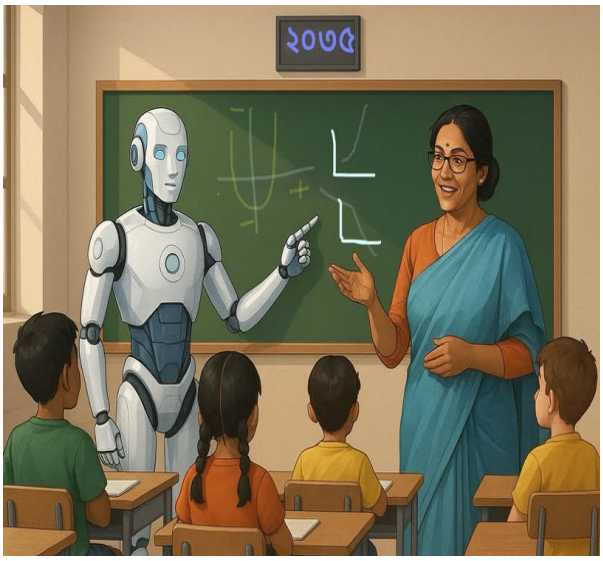

নতুন প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গিই আলাদা তারা সাচ্ছন্দ মনে করে রোবট দিয়ে শিখানো, তাই অনেকেই বলে, “রোবট তো সব জানে ম্যাম, আপনি থাকেন কেন?”

আসমানী ম্যাডাম হাসেন, মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, “রোবট জানে তথ্য, আমি জানি তোমার দুঃখটা কোথায় লুকিয়ে।”

একদিন ক্লাস থ্রির ছাত্র রায়হান হঠাৎ স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়। গৃহশিক্ষক-রোবট তার অনুপস্থিতিতে ক্লাসও চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো শিক্ষকই বোঝে না কেন ছেলেটি হারিয়ে গেল।

আসমানী ম্যাডাম একদিন ছুটির পর হেঁটে হেঁটে গেলেন রায়হানের বাড়ি। দেখলেন, মা অসুস্থ, বাবা বিদেশে, রায়হান এখন ছোট বোনকে দেখে, এখন স্কুল নয়, সংসারই তার দায়িত্ব।

পরদিন স্কুলে ম্যাডাম ঘোষণা করলেন, “আমরা শুধু প্রযুক্তির স্কুল হবো না, মানবতারও হবো।”

তিনি এক ‘মায়া-কোণ’ খুললেন, একটা রুম যেখানে ক্লাস শেষে ছাত্ররা এসে বিশ্রাম নিতে পারে, নিজের কথা বলতে পারে, একে অপরকে সাহায্য করতে পারে। সেখানে মনোবিদ নেই, কিন্তু আসমানী ম্যাডাম আছেন, শ্রবণশীল এক জ্যান্ত মন।

তার প্রস্তাবে স্কুল শুরু করল ‘মায়া-সমর্থন কর্মসূচি’, বাড়ির কাজ, পারিবারিক দায়িত্বে থাকা শিশুদের জন্য নমনীয় ক্লাস টাইম, বন্ধু-সহায়ক দল। রায়হান ফিরে এলো, এবং তার বোনকে নিয়েই এল “ওকে নিয়ে এসেছি ম্যাম, আপনি তো বলেছিলেন, স্কুল মানে ‘ঘর’!”

রোবটরা এবার নতুন করে শেখে, “কান দিয়ে শুধু শোনা যায় না, হৃদয় দিয়েও শোনা যায়।”

পরবর্তী রোবট আরও বুদ্ধিমান হয়, খবর রাখে সবার। ক্লাস এর একটা ছবি নিয়েই বুঝে যায়, কার মন খারাপ কার শরীরে কতো তাপমাত্রা ও কারা কারা শেখায় মনোযোগী।

কিন্তু তাতে কি, ছাত্ররা রোবট নিয়ে খেলতে খেলতে লেখাপড়া শেখে, আর আসমানী ম্যাডাম এর মতো শিক্ষিকাদের কাছ থেকে ভালোবাসা আর মায়া শেখে। ২০৩৫ তে জীবনের অন্য একটা পরিণতি, প্রযুক্তি হলো রোবট আর আবেগ হলো শিক্ষা, আবশ্যকীয় ভাবে গড়া শিক্ষা কার্যক্রম। আর তাই, ২০৩৫ এর সেই দিনে, এই রোবটিক স্কুলে আসমানী ম্যাডাম মনে করিয়ে দিলেন, মানুষের উপস্থিতি কখনো অতিরিক্ত নয়, প্রয়োজনীয়।

প্রযুক্তি অগ্রসর হবে, কিন্তু শিক্ষা যদি হৃদয়ছোঁয়া না হয়, তবে তা শুধু তথ্যের আধার হয়ে থাকবে। এক আসমানী ম্যাডাম, এক রায়হান, আর একটুকু ‘মায়া’, এই গল্পটাই আমাদের ভবিষ্যতের শিক্ষা।

ধনুক-ভাঙা পণ – ৬৮

“সব প্রতিভা ক্লাসরুমে জন্মায় না।”

গাইবান্ধার একটি নদীপাড়ের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নদীপাড়ের ছোট্ট শান্ত একটি স্কুল। দূরে কলকল করে বয়ে যায় ঘোলা নদী, পাড়ে কচুরিপানার বাগান, আর আকাশে মৌসুমি পাখির দল উড়ে যায় সারি বেঁধে। এই স্কুলে প্রতিদিন নৌকায় ভেসে আসে এক বালিকা. নাম তার সোনিয়া। দূরে তাকিয়ে থাকা অভ্যাস তার, যেন আকাশের ভেতরে গাছের ডালপালা দেখে।

সোনিয়ার বাবা একজন কাঠুরে। ভোরের কুয়াশা ভেদ করে নৌকা নিয়ে পাড়ি জমান গাছ কাটতে - কখনো বনের প্রান্তে, কখনো জমির কিনারায়। সোনিয়াও মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে যায়। সেখানেই তার প্রকৃতি চেনা।

সে গাছ দেখে আর বলে,
- “এইটা গামার গাছ, ভাদ্র মাসে ফুল ফোটে।”
- “এই পাতায় ব্যাঙ আসে বেশি, ওরা বর্ষায় ডিম পাড়ে।”
- “এই গাছের বাকল দিয়ে জ্বর কমে।”

কিন্তু স্কুলের খাতায় সোনিয়ার নাম কখনো মেধা তালিকার শীর্ষে ওঠেনি।
শিক্ষকেরা বলেন “সোনিয়া অত বইপড়ে না, গাছ-টাছ নিয়েই পড়ে থাকে।”
একদিন স্কুলে এলেন নতুন একজন জৈববিজ্ঞান শিক্ষিকা, সাঈদা ম্যাডাম। ক্লাসে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “পতঙ্গপরাগায়ন কি কেউ চোখে দেখেছে?” সবাই চুপ। শুধু সোনিয়া বলে, “ম্যাডাম, আমাদের নারকেল গাছে মৌমাছি আসে। ফুলে-মধুতে গুঁতিয়ে পরে, তারপর অন্য গাছে উড়ে যায়।”
- “তুমি বুঝলে ওটা পরাগায়ন?”
- “বাবা বলেন, গাছ একা বাঁচে না, বন্ধুরা ছাড়া ফল দেয় না।”

সাঈদা ম্যাডাম অবাক, এই মেয়েটা যেন জীবন থেকেই বিজ্ঞান শিখে ফেলেছে! তিনি মনে মনে ভাবেন: “প্রকৃত প্রতিভা তখনই ফোটে, যখন শেখার বিষয়টি জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। Passion and context make learning real.”
এরপর শুরু হয় “জীববিজ্ঞান মাঠচর্চা” - এক অভিনব পাঠপ্রণালী। সোনিয়াকে করা হয় মাঠ দলের গাইড। সে সহপাঠীদের নিয়ে যায় ঝোপের ভিতর, পুকুর পাড়ে, কচুরিপানার নিচে, মাটির ফাটলে। ব্যাঙের ছাতা, মৌমাছির বাসা, পোকামাকড়ের চলাফেরা, সব সে দেখায় নিজস্ব ভাষায়। কিন্তু সব ছাত্র তো আর সমান নয়।
ক্লাসেরই একজন বলে, “ও তো শুধু গাছ চেনে। ও কি পরীক্ষায় লিখতে পারবে?”
সোনিয়ার কানে সেই কথাগুলো পৌঁছায়। সে চুপ হয়ে যায়, আর মাঠে যায় না। কয়েকদিন স্যারের চোখ এড়িয়ে চলে। সাঈদা ম্যাডাম সেটা টের পান। একদিন সোনিয়াকে ডেকে বলেন, “তুমি জানো, বিজ্ঞানীরা কীভাবে বড় হয়? তারা দেখে, প্রশ্ন করে, মাপজোক করে, তারপর শব্দ খোঁজে। তুমি দেখতে পারো, এটাই তোমার শক্তি। বাকিটা আমি শেখাবো।”
শুরু হয় “বিজ্ঞান ভাষার অনুবাদ” প্রকল্প। সোনিয়া ছবি আঁকে, মৌমাছির নাচ, ব্যাঙের চোখে বৃষ্টি, কচুরিপানায় জন্ম নেওয়া শেওলা। ম্যাডাম তার লেখা টাইপ করে দেন, পোস্টার বানান, দেয়ালে ঝুলিয়ে দেন “প্রকৃতি পাঠে সোনিয়া” নামে।
স্কুলের বাকি ছাত্ররাও বদলে যেতে থাকে, যারা আগে শুধু মুখস্থ করত, এখন মাঠে যায়, দেখে, গল্প লেখে।
জেলা পর্যায়ের জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে সোনিয়া জমা দেয় তার প্রজেক্ট: “গাছের ভাষা”
তাতে লেখা, “গাছ কাটলেও আমি শুনি ওদের কান্না।” আর ছবি আঁকে, পাতার নীচে ঘুমিয়ে থাকা ব্যাঙ, মৌমাছির ছায়ায় বসন্ত, জলজ গন্ধের রং। বিচারক মন্তব্য করেন:
“এই মেয়ের হাতে বিজ্ঞানের ভাষা কবিতা হয়ে গেছে।”
শেষে সাঈদা ম্যাডাম বলেন,
“শুধু পাঠ্যবই নয়, প্রতিভা গড়ে ওঠে জীবন থেকে, অনুভব থেকে। কেউ কেউ বই পড়ে শেখে, কেউ কেউ প্রকৃতি পড়ে।”
সোনিয়া ছিল দ্বিতীয় ধরনের, প্রকৃতি যার খাতা, জীবন যার বিজ্ঞান।
যখন শিক্ষা কেবল স্ক্রিনে, স্লাইডে আর স্ক্যানারে বন্দী, সেখানে সোনিয়ার মতো মেয়েরা হারিয়ে যায় পাতার নিচে ব্যাঙের ছায়ায়। এই হারিয়ে যাওয়া, চুপিসারে নেমে আসা আধুনিকতার দীর্ঘশ্বাস।
“প্রকৃতির গভীরে তাকাও, তাহলে সবকিছু আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে।” - আলবার্ট আইনস্টাইন।

“নীরব কাজেও দেশপ্রেম শেখানো যায়।”

বগুড়া জেলার একটি সরকারি বিদ্যালয়, “বগুড়া জিলা স্কুল”। কালিপদো দা - বিদ্যালয়ের দপ্তরি। সকালে যখন প্রথম ঘণ্টা বাজে, তখন থেকেই একজন মানুষ ব্যস্ত ছায়ার মতো ছুটে চলেন, কখনো ঝাঁটা হাতে, কখনো খাতা-বইয়ের বোঝা নিয়ে। তিনি কালিপদো দা, স্কুলের দপ্তরি, কিন্তু ছাত্রদের চোখে একজন জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। তাঁর হাঁটার শব্দেই যেন স্কুলের শৃঙ্খলা শুরু হয়। স্কুলে শিক্ষকেরা পাঠ দেন অঙ্ক, বিজ্ঞান, বাংলা আর ইংরেজির। কিন্তু দেশপ্রেম আর দায়িত্ববোধের পাঠ? সেটা কালিপদো দা দেন তাঁর নিঃশব্দ কাজে।

প্রতিদিন সকালের অ্যাসেম্বলিতে তিনিই জাতীয় পতাকা বেধে দেন আর প্রথান শিক্ষক উত্তোলন করেন। পতাকাটিকে তিনি এমন ভাবে ভাঁজ করেন, ২ মিটার উপরে যেয়ে সম্পূর্ণ খুলে যায় (দড়িতে মৃদু একটু টান দিলে)। এই দৃশ্য দেখে ছাত্রছাত্রীরা মনে করে, পতাকা যেন দার হাতের কোনো অদৃশ্য মন্ত্রে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

যখন ছাত্রদের মাঠে খেলা শেষ হয়, সন্ধ্যার আগে আগে ড্রিল স্যার এসে পতাকা নামান, কালিপদো দা পতাকাকে ভাঁজ করেন। এই ভাঁজ করার দৃশ্য দেখতে ছাত্ররা জমা হয়, ছাত্ররা দেখে শেখে, কালিপদো দার সন্মান পতাকার প্রতি। তাঁর সম্মানজনক ভাবে ভাঁজ করার শিষ্টাচার - জাতীয় পতাকাকে একটি পরিষ্কার পৃষ্ঠের উপর সমতলভাবে বিছিয়ে লম্বালম্বিভাবে ভাঁজ করেন, মুড়ায়ে নেন সযত্নে, কিছুটা ছেরে উত্তোলনের দিকে (দড়ির দিকে) একটা গিঁট দেন যা তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার, এখন উত্তোলনের জন্য প্রস্তুত। শুধু কি তাই, ভাঁজ করা পতাকা বহন করার সময়, তিনি হাতের তালুতে বা বাহুতে ধরে রাখেন এবং সর্বদা পরিষ্কার জায়গায় আলমারিতে রাখেন। ছাত্রদের কাছে কালিপদো দার এই পতাকা ভাঁজের অনুষ্ঠানিকতা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সবুজ মাঠের লাল বৃত্তটি সবুজ বাংলাদেশের উপর উদিত সূর্যের প্রতীক, যা জাতির স্বাধীনতার প্রতিনিধিত্ব করে। সম্মানজনকভাবে পরিচালনা এবং ভাঁজ করা এই দেশের প্রতীককে সম্মান করার গুরুত্বপূর্ণ দিক ছাত্ররা স্কুলের দপ্তরি কালিপদো দার কাছ থেকে শিখেছে।

একদিন ক্লাস ফাইভের ছাত্র জাদু দা’কে জিজ্ঞাসা করে, “দা, আপনি পতাকাটা এমন করে ভাঁজ করেন কেন?” কালিপদো দা মৃদু হেসে বলেন, “এই পতাকাটা শুধু কাপড় না রে বাবা। এটা আমাদের দেশের আত্মা। যত্ন করে ভাঁজ করি, যাতে দেশের প্রতি সম্মানটা ভুলে না যাও।” তারপর থেকে বাবলা, কাফি, ববিন - সবাই মিলে একে একে শিখে নেয় পতাকা উত্তোলনের নিয়ম, ভাঁজের শিষ্টাচার, এবং পতাকাকে বাহুতে ধরে রাখার সম্মান।

কালিপদো দা যখন সকাল বেলায় প্রথম ঘণ্টা বাজান, সেটা একেবারে অন্যরকম। না, সেটা কোনো যন্ত্রের ঠনঠন শব্দ না, সেটা যেন একটা ডাক। টিফিনের সময় তাঁর ঘণ্টা একটু খুশির, যেন রোদে লাফানো ঘুড়ি। আর ছুটির ঘণ্টা? সেটা একদম আলাদা। কালিপদো দা অসুস্থ হলে বা স্কুলে না আসলে, সবাই জানতে পারে, সেই ছুটির ঘন্টার মধুর শুর নেই। মাঝে মাঝে দা একটু আলতো করে বলেন, “শোনো রে, এই ঘণ্টা বাজানোর আগে আমি ভাবি, আজকের দিনটা তোমরা কী শিখলে?”

একবার নয়ন নামে এক ছাত্র দার কাছে গিয়ে বলেছিল, “দা, আপনার ছুটির ঘণ্টাটা বাজলেই মনে হয় স্কুলটা আমরাই চালাই!”

কালিপদো দা মৃদু হেসে বলেছিলেন, “তোমরাই তো চালাও। আমি শুধু সময়টা মনে করিয়ে দিই।”

স্কুলের অফিস কক্ষে পুরনো “গ্রান্ডফাদার ক্লক” যা কাঠের এক নান্দনিক দেয়ালঘড়ি ঝুলে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, তার গায়ে সময়ের ছাপ, কিন্তু আবার ঝকঝকে, কারণ, কালিপদো দা নিজে প্রতি সপ্তাহে ঘড়ির পেন্ডুলাম ঘোরান, নিজেই কাঁচ মুছেন, আর চাবি দেন। ছাত্ররা বলে, “আমাদের স্কুলের সময়টা চলে দার হাতে ঘোরানো পেন্ডুলামে!”

একবার ক্লাস থ্রি-এর এক ছাত্র মোকছেদ জিজ্ঞেস করল, “দা, আপনি চাবি না দিলে কি ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাবে?” কালিপদো দা হেসে বললেন, “ঘড়ি হয়তো চলবে, কিন্তু স্কুলের সময়টা ঠিকঠাক চলবে না।” শুধু সময় দেখার জন্য না, ঘড়ির নিচে একটা ছোট কাঠের তাক। সেখানে একটা ফুলদানিতে প্রতিদিন গাঁদা ফুল দেন দা।

একদিন এক অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক বললেন, “আমরা বই দিয়ে পড়াই, কালিপদো দা কাজ দিয়ে শেখান।” সেই দিন, ‘শ্রেষ্ঠ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষক’ হিসেবে স্কুল কর্তৃপক্ষ কালিপদো দাকে দেয় একটি সংবর্ধনা। কোনো সনদ, কোনো ট্রেনিং ছাড়াই তিনি হয়ে উঠেছেন মূল্যবোধ শেখানোর একজন আদর্শ ‘নীরব শিক্ষক’।

ছাত্রদের চাই, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংমিশ্রণ, স্কুলের কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অদৃশ্য নায়কদের স্বীকৃতি দরকার যা ছাত্রদের অবচেতন মনে অনুপ্রেরণা যোগাবে। এই গল্পে কালিপদো দা শুধু একজন দপ্তরি নন - তিনি স্কুলের হৃদস্পন্দন। তাঁর হাত ঘুরে চলে সময়, শৃঙ্খলা আর এক অদৃশ্য শিক্ষা।

“যেখানে সমস্যা আছে, সেখানেই বিজ্ঞানের জন্ম।”

পাবনার বেড়া উপজেলার চর-সীমানপুর গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। রায়হান পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। মানিক স্যার বিজ্ঞানে আগ্রহী এক নবীন শিক্ষক। চরের স্কুলে বৈজ্ঞানিক ল্যাব নেই, নেই ডিজিটাল ক্লাসরুম। কিন্তু আছে খোলা মাঠ, আছে খাল, আর আছে জীবনের বাস্তব সমস্যা। এখানে লেখাপড়ার কোন উচ্চাকাঙ্খা নেই, কোন রকমে একটুখানি জানলেই হলো। সরকারের বিনামূল্যে পাঠ সঙ্গে কিছু বৃত্তি আর মধ্যাহ্ন খাবারের ব্যবস্থা আছে তাই কিছু ছাত্র আসে। চরের জীবন, বর্ষায় জলধারা আর গ্রীষ্মে পাথরকুচির মতো ফেটে যাওয়া মাটি, এটাই চর-সীমানপুর, স্কুলের পাশে মাঠ আর দূরে আঁকাবাঁকা খাল। গ্রীষ্মে চাষ বাস করবার জন্য সরকার থেকে একটা সিমেন্টের নালা করে দেওয়া হয়েছে, যাকে সবাই বলে “প্রকল্প নালা”। খরায় শেলো টিউবওয়েল দিয়ে প্রকল্প নালায় পানি সর্বরাহ করা হয় জমিতে পানি দেবার জন্য। কিন্তু দূরের জমিতে পানি পৌঁছায় কম, আর কাছের জমি পানিতে ডুবে যায়। এ নিয়ে কৃষকেরা ক্ষুব্ধ, মনে হয় প্রকল্প নালা কোন কাজে আসবেনা। সরকারি লোকেরাও কোন সমাধান দিতে পারে না। নালা থেকে সুইচ গেটের মতো পানি চলে যায় ডানে আর বামে, পানির উচ্চতা যত বেশী হয় ততো কাছের জমিগুলো পানিতে ভেসে যায় আর দূরের জমিতে পানি যায় না। সবাই ভাবলো সরকারের এই প্রকল্প নালা কোন কাজের না। রায়হানের এসব দেখে মন খারাপ করে। কারণ তার বাবার জমিও এক প্রান্তে, সবচেয়ে কম পানি পায়।

বিজ্ঞান ক্লাসে মানিক স্যার বলেন, তোমরা চোখ বন্ধ করে স্বপ্ন দেখো, কিন্তু চোখ খুলে সেই স্বপ্নের উপায় খুঁজে বের করো। একদিন স্যার বোঝাচ্ছিলেন পানি তিনটি অবস্থায় থাকতে পারে কঠিন, তরল এবং বায়বীয়। কতো মাজার মজার কথা বলেন মানিক স্যার, পানি যে কোন প্রাণী - কোষ বা উদ্ভিদ-কোষের একটি প্রধান উপাদান। আর তাই, মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বহির্বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজার আগে প্রথমে সেখানে পানির অস্তিত্ব খোঁজেন। কারণ, পানি যদি না থাকে, তাহলে সেখানে প্রাণ থাকতে পারে না। রায়হানকে এই সকল তথ্য খুব আকর্ষণ করে, সে স্যার কে আরও কিছু বলতে বলে।

রায়হান অধীর আগ্রহে পরের দিন স্যারের সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো। স্যার কিছু পাইপ আর দুটি পাত্র এনেছিলেন, দেখালেন পানি সর্বদা উচ্চ থেকে নিম্নে প্রবাহিত হয় এবং ভারসাম্য বজায় রাখে, যা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের কারণে হয়। দেখালেন, সাইফন হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তরে পানি (বা তরল পদার্থ) স্থানান্তরের জন্য মাধ্যাকর্ষণ এবং বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ব্যবহার করে। মানিক স্যার পরিষ্কার করে বুঝালেন সাইফন এর ক্ষত্রে, - নলের উভয় প্রান্ত পানিতে নিমজ্জিত থাকতে হবে। - নলের মধ্যে কোনো বায়ু বুদবুদ থাকা যাবে না। - উচ্চতর পাত্রের তরলের স্তর নিম্নতর পাত্রের চেয়ে বেশি হতে হবে। - বায়ুমণ্ডলের চাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

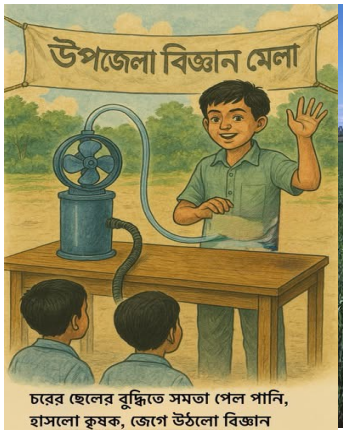

চরের ছেলের বুদ্ধিতে সমতা পেল পানি,
হাসলো কৃষক, জেগে উঠলো বিজ্ঞান

রায়হান অনেক বার সাইফন পরীক্ষা করলো নিজের হাতে নিয়ে, পাত্র দুটিকে উঁচু নিচু করলো, সমানে রেখে দেখলো পানির প্রবাহ বন্ধ থাকে।

ঠিক তখনি ওর মনে হলো, Eureka! যদি একটু উঁচুতে পাইপ বসিয়ে সাইফনের মতো চেপে টান দেওয়া যায়, তাহলে পাশে পাশে থাকা জমিতেও একসাথে এবং একই চাপে পানি চলে যেতে পারে, সমানভাবে। সে ক্ষত্রে প্রকল্প নালার কোন সুইচ গেটে লাগবে না, যার যখন দরকার পাইপ দিয়ে সাইফন করে নেবে। সেই বিকেলেই, রায়হান মাঠে পড়ে থাকা পুরোনো প্লাস্টিকের পাইপ খুঁজে আনে, বাবার সঙ্গে জমিতে যায়। নিজে হাতে পাইপে পানি ভরে বাঁকিয়ে এমনভাবে নালায় ডুবায় যাতে সাইফন সিস্টেম এ পানি জমিতে গিয়ে পড়ে। এবং তাই হলো, সুন্দর ভাবে পানি এলো, এবার সবাই সমান চাপে পানি পাবে। প্রথমে কেউ বিশ্বাসই করেনি, অনেকে বলল, ‘বাচ্চার খেলা!’ কিন্তু যখন সকালে সমান পানি দেখে তারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকল, তখনই বদলে গেল দৃশ্যপট।

এবার, রায়হান আর মানিক স্যার মিলে একটা পরিকল্পনা করলো, তারা মেকানিকাল পানির মিটার বানাবে, যেখানে পানির প্রবাহের সঙ্গে ফ্যান থাকবে এবং একটা সময় পাইপে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দেবে। কতটা পানি সাইফন সিস্টেম এ নিবে তা মিটার এ সেট করা যাবে।

গ্রামের বদি চাচা বলে উঠলেন, - “এই ছেলেটা তো বিজ্ঞানী!” - “কোনো টাকা লাগেনি, তাও একটা নতুন রাস্তা বের করলো!”

মানিক স্যার একদিন তাকে ডেকে বললেন, - “তুমি শুধু বইয়ের বিজ্ঞান না, জীবনের বিজ্ঞান ধরতে শিখেছ।এটাই সত্যিকারের বিজ্ঞানীর পরিচয়” পরে রায়হান গ্রামের অন্য জায়গায় ৮টি জমির জন্য এমন ছোট সাইফন বসায়। সে স্কুলে “আমার পানি ভাগাভাগির যন্ত্র” নামে একটি প্রজেক্ট বানিয়ে উপজেলা বিজ্ঞান মেলায় অংশ নেয়। প্রথম পুরস্কার জেতে।

পত্রিকায় শিরোনাম হয়: “চরের ছেলের বুদ্ধিতে সমতা পেল পানি, হাসলো কৃষক, জেগে উঠলো বিজ্ঞান।”

একটা খালি প্লাস্টিকের পাইপ, একটু মনোযোগ, আর একটা শেখানো চোখ - এই তিনে বদলে গেল চরের পানি বণ্টনের পদ্ধতি। সাইফনের মতোই, বিজ্ঞান ও ভালোবাসাও একে অপরকে টেনে নেয়, শুধু দরকার একজন মানিক স্যার আর একজন রায়হানের। “গণিত কেবল তাদের কাছেই তার গোপন রহস্য প্রকাশ করে যারা এর সৌন্দর্যের জন্য বিশুদ্ধ ভালোবাসার সাথে এর কাছে যায়।” - আর্কিমিডিস।

"ভালো কাজ মানে সাহস, মমতা আর চিন্তার দেয়াল ভাঙা"

সিরাজগঞ্জের চরাঞ্চলের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শামীম চতুর্থ শ্রেণির শান্ত ও অচেনা ছাত্র। রাবেয়া ম্যাডাম সহানুভূতিশীল শ্রেণি শিক্ষক।

চরের স্কুল। ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগই কৃষকের সন্তান। পড়ালেখার পাশাপাশি তাদের জীবনে আছে অনেক বাস্তব দায়িত্ব, গরু তোলা, মাছ ধরা, ভাই-বোন দেখা।

শামীম, চুপচাপ একটা ছেলে। শ্রেণিতে বিশেষ চোখে পড়ে না। না চট করে উত্তর দেয়, না চেঁচায়। কিন্তু সে কোথাও যেন আলাদা।

একদিন রাবেয়া ম্যাডাম লক্ষ করলেন - স্কুলের উঠোনটা হঠাৎই পরিষ্কার, অথচ দপ্তরী আসেনি। পরদিন জানালার ধারে দেখা গেল কাশফুল রাখা, আবার একদিন এক প্রতিবন্ধী ছাত্রকে খাওয়াতে দেখা গেল এক 'অচেনা হাত'। সবাই চুপ। কেউ কিছু বলছে না।

এক বিকেলে স্কুল শেষে রাবেয়া ম্যাডাম দেখে ফেললেন, শামীম একটা ভিক্ষুককে নিজের টিফিন বক্সের কলা দিচ্ছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

- "তুমি এসব করো কেন, শামীম?"

শামীম মাথা নিচু করে বলল,

- "আমার দাদু বলতেন, প্রতিদিন একটা ভালো কাজ করলে জীবন ভালো হয়ে যায়। তাই স্কুলে আসার পথে একটাও করে ফেলি।"

ম্যাডাম মনে মনে শামীমের দাদুকে শ্রদ্ধা জানালেন। তিনি বুঝলেন, এই ছাত্রটিই সেই নীরব সহচর।

পরদিন রাবেয়া ম্যাডাম ক্লাসে দাঁড়িয়ে বললেন,

- "ভালো কাজের জন্য বড় টাকা লাগে না, বড় মানুষও লাগে না, শুধু লাগে মন আর ইচ্ছা।"

তিনি বোর্ডে লিখলেন: "Courtesy costs nothing, but buys everything."

তাঁর নেতৃত্বে শুরু হলো নতুন নিয়ম:

"আমার আজকের ভালো কাজ" নামে একটি বোর্ড, যেখানে প্রতিদিন একজন ছাত্র ছোট্ট ভালো কাজ লিখে ঝুলিয়ে রাখে।

শামীম সেই বোর্ডের প্রথম লেখক:

"স্কুলে আসার পথে এক দৃষ্টিহীন চাচাকে রাস্তা পার করিয়ে দিয়েছি ।"

একদিন সকালে শামীম স্কুলে যাওয়ার সময় দেখে, একটি বেজির বাচ্চা পরিত্যক্ত মাছ ধরার জালে আটকে গেছে। গ্রামে প্রচলিত বিশ্বাস: "বেজি কামড়ালে পাগল করে দেয়!" সবাই ভয় পায়।

শামীম দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর নিজের "ভালো কাজের খাতা" মনে পড়ে। সে ধীরে ধীরে দুটি কাঠি দিয়ে বেজিটার পেছনের পা মুক্ত করে।

বেজি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর খুঁড়িয়ে চলে যায় ঝোপের দিকে।

সেদিন খাতায় শামীম লিখে:

"ভালো কাজ ১৯: একটা প্রাণীকে মুক্ত করলাম। ওর চোখেও কৃতজ্ঞতা ছিল মনে হলো।"

রাবেয়া ম্যাডাম পুরো গল্পটা পড়ালেন স্কুল অ্যাসেম্বলিতে। বললেন,

- "ভালো কাজ মানে সাহস, মমতা আর চিন্তার দেয়াল ভাঙা। শামীম আজ সেটা করে দেখিয়েছে।"

একদিন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এসে ভালো কাজ বোর্ড দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন, "এ স্কুলে শুধু পাঠ্য শেখানো হয় না, মানুষ হওয়াটাও শেখানো হয়।"

সেই বছর শামীম পেল "সেরা মানবিক ছাত্র" সম্মাননা।

তবু সে আগের মতোই চুপচাপ থাকল। শুধু তার খাতার শেষ পাতায় লেখা ছিল:

"ভালো কাজ গাছের ছায়ার মতো, নীরবে কাজ করে, কাউকে না জানিয়ে।"

প্রতিদিন একটি ভালো কাজ, এই ছোট অভ্যাস একদিন বদলে দিতে পারে একটি সমাজ। একজন শিক্ষকের চোখ, একজন ছাত্রের হৃদয়, আর একটি অঙ্গীকার, এই তিনে গড়ে ওঠে নীরব কিন্তু উজ্জ্বল এক আলো।

“সঙ্গীত কণ্ঠে নয়, বিশ্বাসে জন্মায়।”

জেলার সীমান্তবর্তী এক পাহাড়ি এলাকা। রাজু পঞ্চম শ্রেণির এক লাজুক ছাত্র, যার কণ্ঠে লুকিয়ে আছে এক আশ্চর্য জগৎ। জাহিদ স্যার সদ্য বদলি হয়ে আসা এক সংগীতপ্রেমী শিক্ষক।

স্কুলে কেউ কখনও রাজুর গলার আওয়াজ শোনেনি। চুপচাপ থাকে, নিজের মতো থাকে। শিক্ষকরা ভাবে, বোধহয় ভয় পায়, কিংবা কিছু বোঝে না। এমন শিশুকে প্রায়ই দেখা যায় চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণিতে– বয়স যখন ৯-১০, বাইরের গোলমেলে দুনিয়ার সাথে নিজের নির্জন সৃজনশীল জগতের মেলবন্ধন তখনও তৈরি হয়নি। সে খুঁজে ফিরে তার অবস্থান, তারই প্রতিফলন হলো চুপ থাকা। রাজুর নিজের জগত যেন এই কথাগুলোর প্রতিচ্ছবি - “শব্দ তোমাকে ভাবায়, সঙ্গীত তোমাকে অনুভব করায়, গান তোমাকে রূপান্তর করে।” - ই. ওয়াই. হারবার্গ, কিন্তু একদিন বিকেলে, স্কুলের পাশে ঝর্ণার ধারে জাহিদ স্যার হঠাৎ শুনলেন এক অনবদ্য সুর, নির্জন পাহাড়ি বিকেলে একটা ছোট কণ্ঠে বাজছে রবীন্দ্রসংগীতঃ “আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী…”

সেদিনই রাজুর জীবনের মোড় ঘুরে গেল।

জাহিদ স্যার বললেন, “তুমি কি জানো, গানের মাধ্যমে মানুষ হৃদয়ের গভীরতম কথাগুলোও বলে ফেলতে পারে? এই শক্তিটাই তোমার আছে, রাজু।”

রাজু ভয় পেয়ে মাথা নাড়ে “স্যার, আমি ক্লাসে গান গাইতে পারবো না…”

স্যার হেসে বলেন, “তুমি শুধু চোখ বন্ধ করে গাও। আমি থাকবো পাশে, ভয় পেও না।”

এরপর থেকে স্কুলে প্রতি বৃহস্পতিবার একটা ‘সুরের ক্লাস’ হয় - যেখানে সবাই গান গায়, তাল দেয়, নিজের গলার সুর খোঁজে। রাজু শুধু গান গায় না, অন্যদের শেখায়ও। স্কুল চায়, এমন একটা পরিবেশ যেখানে, সঙ্গীত আত্মা থেকে দৈনন্দিন জীবনের ধুলো ধুয়ে দেবে। জাহিদ স্যারের ‘সুরের ক্লাস’ এ মৌলিক কণ্ঠ ও বাদ্যযন্ত্রের পাঠ, বিভিন্ন সঙ্গীত শৈলীর সাথে পরিচিতি, সঙ্গীত তত্ত্বের মূল বিষয়গুলির সাথে পরিচিতি এবং সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা ও অনুশীলন করা হয়। সুরের ক্লাস যেন স্কুলের দেয়াল পেরিয়ে চারপাশের জগতে পৌঁছে দেয় কাজ, সংস্কৃতি ও মানুষের সংস্পর্শে। সঙ্গীত হয়ে ওঠে যোগাযোগের, সৃজনশীলতার ও সহযোগিতার ভাষা।

একবার জেলার শিক্ষা অফিসার স্কুলে আসেন। তিনি রাজুর গলা শুনে অবাক হয়ে যান। বলেন, “এই ছেলেটাকে নিয়ে তো আরও বড় কিছু ভাবা যায়!”

স্কুলে একটা ছোট ‘সঙ্গীত ক্লাব’ গড়ে ওঠে। রাজু হয়ে ওঠে তার কর্ণধার।

একদিন রাজু বলে, “স্যার, আগে কেউ আমার কণ্ঠকে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু আপনি শুনেছেন। আপনার শ্রবণশক্তিই আমার সাহস হয়ে উঠেছে।”

জাহিদ স্যার মৃদু হাসেন, বলেন, “প্রতিভা পাথরের নিচে লুকানো থাকে। আমাদের কাজ হলো সেই পাথরটা সরিয়ে দেওয়া, যাতে আলো পৌঁছায়।”

প্রতিটি শিশুর মধ্যে কোনো না কোনো ‘উপাদান’ থাকে যেটা তাকে আলাদা করে তোলে। সেই উপাদানকে খুঁজে বার করাই শিক্ষকতার সবচেয়ে সৃজনশীল দায়িত্ব। সঙ্গীত হলো শিল্পের সবচেয়ে বিশুদ্ধতম রূপ।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন - “গায়কের ভেতরে সবকিছু থাকে। সুরগুলি তার জীবন থেকেই বেরিয়ে আসে। এগুলি বাইরে থেকে সংগৃহীত উপকরণ নয়।”

“প্রতিভা জায়গা পেলে, ঘরোয়া কাজও গবেষণা হয়ে ওঠে।”

রাজশাহীর শহরতলির এক প্রাথমিক বিদ্যালয়। সবার মধ্যে মিশে থাকা একটি মেয়ে - নাম তামান্না। চুপচাপ, নম্র, মাঝেমধ্যে ক্লাস মিস করে। সে চোখে চোখ রাখে না কারও সঙ্গে, যেন নিজের ছোট জগৎ নিয়ে ব্যস্ত - যেখানে দুপুর মানে বাসন মাজা, আর সন্ধ্যা মানে ছোট ভাইকে ঘুম পাড়ানো। কারণ তার মা অন্যদের বাড়ি কাজ করেন। ক্লাসে তেমন উজ্জ্বল নয়। গণিতে নড়বড়, বিজ্ঞানে অনাগ্রহী।

শিক্ষকেরা প্রায়শই বলেন,

- “এই মেয়ে বোধহয় লেখাপড়ায় কিছু করতে পারবে না।”
- “গৃহকর্মীর মেয়ে, বোধহয় ঐ পথেই যাবে।”

কিন্তু নতুন একজন শিক্ষক, ইশরাত ম্যাডাম, ক্লাসে বৈচিত্র আনবার জন্য একদিন সবাইকে বললেন:

- “তোমরা যার যার বাসার প্রিয় রান্না নিয়ে আসবে, এবং বলবে কী উপকরণ, কেন কেমন স্বাদ হয়, আর কী রকম পরিবর্তন হয় তাপে বা সময়ের ব্যবধানে।”

সবাই কিছু না কিছু আনল। কিন্তু তামান্না আনল এক পাতলা খিচুড়ি, যার রঙ কাঁচা হলুদের মতো হালকা, কিন্তু গন্ধে যেন এক পাকা রাঁধুনির হাতের ছোঁয়া, লবঙ্গ, পেঁয়াজের আলতো ছোঁয়া, আর গরম ঘি মিশে এমন এক ঘ্রাণ ছড়াচ্ছিল, যা ভাষা ছাড়াই গল্প বলে।

সে খুব ধীরে বলল, “এই রেসিপিটা আমার তৈরি। ঘি বেশি হলে ভারি হয়ে যায়, আমি শুধু গরম পাত্রে কয়েক ফোঁটা দেই, লবঙ্গটা চুলার শেষে দেই - তাতে গন্ধ থাকে, রান্নার পর ১০ মিনিট ডেকে রাখি যাতে গরমের ভাবটা সমান ভাবে লাগে ও মসলার গন্ধ সুন্দর ও ঘন হয়। চুলোর তাপ সময়ের সাথে সাথে কমায়ে দিতে হয়, পাতিলের রকমের উপর নির্ভর করে কতটা তাপ দিবো, যদি পাতলা অ্যালুমিনিয়াম হয় তবে ....”

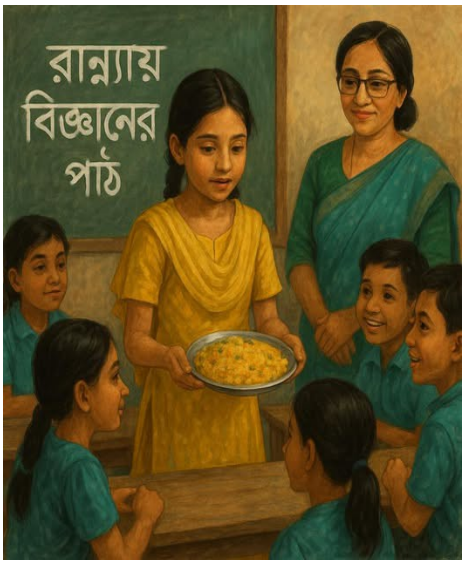

পুরো ক্লাস স্তব্ধ। ইশরাত ম্যাডাম জানলেন কতটা বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি হতে পারে একটা রান্নার কাজ, এ যেন ছবি আঁকা বা গান লেখার মতো। যেমন গানে অনেকগুলি সুর আর ছবিতে অনেক রঙ থাকে, তেমনি অনেকগুলি স্বাদও থাকে রান্নায় - সেটাই যেন বলছে তামান্না।

ইশরাত ম্যাডাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

- “তুমি এটা কোথা থেকে শিখলে?”
- “আম্মু কাজের সময় বলতেন, কিন্তু আমি নিজে করে করে বুঝেছি কীভাবে স্বাদ বদলায়। আমি ওদের রান্না নিয়ে নিজে পরীক্ষা করি। আমি চাই একদিন আমি আমার রান্না দিয়ে মানুষের মন ভাল করে দিই।”

ম্যাডাম জানেন রান্নার জন্য আত্মবিশ্বাসী, অনুমান এবং উন্নতির প্রযোজন - পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সৃজনশীল উপায়ে ব্যর্থতা এবং অনিশ্চয়তার সাথে মোকাবিলা করা। এখানে নিজস্ব প্রতিভা জড়িত।

সেদিন থেকে ইশরাত ম্যাডাম তামান্নার জন্য চালু করলেন এক বিশেষ সেশন,
“রান্নায় বিজ্ঞানের পাঠ”, যেখানে খাদ্য উপাদান, তাপ, গন্ধ ও সময়ের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তনের সহজ ভাষায় পাঠ হয়।

তামান্না হয় এই ক্লাসের সহকারী গাইড।

তার তৈরি করা খিচুড়ির রেসিপি নিয়ে একটি শিশু ম্যাগাজিনেও লেখা বেরোয়, “স্বাদের সূত্রপাত”

একদিন জেলা থেকে এক অফিসার স্কুল পরিদর্শনে এসে বললেন, “এই মেয়েটা তো শুধু রান্না করছে না, একধরনের গবেষণাও করছে। ওর হাতে শুধু খুন্তি নয়, আছে রসায়নের চাবি।”

আমরা যখন রান্নাকে দেখি শুধু কাজ হিসেবে, তখন তামান্নাদের চিনতে পারি না। কিন্তু প্রকৃতি থেকে শেখা এই অনন্য প্রতিভা স্বাদ, গন্ধ, সময় আর অনুভবের সূক্ষ্মতা, সে শুধু খুন্তি নয়, ধরে আছে বৈজ্ঞানিক অনুভব। প্রতিটি শিশুর মধ্যে হয়তো এমনই এক লুকানো চাবি থাকে, দরকার শুধু একজন ইশরাত ম্যাডামের মতো চোখ, তা খুঁজে পাওয়ার জন্য।

যখন কোনো ছাত্র তার স্বভাবগত প্রতিভা ও অন্তরের টানকে একসাথে খুঁজে পায়, তখনই সে জীবনে সত্যিকারের সার্থকতা খুঁজে পায়।

ইশরাত ম্যাডাম একটি আশার আলো, যিনি শিক্ষার সীমানা প্রসারিত করতে চান, এবং রান্নার মতো “ঘরোয়া” কাজকেও বিজ্ঞান শিক্ষার অংশ করে তোলেন। একে “curriculum democratization” বলা যায়।

“সব শিশু এক রকম নয়”

নেত্রকোনার এক প্রান্তিক গ্রামে, যেখানে বন্যা আসলে শিশুদের খেলার মাঠ জলমগ্ন হয়ে যায়, আর রোদ এলে সেই মাঠের ধুলা উড়ে গিয়ে স্কুলের বেঞ্চে জমা হয়, সেই স্কুলেই পড়ে এক চুপচাপ ছেলেটি, নাম আজহার।

তার চোখে যেন অন্য এক জগৎ। শিক্ষক পড়ান, বর্ণমালা, সংখ্যা, অনুচ্ছেদ - কিন্তু আজহারের মন অন্যখানে। বইয়ের পাতায় না, তার কল্পনায়, আর হাতের কাঠের টুকরোয়। কখনো স্কুলের ভাঙা বেঞ্চ থেকে কাঠ খুঁটে বানিয়ে ফেলে কলমদানি, কখনো পেন্সিল রাখার খোপ, আবার কখনো বাঁশির মতো কিছু। ঠুকঠাক শব্দে তার সৃষ্টি জন্ম নেয়। স্কুল ব্যাগ এ থাকে ছেনি, হাতুড়ি আর শিরিষ কাগজ, ছোট ছোট পেরেক আর চাকু। শিমুল গাছের কান্ডতে যে কাঁটা থাকে, ওটা আজহারের খুব পছন্দ, কাঁটাগুলো সহজেই গাছ থেকে উঠানো যায়, কাঁটাগুলো ছোট এবং কাঠ বেশ নরম যাতে বিভিন্ন আকার দেওয়া যায়।

শিক্ষকেরা বলেন, “আজহার তো ক্লাসে থেকেও নেই! ওর মন সবসময় কোথায় যেন উড়ে বেড়ায়।”

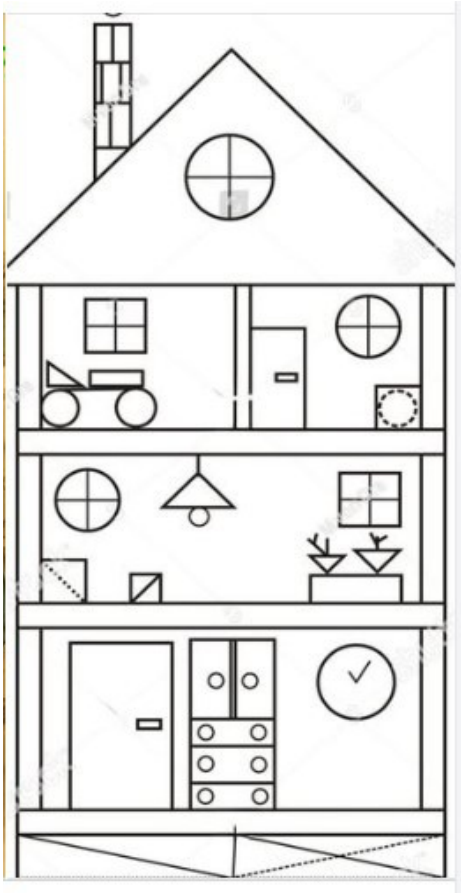

মুখ তুলে বলল,

- “স্যার, ভাঙা বেঞ্চের কাঠ দিয়ে কলম রাখার একটা জিনিস বানাচ্ছিলাম।”
- “কেন?”
- “স্যার, আপনাকে প্রায়ই দেখি টেবিলে কলম খুঁজে বেড়াতে...”

কিন্তু একদিন ক্লাসে নতুন শিক্ষক এলেন - রাফি স্যার। তাঁর চোখে ছিল সজাগ দৃষ্টিতে আর মনে ছিল উপলব্ধির গভীরতায়। তিনি খেয়াল করলেন, ক্লাসের এক কোণায় বসে আজহার ঠুকঠুক করে কিছু তৈরি করছে।

“তুমি কী করছো এখানে?” - মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। আজহারসেই মুহূর্তে রাফি স্যারের চোখে যেন এক শিশুর নিঃশব্দ প্রতিভা কথা বলল। তিনি অনুভব করলেন, এই ছেলেটি হয়তো পাঠ্যবইয়ের ভাষায় দুর্বল, কিন্তু জিনিসের ভাষায় সে স্বতঃস্ফূর্ত। কাঠ, ছুরি আর কল্পনায় সে এক শিল্পী, এক নির্মাতা। স্যার আজহার কি কি বানিয়েছে সব দেখতে চাইলেন, আগামীকাল এনে দেখালো স্যারকে।

রাফি স্যার সেই দিন থেকেই শুরু করলেন এক অভিনব উদ্যোগ - “ঘরের জ্যামিতি” নামের এক প্রজেক্ট সপ্তাহ। স্যার তাঁর আগের স্কুলে “প্রতিদিনের রসায়ন” বা “Everyday Chemistry” বলে প্রজেক্ট ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। সেখানে, সাবান কেন আমাদের পরিষ্কার করে, তেল কেন রান্নায় ব্যবহার করা হয় আরও অনেক কিছুই অনুশীলনে ছিলো। এবার, “ঘরের জ্যামিতি” প্রশিক্ষণে, বিভিন্ন জ্যামিতি আকারের ব্যবহার ও সেখান থেকে প্রতিদিনের আসবাবপত্র ও ঘরের পরিকল্পনা। বলা হলো, শুধু লেখাপড়া নয়, যে যেটা পারো, বানিয়ে আনো। কেউ গাছের ডাল দিয়ে বাঁশি বানালো, কেউ মাটির পাত্র গড়ল।

আর আজহার? সে বানিয়ে আনলো পুরো স্কুলের কাঠের মডেল। টিনের চাল, ক্লাসরুম, উঠোন, পুকুর, খেলার মাঠ, সব কিছু ছোট্ট কাঠের খুঁটিনাটিতে ফুটে উঠেছে তার হাতে। মডেলটি জেলা পর্যায়ে পাঠানো হলো। প্রশংসার ঝড় উঠল।

একজন প্রকৌশলী অফিসার বললেন, “এই ছেলের চোখে ভবিষ্যতের ডিজাইনার লুকিয়ে আছে।”

স্কুল তাকে সম্মান দিল, ‘স্কুল কারিগরি ক্লাবের সহ-পরিচালক’ পদে।

আর রাফি স্যার? তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবলেন, “আজহার জানতো না তার কাঠের কাজ একদিন ভাষা হয়ে উঠবে।কিন্তু আমি জানতাম। কারণ, যখন কাউকে তার প্রকৃত শক্তির জায়গায় দাঁড়াতে দেওয়া হয়, তখন সে শুধু সফল হয় না - সে নিজেকে খুঁজে পায়।”

শুধু বইয়ের পাতায় নয়, মন বোঝার, হাত ধরা, সম্ভাবনায় আলো ফেলার শিক্ষা। একজন শিক্ষক জানেন - সব শিশু এক রকম নয়। আর আজহার, সে প্রমাণ করে দিল - ভাঙা বেঞ্চ থেকেও গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের দৃশ্যপট।

জ্যামিতি হল পৃথিবীর সৌন্দর্যের আদর্শ - জোহানেস কেপলার

“ব্যক্তিগতকৃত কার্টুন বই”

সোনাতলার ছোট্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, রঞ্জিত ব্যানার্জী। তাঁর বিশ্বাস, শিশুর মন পানির মতো - যে পাত্রে রাখবেন, সেই আকার নেবে। আর তাই জীবনের শুরুতেই, ঠিক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতেই, শিশুর কৌতূহল, প্রশ্ন করার সাহস, আত্মবিশ্বাস, ও নিজস্ব চিন্তার বীজ বুনে দেওয়া দরকার। রঞ্জিত স্যার বলেন, “প্রাথমিক শিক্ষা শুধু অক্ষর শেখানো নয়, বরং শেখার আনন্দ জাগানো।”

তাঁর শিক্ষাদর্শন আধুনিক প্রযুক্তি এবং মানবিক বোধের অনন্য সমন্বয়। তিনি জানেন, আজকের শিশু জন্ম নিচ্ছে এক ‘ইন্টারনেট জেনারেশনে’, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আমাদের ভাবনার জগতে নতুন দরজা খুলে দিচ্ছে। আর তাই তিনি এক অভিনব ভাবনা নিয়ে সামনে এলেন, “ব্যক্তিগতকৃত কার্টুন বই”- এমন বই, যেখানে শিশুটিই হবে গল্পের নায়ক/নায়িকা, তার নাম, আগ্রহ, এমনকি ছবিও থাকবে বইয়ে!

এই ভাবনা শুনতে নতুন হলেও, রঞ্জিত স্যারের মতে এটি শিশুশিক্ষায় এক বিপ্লব আনতে পারে। তাঁর যুক্তিগুলো স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ,

১. শেখাকে আনন্দময় করে তোলে: যখন একটি শিশুর নাম, ছবি এবং প্রিয় বিষয় নিয়ে গল্প তৈরি হয়, তখন সেই বই তার কাছে শুধুই পাঠ্যবই থাকে না, তাঁর নিজের জগৎ হয়ে ওঠে। শিশুরা যখন নিজেকে গল্পের মাঝে দেখতে পায়, তখন বইয়ের প্রতি তাদের মালিকানা, ভালোবাসা এবং অংশগ্রহণ বহুগুণ বেড়ে যায়। এটি শেখার প্রতি প্রকৃত আগ্রহ গড়ে তোলে।

২. ভাষা ও শব্দভাণ্ডার বিকশিত করে: ব্যক্তিগত প্রেক্ষাপটে নতুন শব্দ ও ধারণা শেখা সহজ হয়। গল্পের পরিপ্রেক্ষিত যখন শিশুর পরিচিত জগৎকে ছুঁয়ে যায়, তখন শেখা হয় গভীর, স্মরণীয় ও আনন্দময়। এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের পাঠ্যজীবনের ভিত মজবুত করে।

৩. আত্মবিশ্বাস ও আবেগগত বিকাশে সহায়ক: একটি শিশুর নিজের নাম ও ছবি যখন ছাপা বইয়ে থাকে, তখন সে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এই ছোট্ট আত্ম-প্রকাশ তার আত্মসম্মান বাড়ায়, তাকে সাহসী করে তোলে, এবং অন্যদের আবেগ বুঝতে শেখায়। গল্পের মধ্য দিয়ে শিশু শেখে, সে কেবল পাঠক নয়, সে নিজেই এক গল্প।

৪. আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ: রঙিন কার্টুন চিত্র, চেনা নাম ও প্রেক্ষাপট শিশুদের দৃষ্টিনন্দন শেখার পরিবেশ দেয়। এ ধরনের উপস্থাপনা তথ্য ধরে রাখতে ও বুঝতে সাহায্য করে। পাশাপাশি, এটি শিশুদের নিজস্ব গতিতে শেখার সুযোগ দেয়।

রঞ্জিত স্যারের মতো শিক্ষকরা মনে করেন, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার রূপ বদলানো দরকার। আর এই পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে ব্যক্তিগতকৃত কার্টুন বই। এটি কেবল বই নয়, একটি আত্ম-আবিষ্কারের আয়না, কল্পনার রঙিন খাতা, এবং শিশুর হৃদয়ে জাগানো শেখার গান। এই বই হতে পারে প্রজন্মের জন্য একটি যুগান্তকারী উপহার - যেখানে প্রযুক্তি, কল্পনা ও মানবিকতা হাত ধরাধরি করে।

“প্রথম শ্রেণির শিশুর হাতে যদি তার নিজের জীবনের গল্প থাকে, তবে সে কেবল পড়বে না - সে ভাববে, অনুভব করবে, এবং একদিন লিখবে নতুন পৃথিবীর গল্প।”

বই এর পর্যালোচনা:-

“The Element: How Finding Your Passion Changes Everything”,

লেখক: Sir Ken Robinson

এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য শুধু Sir Ken Robinson-এর “The Element” বইটিকে বিশ্লেষণ করা নয়, বরং “ধনুক ভাঙা পণ” সিরিজের মূল দর্শনের সঙ্গে এর সংযুক্তি তুলে ধরা— যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর আলাদা শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যকে শিক্ষার কেন্দ্রে আনা হয়।

লেখক Sir Ken Robinson (৪ মার্চ ১৯৫০ – ২১ অগাস্ট ২০২০), শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি ২০০৩ সালে ‘Sir’ উপাধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ, লেখক ও বক্তা, যিনি সৃজনশীলতা এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় তার বিপ্লবী ভাবনার জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রতিটি শিশুর মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রতিভা আছে, এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেই প্রতিভাকে খুঁজে বের করা ও বিকাশে সহায়তা করা।

এর বইটির মূল বিষয়বস্তু হলো, মানুষের স্বাভাবিক প্রতিভা, নিজস্বতা, এবং জীবনের অর্থপূর্ণতা খোঁজার জন্য একটি দর্শনকে খোঁজা।

১. “Element” বা “মৌলিকতা” হলো সেই জায়গা— যেখানে ছাত্রের স্বাভাবিক প্রতিভা (natural talent) এবং গভীর ভালোবাসা (personal passion) এক হয়ে যায়।

যখন যে কোন ছাত্র এমন কিছু করেন যা সে করতে ভালোবাসে এবং তাতে সে ভালোও, তখনই সে তাঁর নিজস্ব “মৌলিকতা” খুঁজে পায়।

২. প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতি, স্কুলের পদ্ধতিগত কাঠামো এবং পরীক্ষাভিত্তিক মানদণ্ড অনেক সময় শিশুর আসল প্রতিভা চিনতে ব্যর্থ হয়।

Robinson বলেন, অনেক শিশুকে ভুল ভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

যেমন: একজন গায়ক শিশুকে যদি সারা দিন চেয়ারে বসিয়ে গণিত শেখানোর চেষ্টা করা হয় - তাহলে সে হয়তো মনে করবে সে নির্বোধ।

৩. একজন ভালো বক্তা, একজন ডাক্তার, একজন কারিগর, একজন সুরকার, একজন খেলোয়াড়, এদের বুদ্ধিমত্তা সমান গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রতিভা বহুরূপী।

হাওয়ার্ড গার্ডনারের বহুবিধ বুদ্ধিমত্তা তত্ত্ব (Theory of Multiple Intelligences) বলে যে মানুষের বুদ্ধি কেবল একটি একক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি বিভিন্ন ধরনের স্বাধীন বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ে গঠিত। প্রাথমিকভাবে আটটি মূল বুদ্ধিমত্তা:

১. ভাষাগত-মৌখিক বুদ্ধিমত্তা (Linguistic-verbal intelligence): শব্দের ব্যবহার, ভাষা বোঝা এবং প্রকাশ করার ক্ষমতা।

২. যৌক্তিক-গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা (Logical-mathematical intelligence): ধারণা এবং অমূর্তভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা, গাণিতিক এবং লজিক্যাল প্যাটার্ন বোঝা।

৩. স্থানিক-দৃশ্যমান বুদ্ধিমত্তা (Visual-spatial intelligence): চিত্র এবং ছবি দিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা, দৃশ্যমান তথ্য সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা।

৪. শারীরিক-সঞ্চালনমূলক বুদ্ধিমত্তা (Bodily-kinesthetic intelligence): শরীরের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ এবং বস্তু দক্ষতার সাথে ব্যবহার করার ক্ষমতা।

৫. সাংগিতিক বুদ্ধিমত্তা (Musical intelligence): সঙ্গীতের তাল, সুর এবং স্বরলিপি বোঝা এবং তৈরি করার ক্ষমতা।

৬. আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা (Interpersonal intelligence): অন্যদের মেজাজ, উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষা বোঝা এবং যথাযথ প্রতিক্রিয়া দেখানোর ক্ষমতা।

৭. অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা (Intrapersonal intelligence): আত্ম-সচেতনতা, নিজের অনুভূতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং চিন্তা প্রক্রিয়া বোঝা।

৮. প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা (Naturalist intelligence): প্রকৃতির বস্তু, যেমন উদ্ভিদ এবং প্রাণী চিনতে এবং শ্রেণীবদ্ধ করার ক্ষমতা।

৪. আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতা বিকাশে সাহস দরকার। ভয়, ব্যর্থতার ভীতি, এবং সামাজিক চাপ - এই তিনটি শিশুদের নিজস্ব পথে চলা থেকে আটকে রাখে। Robinson বলেন: “শিশুরা জন্মগতভাবে সৃজনশীল। আমরা বড় হয়ে উঠতে উঠতে সেটা ভুলে যাই।”

৫. প্রতিটি মানুষের জন্য পথ ভিন্ন,

- শিক্ষা হতে হবে বিকেন্দ্রীভূত,
- এবং শিক্ষককে হতে হবে গাইড, কোচ, আবিষ্কারক।

৬. ছাত্রের “মৌলিকতা” আবিষ্কারে সহায়ক পরিবেশ প্রয়জোন - যেখানে শিশু ভয় না পেয়ে শিখতে পারে, উৎসাহ পায়, আর নতুন কিছু খুঁজে দেখতে পারে।

এখানে পরিবার, শিক্ষক ও সমাজ—সবাই ভূমিকা রাখে। তিনি মনে করেন, অনেকে সারা জীবন নিজের “মৌলিকতা” খুঁজে পান না, কারণ কেউ তাকে বোঝে না, সুযোগ দেয় না।

৭. সফলতা মানেই সুখ নয়। কেউ বড় চাকরি বা ডিগ্রি পেয়ে সফল হলেও, জীবনের অর্থ খুঁজে পায় না।

বরং, নিজের স্বাভাবিক প্রতিভা ও গভীর ভালোবাসায় নিজেকে সম্পৃক্ত করা মানেই পরিপূর্ণতা।

মূল বার্তা:-

“মৌলিকতা” হলো, “প্রতিভা” + “ভালোবাসা” = “প্রকৃত শক্তি”

শিক্ষার প্রথাগত কাঠামো অনেক সময় সৃজনশীলতা দমন করে, ভুল করতে ভয় না পেলে শেখা সহজ হয়, মানুষের বেড়ে ওঠার জন্য বোঝাপড়ার জায়গা দরকার, সহায়ক পরিবেশ দরকার, সবাই একভাবে শেখে না, তাদের পথও ভিন্ন ও পরিপূর্ণতা বা প্রকৃত সার্থকতা আসে “নিজের জায়গা” খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে।

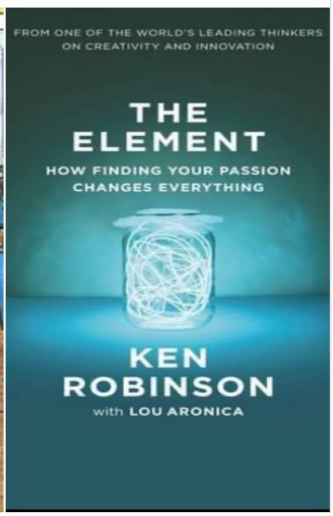

লেখক মনে করেন, বর্তমানে শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজন নেই - এটিকে “রূপান্তরিত করা দরকার”। এই রূপান্তরের মূল চাবিকাঠি শিক্ষাকে মানসম্মত করা নয় বরং এটিকে “ব্যক্তিগতকৃত করা”, প্রতিটি শিশুর স্বতন্ত্র প্রতিভা আবিষ্কার করে কৃতিত্ব গড়ে তোলা, শিক্ষার্থীদের এমন একটি পরিবেশে স্থাপন করা যেখানে তারা শিখতে চায় এবং যেখানে তারা স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রকৃত আবেগ “মৌলিকতা” আবিষ্কার করতে পারে।

“ধনুক ভাঙা পণ” সিরিজটি সেই সব শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের গল্প যাঁরা প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে প্রতিভার খোঁজ করেন। Sir Ken Robinson-এর “The Element” বইটি এই সিরিজের ভাবনার ভিত্তি– যেখানে শেখার পদ্ধতি নয়, শেখা কিভাবে জীবন হয়ে উঠতে পারে, সেই রূপান্তরের কথাই বলা হয়। প্রতিটি গল্পই যেন “মৌলিকতা” খোঁজার এক অনুসন্ধান।

সারাংশ ও আহ্বান:-

- প্রতিটি শিশু জন্মায় এক অনন্য প্রতিভা ও সম্ভাবনা নিয়ে।
- শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব, সেই সম্ভাবনা খুঁজে বের করে তাকে বিকশিত করতে সহায়তা করা।
- “মৌলিকতা” মানে সেই জায়গা, যেখানে ছাত্রের স্বাভাবিক প্রতিভা ও ভালোবাসা মিলিত হয়।
- এই বই শুধু একটা দর্শন নয়, বরং “ধনুক ভাঙা পণ” এর মতো প্রতিটি শিশুর পক্ষে দাঁড়ানোর আন্দোলনের উৎসাহদাতা।

“কৌতূহলই বিজ্ঞানের প্রথম আলো”

সাতক্ষীরার একটি গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অয়ন, তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র।

সেদিন সন্ধ্যায় অয়ন স্কুলে এলো, কিন্তু আজ তার ব্যাগে বই-খাতা নেই, আছে শুধু একটা ছোট টর্চলাইট, তার রাতের জন্য মোটা কাপড়, আর চোখে অদ্ভুত এক কৌতূহল।

আজ স্কুলে হচ্ছে “রাতের স্কুল”!

চারপাশে রাত নেমেছে, গাঢ় অন্ধকার। কিন্তু স্কুলের মাঠে টিমটিমে আলো জ্বলছে, আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক টেলিস্কোপ - যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা এক জাদুকর।

তাহমিনা ম্যাডাম বললেন, “আজ আমরা আকাশ দেখব। আকাশ শুধু নীল নয়, সেখানে আছে লক্ষ লক্ষ তারা, গ্রহ, আর অনন্ত ছায়াপথ।”

অয়ন উৎসাহ নিয়ে টেলিস্কোপে চোখ রাখল। হঠাৎ চমকে উঠল,

- “চাঁদের গায়ে গর্ত?”

- “হ্যাঁ,” ম্যাডাম বললেন, “ওগুলোকে বলে ক্র্যাটার (craters)। চাঁদের গায়ে হাজার হাজার বছর ধরে উল্কাপিণ্ড আঘাত করেছে, সেই দাগগুলোই এসব গর্ত।”

তারপর ম্যাডাম আঙুল তুলে বললেন,

- “ওই যে দূরে একটা ছোট নীল বিন্দু দেখছো? ওটা নেপচুন, আমাদের সৌরজগতের একেবারে শেষ দিকের গ্রহ।”

সবার চোখ বড় বড়।

তাহমিনা ম্যাডাম তখন ছোট প্রজেক্টরে এক ছবি দেখালেন, সোনালি আয়নার মতো দেখতে একটা বিশাল জিনিস।

- “এটাই হলো James Webb Space Telescope। মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ায়, আর আমাদের পৃথিবীর বাইরে কি আছে তা দেখে। এটি পৃথিবী থেকে বহু বহু দূরে আছে।”

অয়ন জিজ্ঞেস করল,

- “ওটা কি আমাদের মতো করে তারা দেখে?”

- “তা নয়,” ম্যাডাম বললেন, “ওটা দেখতে পায় বহু দূরের তারা কখন জন্মায়, কোন গ্যালাক্সি কেমন দেখতে, এমনকি আমাদের মহাবিশ্ব কীভাবে শুরু হয়েছিল, সেই রহস্যও।”

অয়ন ভাবল, এ যে এক মহাজাদু যন্ত্র!

রাত ঘনিয়ে এলো। তারা আরো জ্বলজ্বল করতে লাগল। ছাত্ররা চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে, যেন তারা নতুন কোনো ভাষায় মহাবিশ্বের গল্প শুনছে।

তাহমিনা ম্যাডাম ধীরে ধীরে বললেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বড় হয়ে মহাকাশ বিজ্ঞানী হতে চাও, তবে মনে রেখো, তোমার চোখ সবসময় থাকুক আকাশের দিকে।”

অয়ন চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। মনে হলো, এই বিশাল মহাবিশ্ব তার কাছে হাত বাড়িয়ে বলছে, “এসো, আমায় জানো।”

শিশুদের মধ্যে আগ্রহ ও কল্পনা জাগিয়ে তোলাই হলো একজন শিক্ষকের দায়িত্ব, ভবিষ্যতে শিশুরা যেন বিজ্ঞানী, গবেষক, আবিষ্কারক হতে পারে।

“যারা খুঁজতে শেখে, তারাই আবিষ্কার করে।”

গাইবান্ধার ফুলছড়ির একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। লিমন – ৩য় শ্রেণির এক কৌতূহলী ছাত্র। মাসুদ স্যার – বিজ্ঞানমনস্ক এক তরুণ শিক্ষক।

লিমন খুব সাধারণ ছাত্র। পড়ালেখায় কখনো সেরা নয়, তবে চোখ দুটো তার সবসময় খুঁজে ফেরে অদ্ভুত কিছু। স্কুলের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট খালটার ধারেই ওর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা - কচুরিপানার মধ্যে পানি টলটল করে, পোকামাকড় চলে, আর লিমনের মন দৌড়ায়।

একদিন মাসুদ স্যার ক্লাসে এসে বললেন, “আজ আমরা একটা ক্ষুদ্র জগত ঘুরে দেখবো, যা খালি চোখে দেখা যায় না!”

সবাই অবাক, ক্ষুদ্র জগত? আবার ঘোরা?

স্যার বোর্ডে লিখলেন: অণুবীক্ষণিক জগৎ -

“Microscopic World” - ক্ষুদ্র কিন্তু বিস্ময়কর!

তারপর তিনি বের করলেন মোবাইল আর একটা ছোট্ট সস্তা মাইক্রোস্কোপ লেন্স— যেটা মোবাইলের ক্যামেরায় লাগানো যায়।

তিনি বললেন,

- “এইটা দিয়ে আমরা পানির একটা ফোঁটা অনেক বড় করে দেখতে পারবো।”

তারপর তিনি লিমনকে ডেকে বললেন,

- “চলো লিমন, খাল থেকে একটু পানি আনো।”

লিমন খুশি হয়ে একটা কাচের স্লাইডে নিয়ে এল একফোঁটা পানি।

স্যার মোবাইলের সঙ্গে লেন্স লাগিয়ে, সবাইকে দেখালেন,

ওমা! সেই একফোঁটা পানি ছোট ছোট কি যেন নড়াচড়া করছে!

কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে, কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ সাঁতার কাটছে!

রুমি বললো,

- “স্যার, ওগুলো কী? মাছ?”

মাসুদ স্যার হেসে বললেন,

- “না, ওরা মাইক্রোস্কোপিক জীব। প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া, আমরা যাদের দেখি না, অথচ ওরাও আমাদের মতো এই পৃথিবীর বাসিন্দা।”

রুমান বললো, “আমরা কি এদের ছবি আঁকতে পারি?”

স্যার বললেন, “অবশ্যই। তোমাদের প্রত্যেককে আজ একটা কাজ, নিজেরা কোনো একটা জায়গা থেকে পানি বা মাটি এনে এইভাবে দেখবে, আর আঁকবে কেমন জিনিস দেখলে!”

লিমন খুশি হয়ে বলল, “স্যার, আমি খাল ছাড়াও স্কুলের গাছের পাতার পানিও আনবো!”

পরের কয়েকদিন স্কুলের একপাশে তৈরি হলো “ক্ষুদ্র জগত কর্নার”, সেখানে সবাই ছবি ঝুলিয়ে রাখে। কেউ পোকামাকড়ের পা এঁকেছে, কেউ পাতার নিচের নকশা, কেউ পানিতে ভেসে থাকা অদৃশ্য জীবদের!

স্কুলে একদিন এক অতিথি এলেন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। তিনি ক্ষুদ্র জগত কর্নার দেখে বললেন, “এই ক্লাস তো গবেষণাগার হয়ে গেছে! এই বয়সেই এরা বিজ্ঞানী হয়ে উঠছে!”

একদিন মাসুদ স্যার ক্লাসে বললেন, “আমাদের চারপাশে অনেক কিছু আছে যা আমরা দেখি না, ভাবিও না। কিন্তু যারা দেখে, খুঁজে, বোঝে— তারাই একদিন বিজ্ঞানী হয়। কে জানে, লিমন হয়তো একদিন এক নতুন জীব আবিষ্কার করবে!”

সবাই একসাথে হাততালি দেয়।

লিমনের মুখে সেইদিন ছিল এক বিশাল হাসি, পানির ফোটার মধ্যে সে আবিষ্কার করেছিল তার প্রথম ‘জগৎ’। ছোট কিছু দিয়েও বড় বিস্ময় খুঁজে পাওয়া যায়। দেখার চোখ, প্রশ্ন করার মন, আর জানার ইচ্ছে, এই তিনটাই বিজ্ঞান শেখার প্রথম ধাপ।

“তুমি যা ভালোবাসো, সেটাই করো।”

স্দিনাজপুর জেলার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়। আকাশ, তৃতীয় শ্রেণির এক অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু।

শিক্ষক: শাওন স্যার। স্কুলটি বড় রাস্তা থেকে অনেক ভেতরে। পুকুরপাড় ঘেঁষে ছোট একটি খোলা মাঠ, পাশেই আধাপাকা ও টিনের ছাউনি দেওয়া ক্লাসরুম। এই স্কুলেই পড়ে তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্র আকাশ। আকাশ কখনো কারও চোখের দিকে তাকায় না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না। খেলার সময় সবার থেকে দূরে দাঁড়িয়ে গাছের পাতার দিকে চেয়ে থাকে, যেন বাতাসের সুর শুনছে।

ক্লাসে কেউ ফিসফিস করে বলে, “ও অটিস্টিক না পাগল?” শিক্ষকরাও বিভ্রান্ত। অনেকে বলেন, “এই ছেলেটার জায়গা আলাদা স্কুলে। ও তো ক্লাসে কিছুই করে না।” তবে এই বছর নতুন একজন শিক্ষক বদলি হয়ে আসেন - শাওন স্যার। তিনি মনোবিদ নন, বিশেষজ্ঞ নন, তিনি শুধু একজন শিক্ষক যিনি মনে করেন, “সবার আগে জানতে হয়, একজন মানুষ কী চায়, তারপর তাকে শেখাতে হয়।”

শাওন স্যার আকাশকে ডেকে বলেন না, “তুমি উত্তর দাও।” বরং বলেন, “তুমি যা ভালোবাসো, সেটাই করো।” স্যার জানেন, অটিজমে থাকা শিশুরা সাধারণত আচরণ ও যোগাযোগে ভিন্নতা প্রকাশ করে। তাই তিনি চেষ্টা করেন এমন শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করতে, যা তাদের সংবেদনশীলতা ও বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে খাপ খায়। যেহেতু তারা খুব বেশি সংবেদনশীল হয় তাই তাদের ক্লাস ঘর এর বিশেষ নকশা দরকার। ওদের নতুন কিছু শিক্ষা দেওয়া সমস্যা, তাই যার যেখানে দক্ষতা রয়েছে, প্রতিভা রয়েছে, সেটাকে সুন্দর করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করতে হবে। তাদের বিহেভিয়ার মোডিফিকেশন থেরাপির কথা ভেবে তিনি তাদের আচরণগত বিকাশে সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্ব দেন, যা ‘আচরণ উন্নয়নমূলক কৌশল’ হিসেবে পরিচিত।

চালু করেন “সহানুভূতিশীল শ্রেণিকক্ষ”। দেয়ালে ঝুলে থাকে একটি বাক্য: “তুমি যদি আলাদা হও, তবু তুমি ঠিক আছো।”

ক্লাসের এক কোণায় তৈরি হয় এক শান্তির জায়গা - নরম আলো, কিছু রঙতুলির কৌটা, কাগজ, আর একদলা কাদামাটি। কেউ যদি শব্দ এড়াতে চায়, একা থাকতে চায়, সেখানে বসে থাকতে পারে।

একদিন বিকেলে মাঠে...শাওন স্যার দেখেন, আকাশ মাঠের এক কোনে বসে এক ভাঙা বাঁশির টুকরো ঠোঁটে নিচ্ছে। সে কিছু একটা বাজানোর চেষ্টা করছে, পাখির ডাকার মতো এক অস্পষ্ট সুর। স্যার আকাশকে নিয়ে ভাবেন, ওর পরিবারের সঙ্গে কথা বললেন, যে নিউরোলজির ডাক্তার ওকে দেখেন তাঁর সঙ্গেও কথা বললেন। সবার কাছথেকে পরামর্শ নিয়ে স্যার পরের সপ্তাহে চালু করেন এক অভিনব ক্লাস: “শব্দ ও নীরবতার ক্লাস” - যেখানে প্রশ্নের উত্তর আসে ছন্দে, গল্প হয় বিভিন্ন আওয়াজে, কেউ কেউ রাবার দিয়ে শব্দ তোলে, কেউ দড়ির ঘষা দিয়ে ঝিঁঝিঁর সুর। শ্রেণিকক্ষে আবেগগত নিরাপত্তা, আত্মমর্যাদা ও শৈল্পিক বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়।

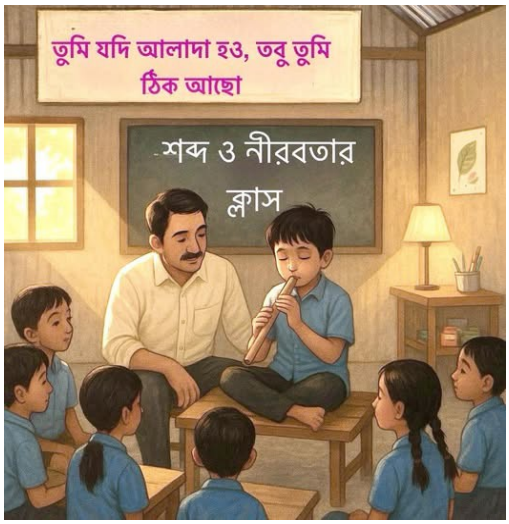

আকাশ সেখানে বাঁশি বাজায়। সে শব্দ করে না, কিন্তু তার বাঁশির সুর বলে দেয়—

- পাতার দোলা,
- বৃষ্টির ফোঁটার গান,
- আর এক জগৎ, যেখানে শব্দ নেই, তবু মন কথা বলে।

সহপাঠীরা তখন চুপচাপ শোনে। কেউ আর বলে না, “ও পাগল”। বরং বলে, “ওর বাঁশিটা মেঘের মতো বাজে।” শাওন স্যার একদিন জেলা অফিস থেকে ছোট একটা অনুদান এনে শুরু করেন: “সৃজনশীল বিকাশ কর্মশালা” শুধু আকাশ নয়, আরও দুই জন শিশু, যাদের কেউ স্বাভাবিক গতিতে শেখে না, এক জন শব্দে অতিসংবেদনশীল, তারাও অংশ নেয়। এই কর্মশালায় নিয়ম নেই, চাপ নেই, বরং আছে প্রতিক্রিয়া, অনুভব, আর ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা। আকাশ সেখানে প্রথমবার নিজের হাতে একটি সুর আঁকে, বাঁশির মাথায় রং করে রাখে সাতটি বিন্দু।

একদিন এক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পরিদর্শনে এসে বলেন, “এই স্কুল আমাদের শিখিয়ে দিল - সহযোগিতা মানে শুধু সুযোগ দেওয়া নয়, বরং বোঝার চেষ্টা করা।” তিনি আরও বলেন, “সব শিশু একভাবে শেখে না, সব শিশু একভাবে কথা বলে না। কিন্তু সবাই শেখে, সবাই বলে - শুধু আমাদের দেখতে জানতে হবে।” শাওন স্যার তখন আকাশের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, “আমার শেখানো ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে গভীর কথা যে বলেছে, সে কোনোদিন মুখে শব্দ করেনি। কারণ, সুর এমন কিছু প্রকাশ করে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এবং যা নীরব থাকতে পারে না।”

তার সহপাঠীরা এখন জানে - কেউ কথা না বললেও সে কিছু বলছে। শুধু শুনতে জানতে হয়। “যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যা বলা হয় না, তা শোনা।” - পিটার ড্রাকার

শিক্ষকের কাজ হলো, তাদের ভাষা, ছন্দ ও সংবেদনশীলতা অনুযায়ী শেখার সুযোগ ও সৃজনশীল প্রকাশের মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া।

আকাশ আর নীরব নয়। তার বাঁশির সুরে কথা বলে মেঘ, কথা বলে গাছের পাতা, আর আমাদের হৃদয়ের গোপন অনুভূতি। হয়তো একদিন সে এমন এক সুর রচনা করবে, যা আমরা আগে কখনো শুনিনি, কিন্তু শুনলে, সেই সুর আমাদের ভেতরটাকে অন্য এক মাত্রায় নিয়ে যাবে। কারণ, “অটিজম কোনো অক্ষমতা নয়, এটা এক অনন্য ক্ষমতা।” - স্টুয়ার্ট ডানকান

“রঙের রাজ্য”

স্কুষ্টিয়ার এক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সায়রা, ক্লাস ফাইভ। শিক্ষক, মঈন স্যার।

সায়রার স্কুলে একদিন মঈন স্যার ক্লাসে এসে বললেন, “আজ আমরা আলো আর রঙ নিয়ে গল্প করব। না, এটা শুধু বিজ্ঞান না, এটা রঙের রাজ্যের জাদু!”

স্যার আনলেন একটা কাঁচের ত্রিভুজ, “এটাকে বলে প্রিজম। এখন দেখো, সূর্যের আলো এতে পড়লে কী হয়।” সূর্যের আলো জানালা দিয়ে ঢুকে প্রিজমে পড়ল। হঠাৎ করে সবার চোখ বড় হয়ে গেল - মেঝেতে রঙধনুর মতো সাতটা আলোর রেখা!

লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, আকাশি, নীল আর বেগুনি (বে-নী-আ-স-হ-ক-লা)।

সায়রা বলল, “স্যার! সূর্যের আলো তো সাদা, তাহলে রঙ এলো কোথা থেকে?”

মঈন স্যার হেসে বললেন, “সূর্যের আলো আসলে সাদা না, সেটা সাতটা আলোর মিশ্রণ। আমরা একসাথে দেখি বলে মনে হয় সাদা। প্রিজম সেই রঙগুলো আলাদা করে দেয়।”

স্যার নিউটনের রঙচক্র (Newton‘s Colour Disc) দিয়ে দেখালেন, যখন সূর্যের ৭ রঙ কে দ্রুত ঘুরালো হয় তখন রঙগুলো সব মিশে সাদা রঙ দেখা যায় আমাদের চোখে।

তারপর স্যার বোর্ডে একটা চিত্র আঁকলেন—চোখ, আলো, আর মস্তিষ্ক। “আমরা যে জিনিসকে লাল দেখি, সেটা আসলে ওই বস্তু লাল রঙের আলো প্রতিফলিত করে, আর বাকিগুলো শোষণ করে ফেলে। আমাদের চোখে সেই প্রতিফলিত লাল আলো এসে লাগে।”

মজার না, স্যার বললেন, “তা হলে কালো কি রঙ? না, কালো আসলে কোন রঙ নয়। যখন কোন বস্তু আলোর সব রং শোষণ করে নেয় এবং কোন রং প্রতিফলিত করে না, তখন আমরা সেই বস্তুকে কালো দেখি। কালো হলো রঙের অনুপস্থিতি। মজার তাই না। আর তাই তো রাতের অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।“

সায়রা জিজ্ঞেস করলো, “স্যার, আমরা কেন বৃষ্টির পর রঙধনু দেখি?”

মঈন স্যার ব্যাখ্যা দিলেন “বৃষ্টির ছোট ছোট ফোঁটা হচ্ছে ছোট প্রিজমের মতো, সূর্যের আলো ভেঙে ফেলে রঙধনু করে।”

সবাই তখন জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, সূর্য যেন আকাশে বসে হাসছে, যেন বলছে -

“তোমাদের রঙ আমি এনে দিই!”

শেষে মঈন স্যার বললেন,

- “এই রঙের রাজ্যে সূর্য হলো রাজার মতো। সে আলো দেয়, আর তার আলো ভেঙেই তৈরি হয় আমাদের চারপাশের সব রঙ। আর আমাদের চোখ, সে তো একজন দারুণ শিল্পী, যে এই রঙগুলো মিলিয়ে বানিয়ে ফেলে এক বিশাল রঙিন দুনিয়া।”

সায়রা নিজের খাতায় লিখল,

“সূর্য সব রঙের রাজা— আমরা তার আলোতেই দেখি পৃথিবীর সব রঙ। আর রঙ হলো প্রকৃতির হাসি।”

“প্রতিভা + ভালোবাসা”

চাঁদপুরের কড়ইতলা গ্রামের স্কুল। এই স্কুলেই পড়ে এক কিশোরী— নাম সাহানা।

বাবা একজন দরজি। ছোট্ট দর্জিখানায় বসে বসে কাপড় কেটে সেলাই করেন। টিনের চালের নিচে বাবার দর্জিখানায় সন্ধ্যার পর জ্বলতে থাকে একটা বাতি। তার নিচে বসে সাহানা নিজের খাতা খুলে রাখে। পাশেই বোতামের ছোট বাক্স। কখনো সুতো গুনছে, কখনো আঁচলের নকশা আঁকছে। মেয়েটি সন্ধ্যার পর বাবার পাশে বসে - সুই-সুতা, কাপড়, বোতাম নিয়ে খেলে। কাপড়ের ছোট ছোট টুকরা জোগাড় করে আর কল্পনায় কতো কিছু বানায়।

শিক্ষকরা জানেন, সাহানা ভালো ছাত্রী নয়। অঙ্কে পিছিয়ে, ভাষায় দ্বিধাগ্রস্ত। তবু সে স্কুলে নিয়মিত আসে। তার খাতা ভর্তি থাকে শাড়ির আঁচলের নকশা, গলার ডিজাইন, সেলাইর বিভিন্ন পরিকল্পনা, রঙের রঙের সুতা আর বাচ্চাদের জামার প্যাটার্ন।

একদিন স্কুলে আসে নতুন শিক্ষক—সামিহা ম্যাডাম। তিনি সাহানার ক্লাসের সহপাঠীদের খাতা ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন, হঠাৎ থেমে গেলেন সাহানার খাতায়।

- “এই ডিজাইনগুলো কে এঁকেছে?”
- “আমি, ম্যাডাম... আমার কল্পনা থেকে”
- “তুমি কি এসব বানাও?”
- “জ্বি, বাবার সাথে রাতের দিকে করি।”

সামিহা ম্যাডাম জানলেন, এই মেয়ে শুধু আঁকে না, বাস্তবেও সেলাই করে। সুই-সুতাকে রঙ-তুলি করে সে আঁকে। সে বোঝে কাপড়ের ওজন, সুতোর বুনোন, রঙের সমতা, বোতামের ভারসাম্য, আর মানুষের মনের চাহিদা, যা আদি ও অকৃত্রিম মানুষের পোশাকের বোধ ও চাহিদা। এতটুকু মেয়ের প্রতিভা ও ভালোবাসা, এটাইতো প্রকৃত শক্তি।

সামিহা ম্যাডামের মনে কেন জানি এক প্রকারের আন্তরিকতা ও ভালোবাসার জন্ম নিলো সাহানার প্রতি তার খাতার প্রতি। তখনি বললেন - “তুমি তোমার ডিজাইন দিয়ে একটা স্কুল ইউনিফর্ম তৈরি করবে - মেয়েদের জন্য, যেটা আরামদায়ক, চলাচলে সহজ, আর দেখতে সুন্দর। পারবে না!”

সাহানা অবাক! এমন দায়িত্ব তাকে কেউ দেয়নি আগে। সে বললো - “আমি পারবো ম্যাডাম।”

এক সপ্তাহ পরে, সাহানা বানিয়ে আনল সুন্দর সাদা-নীল ইউনিফর্ম। গলায় নীল আর সাদা সুতোয় সূচিশিল্প করা, হাতে ঢেউর মতো করে বুনোন, স্কুল ড্রেস যেন আরামদায়ক ও স্মার্ট হয় তার জন্য কমরে ফিতা। ব্যাবহারিক দিক থেকে দুটো লুকানো পকেট ও আছে। কাপড় এমন যে ঘামে দাগ পড়ে না। আর তাতে ছিল একটি সূচিকর্ম, ছোট্ট পাখি, পাখির খোলা ডানা যেন সাহানার নিজের স্বপ্নকে উড়াল দিলো। শুধু কি তাই, ওর বাবার কাছ থেকে জামার দাম কতো হতে পারে সেটাও যেনে আসছে।

সবাই মুগ্ধ।

সামিহা ম্যাডাম ক্লাস এ বললেন, “তোমরা বলো, সাহানার এই স্কুল ড্রেস টা কী? শিল্প, ব্যবহারিক জ্ঞান নাকি মানুষের প্রয়োজন বোঝা!”

স্কুল এর পরিচালনা কমিটির মিটিং এ সামিহা ম্যাডাম সাহানার ডিসাইন করা স্কুল ড্রেসটির অনুমতি নিলেন, স্কুল থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হলো ছাত্রীদের। সাহানার যখন দেখলো তার ডিসাইন করা স্কুল ড্রেস সবাই পরে আছে, তখন তার আত্মবিশ্বাস ও নিজের কাজের প্রতি ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হলো। স্কুল ইউনিফর্ম কেবল একটি পোশাকবিধি নয়; এটি শৃঙ্খলা, সমতা, সম্প্রদায় এবং গর্বকে উৎসাহিত করে, আর সেই পাখিটা আজ শুধু সাহানাদের ইউনিফর্মে নয়, তার মনের ভেতরও ডানা মেলেছে।

সাহানা হয় স্কুল “ডিজাইন ক্লাব”-এর পরিচালক। সে অন্য ছাত্রীদের শেখায় কীভাবে রঙ, কাপড়, প্রয়োজন, ও ভালোবাসা একত্র হয়।

প্রকৃত সাফল্য এবং পরিপূর্ণতা আসে কেবল প্রাকৃতিক প্রতিভা থাকার চেয়ে বরং নিজের কাজের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা থেকে। একজন সত্যিকারের প্রতিভা তার সাফল্যের আনন্দ খুঁজে পায় তার বাস্তবায়নের মধ্যে। প্রতিভা + ভালোবাসা = এমন কিছু সৃষ্টি করে যা মানুষকে ছুঁয়ে যায়।

“শিক্ষা জীবনের প্রস্তুতি নয়; শিক্ষা নিজেই জীবন।”

স্বাগেরহাটের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শ্রেয়া, চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী।

শিক্ষক: তাসনিম ম্যাডাম, সমাজ-সংবেদনশীল এক উদ্ভাবনী শিক্ষিকা।

স্কুলের নাম ‘সুরধ্বনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়’। ছোট্ট একটা মাঠ, পেছনে নদী। প্রতিদিন স্কুলে আসে শ্রেয়া, চুপচাপ, একটু গুটিয়ে থাকে। কেউ কিছু বললে সে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠে, কখনো আবার মুখ গোমড়া করে বসে থাকে।

তাসনিম ম্যাডাম খেয়াল করলেন, শ্রেয়ার এমন আচরণ যেন শুধু মন খারাপ নয়, বরং তার শরীরই যেন ভয় পেয়ে যায়!

ম্যাডাম জানেন শিশুদের অনুভূতি মৌখিকভাবে প্রকাশ করতে অসুবিধা হয়; ফলস্বরূপ তারা প্রায়শই আচরণগতভাবে মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশ করে। কিছু শিশু ভিতরে বড় অনুভূতি ধরে রাখে। আবার কিছু শিশু মাঝে রাগের বিস্ফোরণ হতে পারে বা নাটকীয় রাগ প্রকাশ করতে পারে। কখনও কখনও শিশুরা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি আক্রমণাত্মক হয় এবং অন্যরা চুল টেনে বা ত্বকে টান দিয়ে নিজেদের ক্ষতি করতে পারে। শিক্ষক হিসেবে এই সমস্ত আচরণ শিশুদের মধ্যে দেখতে বিরক্তিকর হতে পারে। কিন্তু এই আচরণগুলি এমন কৌশল যা শিশুরা তাদের মন, শরীর এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহার করে।

তাসনিম ম্যাডাম এ ব্যাপারে জানাশুনা আছে, ওনি জানেন Polyvagal Theory কি এবং এর আবেগ নিয়ন্ত্রণ এর উপায় গুলো স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা শরীরের ভ্যাগাস স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভ্যাগাস স্নায়ু মস্তিষ্ককে পেট এবং অন্ত্র, হৃদয়, ফুসফুস, গলা এবং মুখের পেশী সহ শরীরের প্রধান তন্তের সাথে সংযুক্ত।

Polyvagal Theory অনুসারে ভ্যাগাস স্নায়ুর তিনটি শাখা রয়েছে;

১. সামাজিক (সবুজ) ,

২. সহানুভূতিশীল (লাল) ও

৩. বিষণ্ন (নীল)।

ম্যাডাম শ্রেয়ার জন্য ভাবেন এবং একদিন ক্লাসে সবাইকে অবাক করে সবুজ, লাল আর নীল কাগজ নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, “এই সবুজ কাগজ মানে তুমি নিরাপদ, শান্ত, বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে বা পড়তে ভালোলাগছে। এই লাল রঙ মানে হলো তুমি ভয় পেয়েছো বা রেগে গেছো। আর এই নীল কাগজ মানে হলো তুমি এতটাই ভয় পেয়েছো বা কষ্টে আছো যে তুমি একদম চুপচাপ হয়ে গেছো“

শ্রেয়া একটু হেসে ফেললো।

তাসনিম ম্যাডাম বললেন, “শরীর আমাদের বন্ধু। সে আমাদের বলে দেয় কখন আমরা নিরাপদ, কখন ভয় পাচ্ছি। যদি আমরা শুনতে পারি, তাহলে আমরা নিজের যত্ন নিতে শিখি।”

এরপর সবাই একটা করে ‘মনের মানচিত্র’ আঁকলো, তিনটি রঙ দিয়ে তারা নিজের ভেতরের অনুভূতিগুলোকে ভাগ করলো।

শ্রেয়া নিজের মানচিত্রে লিখলো,

“যখন বাবা মা ঝগড়া করে, আমি লাল হয়ে যাই। যখন কেউ জোরে ডাকে, আমি নীল হয়ে যাই। আর যখন তাসনিম ম্যাডাম বলেন, ‘তুমি ঠিক আছো’, তখন সবুজ হয়ে যাই।”

ক্লাসের সবাই শ্রেয়ার আঁকা দেখে হাততালি দেয়।

তাসনিম ম্যাডাম বললেন, “এটাই তো শিক্ষা। নিজের শরীর আর মনের কথা বুঝতে পারা, নিজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা।”

এরপর থেকে স্কুলে একটা ‘রঙের দেয়াল’ বানানো হলো, সবাই সেখানে রঙ দিয়ে প্রতিদিন জানায়, তারা আজ কেমন বোধ করছে। কেউ লাল, কেউ নীল, কেউ সবুজ... আর কেউ কেউ সব রঙ একসাথে!

শ্রেয়া এখন জানে, ভয় পেলে তার শরীর তাকে রক্ষা করতে চায়। শান্ত থাকলে সে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে পারে। আর কেউ যদি বুঝে নেয়, সে আবার সবুজ হয়ে উঠতে পারে।

তাসনিম ম্যাডামের উদ্দেশ্য Polyvagal Theory ছোটদের ভাষায় শেখানো “রঙ ও অনুভব” দিয়ে, ছাত্ররা জানবে নিজের মনের অবস্থা বোঝা, ভাষা দেওয়া, ও তা সামলানোর কৌশল শেখা সম্ভব। এতে তারা নিজেদের “ভেতরের পৃথিবী” ও “নিরাপত্তার অনুভব”কে গুরুত্ব দিতে শেখবে।

“শিক্ষা জীবনের প্রস্তুতি নয়; শিক্ষা নিজেই জীবন।” - জন ডিউই

ধনুক ভাঙা পণ – ৮২

বরগুনার পাথরঘাটার উপকূলীয় গ্রাম। ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা। বারবার আসে দানা, রেমাল, সিডরের মতো আতঙ্ক। কিন্তু গ্রামের মাঝেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্কুল - ত' ার সামনে বিশাল এক উঁচু আশ্রয়কেন্দ্র যেটি ঘূর্ণিঝড় আশ্র মিনার।

এই স্কুলে গণিত ছিল এক আতঙ্ক। ছাত্রদের মুখে মুখে ঘোরে এক অদৃশ্য ভয় - "গণিত? মানে মাথাব্যথা। যোগ-বিয়োগ বোঝা যায়, তারপর সব কিছুই ঝাপসা।"

ঠিক তখনই বদ— ল হয়ে এলেন মোজাম্মেল স্যার, একটি পুরনো ব্যাগ, কিছু চক আর অনেকগুলো স্বপ্ন নিয়ে।

প্রথম দিনেই তিনি কালো বোর্ডের বদলে বেছে নিলেন মাঠকে, আর খাতা-কলমের বদলে বেছে নিলেন কলাপাতা, বালির ঢিপি আর বোতলের ঢাকনা।

তিনি বললেন,

— "গণিত মানে শুধু হিসাব না, গণিত মানে জীবন। গণিত মানে গল্প, কল্পনা আর অভিনয়!"

শুরু হলো 'সংখ্যার নাট্যমঞ্চ —

- তিন জেলে আর পাঁচ মাছ:

তিনজন ছাত্র মাথায় জালের টুপি পরে হলো জেলে। পাঁচটি বোতলে ভরা ছিলো রঙিন জল, (" যগুলো প্রশ্ন মাছ — " ছল তারা কীভাবে মাছ ভাগ করবে, যদি একটাতে রয়েছে সোনা?" শিশুদের উত্তরে তৈরি হলো এক গল্প, যেখানে ভগ্নাংশ আর ন্যায্যতা একসাথে ধরা দিলো।

- "ভগ্নাংশ কেক ঘর":

বাঁশের খুঁটির নিচে স্থাপিত হলো শিশুদের বানানো কেকের দোকান। "এক কেক ৮ টুকরো। তুমি যদি ৩ টুকরো খাও, তাহলে তুমি কত অংশ খেলো?" প্রশ্নটি উত্তর নয়, আলোচনার রূপ নিলো। কেউ কেকের জায়গায় ডিম বা রুটি আনলো, ক' ারণ সবসময় কেক পাওয়া যায় না, স্যার!" তখন (— শখা হলো ভগ্নাংশ কেবল সংখ্যা না, অভ্যাসেরও ভাষা।

- মাঠের ম্যাপ, দৈর্ঘ্য আর ইটের গাণিতিক খেলা:

স্কুল মাঠে দাড়িয়াবান্ধা খেলার দাগকে ব্যবহার করে বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, অনুপাত শেখানো হলো। শিশুরা নিজের ধাপ মেপে বুঝল, "আমার দুই ধাপ = ১ গজ!"

তৃতীয় মাত্রা বোঝাতে দেওয়া হলো ৩টি ইট, রাখা হলো একটা ছোট্ট খুপরি, আর প্রশ্ন করা— " া হলো এই ঘরটার আয়তন?" কত

- বীজগণিতের রহস্যনাট্য:

"এক ঝুড়ি বল" নামের নাটকে X, Y আর Z রূপ পেলো তিন রঙের ঝুড়িতে। দর্শক ছিলো শিক্ষার্থী, আর অভিনেতা শিক্ষক ও অভিভাবক! সবাই হাসতে হাসতে শিখলো, "X মানে শুধু একটা অজানা সংখ্যা নয়—X মানে এক লুকানো গল্প!"

মোজাম্মেল স্যার ভালো ভাবেই জানেন, এই variable এর ধারণা টাতে এসেই সবাই কিছুটা হলেও অংক নিয়ে দ্বিধায় পরে, আর তখনি আরম্ভ হয় অংক ভীতি।

- দাদির মুদির দোকান = গণিতের ক্লাস:

মোজাম্মেল স্যার ক্লাসে একদিন বললেন—

— "কে কে বাজারে যায়?"

ি—" শশুরা বললো আমি দাদির সঙ্গে যাই"

তাদের দিয়ে তৈরি হলো "দাদির দোকান", যেখানে শিখানো হলো গুন, ভাগ আর মুনাফার ধারণা।

— "তোমার ৫ টাকায় ২টা আম আর ৩টা কলা হলে, প্রতি ফলের দাম কত?"

এই রকম ব া স্তব সমস্যা থেকেই তারা শিখলো একাধিক চলকের সমীকরণ

একদিন এক মা মাঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

"আগে মেয়েকে বলতাম, রান্না শেখো। এখন সে আমাকে বলে, 'মা, চালের ওজন আর ডাল ভাগ করে হিসাব করো!'"

মোজাম্মেল স্যার বোঝান,

"গণিত মানে শুধু সূত্র নয়, গণিত মানে গল্পের ভাষা, যেটা তুমি ছুঁয়ে দেখতে পারো, গান গেয়ে বলতে পারো, রঙ দিয়ে আঁকতে পারো।"

সেদিন মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলো এক ঝাঁক ছোট্ট বাচ্চা, তাদের হাতে রঙিন খাতা, পায়ে বালু, আর চোখে এক চিলতে কল্পনা। কেউ হয়তো এখনো X মানে বুঝে না, কিন্তু সে জানে X একটা রহস্য, আর সে সাহস পেয়েছে সেটা বোঝার। সৃজনশীলতা, কল্পনাশক্তি এবং আবেগ - এগুলো কোনো আলাদা বিষয় নয়, বরং সব বিষয়ের মধ্যেই থাকা উচিত।

“যেখানে প্রশ্ন জাগে, সেখানেই শিক্ষা শুরু হয়।”

বান্দরবানের থানচি উপজেলার একটি দুর্গম পাহাড়ি স্কুল। স্কুলটি একটি পাহাড়ের কোলে, যেখানে পাকা রাস্তা শেষ হয়ে যায়, আর শুরু হয় কাঁচা পথ আর বাঁশের সাঁকো। সকালে কুয়াশা আর পাখির ডাকের মাঝে স্কুলের টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ মিশে যায়। এই স্কুলে পৌঁছাতে হলে আরিফ স্যারকে প্রতিদিন পাহাড়ি পথে হাঁটতে হয়, কখনো ঝর্ণার পাশ দিয়ে, কখনো বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে।

আরিফ স্যার, একজন তরুণ শিক্ষক, যিনি শিক্ষার প্রচলিত ধারণাকে ভাঙতে এসেছেন। তাঁর চোখে স্বপ্ন আর হৃদয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। ঢাকার একটি কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করে তিনি বেছে নিয়েছেন এই দুর্গম পথ, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, শিক্ষা কেবল শহরের জন্য নয়, পাহাড়ের শিশুদের জন্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

থানচির এই পাহাড়ি স্কুলে শিক্ষার পরিবেশ ছিল অনেকটা একঘেয়ে আর ভীতিকর। শিক্ষার্থীরা ক্লাসে বসত চুপচাপ, তাদের চোখে কৌতূহলের বদলে ভয় আর নীরবতা। শিক্ষক মানেই ছিল কঠিন নির্দেশ, ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা জটিল শব্দ, আর মুখস্থ করার চাপ। পাঠ্যপুস্তক ছিল তাদের একমাত্র জানালা, কিন্তু সেই জানালা দিয়ে তারা কখনো পাহাড়ের সৌন্দর্য বা জীবনের রং দেখতে পেত না।

আরিফ স্যার যখন প্রথম দিন স্কুলে পৌঁছালেন, তিনি লক্ষ করলেন ছাত্রদের নীরবতা। তাদের মধ্যে কেউ কথা বলছে না, কেউ প্রশ্ন করছে না। তিনি বুঝলেন, এই শিশুদের মনে শিক্ষার প্রতি ভালোবাসা জাগানোর আগে তাদের মনের ভয় কাটাতে হবে।

আরিফ স্যার ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে না তাকিয়ে ছাত্রদের দিকে তাকালেন। তিনি বেঞ্চগুলো গোল করে সাজালেন এবং বললেন, “আজ আমি তোমাদের শিক্ষক নই, আমি তোমাদের একজন বন্ধু। আজ থেকে আমরা একসঙ্গে শিখব।” ছাত্ররা অবাক হয়ে তাকাল। এমন শিক্ষক তারা কখনো দেখেনি।

তিনি শুরু করলেন এক অনন্য শিক্ষার যাত্রা, যেখানে ক্লাসরুম আর চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। তিনি শিক্ষাকে নিয়ে গেলেন পাহাড়ের ঢালে, ঝর্ণার ধারে, আর গ্রামের মাঝে। তাঁর পদ্ধতি ছিল সহজ কিন্তু বৈপ্লবিক:

• গল্পের আসর: ক্লাসরুমে পড়াশোনা শুরু হতো গল্প দিয়ে। আরিফ স্যার ছাত্রদের বলতেন, “তোমরা তোমাদের গ্রামের গল্প বলো।” ছাত্ররা শুরু করল তাদের পাহাড়ি জীবনের গল্প— ঝর্ণা থেকে পানি আনার গল্প, বাঁশের বাড়ি তৈরির গল্প, বা পাহাড়ে হরিণ দেখার গল্প। এই গল্পের মাধ্যমে তারা শিখল কীভাবে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা শিক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা যায়।

• প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞান: বিজ্ঞানের ক্লাসে আরিফ স্যার ছাত্রদের নিয়ে যেতেন কাছের ঝর্ণার ধারে। তিনি প্রশ্ন করতেন, “এই পানি কোথা থেকে আসে? কীভাবে পাহাড় থেকে নেমে আসে?” ছাত্ররা ঝর্ণার পানি ছুঁয়ে, পাথরের গঠন দেখে শিখল পানির চক্র, ভূ-তত্ত্ব, আর পরিবেশের গুরুত্ব। একজন ছাত্র, রুংমা, বলল, “আমি ভাবতাম ঝর্ণা শুধু পানি দেয়, এখন বুঝলাম এটা প্রকৃতির গল্প।”

• গণিত জীবনের সঙ্গে: গণিতের ক্লাসে আরিফ স্যার পাঠ্যপুস্তকের জটিল সূত্র বাদ দিয়ে জীবনমুখী উদাহরণের মাধ্যমে গণিত সহজ করে শেখালেন। তিনি বাঁশের খুঁটি দিয়ে বাড়ির উচ্চতা মেপে শিখালেন কীভাবে একটি বাঁশের ঘর তৈরি করা যায়। একদিন তিনি ছাত্রদের নিয়ে গেলেন তাদের গ্রামের বাঁশের বাড়িতে। সেখানে তারা বাঁশের খুঁটি গণনা করে গণিত শিখল।

• বাংলা ও পাহাড়ি ভাষা: বাংলার ব্যাকরণ শেখানোর সময় তিনি পাহাড়ি ভাষার সঙ্গে বাংলা মিলিয়ে শেখাতেন। যেমন, মারমা ভাষায় ‘যাদো লাযে?’ মানে ‘কোথায় যাচ্ছ।’ এভাবে ছাত্ররা তাদের নিজস্ব ভাষা থেকে বাংলা শিখল।

• সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য: আরিফ স্যার ছাত্রদের তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গল্প বলতে বলতেন। একদিন তিনি বললেন, “তোমরা যে গল্প জানো, সেটা আমাকে বলো।” ছাত্ররা তখন তাদের পাহাড়ি গল্প শুরু করল - যেমন, বুনো হাঁসের গল্প, বা ঝর্ণার পাশে বসে পূর্বপুরুষের গল্প। এভাবে তিনি তাদের দেখালেন নিজস্বতা ও গর্বের ঐতিহ্য।

এই শিক্ষার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। আরিফ স্যার বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা কেবল বই থেকে পড়া নয়, জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে চলা উচিত। তিনি ছাত্রদের তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখান। তিনি বলেন, “আমি শিক্ষক নই, আমি পথ দেখাই না; আমি পাশে থাকি।” এই দর্শনের মাধ্যমে তিনি ছাত্রদের শেখার আনন্দ ফিরিয়ে দিলেন।

একদিন ছোট্ট মেয়ে সানু বলল, “স্যার, আপনি পড়ান না; আপনি আমাদের বুঝেন।” আরিফ স্যার হেসে বললেন, “বুঝতে হলে প্রশ্ন করতে হয়। শিক্ষা মানে প্রশ্ন করা।”

আরিফ স্যারের পদ্ধতি হলো শিক্ষার্থীদের জীবনের অংশ হিসেবে শিক্ষাকে গ্রহণ করা।

একজন ছাত্র বললো, “আমরা শুধু পড়তাম আর পরীক্ষা দিতাম। আরিফ স্যার আমাদের শিখিয়েছেন, শিক্ষা মানে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে চলা।” এই পরিবর্তন এমন একটি শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে এসেছে যা শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার আনন্দ দিয়েছে।

এই শিক্ষা এমন একটি পথ, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের স্বপ্ন আর কল্পনার মাধ্যমে শেখে।

“শেখার উৎসব: জানালার ওপারে জীবন”

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার একটি উচ্চ বিদ্যালয়। নায়ক: নাজমুল স্যার। এই স্কুলে ক্লাস মানেই বই খোলা, নোট মুখস্থ করা, আর প্রতিনিয়ত মডেল টেস্ট, প্রি-টেস্ট, পোস্ট-টেস্ট আর MCQ.

শিক্ষকরা বলেন, “ভালো রেজাল্ট না হলে কিছুই হবে না।”

শিক্ষার্থীরা মুখে হাসি মেখে পরীক্ষা দেয়, কিন্তু চোখে ক্লান্তি আর মনে একটাই প্রশ্ন, “শেখা কি শুধু নম্বরের জন্য?”

এই সময় বদলি হয়ে এলেন নাজমুল স্যার, যিনি আগে এক এনজিও স্কুলে কাজ করতেন।

প্রথম দিনেই তিনি বোঝেন, ছাত্ররা শিখছে না, কেবল বাঁচতে চাইছে।

একদিন তিনি ক্লাসে ঢুকে বললেন,

“আজ পরীক্ষা নেই, বরং তোমাদের শেখার গল্প শুনব।”

সবাই চমকে ওঠে।

তিনি চালু করলেন “শেখার দিনলিপি”,

ছাত্ররা প্রতিদিন লিখবে কী শিখেছে, কোথায় ভুল করেছে, কী জানতে চায়।

তারপর শুরু হলো “বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী”,

- ভূগোল ক্লাসে কেউ বানালো গ্রামের মানচিত্র,
- বাংলায় কেউ অভিনয় করলো “সোনার তরী”,
- গণিতে কেউ তৈরি করল জীবনঘনিষ্ঠ সমস্যা সমাধানের গল্প।

পরীক্ষার বদলে তৈরি হলো “শেখার জানালা” - যেখানে নম্বর নয়, মূল্যায়ন হয় উদ্ভাবন, ভাবনা আর অংশগ্রহণে। এই “শেখার জানালায়”ছাত্ররা নান্দনিক অভিজ্ঞতা উপভোগ করে, আর তখন তাদের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বোচ্চ স্তরে কাজ করে ও মুহূর্তে গুলো ফলপ্রশু হয়।

এক অভিভাবক অভিভূত হয়ে বললেন: “আমার ছেলে এখন রাতে মুখস্থ করে না - ও এখন ভাবে, প্রশ্ন তো আসবে ওর ভাবনা থেকে!”

নাজমুল স্যার বলেন: “পরীক্ষা দরকার, কিন্তু শিখতে হলে দরকার স্বাধীনতা। নাম্বারের খাঁচা খুলে দিলে শেখার জানালাগুলো এমনিতেই খুলে যায়।”

এক বছর শেষে নাজমুল স্যার ও তাঁর সহকর্মীরা আয়োজন করলেন এক ব্যতিক্রমী উৎসব,

“শেখার উৎসব: জানালার ওপারে জীবন”।

স্কুলের মাঠজুড়ে প্রদর্শনী, ছোট মঞ্চ নাটক, গণিতের জীবনঘনিষ্ঠ সমস্যা সমাধান প্রতিযোগিতা, জীববিজ্ঞান ছাতা, বাংলা কবিতা পোস্টার, গ্রামীণ ইতিহাসের অডিও-গল্পশালা, এমনকি “মা-বাবার স্মৃতি দিয়ে শেখা” কর্নার।

অভিভাবকরা আসেন, বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, “আমরা তো কখনো ভাবিইনি স্কুল এমন হয়!”

এক ছাত্র বলল, “আমরা জানালায় তাকাই, শুধু বাইরের দৃশ্য নয়, নিজেকেও দেখি নতুন করে।”

জেলা শিক্ষা অফিসার এসে সেই দিন ছবি তুললেন, পরদিন তাঁর বক্তব্য ছাপা হলো পত্রিকায়: “এই স্কুলটি পরীক্ষার বাইরে এক পরীক্ষামূলক ভবিষ্যৎ দেখালো।”

উৎসবের শেষে শিক্ষার্থীরা তৈরি করল একটি সম্মিলিত দেয়ালচিত্র; ‘শেখার জানালা’।

সেখানে আঁকা ছিল এক খোলা জানালা, যার ওপারে ছড়িয়ে আছে জীবন, প্রশ্ন আর কল্পনা। সবার নাম লেখা সেই ছবিতে— যা পরিণত হয় স্কুলের প্রতীক চিত্রে।

শুধু পরীক্ষার পেছনে ছুটে শিশুরা শেখার আনন্দ হারিয়ে ফেলে। স্কুল গুলোতে ছাত্ররা উচ্চাকাঙ্খা করে ব্যর্থ হয় না - বরং বিপরীত ছাত্ররা কম লক্ষ্য রাখে (পরীক্ষার নম্বর) এবং সফল হয়। আর তাই স্কুল সৃজনশীলতার দিকে টানেনা সৃজনশীলতা থেকে দূরে নিয়ে যায়। স্কুলের বাধ্যবাধকতার মধ্যে আটকা পড়ে থাকলে নিজেকে আবিষ্কার করা যায় না।

“শিক্ষা যখন সাহস দেয়, তখন পাহাড়ও পথ হয়ে যায়।”

রাঙামাটির পাহাড়ি অঞ্চলের এক প্রত্যন্ত স্কুল। পাহাড়ের কোলে গড়া সেই স্কুলে শিশুরা আসত ঠিকই, কিন্তু যেন হাওয়ায় ভেসে আসত তাদের শরীর - ভয়ে জড়ানো মুখ, ক্লান্ত চোখ, আর প্রশ্নহীন এক নিঃশব্দতা। শিক্ষকরা শুধু পাঠ্যবই মুখস্থ করান, কবে পরীক্ষা সেই চিন্তা। স্কুলের দেওয়ালগুলো যেন শুধু ইটের নয়, ছাত্রদের মনের মধ্যেও একটি দেওয়াল তৈরি হয়েছিল, যা তাদের কল্পনা আর স্বপ্নকে আটকে রেখেছিল।

এমন সময় বদলি হয়ে এলেন জহির স্যার, ঢাকায় ট্রেনিং নেওয়া এক তরুণ শিক্ষক। তিনি স্কুলে ঢুকে দেখলেন, শিক্ষার্থীরা চুপচাপ, তাদের মুখে হাসি নেই, চোখে ক্লান্তি। তিনি বুঝলেন, এই শিশুদের শিক্ষার প্রতি ভালোবাসা জাগানোর আগে তাদের মনের ভয় আর একঘেয়েমি দূর করতে হবে।

প্রথম দিন তিনি একটি পোস্টার টাঙালেন, যেখানে লেখা, “স্কুল মানে শুধু পরীক্ষার খাতা না, স্কুল মানে আমরা—তুমি, আমি, ওরা।”

১. প্রত্যেক শিশুই আলাদা:-

জহির স্যার লক্ষ্য করলেন,

- ঝর্ণা চুপচাপ, পড়াশোনায় ধীর, কিন্তু অসাধারণ কাঠখোদাই করে।
- মোহন একদম পড়ালেখায় নেই, কিন্তু নাটক লিখে ফেলে সহজেই।
- রুপাই নিয়মিত অনুপস্থিত—সে হাল চাষে যায়।

তিনি ক্লাসে একদিন বললেন,

“শিক্ষা মানে সবাইকে এক কাঠিতে মাপা নয়, তুমি যেমন, তেমনই তুমি শিখবে।”

২. সৃজনশীলতা, কল্পনা ও আবেগ প্রতিটি বিষয়ের ভিতরে:-

তিনি গণিত শেখালেন বাঁশের দৈর্ঘ্য মেপে ঘর বানিয়ে,
ভূগোল শেখালেন পাহাড় বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে,
আর বাংলা শেখালেন নিজস্ব জীবনের গল্প দিয়ে নাট্যরূপ দিয়ে।

৩. পরীক্ষানির্ভর শিক্ষা নয়, শেখার আনন্দ:-

জহির স্যার বললেন, “এই মাসে কোনো পরীক্ষা নেই।” শুরু হলো “জানার উৎসব”, যেখানে শিশুরা নিজের শেখা নিজেই দেখাল। কেউ গান গেয়ে, কেউ ছবি এঁকে, কেউ নাটক করে।

৪. শিক্ষক মানে গাইড, সাথী:-

জহির স্যার চেয়ারে বসতেন না, হাঁটতেন ছাত্রদের পাশে, জিজ্ঞেস করতেন, “তোমার কী শেখার ইচ্ছা আজ?”

ছাত্ররা তাকে ‘স্যার’ না বলে ডাকতো “জহির ভাই”।

৫. শিক্ষা সংস্কার একার পক্ষে নয়—সমাজের সম্মিলিত প্রয়াস:-

একদিন তিনি গ্রামে আয়োজন করলেন “আমাদের স্কুল” মেলা। কিরণ বুড়ি রান্না করলেন, বনানী মাস্টার ছেলেমেয়েদের দিয়ে নাটক করালেন, রুপাইয়ের বাবা বললেন, “স্কুলে এবার আমি মাটি কাটব, তোমরা রঙ করো।”

জহির স্যার বোঝালেন: “এই স্কুল এখন কারও নয়, এটা আমাদের। এখানে শেখে সবাই, ছাত্র, শিক্ষক, মা, পাড়া। আর শেখা মানে শুধু পড়া নয়, বেঁচে থাকা, বোঝা, অনুভব করা।”

কয়েক বছরের মধ্যে রাঙামাটির এই প্রত্যন্ত স্কুলটি জেলার মধ্যে একটি আদর্শ হিসেবে পরিচিতি পেল। শিক্ষার্থীরা শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলই করল না, তারা জীবনের জন্য প্রস্তুত হল। ঝর্ণা তার কাঠখোদাই দিয়ে স্থানীয় হস্তশিল্পের প্রদর্শনীতে অংশ নিল। মোহন তার গল্প লিখে একজন স্থানীয় লেখক হিসেবে পরিচিতি পেল। আর রুপাই তার কৃষির অভিজ্ঞতা শিক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে গ্রামে একটি কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু করল।

জেলা শিক্ষা অফিসার মেলায় এসে বললেন, “এই স্কুল আমাদের শিখিয়েছে, শিক্ষা কেবল পৃষ্ঠার অক্ষর নয়, বরং জীবনের গল্প, অনুভবের রঙ আর স্বপ্ন দেখার সাহস।”

এই গল্পটি রাঙামাটির একটি স্কুলের নয়, এটি বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের সেই স্কুলের সম্ভাবনার গল্প, যেখানে একজন জহির স্যার, কিছু ঝর্ণা-মোহন-রুপাই, আর একটুখানি বিশ্বাস, পরিবর্তনের উৎসব রচনা করতে পারে।

ধনুক ভাঙা পণ – ৮৫

“সবার স্কুল”

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার একটি ছোট্ট স্কুল। সালমা ম্যাডাম এই স্কুলে যোগ দিলেন।

কালীগঞ্জের এই ছোট্ট স্কুলটিতে একসময় কেউ ঠিকমতো ক্লাসে আসত না। শিক্ষকগণ সময়মতো আসতেন না, অভিভাবকরা বলতেন “স্কুলে শিখিয়ে কী হবে, কাজে তো নামতেই হবে।” ছাত্রদের চোখে স্বপ্ন নেই, স্কুল ছিল শুধু রুটিন আর অনুপস্থিতির তালিকা।

নতুন যোগ দিলেন সালমা ম্যাডাম। তিনি প্রথমেই বললেন,

“স্কুল শুধু আমাদের নয়, এটা পুরো গ্রামের। যদি সবাই মিলে ঠিক না করি কেমন স্কুল চাই, তবে কিছুই বদলাবে না।”

শুরু হলো “স্কুল পুনর্গঠনের গণপরিকল্পনা”:

• প্রতি শুক্রবার বিকেলে স্কুল মাঠে হয় ‘স্কুল সভা’, যেখানে ছাত্র, অভিভাবক, স্থানীয় পেশাজীবী এবং শিক্ষক একসাথে বসে।

• ছাত্ররা বলে তাদের ভয় কোথায়, শিখতে কেমন লাগে।

• অভিভাবকরা বলেন তাদের স্বপ্ন কী, বাধা কী।

• এক কাঠমিস্ত্রী বলেন, “আমি ফ্রি-তে বেঞ্চ বানিয়ে দেবো।”

• এক চা-ওয়ালা বলেন, “স্কুলে চায়ের বদলে একদিন ছাত্রদের গল্প শুনতে চাই।”

• ছোট্ট মায়া বলে, “আমি চাই, আমাদের ক্লাসের দেয়ালে আমাদের আঁকা ছবি থাকুক।”

তিন মাসের মধ্যেই বদলে যায় পুরো চেহারা,

• দেয়ালজুড়ে ছাত্রদের আঁকা ছবি,

• প্রতিমাসে “আমার শেখা, আমার পথ” উৎসব,

• অভিভাবকদের জন্য “শেখার সন্ধ্যা”,

• আর স্থানীয় মানুষজন স্কুলকে বলেন, “আমাদের হৃদয়ের কেন্দ্র”।

সালমা ম্যাডাম বলেন, “পরিবর্তন সরকারের দয়ায় আসে না, পরিবর্তন আসে যখন সবাই মিলে স্কুলকে নিজের বলে ভাবতে শেখে। স্কুলকে অবশ্যই সক্রিয় সম্প্রদায়ের প্রকৃত রূপ হতে হবে, স্কুল শিক্ষা গ্রহণের জন্য আলাদা করে রাখার জায়গা নয়।"

শিক্ষার সংস্কার কোনো একক সিদ্ধান্তে সম্ভব নয়; এটা একটি ‘তৃণমূল আন্দোলন’, যা শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ও সমাজ একসঙ্গে অংশগ্রহণের ফলেই সম্ভব। তাই তো বলা হয়,

“একটি শিশুকে লালন-পালন করতে একটি গ্রাম লাগে।” শিশুর শিক্ষা, নৈতিকতা, সংস্কৃতি, এবং সামাজিক মূল্যবোধ গঠনের জন্য কেবল বাবা-মা বা শিক্ষকের উপর নির্ভর করা যায় না। গ্রামের প্রত্যেকে - শিক্ষক, প্রতিবেশী, আত্মীয়, বা সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব ভূমিকা পালন করেন।

"শিক্ষা হল সমাজের প্রাণ, এটি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে চলে যায়।"

“একটি শিশুকে বড় করতে লাগে পুরো একটি গ্রাম।”

ভোলার চরাঞ্চলের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। হাসিনা ম্যাডাম – এক নিঃশব্দ আলোকবর্তিকা। ঘাসে ঢাকা মাঠের পাশে ছোট্ট স্কুলটি দাঁড়িয়ে ছিল নিঃসঙ্গ এক গাছের মতো। না ছিল রঙিন দেয়াল, না ছিলো কোলাহল—শুধু ছিল ধুলো, নীরবতা আর বিস্মৃতির গন্ধ।

বাচ্চারা আসত, হ্যাঁ, প্রতিদিনই আসত, কিন্তু তাদের চোখে ছিল না আগ্রহ, মুখে ছিল না প্রশ্ন। কারো পায়ের স্যান্ডেল ছেঁড়া, কারো খাতায় অর্ধেক পৃষ্ঠা। কিন্তু তার চেয়েও করুণ ছিল, তাদের আশেপাশে ছিল না কোনো ‘বিশ্বাস’।

এই স্কুলেই বদলি হয়ে এলেন হাসিনা ম্যাডাম। বয়স পঁয়তাল্লিশ, চুলে কিছু পাকা সাদা রেখা, চোখে অপার মমতা। তিনি বুঝে গেলেন, শিক্ষার অভাব যতটা না বইয়ের, তার চেয়েও বেশি হৃদয়ের।

প্রথম দিনেই তিনি বোর্ডে একটি লাইন লিখে রাখলেন, “একটি শিশু, একটি গ্রাম, এ যেন এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন।”

সপ্তাহ পেরোল, কেউ সে লেখার দিকে তাকায়নি। তবুও তিনি হাল ছাড়েননি।

এক সন্ধ্যায়, যখন চরে হাওয়া থমকে থাকে, গরুর দল ফিরতে থাকে ঘরে, তখন তিনি এক এক করে সবার বাড়িতে গিয়েছিলেন। হাঁটছিলেন পানি আর কাদায়, কোনোদিন জোছনার আলোয়, কোনোদিন ঝড়ের গর্জনে।

তিনি শুধু বলতেন, “আপনার ছেলেটা ক্লাসে গল্প বলছে, কিন্তু সে গল্পে মায়ের চরিত্রটা নেই। আপনার মেয়েটা ছবি আঁকে, কিন্তু রঙের খাতা নেই।”

মানুষ অবাক হতো, শিক্ষিকা এসে এমন কথা বলে? তারপর এল সেই দিন, একটি সভার দিন। স্কুলের উঠানে জড়ো হলেন বাবারা, মায়েরা, জেলেরা, কৃষকেরা, ইমাম সাহেব, এমনকি চায়ের দোকানের রফিকও।

হাসিনা ম্যাডাম দাঁড়িয়ে বললেন “আমি একজন শিক্ষিকা। কিন্তু আমি একা নই। এই শিশুরা আপনারও, আমারও। একজন শিশুকে বড় করতে একটা স্কুল যথেষ্ট না, লাগে পুরো একটা গ্রাম।”

তার কণ্ঠ থেমে গেলে, অনেকক্ষণ ছিল নিঃশব্দ। তারপর প্রথম কথা বললেন রহিমা খালা “তাহলে আমি সপ্তাহে একদিন রান্না শেখাতে পারি।”

সাথে সাথেই কামাল চাচা বললেন, “স্কুলের টিন বদলাই আমি। খরচ আমার।”

সে সন্ধ্যা থেকে স্কুল বদলে যেতে লাগল। কেউ ফুলগাছ লাগাল, কেউ বাঁশ দিয়ে খেলার দোলনা বানাল, কেউ গল্প বলার জন্য এসেই গেল সপ্তাহে একবার।

মজার ছিলো, স্কুল home work এর সাহায্য সেন্টার, বিকেল ৪-৬ টা, কারো সাহায্য লাগলে ক্লাস ঘরে আসবে, গ্রামের গুণীজন রা ওখানে থাকেন সাহায্য করার জন্য। এতে, স্কুলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হলো গ্রামবাসীর।

শিশুদের চোখে এবার সত্যিকারের জ্যোতি। তারা জানে, তারা একা নয়। তারা জানে, শেখার পথটি কেবল বইয়ের নয়, ভালবাসারও।

অবশেষে কেউ বললো না, এই স্কুলটা কার? কারণ, উত্তরটা এখন সবার জানা, “এই স্কুলটা আমাদের। এই শিশুরাও আমাদের।”

একটি শিশুকে বড় করতে কেবল একজন শিক্ষকের দরকার পড়ে না, দরকার পড়ে একজন রাধুনির, একজন মাঝির, একজন চাষির, একজন গল্পকারের, একজন নিরব ভালোবাসার, যা মিলে গড়ে তোলে একটি পুরো গ্রামের হৃদস্পন্দন।

ধনুক ভাঙা পণ - ৮৭

এক নজরে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যান:

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১,১৪,৬৩০

প্রাথমিক শিক্ষার্থীর ১,৯৭,১৩,৬৮৫ (২ কোটির মতো)

প্রাথমিক শিক্ষক ৬,৫০,২৯৩

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:২৯

শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান (শতকরা) ১০০%

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের হার (%) ৮৬.৮৫%

নেট ভর্তির হার (%) ৯৭.৭৬%

নিরাপদ স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা (%) ৮৮.৪১%

নিরাপদ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা (%) ৯৩.৬৭%

যদিও অবকাঠামো এবং পরিসংখ্যানগত অগ্রগতি ঈর্ষণীয়, তবুও শিক্ষার গুণগত মান এবং শিক্ষার্থীদের শেখার দক্ষতা প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছায়নি।

সম্ভাব্য সমাধান: শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা একান্ত দরকার। “It takes a village to raise a child” কথাটার মর্ম আছে। আমাদের দেশের সম্প্রদায়ের গুনগত মান ভালো না, সমাজের নীতি ভালোনা, সম্প্রদায়ের শিক্ষার দরকার। অভিভাবক, স্থানীয় নেতা, এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে এমন ভাবে যাতে স্কুল ও সমাজ সমান ভাবে শিক্ষা পায়।

কেমন হয় - যদি!

"শিক্ষা-ই-শক্তি" নামে একটি সরকারি প্রকল্প থাকে। এই প্রকল্পের বিশেষত্ব হল,

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BCS) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাইলে, এক বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতেই হবে। সরকারি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মানুষিক ও নৈতিক ভাবে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম কে সংযুক্ত করার উদ্যোগ। এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুব সমাজের, তারুণ্য কে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমে সংযুক্ত করা।

ছবিগুলো বাংলাদেশের স্কুলের, সুন্দর দালান দেশ জুড়ে, চাই শুধু ব্যবস্থাপনা আর কিছুই না। যেখানে সমাজ স্কুল থেকে শিখবে আর স্কুল সমাজ থেকে শিখবে।

PTA - Parent Teacher Association

বাংলাদেশের কুমিল্লার একটি ছোট্ট গ্রাম, তিতাস নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রামের নাম ধানখালী, যেখানে ধানক্ষেত, মাটির বাড়ি, আর লোকসংস্কৃতির ছোঁয়ায় জীবন চলে। গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধানখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাধারণ পড়াশোনার জায়গা হলেও শিক্ষার্থীদের চোখে স্বপ্নের স্ফুলিঙ্গ কম। রেহানা আক্তার, একজন তরুণ শিক্ষিকা, যিনি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন করতে চান। তিনি বিশ্বাস করেন, "শিক্ষা শুধু বইয়ের পাতায় নয়, আমাদের গ্রামের গানে, গল্পে, আর হাতের কাজে লুকিয়ে আছে।" ধানখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবকাঠামো ছিল সীমিত, ভাঙা বেঞ্চ, অপ্রতুল শিক্ষা উপকরণ, আর টয়লেটের বেহাল দশা। শিক্ষিকা রেহানা আক্তার লক্ষ করলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাদের শেখার আনন্দ হারিয়ে গেছে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, শিক্ষাকে গ্রামের সংস্কৃতি, শিল্প, এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করে একটি নতুন দিশা দেবেন। তিনি চাইলেন শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধ জাগানো এবং সম্প্রদায়কে শিক্ষার অংশীদার করা।

রেহানা ম্যাডাম গ্রামের মানুষদের একটি সভায় ডাকলেন। তিনি বললেন, "আমাদের গ্রামের লোকগান, পটচিত্র, আর তিতাস নদীর গল্প আমাদের শিক্ষার অংশ হতে পারে। আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করি, তবে আমাদের স্কুল হবে গ্রামের হৃদয়।" তিনি একটি অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি (PTA - Parent Teacher Association) গঠনের প্রস্তাব দিলেন, যার নাম দিলেন "ধানখালী সংস্কৃতি ও শিক্ষা সমিতি"। এই সমিতির লক্ষ্য ছিল: • শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা। • সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্কুলের সেতু তৈরি করা। • জীবনমুখী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বাড়ানো। শিক্ষার্থীদের শেখার আনন্দ ফিরিয়ে আনবার জন্য PTA বিভিন্ন উদ্যোগ নিল।

১. সাংস্কৃতিক শিক্ষার সমন্বয়: • পটচিত্রের ক্লাস: গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ কারিগর হাফিজ উদ্দিন শিক্ষার্থীদের পটচিত্র আঁকা শেখালেন। শিক্ষার্থী রিফাত, যে পড়াশোনায় দুর্বল ছিল, পটচিত্রে দারুণ দক্ষতা দেখাল। তার আঁকা তিতাস নদীর গল্পের ছবি স্কুলের দেওয়ালে স্থান পেল। • লোকগানের ক্লাস: গ্রামের বাউল শিল্পী ফকির আলম শিক্ষার্থীদের লালনের গান শেখালেন। এই গানগুলো বাংলা ক্লাসের সঙ্গে যুক্ত হলো, যেখানে শিক্ষার্থীরা গানের মাধ্যমে ভাষার সৌন্দর্য শিখল। • নৌকা তৈরির কর্মশালা: স্থানীয় মাঝি রশিদ মিয়া শিক্ষার্থীদের ছোট কাঠের নৌকা তৈরি শেখালেন, যা গণিতের পরিমাপ ও জ্যামিতির পাঠের সঙ্গে যুক্ত হলো। শিক্ষার্থী তানিয়া তার নৌকা দিয়ে স্কুলের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতল।

২. জীবনমুখী শিক্ষা: • তিতাসের পাঠশালা: রেহানা ম্যাডাম তিতাস নদীর পাড়ে ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষার ক্লাস বসালেন। শিক্ষার্থীরা নদীর স্রোত, মাছ ধরার পদ্ধতি, এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ে শিখল। গ্রামের মৎস্যজীবীরা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন।

• বাজারের গণিত: অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সদস্যরা শিক্ষার্থীদের স্থানীয় বাজারে নিয়ে গেলেন, যেখানে তারা দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলে হিসাব শিখল। অভিভাবক নুরুল হক, একজন দোকানদার, শিক্ষার্থীদের লাভ-ক্ষতির ধারণা বুঝিয়ে দিলেন। • গল্পের ক্লাস: বাংলা ক্লাসে শিক্ষার্থীরা তাদের গ্রামের গল্প লিখল। শিক্ষার্থী সুমাইয়া তার দাদির কাছ থেকে শোনা একটি লোককাহিনী লিখে সবাইকে মুগ্ধ করল।

৩. সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ: • অভিভাবক শিক্ষা দিবস: অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি প্রতি মাসে একটি "অভিভাবক শিক্ষা দিবস" আয়োজন করল, যেখানে অভিভাবকরা শিখলেন কীভাবে বাড়িতে শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে হয়। এটি অভিভাবকদের দায়বদ্ধতা বাড়াল। • অবকাঠামো উন্নয়ন: গ্রামের ব্যবসায়ী রহিম মিয়া স্কুলের জন্য নতুন বেঞ্চ দান করলেন। স্থানীয় এনজিওর সহায়তায় টয়লেট মেরামত করা হলো, আর অভিভাবকরা একত্রিত হয়ে স্কুলের বাগান তৈরি করলেন। • মহিলাদের প্রকল্প: অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির মাধ্যমে গ্রামের মহিলাদের জন্য একটি হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ প্রকল্প চালু হলো, যেখানে তারা নকশী কাঁথা তৈরি শিখলেন। এটি শিক্ষার্থীদের পরিবারের আর্থিক স্থিতিশীলতায় সহায়ক হলো।

৪. সংস্কৃতি ও শিক্ষা উৎসব:

রেহানা ম্যাডাম ও অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি (PTA) একটি "ধানখালী সংস্কৃতি ও শিক্ষা উৎসব" আয়োজন করল। এই উৎসবে শিক্ষার্থীরা তাদের শেখা প্রদর্শন করল। অভিভাবকরা অবাক হয়ে দেখলেন, তাদের সন্তানরা কীভাবে শিক্ষার সঙ্গে গ্রামের সংস্কৃতি মিশিয়ে ফেলেছে। একজন অভিভাবক, ফাতেমা বেগম, বললেন, "আমি ভেবেছিলাম, স্কুল শুধু বই পড়ার জায়গা। এখন দেখি, এটা আমাদের গ্রামের গল্পের আড্ডা।"

দুই বছরের মধ্যে ধানখালী স্কুল জেলার মধ্যে একটি আদর্শ হিসেবে পরিচিতি পেল। জেলা শিক্ষা অফিসার বললেন, "ধানখালী স্কুল প্রমাণ করেছে, শিক্ষা তখনই জীবন্ত হয়, যখন এটি আমাদের সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যায়।"

একটি জাতির সংস্কৃতি তার জনগণের হৃদয়ে এবং আত্মায় বাস করে। আর তাই, "It takes a village to raise a child" প্রবাদের মতো, শিক্ষা একটি সম্মিলিত স্বপ্ন, যা সংস্কৃতির রঙে আরও উজ্জ্বল হয়।

“মা-মেয়ে শিল্প ক্লাস”

স্কুড়িগ্রামের নদীভাঙা অঞ্চল , একটি বন্যাপ্রবণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সাবিহা আপা, চারুকলার ছাত্রী থেকে গ্রামীণ শিক্ষিকা হয়ে ওঠা এক যুবতী।

প্রতিবার বন্যা এলে এই গ্রাম হারায়, জমি হারায়, ঘর হারায়, অনেক সময় হারায় স্কুলটাও। তারপর আবার নতুন জায়গায় বাঁশ, টিন আর মাটির ওপর গড়ে ওঠে নতুন স্কুলঘর।

কিন্তু হারায় না শিশুদের চোখের ভরা প্রশ্ন,

“এই স্কুলটা আমাদের কবে নিজের হবে, আপা?”

সাবিহা আপা, ঢাকায় চারুকলায় পড়াশোনা শেষ করে ফিরে এসেছেন নিজ জন্মগ্রামে, এই স্কুলেই এখন তিনি শিক্ষিকা।

ক্লাসে এসে দেখেন, বাচ্চারা ক্লান্ত, বিমুখ। শিক্ষা যেন শুধু বইয়ের বোঝা।

তিনি জানতেন, শিক্ষা কেবল অক্ষরের গাঁথুনি নয়, তা হৃদয়ের সেতুবন্ধ। বিশ্বাস করতেন - শিল্প আর সংস্কৃতি যদি জেগে ওঠে, তবে শিশুরা জীবনকে বুঝবে নিজেদের ভাষায়। একদিন তিনি ক্লাসে নিয়ে এলেন একটি ছেঁড়া নকশাদার শাড়ি। বললেন, “এই শাড়ির টুকরোটাকে দেখে কে কী ভাবো? কার মনে কী গল্প আসে?”

তখনি মেয়ে ছোট্ট লাবনী বলল -

“এটা তো আমার আম্মুর শাড়ির মতো, যা দিয়ে আম্মু আমায় ঝুড়ি বানিয়ে দোল খাওয়াতেন।”

আরও একে একে শিশুরা বলতে লাগল, কেউ দেখল তাতে পদ্মফুল, কেউ বলল মাছের আঁশ, কেউ আবার দাদির কোলে শুয়ে রূপকথার গল্প।

সাবিহা আপা খাতা এনে বললেন, “তোমরা এসব নকশা আঁকো। আর সাথে লেখো সেই গল্প। এই স্কুল হবে আমাদের ‘নকশা পাঠশালা’।”

দু’সপ্তাহ পরে, স্কুলের দেয়াল, বেঞ্চ, এমনকি কালো বোর্ডও ঢাকা পড়ে গেল শিশুদের আঁকা গল্পে - ছেঁড়া শাড়ির টুকরো থেকে জন্ম নিল শিল্প, শিল্প থেকে গল্প, আর গল্প থেকে ফিরে এলো হারিয়ে যাওয়া শিক্ষার আনন্দ।

গ্রামের মা-বোনেরা এসে বললেন, “আমাদেরও শেখাও আঁকতে। আমরা জানি কীভাবে শাড়ির পাড়ে বুনন হয়, কিন্তু কখনো লিখিনি সেটা।”

এভাবে শুরু হলো “মা-মেয়ে শিল্প ক্লাস”, দুপুরে, রান্নার ফাঁকে, বাঁশঝাড়ের নিচে, ছেঁড়া কাপড় আর কাদামাটি দিয়েই।

একদিন UNICEF-এর প্রতিনিধি এসে বললেন, “এই স্কুলটা শুধু স্কুল না, এটা তো এক জীবন্ত সংগ্রহশালা— লোকশিল্প, গল্প আর আত্মার মিল খুঁজে পওয়া।”

আর সাবিহা আপা শুধু হাসলেন, বললেন “এটাই তো চেয়েছিলাম। শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি - সব মিলে শিশুর ঘর হোক। কারণ একটা শিশুকে বড় করতে কেবল স্কুল না, লাগে পুরো একটা সমাজ।”

ছেঁড়া শাড়ির পাড়ে যেমন লুকিয়ে থাকে হাজার বছরের বুনন, তেমনি শিশুর মনে লুকিয়ে থাকে অজস্র গল্প— যা বেরিয়ে আসে যদি কেউ প্রশ্ন করে, “এইটুকু কাপড়ে তুমি কী দেখো?” আসলে, নিজস্ব শিল্পর ও সংস্কৃতির একতাই পারে সমাজ গড়তে, শিশুকে গড়তে।

“ভুলের ভেতর দিয়েও ভাবনা আলো জ্বালাতে পারে”

কুড়িগ্রামের একটি ইউনিয়ন স্কুল, দিপু - পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র, মুকুল স্যার - ইংরেজি শিক্ষক।

দিপু - চুপচাপ, নম্র ছেলে। কিন্তু পরীক্ষায় সবসময়ই কম নম্বর পায়। তার খাতা ভর্তি ভুল, ব্যাকরণ ও বানান এলোমেলো। প্রতিবার পরীক্ষার পর মাথা নিচু করে দাঁড়ায় বকুনি শুনতে। ওর কাছে অনেকটা, রিচার্ড ফাইনম্যান (নোবেল প্রাইজ ফিজিক্স ১৯৬৫) এর উক্তির মতো, “ভুল বানান হলো কি না চিন্তা করাটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়, কারণ ইংরেজি বানান কেবল মানুষের একটি নিয়ম - এর সাথে বাস্তব, প্রকৃতির যেকোনো কিছুর কোনও সম্পর্ক নেই। যেকোনো শব্দের বানান ভিন্নভাবেও ঠিক একইভাবে করা যেতে পারে।”

দিপুর চিন্তায়, ভাষার নির্ভুলতার চেষ্টা যোগাযোগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বাধা হিসেবে আসে। তার মনে হয়, ব্যাকরণগত নিয়মগুল ভাব প্রকাশের জন্য বাধা স্বরূপ। ছোটখাটো ব্যাকরণগত ত্রুটিগুলি নিয়ে চিন্তা করার চেয়ে বার্তার সারাংশের উপর মনোযোগ দেওয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ বলে দিপু মনে করে।

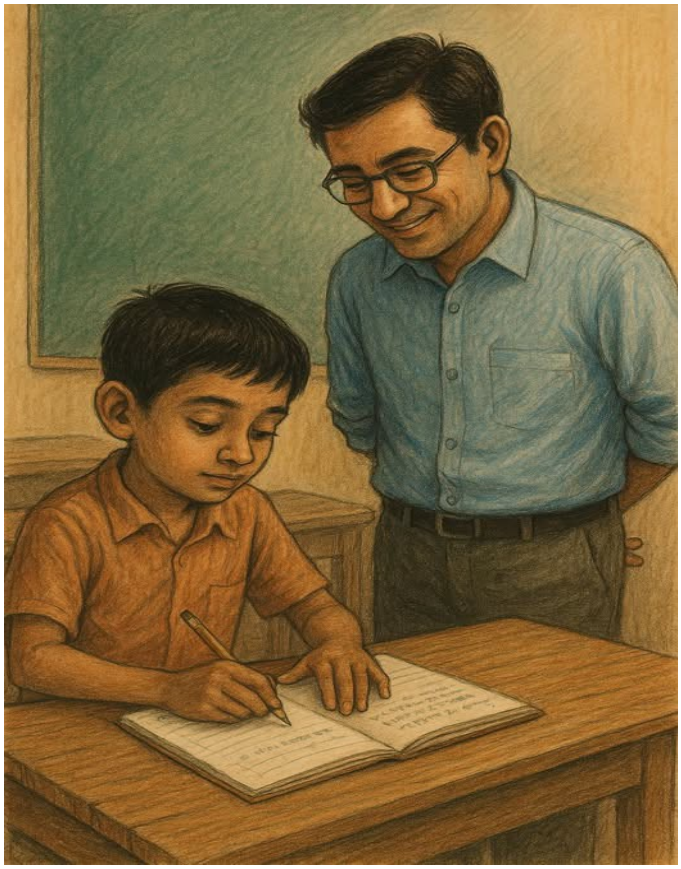

এমন সব ভাবনা থেকে সে পরীক্ষায় পিছিয়ে যায় আর সবার কাছে হয়ে উঠে - “দিপু the ব্যাকবেঞ্চার”।

মুকুল স্যার নতুন যোগ দিয়েছেন। একদিন ইংরেজি ক্লাসে সবাইকে বললেন, “তোমরা নিজের মতো করে একটা গল্প লেখো। বানান ভুল হলেও চলবে, ব্যাকরণ ভুল হলেও চলবে। শুধু নিজের কথা লিখো, যা তোমার মাথায় ঘোরে।”

সবার মাঝে হালকা হাসি, কেউ কেউ সন্দিগ্ধ। কিন্তু দিপুর চোখ জ্বলে উঠলো।

সেই রাতেই দিপু লিখল এক গল্প: “A Tree That Could Talk”

গল্পে একটি গাছ ছিল, যে শুধু বাতাসের সঙ্গে কথা বলতে পারত, আর তার পাতাগুলো প্রতিবার রোদ পেলে গান গাইত।

ভাষা ছিল তার অগোছালো, বাক্য ছিল এলোমেলো, কিন্তু ভাবনায় ছিল; ভালোবাসা দুঃখ, আশা, প্রকৃতি, সময় নিয়ে শিশুসুলভ কিন্তু গভীর দার্শনিক ভাবনা।

মুকুল স্যার পড়েই থমকে গেলেন। “এটা তো শুধু গল্প না, এটা তো ভাবনার আলো।”

তিনি দিপুকে ডেকে বললেন, “তুমি হয়তো বানান ঠিক করো না, ব্যাকরণে দুর্বল, কিন্তু তোমার ভাবনায় এমন কিছু আছে, যা অনেকেই ধরতে পারে না।”

এরপর দিপুর লেখা স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপা হলো, বানান ভুল সহ, ভাষার দুর্বলতা সহ, সবকিছু যেমন ছিল, তেমন করেই। প্রথমবার কেউ দিপুর ভুলকে শুধরে দেয়নি, বরং তার ভাবনাকে মর্যাদা দিয়েছে।

একদিন ক্লাসে মুকুল স্যার বললেন, “দিপু আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রতিটি শিশুর ভাবনার নিজস্ব ভাষা আছে। কেবল নম্বরের খাতায় সব কিছু ধরা পড়ে না। পরীক্ষার বাইরে, জীবনের ভিতরেই সবচেয়ে বড় শিক্ষা লুকিয়ে থাকে।”

শিক্ষা যদি হয় কেবল নম্বর আর ব্যাকরণে সীমাবদ্ধ, তাহলে অনেক ‘দিপু’ হারিয়ে যাবে শব্দের গোলকধাঁধায়। সত্যিকারের শিক্ষা তখনই হয়, যখন সেই দিপুর ভাবনা, কল্পনা ও অনুভবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রতিটি শিশুর মধ্যে আলাদা রঙ আছে, যার অনেকটাই পরীক্ষার সাদা কাগজে ধরা পড়ে না। আর সেই রঙগুলোই তো জীবনকে সত্যি রঙিন করে তোলে।

“স্মৃতিবিদ্যা”

স্নেত্রকোনার দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের একটি সরকারি বিদ্যালয়। রুমানা ম্যাডাম বিজ্ঞাণের শিক্ষক ও অনিক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র।

রুমানা ম্যাডাম সদ্য বদলি হয়ে এসেছেন। তার প্রথম ক্লাস – চতুর্থ শ্রেণির বিজ্ঞান। বিষয়: “পানিচক্র” (Water Cycle).

রুমানা ম্যাডাম রঙিন চকের আঁচড়ে বোর্ডে একখানা জীবন্ত ছবিই এঁকে ফেললেন, সূর্য, জলীয়বাষ্প, মেঘ আর ঝরঝরে বৃষ্টি। কিন্তু সেই ছবি যেন নিঃশব্দ হয়ে রইল শ্রেণিকক্ষে। শিশুদের চোখে ছিল না বিস্ময়, মুখে উঠেনি প্রশ্ন। যেন বোঝা আর অনুভবের মাঝখানে কিছু একটা আটকে আছে। একটু বুঝিয়ে বললেন, পানিচক্র (Water Cycle) হল একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, এটি বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, বৃষ্টিপাত এবং পানির প্রবাহের মতো বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তবুও ক্লাস বেশ চুপ, ম্যাডাম বুঝতে পারছেন এতো সুন্দর পানিচক্রের ধারণাটা ছাত্ররা উপভোগ করছে না এবং অবাক ও হচ্ছে না।

তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন,

“এই চক্রটা যদি গানের মাধ্যমে বলি কেমন হয়?”

সবাই অবাক।

তিনি গাইতে শুরু করলেন এক ছন্দে:

“সূর্য দিলো তাপ, বাষ্প উঠলো চাপ,
মেঘ করে জমা, বৃষ্টি দিলো টাপুর টুপুর।”

ম্যাডাম এই পানিচক্র কে আরও আকর্ষণীয় করবার জন্য একটা “পানিচক্র মডেল” এর প্রস্তাব করলেন। বাটি, প্লাস্টিক, আর তুলা দিয়ে হুবহু বোর্ডে দাগানো ছবির মতো করে।

রুমানা ম্যাডাম বললেন, “অনিক সমন্বয় করবে আর তোমরা সবাই মিলে এই ‘পানিচক্র মডেল‘ তৈরির জন্য কাজ করবে।”

তিনদিন পর, এক বাটি পানির ওপরে বসানো প্লাস্টিকের ঢাকনা, মোমবাতির তাপ, তুলোর ভেতর জমা জলকণা আর ছড়িয়ে পড়া ‘বৃষ্টি’, এই ছিল অনিকের দলের পানিচক্র মডেল।

আর সেই মডেলের সঙ্গে গাওয়া হলো সেই ছন্দের গান।

এক ছাত্র বলল, “আমরা এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘ দেখলে জানি ওটা কেমন করে এসেছে।”

রুমানা ম্যাডাম এখানে সুন্দর ভাবে স্মৃতিবিদ্যা (mnemonic learning) ব্যাবহার করেছেন। যা হলো, স্মৃতি সহায়ক - ছাত্রদের কে আরও কার্যকরভাবে তথ্য পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে। ছাত্ররা পানিচক্র তথ্য সহজেই দৃশ্যমান মডেল ও ছড়া/গান দ্বারা মনে রাখবে।

পুরো স্কুল অবাক। প্রধান শিক্ষক বললেন,

“এটা শুধু বিজ্ঞান না, এটা তো কবিতা, আবেগ, আর দলগত চিন্তার জয়!”

শুধু তথ্য নয়, কল্পনা, সৃজনশীলতা ও আবেগ যদি পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে মিশে যায়, তাহলে শেখা হয়ে ওঠে আনন্দদায়ক, গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। সৃজনশীলতা, কল্পনাশক্তি এবং আবেগ, এগুলো কোনো আলাদা বিষয় নয়, বরং সব বিষয়ের মধ্যেই থাকা উচিত। শিক্ষা তখনই প্রাণ পায়, যখন তাতে মিশে যায় হৃদয়ের স্পর্শ, কল্পনার ডানা আর সৃষ্টির আনন্দ। শুধু তথ্য নয়, শিক্ষার প্রতিটি বর্ণেই থাকুক স্পর্শের উষ্ণতা, তবেই গড়ে উঠবে আবিষ্কারের ভিত।

ধনুক ভাঙা পন – ৯৪

“সব ফুল একসাথে ফুটে না।”

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার এক নদীবেষ্টিত গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়। রত্না ম্যাডাম সেখানের একজন শিক্ষক। মোহনগঞ্জের চরঘেরা গ্রামে অবস্থিত চরগোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় - ছোট্ট একটা স্কুল, নদীর ধারে। বন্যা এলে মাঝে মাঝে স্কুলটাকে সরিয়েও নিতে হয় বাঁধের উঁচু জায়গায়।

এই স্কুলে এক সময় ক্লাস ফাইভে পড়তো জয়ন্ত, এক চুপচাপ বাচ্চা। অঙ্কে একেবারে দুর্বল। তিনবার টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করল। শিক্ষকরা বললেন, “ওকে ক্লাস ফাইভে রেখো না, পারবে না।”

কিন্তু রত্না ম্যাডাম বললেন, “ফেল মানে সবকিছু শেষ না। জয় তো শুধু অঙ্কে ফেল করছে, জীবনে তো না।”

কোন ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তাকে পরের শ্রেণীতে না নেয়ার ঘোর বিরোধিতা করেন রত্না ম্যাডাম, তিনি মনে করেন এতে ছাত্রের মানুষিক অসুবিধা হয়, তার লেখাপড়ার কোন উন্নতি হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর পর থেকে শিশুর মনে আত্মসম্মানবোধ গড়ে ওঠে, যা তাকে আত্মমর্যাদাশীল করে তোলে। এই বোধ কে সন্মান করা ও উদশাহিত করাই বিদ্যালয়ের কাজ।

রত্না ম্যাডাম খেয়াল করলেন, জয়ন্ত গাছের পাতা দিয়ে মজার নকশা বানাতে পারে। একদিন স্কুলের দেওয়ালে একটা ‘প্রকৃতি বোর্ড’ বানানোর কাজ দিলে, জয়ন্ত নিজের হাতে বানালো একখানা পাতার মানচিত্র।

পরদিন ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন, “এই সব কোথায় শিখেছিস?”

সে মাথা নিচু করে বলল,

“বাবার সঙ্গে মাঠে যাই। ফাঁকে গাছপালার খোঁজ নেই।”

এরপর স্কুলে চালু হল প্রকৃতি পাঠ, রত্না ম্যাডাম বললেন,

“শুধু বইয়ের শিক্ষা নয়, জীবন থেকেও শেখা যায়।”

জয়ন্তকে দিলেন প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাবের দায়িত্ব। ক্লাসের সবাই ওর নেতৃত্বে মাঠে গিয়ে গাছের ধরণ শিখতে লাগল। অঙ্কে সে এখনও দুর্বল, কিন্তু এখন সে স্কুলের ‘প্রাকৃতিক উৎসাহী’, একটা পরিচিতি পেয়ে গেছে।

রত্না ম্যাডাম বললেন, “সব ফুল একসাথে ফুটে না, কেউ আগে ফোটে, কেউ পরে। জয়ন্ত একটু দেরি করে ফুটেছে, তবু সে আপন রঙে।”

এখন, স্কুলে একজন নতুন ছেলেও অঙ্কে ফেল করলে, সবাই বলে, “চিন্তা করো না, জয়ন্ত ভাইও একসময় অঙ্কে ফেল করত—তবু সে এখন সবার প্রিয় ‘প্রকৃতি ভাই’!” “ফেল” মানে ব্যর্থতা নয়, বরং বিকাশের পথ খোঁজার সুযোগ।

ভালো ফল = সাফল্য নয়, শিশুর নিজস্ব গুণাবলি ও ভালোবাসা চিনে শিক্ষা পুনর্গঠন করা যায় এবং একজন সহানুভূতিশীল শিক্ষকই শুধু একজন ফেল করা ছাত্রকে, নিজেকে চিনতে সাহায্য করেন।

ধনুক-ভাঙা পণ – ৯৩

“বিজ্ঞানদূত”

খুলনার পাইকগাছার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মীম চতুর্থ শ্রেণির এক কৌতূহলী ছাত্রী ও তাহসিন স্যার বিজ্ঞানে মজার গল্প বলেন।

মীম সবসময় কিছু না কিছু নিয়ে ভাবতে ভালোবাসে। একদিন ক্লাসে তাহসিন স্যার বললেন,

“আজ আমরা এমন কিছু শিখব, যা আমরা কখনো চোখে দেখিনি, কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই আছে।”

সবাই চমকে উঠল। “কী স্যার?”

“পরমাণু ও অণু। পৃথিবীর প্রতিটা জিনিস এদের দিয়েই তৈরি!”

মীম চোখ বড় বড় করে বলল, “মানে আমি, আমার কলম, এমনকি বাতাসও?”

“হ্যাঁ, মীম! সবই। চল, আজ আমি তোমাদের নিয়ে যাই ‘অণুদের দেশে।’”

স্যার আজ এমন এক কল্পনার বীজ বুনে দিতে চান, যা শিশুদের মনে বিজ্ঞানকে রঙিন করে তুলবে।

বললেন, “পরমাণু হলো ক্ষুদ্র ইটের মতো যা সবকিছু তৈরি করে, আর অণু হলো বিভিন্ন কাঠামোর মতো যা ঐ ইট দিয়ে তৈরি করতে পারেন, যেখানে একাধিক পরমাণু সংযুক্ত থাকে। পরমাণু হলো একটি মৌলের ক্ষুদ্রতম একক, অন্যদিকে পরমাণুগুলো যখন একত্রিত হয় তখন অণু তৈরি হয়।“

স্যার বোর্ডে আঁকলেন এক চমৎকার ছবি। “এই যে, এটা একটা পানির অণু H_2O , মানে দুইটা হাইড্রোজে আর একটা অক্সিজেন পরমাণু মিলে বানায় পানি।”

স্যার, প্লাস্টিকের তৈরি আণবিক মডেল নিয়ে এসেছিলেন, তাই দেখালেন এবং সবার হাতে একটি করে দিলেন। ছাত্ররা আলাদা করলো ভাবলো এবং আবার পানির অণু বানালো। সেখানে অক্সিজেণের একটি পরমাণু দুই টি হাইড্রোজেন পরমাণুকে ধরে আছে। তারপর, তাহসিন স্যার দেখালেন বিশাল এক রঙিন ছক, Periodic Table, যেখানে পৃথিবীর সব মৌল যেন এক বিশাল পরিবার। ক্লাসের ছাত্ররা খেলতে খেলতে একটা স্বপ্নের জগৎতে চলে গেলো, তাহসিন স্যার ছাত্রদের চোখে তা দেখতে পেলেন।

মীম কল্পনায় হারিয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, যদি আমি অণুদের দেশে যেতে পারতাম!

সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর মীম হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। চোখ খুলতেই দেখে— সে এক অদ্ভুত জগতে! চারদিকে ছোট ছোট গোল রঙিন বলের মতো কিছু ঘুরছে। একটাকে সে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কে?”

“আমি হাইড্রোজেন! আমি খুব হালকা, আর আমি বন্ধু খুঁজছি।”

আরেকটা বল বলল,

“আমি অক্সিজেন। আমি একটু গম্ভীর, কিন্তু বন্ধু পেলে আমি খুবই কাজের!”

তারা তিনজন হাত মিলিয়ে গঠন করল পানির অণু - H_2O!

মীম হেসে উঠল,

“তোমরা তো মিলে মিশে একসাথে কাজ করো, ঠিক আমাদের মতো বন্ধুদের দল!”

হঠাৎ একটা বাতাসের ঝাপটা এল, আর মীম ফিরে এল ক্লাসে। চোখ মেলে দেখে তাহসিন স্যার বলছেন,

“মীম, আজ তুমি চুপচাপ কেন?”

মীম ধীরে ধীরে বলল,

“স্যার, আমি স্বপ্নে অণুদের সঙ্গে দেখা করেছি!”

সবাই হেসে উঠল। স্যার বললেন,

“তুমি আজ আমাদের ক্লাসের বিজ্ঞানদূত!”

তারপর স্কুলে একটা নতুন দেয়ালচিত্র আঁকা হলো “অণুর দেশ”, যেখানে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বনের ছোট ছোট চরিত্রে সাজানো গল্পের ছবি টাঙানো থাকত। স্কুলের সেই দেয়ালে আঁকা অণুগুলো যেন বলত ‘আমরা যত ছোটই হই, একসাথে হলে অনেক কিছু গড়া যায়।’ আর মীম প্রতিদিন বলত - আমি অণুদের দেশে গিয়েছিলাম, ওরা বন্ধুত্ব শেখায়। সবকিছুতেই আছে অণু, কিন্তু বন্ধুত্ব দিয়েই গড়ে ওঠে বড় কিছু! বিজ্ঞানের মূল কথাগুলো শিশুদের কল্পনার ভাষায় শেখানো গেলে, তারা শুধু মুখস্থ করে না - অনুভব করে।

“গণিত যখন গল্প হয়, ভয় তখন কৌতূহলে বদলে যায়।”

ময়মনসিংহের একটি গ্রাম, হালুয়াঘাট। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট। যেখানে আকাশটা একটু বেশি নীল, আর নদীর স্রোতের সাথে সাথে বয়ে চলে গ্রামের শিশুদের স্বপ্ন। ধানক্ষেতের সবুজের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে হালুয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যেখানে গণিত কখনো ভয়, কখনো বিস্ময়। আরিফ হালুয়াঘাট স্কুলের একজন ছাত্র।

এই স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য গণিত মানে জটিল হিসাব আর ভয়ের বিষয়। এই শ্রেণিতে এখন বীজগণিতীয়, ক্যালকুলেস ও ফাংশণের ধারণা দেয়া হচ্ছে, যা উচ্চতরো গনিতের ভিত্তি। আজ স্যার “লগারিদম” চেনাবেন।

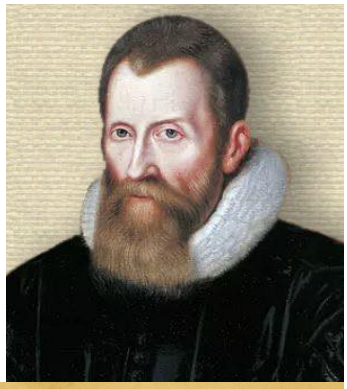

আরিফ গণিত ক্লাসে পিছনের বেঞ্চে বসত, শিক্ষক লগারিদম শব্দটি উচ্চারণ করতেই আরিফের মাথা ঘুরে গেল। সবার উদ্দীপনা বাড়াতে স্যার দেখালেন জন নেপিয়ারের ছবি, যিনি ৪০০ বছর আগে ‘লগারিদম’ নামক এক যাদুকরী হিসাব পদ্ধতির ধারণা দিয়েছিলেন, যাতে বড় গুণফলও ছোট কাগজে স্থান পায়।

স্যার একটা ভিন্ন ধরনের গ্রাফ কাগজ দেখালেন, যেটা লগারিদম গ্রাফ পেপার এবং লগারিদমের মতো জটিল বিষয়কে গ্রামের জীবনের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে আনন্দময় করে তুলতে চাইলেন। স্যার জানতেন, আরিফ গল্পে পারদর্শী। তার কণ্ঠে গল্প মানেই বাকিরা কান পেতে শোনে। তাই চাইলেন, এই বার ক্লাসে শেখাবে আরিফ, গল্পে গল্পে। এটা এক ধরনের শিক্ষন পদ্ধতি (ছাত্র-নির্ভর শিক্ষাদান (student-mediated learning), যা ২১শ শতকের শিক্ষার মূলমন্ত্র “শিখিয়ে শেখা” (learning by teaching)। এই পদ্ধতি ভালো কাজ ,কয়ের জানেন।

লগারিদমের গল্প: বললেন, “ধরো, হাসান চাচার দোকান একটি জাদুকরী দোকান। তিনি একটি ধানের দানা দিয়ে শুরু করলেন। পরের দিন তিনি ১০টি দানা পেলেন, তারপর ১০০টি, তারপর ১০০০টি। এই দ্রুত বৃদ্ধিকে বোঝার জন্য লগারিদম হলো আমাদের জাদুকরী চশমা। এটি আমাদের বলে, এই বৃদ্ধি কত দ্রুত হচ্ছে।” আরিফ মজা পেল। সে বলল, “তাহলে লগারিদম হলো গ্রামের বাজারের গল্প?”

স্যার বললেন, “যদি একটি সংখ্যাকে বার বার গুণ করো, তাহলে লগারিদম সেই সংখ্যাটিকে কতবার গুণ করা হয়েছে তা গণনা করে। যেমন, ১০ কে ৩ বার গুণ করলে ১০০০ হয়, তাহলে ১০০০ এর ভিত্তি ১০ এর লগারিদম হবে ৩, এভাবে লেখা হয়: log ১০(১০০০) = ৩ আবার, Log ২(৮) = ৩, কেমন করে হলো বলো?” তারপর লগারিদম এর সূত্র গুলো দেখালেন এবং ছাত্রদের প্রমান করতে বললেন।

দেওয়ালে লেখা হলো: “গণিত একটি গল্প, প্রতিটি সংখ্যা একটি রঙ।”

আরিফের জীবন বদলে গেল। সে এখন গণিত ক্লাসে আগ্রহ নিয়ে আসে। সে বলল, “আমি ভেবেছিলাম, গণিত আমার জন্য নয়। কিন্তু এখন বুঝি, লগারিদম আমার গল্পের জাদু।”

লগারিদমের মতো জটিল গণিতও গল্প, খেলা, আর গ্রামের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ছাত্রদের জন্য আনন্দময় হতে পারে। স্যারের গল্পভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে আরিফ তার নিজস্ব রঙ খুঁজে পেয়েছে। এই গল্প প্রমাণ করে, গণিত তখনই সত্যিকারের হয়, যখন তা শুধুই কষা নয়; কল্পনার রং, জীবনের ছন্দ, আর হৃদয়ের গল্পে মিশে যায়। আরিফের চোখে এখন সংখ্যা মানেই রঙিন বীজ, আর লগারিদম, এক যাদুকরী পথ।

“গণিত ছাড়া তুমি কিছুই করতে পারবে না। তোমার চারপাশের সবকিছুই গণিত। তোমার চারপাশের সবকিছুই সংখ্যা।”- শকুন্তলা দেবী

“সংখ্যা তখনই কথা বলে, যখন কল্পনা বৈঠা ধরে।”

অবস্থান: পাবনার চরাঞ্চলের একটি উচ্চ বিদ্যালয়, সায়েদ স্যার (গণিত শিক্ষক), নিশান (পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র)।

পাবনার নদীঘেরা এক স্কুল, যেখানে প্রতিদিন বইয়ের ব্যাগ বয়ে আসে ছাত্ররা, আর সায়েদ স্যারের ক্লাসে এসে যেন এক নতুন জগত খোলে তাদের সামনে। তিনি বলেন, “গণিত শুধু কাগজে থাকে না, তা নদীর স্রোতে, মাঝির বৈঠায়, কিংবা তোমার কল্পনার ডাঙাতেও! গণিতকে একটি ভাষা, শিল্পের একটি রূপ এবং মহাবিশ্ব বোঝার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।”

একদিন তিনি ক্লাসে এসে বললেন, “আজ আমরা সমস্যার উত্তর খুঁজব না, বরং সমস্যা নিয়ে ভাবব। ধরো, একটা নৌকা আছে, যা প্রতি ঘণ্টায় ৫ কিমি চলে। যদি নদীর স্রোত ২ কিমি হয়, উজানে গেলে কী হবে?”

নিশান একটু চিন্তা করে বলল, “স্যার, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...”

সায়েদ স্যার হেসে বললেন, “আমিও চাই না তুমি এখনই বুঝে ফেলো। বরং চোখ বন্ধ করো– ভাবো তুমি এক মাঝি। বৈঠা হাতে, পদ্মার ঢেউয়ের বিপরীতে চলছো।”

নিশান চোখ বন্ধ করল। তার সামনে বিশাল জলরাশি, ঢেউয়ের গর্জন, আর সে নিজেই বৈঠা চালাচ্ছে। সে ভাবে– উজানে যেতে হলে তার গতি কমে যাবে নিশ্চয়!

- “স্যার, তাহলে তো নৌকার গতি কমবে... ৫ - ২ = ৩ কিমি/ঘণ্টা?”

সায়েদ স্যার বললেন, “তোমার মনে হয় কেন কমবে?”

নিশান জবাব দিল,

- “কারণ স্রোত আমাকে ঠেকাচ্ছে! আমি তো শুধু সামনে এগোচ্ছি না, স্রোতের সঙ্গে লড়ছিও!”

সায়েদ স্যারের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। বললেন, “দেখো, তুমি অঙ্কের উত্তর বের করোনি শুধু, তুমি অনুভব করেছো। তুমি বুঝেছো, গণিত অনুভবের মধ্য দিয়েও শেখা যায়। এই অনুভবই গণিতের প্রাণ।”

সারাটি ক্লাস স্তব্ধ হয়ে শুনছে। এমন কল্পনায় তারা আগে কখনও গণিত শেখেনি।

সায়েদ স্যার বোঝান, “গণিত মানে শুধু যোগ-বিয়োগ নয়, মানে বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ভাবা এবং বলা। যদি কোনো সমস্যাকে তুমি নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারো, তাহলে তার সমাধানও তোমার হাতের নাগালে আসে। আর মাতৃভাষা, সেটা হলো তোমার অনুভবের আয়না। যে আয়নায় তুমি সংখ্যাকে চেনো, অঙ্ককে ভালোবাসো।”

তিনি আরও বলেন, “তোমাদের কল্পনা আর যুক্তির পথ খুলে দিতেই আমি এসেছি।”

সেদিন নিশান শুধু একটা সমস্যার উত্তর শিখেনি। সে শিখেছে,

- গণিত একটা ভাষা,
- যেখানে প্রতিটি সংখ্যা একটা গল্প বলে,
- আর প্রতিটি সমস্যা একটা নতুন যাত্রা।

সায়েদ স্যার সৃজনশীল গণিত শিক্ষার মূলভিত্তিকে তুলে ধরেন, যেখানে শিক্ষক সমস্যার সমাধান না দিয়ে ভাবনার সূচনা করেন, এবং শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে গণিতকে সংযুক্ত করে শেখান। এতে ভাষা, কল্পনা, এবং আত্ম-সম্পৃক্ততা একসাথে মিশে যায়, আর গণিত হয়ে ওঠে একটি বোধগম্য ও আনন্দময় বিষয়।

“ভাষা কঠিন হয় না— কঠিন হয় ভালোবাসাহীন শেখানো।”

রাজবাড়ীর একটি ছোট্ট গ্রামীণ উচ্চবিদ্যালয়, আনাম ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র আর ফারিহা ম্যাডাম বাংলার শিক্ষকা।

আনাম কখনো বাংলা ভালোবাসতো না। “অর্থ করো”, “বিশ্লেষণ করো”, “শব্দার্থ লেখো”, এসব তার কাছে ছিল একঘেয়ে আদেশ। ক্লাসে সে চুপচাপ বসে থাকতো, চোখ জানালার বাইরে, মন স্কুলের বাইরে।

কিন্তু একদিন বদলি হয়ে এলেন একজন নতুন শিক্ষক ফারিহা ম্যাডাম।

প্রথম দিনেই নতুন শিক্ষকরা সাধারণত উপলব্ধিমূলক ক্লাস নেন, ছাত্রদের মানসিক স্তর ও বিষয়ভিত্তিক অবস্থান বোঝার জন্য। ফারিহা ম্যাডামও তাই করলেন। তিনিও দিয়েছিলেন “আমার একদিন” এই শিরোনামে, কিছু লিখতে। তিনি বুঝেছিলেন ক্লাস ৬ এর আত্মসচেতনতা এখনো হয়নি।

পরের সপ্তাহে তিনি ক্লাসে ঢুকে বললেন, “আজ আমরা গল্প পড়বো না, গল্প বানাবো!”

সবাই অবাক।

তিনি চক তুলে বোর্ডে লিখলেন, “তোমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে আর কেন সে প্রিয়?”

আনাম মাথা নিচু করে রইলো। সে মনে মনে খুঁজছে, কে তার “প্রিয়”, ও এখনও এমন করে ভাবতে শেখেনি। কিন্তু হঠাৎ, ফারিহা ম্যাডামের হাসিমাখা মুখটা মনে পড়ে গেল। যেদিন সে খাতা জমা দিতে ভুলে গিয়েছিল, স্যাররা রেগে গেলেও ম্যাডাম বলেছিলেন, “ভুল হতেই পারে। তুমি চলো, একসাথে বানিয়ে ফেলি তোমার লেখা।”

সেদিন, যখন আনামের পেন্সিলটা পড়ে গিয়েছিল দূরে, সে লজ্জায় চেয়ে ছিল, কেউ দেখছে কিনা। ফারিহা ম্যাডাম চুপিচুপি গিয়ে পেন্সিলটা তুলে হেসে তার হাতে দিয়েছিলেন। এমন ছোট ছোট মুহূর্তে আনাম একটা নতুন অনুভূতি পেতে লাগলো, পড়া মানে রাগ নয়, ভয় নয়, পড়া মানে ভালোবাসা। তার বাংলা বইয়ের পাতা যেন মিষ্টি হয়ে উঠলো। শব্দেরা আর কাঁটা নয়, যেন ফুলের মতো।

একদিন সে ক্লাসে দাঁড়িয়ে বলল, “আমি আগে বাংলা ভয় পেতাম। কিন্তু এখন বাংলা আমার প্রিয়, কারণ এতে ফারিহা ম্যাডামের স্পর্শ থাকে।”

সবাই হাসলো। ফারিহা ম্যাডাম হেসে চোখ নামিয়ে নিলেন। কিন্তু তার চোখে জল ছিল, আনন্দের, স্বীকৃতির, শিক্ষার মানবিক স্পর্শের।

প্রতিটি বিষয়ের পেছনে একজন মানুষ থাকে, আর সেই মানুষ যদি ভালোবাসা দিয়ে শেখান, তাহলে জটিল বিষয়ও প্রিয় হয়ে যায়। বাংলা এখানে কেবল ভাষা নয়, ফারিহা ম্যাডামের বন্ধুত্ব, সহানুভূতি ও হাসির একটি ভাষ্য।

একজন শিক্ষক আশা জাগাতে পারেন, কল্পনাশক্তি জাগিয়ে তুলতে পারেন এবং শেখার প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে পারেন। ছোট মন গঠনের জন্য শিক্ষকের একটি বিশাল হৃদয়ের প্রয়োজন হয়।

“বিজ্ঞান যখন শরীরের গল্প বলে, ভয় তখন কৌতূহলে বদলে যায়।”

সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলার চরাঞ্চলের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সামিউল স্যার, বিজ্ঞানের শিক্ষক।

চরাঞ্চলের ওই স্কুলে বইপত্রের বাইরে বিজ্ঞান শেখা মানেই ছিল বিস্ময় আর ভয়, বিশেষ করে “ডিএনএ” আর “আরএনএর” মতো শব্দগুলো। একদিন সামিউল স্যার অষ্টম ক্লাসে এসে বললেন, “আজ একটা গল্প বলি, একেবারে তোমাদের শরীরের ভেতরের গল্প।”

সবার চোখে বিস্ময়। স্যার বোর্ডে একটা ছবি আঁকলেন – দেখতে জ্যামিতির মতো, ঘুরপ্যাঁচানো সিঁড়ি। “ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে ডিএনএ, DNA) হল সেই অণু যা জীবের বিকাশ এবং কার্যকারিতার জন্য জিনগত তথ্য বহন করে। তোমার শরীরের সব তথ্যের লাইব্রেরি। আর এই লাইব্রেরির একেকটা পাতা থেকে বার্তা বয়ে নিয়ে যায় আরএনএ (রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে আরএনএ, RNA)) – যারা তোমার শরীরকে বলে, কিভাবে কী তৈরি করতে হবে।”

তারপর শুরু হলো গল্প। “একটা স্কুল ভাবো, যেখানে হেড টিচার হচ্ছেন ডিএনএ। তিনি সব প্ল্যান জানেন, কে কখন পড়াবে, কী পড়াবে, কোথায় যাবে। আর আছে একজন দৌড়বাজ ছাত্র, যার নাম আরএনএ। সে সবার কাছে হেড টিচারের বার্তা পৌঁছে দেয়, যেন ঠিকমতো ক্লাস হয়, ঠিকমতো প্রজেক্ট চলে। এই দুইজন না থাকলে স্কুল অচল!”

ছাত্ররা তখন হাঁ করে শুনছে। সামিউল স্যার বললেন, “তোমরা যেভাবে প্রতিদিন ক্লাস করো, কেউ গান শেখে, কেউ ফুটবল, কেউ অঙ্কে পটু, সবকিছুই তোমার ডিএনএ-র লেখা। আর সেই লেখা কাজে লাগায় আরএনএ।”

তিনি সবাইকে একটি অনুশীলনী দিলেন: প্রত্যেকে নিজের একটি ছোট “জীবনের ম্যাপ” বানাবে, যেখানে লিখবে নিজের শক্তি, আগ্রহ, স্বপ্ন, আর সেখানে বোঝাবে, ডিএনএ-আরএনএ কিভাবে তাদের শরীরকে সেই অনুযায়ী কাজ করাতে সাহায্য করে।

মাহফুজ নামের একজন ছাত্র বললো,

- “স্যার, তাহলে আমার যে কবিতা লেখার ঝোঁক, সেটাও কি আমার ডিএনএ-তে লেখা ছিল?”

- “হ্যাঁ মাহফুজ! ঠিক সেটাই, তোমার ডিএনএ তোমার ভেতরের ম্যাপ, আর তুমি তার একমাত্র পাঠক!”

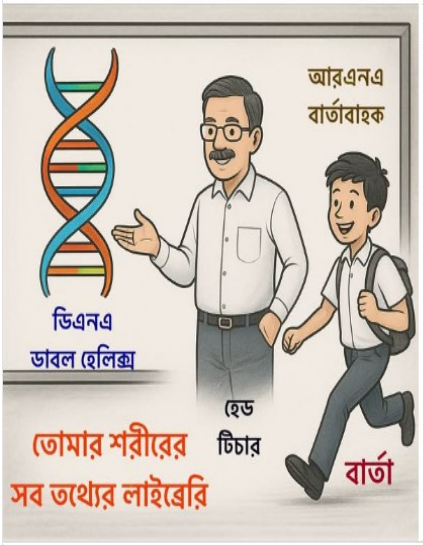

শেষের দিকে সামিউল স্যার বললেন, “জীবন শুধু বাইরের পড়া না, জীবনের ভেতরের ভাষা বোঝাটাও বিজ্ঞান। আজকের বিজ্ঞান তোমাদের বলছে, ‘তোমরা সবাই আলাদা, কারণ তোমাদের ডিএনএ-ই আলাদা।’ আর এটাই তোমাদের শক্তি।”

প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীই একটি ভিন্ন ম্যাপ, একটি বিশেষ সংকেত। বিদ্যালয়ের কাজ হলো সেই ম্যাপ বুঝে তাতে আলো ফেলানো।

ডিএনএ ও আরএনএ শেখানোর গল্পে বিজ্ঞান হয়ে উঠলো জীবনের গল্প, আর স্কুল হয়ে উঠলো জীবনের পাঠশালা।

বিজ্ঞানের শিক্ষক সামিউল স্যার এক মজার কাজ করলেন। স্কুলের বিজ্ঞান তহবিল থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে তিনি ক্লাসের ২৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ গেঞ্জি বানালেন। প্রতিটি গেঞ্জিতে মজার কার্টুন ভঙ্গিতে আঁকা ছিল DNA ও RNA-এর ছবি— যেন ছাত্ররা নিজের শরীরের অদৃশ্য বিজ্ঞানকে গায়ে পরে ঘুরে বেড়ায়।

স্যার বলতেন, “বিজ্ঞান বইয়ের বিষয় না, ওটা অনুভবের জিনিস। যখন সেটা মনের গায়ে লাগে, তখনই শেখা শুরু হয়।”

তাঁর বিশ্বাস, একবার যদি আগ্রহের আগুনটা জ্বলে ওঠে, তাহলে সেটাই হবে শিক্ষার সত্যিকারের শুরু। সেই গেঞ্জিগুলো শুধু পোশাক নয়, বরং হয়ে উঠল বিজ্ঞানচর্চার প্রতীক - আর সামিউল স্যারের কল্পনা স্কুলে বিজ্ঞানকে করে তুলল বেঁচে থাকা জীবনেরই অংশ।

“চিত্র স্মৃতি, মুখস্থ বিদ্যার চেয়ে গভীর।”

রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাসিব নবম শ্রেণির ছাত্র এবং রাফিদ স্যার বিজ্ঞান ও ভূগোলের শিক্ষক।

হাসিবের চোখে সবসময় ঘুমঘুম ভাব। ক্লাসের বাঁধাধরা বিষয়, এক বাংলা বিষয়ে তিনটি বই (বাংলা সাহিত্য, বাংলা সহপাঠ, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ) বাংলা বিষয়ের তিনটি বইয়ের চাপ, তার ওপর অন্য বিষয়ের বই – এসব দেখে হাসিব যেন হাঁপিয়ে ওঠে। ওর একটাই কাজ বসে বসে কেবল খাতায় আঁকিবুঁকি কাটে। পরীক্ষার খাতা দেখে শিক্ষকরা বলেন,

- “ওর থেকে কিছু হবে না।”
- “খালি ছবি আঁকে, কিন্তু লেখে না।”

নবম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য রাফিদ স্যার একটা ভিন্নধর্মী প্রকল্প দিলেন - ভূগোল ও পরিবেশ বই এর চিত্র ১১.৪ : বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ (পৃষ্ঠা ১৭১) কে আরও অর্থবহ করে, “বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যবহারের ভবিষ্যৎ” এই বিশ্লেষণ মূলক একটা চিত্র ও ব্যাখ্যা দিতে বললেন। কাজটাতে তথ্য সংগ্রহ, বিবেচনা করতে হবে এবং দলবেঁধে গবেষণাপত্র লিখতে হবে, ছবি আঁকতে হবে, পোস্টার বানাতে হবে।

সবার চোখ বড়, “এই কাজ আমরা পারবো?”

কিন্তু যখন জানা গেল ছবির কাজ থাকবে, তখনই হাসিবের মনে উঁকি দিল এক প্রশ্ন “এই বইয়ের ছবি গুলো এত শুকনো কেন? কোথাও তো প্রাণ নেই, না আছে রঙ, না আছে অনুভব।” সে ভাবলো, এভাবে কি কখনো কোনো ছাত্রের মনে ‘চিত্র স্মৃতি’ গাঁথা যায়? অথচ সে জানে, একটি ভালো ছবি শুধু দেখায় না, বোঝায়; একটি ছবি কথা বলে, আর এক হাজার শব্দের চেয়েও গভীর দাগ কাটে। উপস্থাপনার নকশা, রেখা, রঙ সবকিছুতেই হাসিব খুঁজে ফেরে অর্থ আর ছন্দের মেলবন্ধন।

উপস্থাপনার দিন হাসিবের দল নিয়ে এল একটা বিশাল পোস্টার, যেখানে আঁকা,

- সুন্দরবনের নিচে গ্যাস ফিল্ড
- পাহাড়ি অঞ্চলের কয়লা স্তর
- সমুদ্রতীরবর্তী তেলক্ষেত্রের সম্ভাবনা
- দ্বীপাঞ্চলের সম্ভাব্য সোলার হাব
- ঢাকায় বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদনের কল্পচিত্র।

হাসিব সব নিজে হাতে এঁকে বানিয়েছে এক বিশাল রঙিন মানচিত্র! যেখানে বাংলাদেশ যেন জীবন্ত এক সম্ভাবনা, চিত্রকরের দরদ ও একাগ্রতা ছবিতে ফুটে উঠেছে।

রাফিদ স্যার তাকিয়ে অবাক। বললেন, “এই তো! এই ছবিতে কল্পনা আছে, বিশ্লেষণ আছে, চিন্তা আছে, আর এটাই বিজ্ঞান!” “তোমাদের মধ্যে অনেকের প্রতিভা আছে, যা আগ্নেয়গিরির মতো, মাটির নিচে ঘুমিয়ে আছে। সঠিক উত্তাপ, সঠিক পরিস্থিতি পেলে সে জেগে উঠবে।”

পরদিন ক্লাসে হাসিবকে দিয়ে দেওয়া হলো “স্কুল সৃজনশীল ম্যানেজমেন্ট টিম”-এর পোস্টার ডিজাইনের দায়িত্ব।

এবং প্রথমবার হাসিবের খাতা দেখে শিক্ষকরা বললেন, “ভালো কাজ। আগ্নেয়গিরির মত ছিলে, এখন জেগে উঠেছো।”

কিশোর বয়স এমন এক অদৃশ্য আগ্নেয়গিরির মতো, যার ভেতর চাপা থাকে অজস্র অনুভব, সৃষ্টির আগুন, আত্মপ্রকাশের আকুতি। তারা চায় কেউ যেন বলে ‘তুই পারিস’। কিন্তু অনেক সময় সমাজ বা বিদ্যালয় সেই আগ্নেয় প্রশান্তিকে দেখে, ভিতরের লাবা দেখে না। কিশোরের বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক মৌলিক স্বতন্ত্রতা জন্ম নেয়, যা কেবল নম্বর বা শৃঙ্খলায় ধরা পড়ে না, দরকার হয় সহানুভূতি, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাহস দিয়ে পাশে দাঁড়ানো এক শিক্ষকের।

“স্বপ্নের বাক্স খুললেই আলো জ্বলে।”

স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের দরকার উদ্দীপনা, কল্পনা, আর আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সুযোগ। এই বয়সে অনুপ্রেরণা খুব শক্তিশালী, একটি গল্প, একটি প্রশ্ন, বা একজন শিক্ষক - চলমান জীবনের অভিমুখ বদলে দিতে পারে। তারা স্বপ্ন দেখে, তারা প্রশ্ন তোলে, তারা আবিষ্কারের রোমাঞ্চ খোঁজে। তাই এই স্তরে আমাদের পাঠ্যক্রম হতে হবে আগ্রহ-নির্মাণের, স্বপ্ন-সঞ্চারণের।

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসে শিক্ষার্থীরা হয়ে ওঠে প্রাপ্তবয়স্ক। তাদের কাছে শুধু ‘কী শিখছি’ নয়, বরং ‘এই শিখন দিয়ে কী নির্মাণ করছি’ এই বোধটাই হওয়া উচিত মূল কেন্দ্রবিন্দু। আর তাই, গবেষণামূলক চিন্তা, বাস্তব সমস্যার সমাধান, এবং উদ্যোগ নেবার মানসিকতা তৈরিই হওয়া উচিত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিটি বিষয়ে বিজ্ঞান, ব্যবসা, কিংবা সাহিত্যে - স্নাতক পর্যায়ের শেষ বর্ষে অন্তত দুটি সেমিস্টারজুড়ে বাস্তবমুখী, বাধ্যতামূলক “উদ্ভাবন ও উদ্যোগ” (Startup and Entrepreneurship) কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারণ আগামী পৃথিবীতে শুধুমাত্র সার্টিফিকেটধারী নয়, প্রয়োজন ভাবনার উদ্যোক্তা, যারা জ্ঞানকে বাজারে রূপ দিতে জানে, যাদের চিন্তা চাকরি খোঁজে না, বরং চাকরি সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষে প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন অন্তত একবার ভাবে “আমার জ্ঞান দিয়ে আমি কী সৃষ্টি করতে পারি?” এটাই আমাদের শিক্ষার দায়িত্ব।

খুলনার একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, রোকসানা, ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। আমিরুল স্যার, “উদ্ভাবন ও উদ্যোগ” কোর্সের অতিথি শিক্ষক। রোকসানা সাহিত্যের ছাত্রী। ইংরেজি সাহিত্য ভালোবাসেন, কিন্তু লেখাপড়ার বাইরে ভবিষ্যৎ নিয়ে তার দুশ্চিন্তা “শুধু সাহিত্য করে আর কবিতা পড়ে কি জীবন চলে?”

চতুর্থ বর্ষে হঠাৎ শুরু হলো একটি নতুন কোর্স “উদ্ভাবন ও উদ্যোগ”। সবাই ভাবলো এটা তো ব্যবসায়ীদের জন্য, সাহিত্য পড়িয়ে কী হবে? কিন্তু প্রথম ক্লাসেই আমিরুল স্যার বোঝালেন - “উদ্যোক্তা মানে শুধু পণ্য বেচা নয়, আপনার চিন্তা বিকাশ ঘটিয়ে সমাজে প্রভাব ফেলা। সাহিত্য দিয়েও তা সম্ভব।”

রোকসানা প্রথমে সংশয়ী ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এক ধারণা মাথায় এলো, সে গ্রামের শিশুদের জন্য ‘Story Box’ বানাবে। প্রতিটি বাক্সে থাকবে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা কল্পনার গল্প, সঙ্গে ছবি আঁকার উপকরণ, আর QR কোড, যেখানে অডিও গল্প শুনতে পারবে।

তার প্রজেক্টের নাম: “স্বপ্নের বাক্স”।

কোর্স শেষে, সে একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করলো। একটি স্থানীয় NGO সেটি গ্রহণ করলো। এরপর তার নিজের একটা ছোট্ট স্টার্টআপ দাঁড়ালো– “Literacy & Light”।

রোকসানার সাহিত্যের স্বপ্ন এখন শুধু পৃষ্ঠায় নয়, শিশুদের হাতে হাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শেখা এখন সমাজে ফিরে আসছে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১০২

“গভীর মাটির নিচে চাপা পড়া রত্ন“

নাটোর জেলার বড়াইগ্রামের একটি মাটিরঘেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তানিম চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র, আলিম স্যার সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক। তানিম চুপচাপ, মিশুক নয়, প্রশ্ন করে না, বোর্ডে ডাকা হলে গলা কাঁপে। তার খাতা প্রায় ফাঁকা থাকে, পরীক্ষায় নম্বর কম। সহপাঠীরা বলে, “তানিম কিছুই পারে না!”

কিন্তু আলিম স্যার অন্য চোখে দেখতেন। গ্রামের ছেলে হয়েও তিনি ঢাকায় মাস্টার্স করেছেন ভূগোলে। তিনি জানতেন, যেমন মাটির নিচে থাকে কয়লা, খনিজ, এমনকি হীরাও - তেমনি অনেক শিশুর প্রতিভা থাকে চাপা, অজানা, অপ্রকাশিত।

একদিন তিনি সবাইকে মাঠে নিয়ে গেলেন। বললেন, “আজ আমরা স্কুলের চারপাশে মাটি দেখবো। কার কোথায় কী লুকিয়ে আছে!”

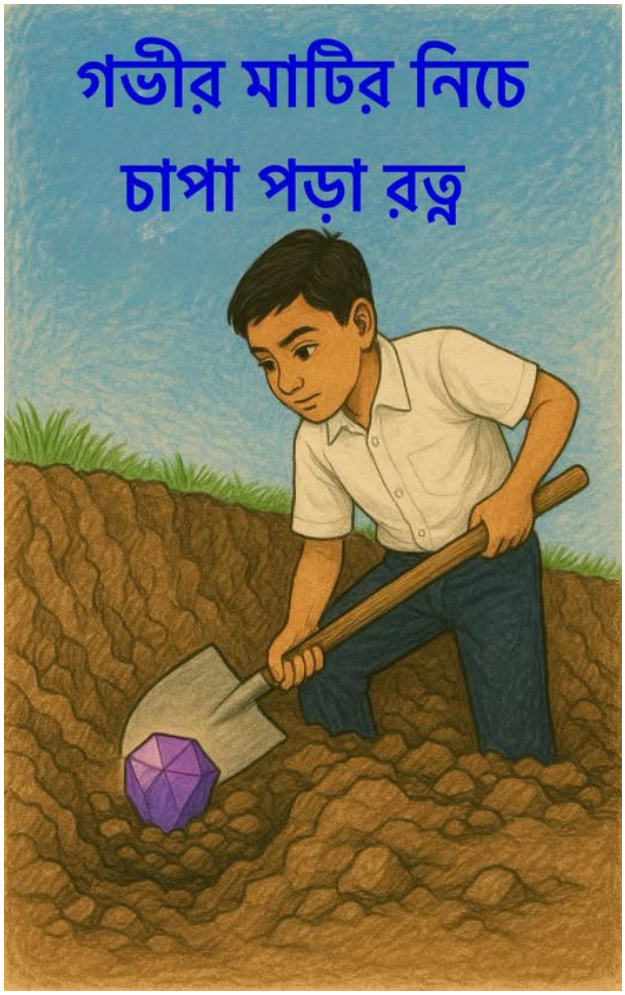

সবাই মাটি খুঁড়তে শুরু করলো। কেউ পোকা পেল, কেউ পাথর। তানিম কাদা মাটি ঘাঁটছিলো চুপচাপ, হঠাৎ তার চোখ জ্বলে উঠলো, সে বললো, “স্যার, এইটা কেমন জানি। একটু চকচকে!”

আলিম স্যার কাছে এসে দেখলেন, তানিম পেয়েছে মাটির নিচে একটা কালছে মেটে পাথর, যার গায়ে লোহার রঙের ছোপ। তিনি বললেন, “তানিম, তুমি তো পেয়ে গেস ‘ল্যাটেরাইট’, যার ভেতরে লোহা থাকে! এটা লোহা আকরিক, খনিজ পদার্থ যা থেকে মৌলিক ধাতু বের করা যায়।”

আলিম স্যার ক্লাসে যখন ল্যাটেরাইট এর গঠনের প্রক্রিয়া বলছিলেন তখন তানিম এক স্বপ্নের জগৎতে চলে গেলো। স্যার বললেন, “আমাদের এখানে অনেক বৃষ্টি তখন ল্যাটেরাইট গঠিত হয়।” কেমন করে জানো, “বৃষ্টির পানিতে অন্যান্য খনিজগুলি ধুয়ে যায়, অপেক্ষাকৃত কম দ্রবণীয় লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম অবশিষ্ট থাকে, যা ল্যাটেরাইট তৈরি করে।”

সেই বিকেলেই তানিম আবার ফিরে গেলো স্কুলের পাশের সেই জায়গায়, মনে তার, তা হলে কি এখানে লোহার খনি আছে, সে কি লোহার খনি বের করেছে! নিজের মধ্যে একটা আত্মীবিশ্বাস - সে যেন নতুন হয়ে উঠলো।

একদিন সাহস করে তানিম চুপচাপ বলেছিল, “স্যার, আমার আবিষ্কার কি সত্যি কিছু?”

আলিম স্যার মৃদু হেসে বললেন, “তুমি যে খুঁজতে পেরেছ, সেটাই তো সবচেয়ে বড় আবিষ্কার।”

পরের দিন আলিম স্যার বোর্ডে লিখলেন: “প্রতিভা প্রাকৃতিক সম্পদের মতো - সবসময় চোখে পড়ে না, খুঁজে বের করতে হয়।”

এরপর তিনি স্কুলে চালু করলেন এক নতুন কর্নার “লুকানো রত্ন”।

যেখানে সবাই প্রতিদিন নিজের একটা ‘আবিষ্কার’ বা ‘দক্ষতা’ নিয়ে কথা বলবে।

তানিম এখন প্রতিদিন খোঁজে কোথাও কি মাটির নিচে অন্য কিছু আছে? আর ক্লাসে, শিক্ষকরা এখন প্রশ্ন করেন, “তানিম, আজ কী শিখলে?” সে উত্তর দেয়, আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

প্রতিটি শিশু নিজেই এক অজানা খনি, তার ভেতর লুকানো থাকে সম্ভাবনার সোনালি স্তর। বইয়ের পাতায় নয়, ভালোবাসা আর অনুসন্ধানে সেই রত্নের খোঁজ মেলে। শিক্ষকই সেই ভূতত্ত্ববিদ, যিনি খুঁজে বের করেন মাটির নিচের রত্ন।

ধনুক-ভাঙা পণ - ১০১

“লুকিয়ে থাকা প্রতিভা ঠিক ফিরে আসে।”

যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার এক ছোট্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাওছার চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র।

কাওছার ছিল একটু অন্যরকম। খেলাধুলা বা পড়া নয়, তার মন পড়ে থাকতো কোনো কিছু কাটাকুটির কাজে। হাত দিয়ে কিছু করতে, অনেকটা এমন, “যে ব্যক্তি তার হাত দিয়ে কাজ করে সে একজন শ্রমিক; যে ব্যক্তি তার হাত এবং মস্তিষ্ক দিয়ে কাজ করে সে একজন কারিগর; কিন্তু যে ব্যক্তি তার হাত, মস্তিষ্ক এবং হৃদয় দিয়ে কাজ করে সে একজন শিল্পী।”কাওছার যেন নিজের অজান্তেই সেই পথ ধরেছিল, হাত দিয়ে কাজ, মস্তিষ্ক দিয়ে পরিকল্পনা, আর হৃদয় দিয়ে সৃষ্টি। আর এটাই তো একজন শিল্পীর পরিচয়।

একদিন স্কুলে হেড স্যার বললেন, “আগামী সপ্তাহে তোমরা যা পারো বানিয়ে নিয়ে আসবে— আমাদের ছোট্ট ‘শিল্প প্রদর্শনী’ হবে।”

সবাই কাগজে ছবি আঁকবে, কেউ কেউ মাটির ঘর বানাবে। কাওছার ভাবলো, সে খোদাই করে কিছু করবে, একটা মমের কথা ভাবলো কিন্তু মম তো সবসময় লম্বা ও চিকন হয়! সাবানে করলে কেমন হয়, ওর মার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে একটা সাদা সাবান নিলো। সেটি নিয়েই সে দিনরাত পরিশ্রম করে সাবানে একখানা খরগোশ খোদাই করে ফেললো একটা চাকু দিয়ে। খরগোশটার ছিল লম্বা কান, খুঁটিনাটি পায়ের রেখা, এমনকি চোখের ঘিরেও ছিল ছোট্ট দাগ, একেবারে জীবন্ত! কাওছার যখন ওটা ওর মাকে দেখালো, ওনি অবাক হয়ে কাওছার কে কাছে জড়িয়ে ধরে উদসাহ দিলেন।

হেড স্যার সেটা দেখে মুগ্ধ। বললেন, “এত সুন্দর সাবানের খরগোশ! আমি এটা অফিস রুমের প্রদর্শনী কর্নারে রেখে দিচ্ছি।”

কাওছারের মনে হলো, তার হাতের কাজ বুঝি এবার জায়গা পেলো।

কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর একদিন সে দেখলো, স্কুলের আয়া আপা খরগোশটি দিয়ে থালা ধুচ্ছে। সাবানের খরগোশ আর নেই, শুধু ফেনা আর গন্ধ! ১০-১১ বছরের কাওছার সেদিন বুঝেছিলো তার বানানো খরগোশটার অবয়ব আয়া আপা বুঝতেই পারেনি, তাই কি, নাকি সাবানের এতো প্রয়োজন ছিলো যে খরগোশটাকেই ব্যবহার করতে হয়েছে?

সে কিছুই বললো না। চোখের কোনায় পানির ধারা, কিন্তু কেউ বুঝলো না, সেই দিনই এক শিশুশিল্পীর হৃদয়ে জন্ম নিলো এক শূন্যতা।

বছরের পর বছর কেটে গেছে। কাওছার একদিন শহরের এক কনফারেন্সে সে গেল ‘ক্যারিয়ার মেলা’তে। সেখানে এক বুথে সে দেখলো ফল দিয়ে তৈরি অপূর্ব সব নকশা, তরমুজের পদ্মফুল, পেয়ারা দিয়ে পাখি, পেঁপেতে ভাস্কর্য।

সে হঠাৎ যেন পুরোনো সেই সাবানের খরগোশটাকে মনে পড়লো। কিছু একটা তার ভেতরে নড়েচড়ে উঠলো। সে শুরু করলো ফল কাটাকুটির কাজ। প্রথমে বাড়িতে, পরে বন্ধুদের জন্য। এখন সে সুযোগ পেলেই fruit carving করে, শেখায়, বিয়ে-অনুষ্ঠান পেলে খুশি হয়ে যায়, এমনকি পত্রিকায়ও তার কাজ ছাপা হয়।

একবার সে ছুটি নিয়ে নিজ স্কুলে গেলো। স্কুলে গিয়ে দেখে হেড স্যার বদলি হয়ে গেছেন, কিন্তু পুরোনো প্রদর্শনী কর্নার এখনো আছে। তবে এখন সেখানে লেখা, “শিল্প মানে কেবল ছবি না, কখনো সাবানে খরগোশ, কখনো ফলের ভাস্কর্য। শিশুদের হাতে যা উঠে আসে, সেটাই আমাদের ভবিষ্যৎ শিল্প।” কাওছার দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ।

আমরা অনেক সময় শিশুদের শিল্প ও আবেগকে গুরুত্ব না দিয়ে নিছক বস্তু হিসেবে দেখি। একটুকরো সাবান কাওছারের কাছে ছিল শিল্প, অনুভূতি, আর ভবিষ্যতের প্রতীক। একটিবার অবহেলা তার সেই পথকে থামিয়ে দিলেও, মনের ভিতরে একাগ্র ও নিজস্ব শিল্পের জেদ তাকে আবার ফিরিয়ে এনেছে। স্কুল যেন এমন জায়গা হয় যেখানে প্রতিটি ছোট্ট সৃষ্টি নিরাপদে বড় হতে পারে।

আসল প্রতিভা কখনো হারিয়ে যায় না। সময় হলে, সুযোগ পেলে, ঠিক ফিরে আসে— নতুন রূপে, নতুন শক্তিতে। সাবানের খরগোশ হারিয়ে গেলেও, তার শিল্পের আত্মা ফলের ভেতর আবার বেঁচে উঠেছে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১০৪

“বহুবুদ্ধিমত্তা: প্রতিভার রূপ এক নয়”

(Howard Gardner's Theory of Multiple Intelligences (MI))

নাটোরের লালপুর উপজেলার একটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তাহমিনা ম্যাডাম এর ছাত্রী ফারিহা সপ্তম শ্রেণী তে পড়ে। ফারিহা ক্লাসে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না। বোর্ডে ডাকা হলে কান্না পায়, বন্ধুদের সঙ্গে খুব একটা মিশে না। তার নিজস্ব একটা জগৎ আছে, কল্পনার ও সাহসের।

শিক্ষকরা বলেন - “অস্বাভাবিক মেয়ে। না লেখে, না বলে। হয়তো ওর পড়াশোনা চলবে না।”

তাহমিনা ম্যাডাম, বাংলা শিক্ষক, একদিন হোমওয়ার্ক দিলেন - “তোমরা তোমাদের দেখা একটা ঘটনা লিখে আনো, নাটকের মতো।”

পরদিন, সবাই ছোটখাটো কিছু লিখল। কিন্তু ফারিহা জমা দিল একটা চারপাতার পাণ্ডুলিপি - “মালার স্বপ্ন” গ্রামের এক কিশোরী কিভাবে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সেই কাহিনি।

তাহমিনা ম্যাডাম মুগ্ধ হয়ে বললেন, “তুমি তো একদম নাট্যকার!”

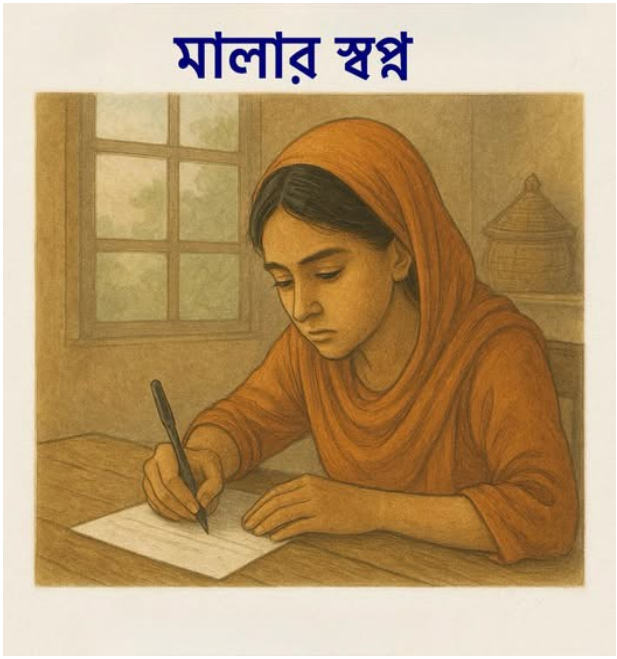

ম্যাডাম জানেন, বর্তমান বাস্তবতায় ধারণাগুলো তুলে ধরার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হল গল্প-নাটক লেখা। তিনি এটাও জানেন, নিজের ভেতরে অকথিত গল্প বহন করার চেয়ে বড় যন্ত্রণা আর কিছু নেই। আর সেই জন্যই ফারিহা চুপ চাপ থাকে, ওর ভিতরে না বলা কথা জমে আছে।

ফারিহার নাটক দারুণ এক দাহসী কিশোরীর গল্প “মালার স্বপ্ন”, সংক্ষেপে - (মালার বয়স মাত্র চৌদ্দ, স্কুলের খাতা ভর্তি করে স্বপ্ন আঁকা তার নেশা। তার মামা আর বাবা তার বিয়ের কথা তুলছে, মা চুপচাপ, যেন কিছু বলতেও ভয় পান। মালা মাথায় ঘুরছে আফরোজা ম্যাডামের বলা কথাগুলো - “নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবো। নিজের পক্ষে কথা বলাটা ভুল না।” কাঁপা হাতে একটা চিঠি লিখল,

প্রাপক: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

বিষয়: “আমার অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে”

চিঠির শেষে শুধু এক লাইন: “আমি পড়তে চাই, আমি বড় হতে চাই।” সুন্দর একটা সংযধায় বিয়ে বন্ধ হলো।)

একটা সাহসী কিশোরীর জয়ের ও স্বপ্নের নাটক, যার প্রিতিটি কথায় সাহস আর প্রত্যয়।

পরের সপ্তাহে ক্লাসে শুরু হল “নাট্যপাঠ ও অভিনয় কর্মশালা”। স্কুল মাঠে মঞ্চ বানানো হলো, শিক্ষার্থীরা নিজেরাই গল্প লেখে, সংলাপ বানায়, অভিনয় করে।

তাহমিনা ম্যাডাম জানেন, “গল্প-নাটকে থাকে লুকিয়ে থাকা সত্য, যা আমরা কে তার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। সমাজকে ফিরে দেখায় আমাদের মধ্যে সংশোধনের পথ তৈরী হয়।”

ম্যাডাম বিশ্বাস করেন, “প্রত্যেকেই তাদের নিজের মনের মধ্যে নিজেদের সম্পর্কে একটি গল্প বলে। সর্বদা। সর্বদা। সেই গল্পটি একজন কে নিজের মতো করে তোলে। আমরা সেই গল্প থেকেই নিজেদের তৈরি করি।”

স্কুলের “নাট্যপাঠ ও অভিনয় কর্মশালা” য় ফারিহা সবার পিছনে বসে চুপচাপ নির্দেশনা দেয় - কে কোথায় দাঁড়াবে, কার কণ্ঠ কেমন হবে, সংলাপ কেমন করে বলা উচিত। মনের অজান্তেই ও বুঝে গেছে একটা বড় দায়িত্ব, যা হলো, “গল্প-নাটক বলা পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি আমাদের কর্তব্য।”

তবে ক্লাসের সবাই যখন মঞ্চে ওঠে, অভিনয় করে, চরিত্রের ভেতরে ঢুকে পড়ে, ফারিহা তখন এক কোণায় চুপ করে বসে থাকে। তাহমিনা ম্যাডাম একদিন বললেন, “তুমি সামনে কেন আসো না?”

ফারিহা মাথা নিচু করে বলল, “এতো আমি আছি, সব দেখি।”

কিন্তু ম্যাডাম বুঝতে পারেন, এই না-আসা শুধু লজ্জা নয়, বরং ভয়ের চেয়ে গভীর কিছু।

ভয় - নিজেকে প্রকাশ করার, ভুল হওয়ার, আবার ব্যর্থ হওয়ার।

ভয় - নিজের গল্প যদি কেউ না বোঝে!

আরো ভয় - গভীরের সেই অজস্র কথাগুলো যদি বের হয়ে এসে তাকে আর তার কল্পনার জগতকে একা ফেলে দেয়!

ফারিহা জানে, সে নাট্যকার, গল্পকার - নাটকের পেছনের আত্মা। তার ভাষা শব্দে নয়, নীরব নির্দেশনায়। তার উপস্থিতি আলোয় নয়, ছায়ায়। প্রতিভা মানেই চিৎকার করে নিজের জায়গা করে নেওয়া নয় - নীরব প্রতিভাও থাকে। সব শিশু একইভাবে শেখে না, প্রকাশ করে না, কিন্তু তাদের সবার ভিতরে কিছু না কিছু জ্বলছে। শিক্ষক যদি সেই বৈচিত্র্য বুঝতে পারেন, তবেই সকলের ভিতরের আলো জ্বলে ওঠে।

“বিজ্ঞান মানে সত্য, সাহিত্য মানে সৌন্দর্য।”

কুষ্টিয়ার একটি নদীবেষ্টিত উচ্চ বিদ্যালয়, রিশাত দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আর আফরিন ম্যাডাম বাংলা ও সৃজনশীল বিষয় শিক্ষক। রিশাত বিজ্ঞানের ছাত্র। পদার্থবিজ্ঞান তার প্রিয় বিষয়, বিশেষ করে নিকোলা টেসলা, আইনস্টাইন আর তরঙ্গতত্ত্ব নিয়ে সে রীতিমতো মুগ্ধ। একদিন সে তার ডায়েরিতে লিখে রাখে, “If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” - Nikola Tesla.

রিশাতের কাছে তরঙ্গ মানের বৈচিত্র সময়ের সাথে। কেননা, কম্পনের হার তরঙ্গ গঠন করে, যেমন শব্দ তরঙ্গে, তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রে, অথবা রেডিও তরঙ্গ এবং আলোতে, যা সময়ের সাথে পরিমাপ করা হয়। সে ভাবে, তরঙ্গ- কেবল শব্দ বা আলো নয়, আমাদের অনুভব, আবেগ এমনকি চিন্তাও বুঝি তরঙ্গ! তরঙ্গের সমীকরণ এর মধ্যে সে ছন্দ খুঁজে পায়। দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বই এর শপ্তম অধ্যায় “তরঙ্গ ও শব্দ” ওর সবচাইতে প্রিয়। তার আগ্রহ এতো যে, বিখ্যাত বই, HC Verma's "Concepts of Physics" এর Chapter 15: Wave Motion and Waves on a String আর Chapter 16: Sound Waves from Volume 1 তার মুখস্থ।

রিশাতের চিন্তা আরও গভীর হচ্ছে। সে এখন ভাবছে, মানুষের মনের চিন্তাও কি একধরনের তরঙ্গ? সময়, স্পন্দন, কল্পনা - সবই কি এক সূত্রে বাঁধা? সে ভাবে মানুষের মনের চিন্তার ক্ষেত্র নিয়ে, এমন কঠিন ও উন্মুক্ত ভাবে, The dimensionless domain is equal to “the domain of our mind!” Thus the spacetime domain is the frequency domain is just frequency, i.e. “the domain of pure mind”.

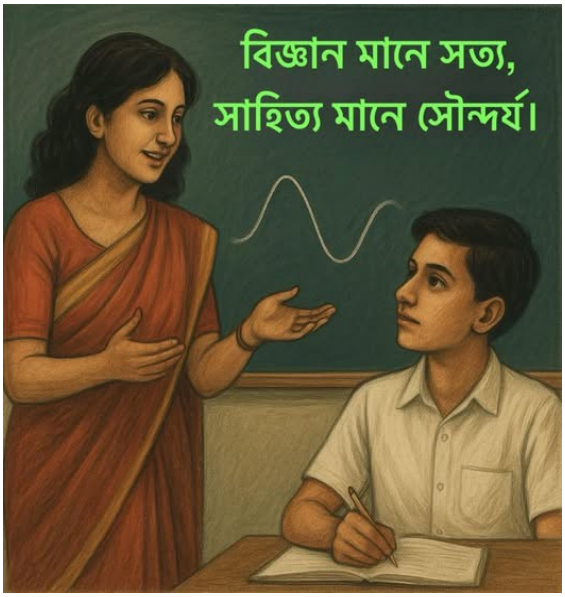

কিন্তু বাংলা ক্লাসে তার মন বসে না। সে ভাবে, কবিতা, গান, সাহিত্য - এসব তো “আবেগের খেলা”, বাস্তব কিছু নয়। আবেগ আর বিজ্ঞান দুটি দুই মেরুতে অবস্থান।

একদিন আফরিন ম্যাডাম ক্লাসে একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে এলেন:

“বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে। সব গগন উদ্বেলিয়া- মগন করি অতীত অনাগত আলোকে-উজ্জ্বল জীবনে-চঞ্চল একি আনন্দ-তরঙ্গ ॥ তাই, দুলিছে দিনকর চন্দ্র তারা, চমকি কম্পিছে চেতনাধারা, আকুল চঞ্চল নাচে সংসার, কুহরে হৃদয়বিহঙ্গ ॥”

তিনি বোর্ডে লিখলেন: “একটি গান কীভাবে বিজ্ঞানের মতো স্পন্দিত হতে পারে?”

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, “তরঙ্গ শুধু শব্দ বা আলো নয়, তা আমাদের মনেও হয়?”

এখানে “প্রকৃতির বিশালতা এবং শক্তির প্রকাশ করা হয়েছে।”

রিশাতের চিন্তার চোখ যেন খুলে গেলো। প্রথমে একটু চুপ করে রইল। তারপর আস্তে বলল, “টেসলা বলেছিলেন, সবকিছুকে বুঝতে হলে frequency, energy আর vibration-এর চোখে দেখতে হবে। তাহলে, কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ কি তার গানে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন!”

আফরিন ম্যাডাম হাসলেন, তার সাহিত্য চিন্তায় ব্যাখ্যা দিলেন, বললেন, “দেখো, রিশাত। রবীন্দ্রনাথ বলছেন - ‘আনন্দ-তরঙ্গ’। এই আনন্দ, এই দুলুনি, একধরনের অনুভবের স্পন্দন। সাহিত্য শুধু ভাষা নয়, একরকম তরঙ্গের ভাষা।”

ম্যাডাম আরও বলেন, “তুমি যখন গানে ‘চঞ্চল আনন্দ-তরঙ্গ’ পড়ো, সেটাও কিন্তু কম্পনের মতোই - মনোজগতের এক নিখুঁত ছন্দ।”

রিশাত তারপর পড়ে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, নজরুল - তাদের কবিতার শব্দে, দুলুনিতে, বিরতিতে একেকটি অনুভবের frequency খুঁজে। ক্লাসের শেষে রিশাত বোর্ডে লেখে “একদিন আমি বুঝেছিলাম বিজ্ঞান মানে সত্য, সাহিত্য মানে সৌন্দর্য। আজ বুঝলাম, তরঙ্গ - সত্য ও সৌন্দর্যকে এক সুরে বাঁধে।”

বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের শিক্ষক এক জন হন না, কিন্তু একজন ছাত্র বিজ্ঞান ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করে। স্কুলের সকল বিষয় ছাত্রদের জ্ঞানীয় পরিচর্চার জন্য প্রযোজ্য, তাই বিভিন্ন বিষয়ের ভিতর সাদৃশ্যতা থাকা দরকার।

বিজ্ঞান হল প্রকৃতি ও মহাবিশ্বকে জানার একটি নির্ভরযোগ্য পথ - যেখানে ইন্দ্রিয়, যুক্তি ও পরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা সত্যকে খুঁজি। আর সাহিত্য হল সেই সত্যকে অনুভবের রঙে দেখার চোখ, অনুভবের ভাষায় বলার শিল্প। একটিতে জ্ঞান, অন্যটিতে সৌন্দর্য; কিন্তু উভয়েই মানুষকে বিস্ময়ে ও কল্পনায় ভরিয়ে তোলে।

আফরিন ম্যাডাম রিশাতকে বুঝিয়েছিলেন - বিজ্ঞান ও সাহিত্য দুইটিই আসলে সৃষ্টিশীলতার দুই দিক। একটিতে প্রশ্ন জাগে, অন্যটিতে উত্তরের নান্দনিক রূপ।

একজন দশম শ্রেণির ছাত্র যখন নিজের উপলব্ধি তৈরি করে, তখন শিক্ষকের ভূমিকা হয়ে ওঠে বিষয়-সমন্বয়কারী ও উপলব্ধির পথপ্রদর্শক। বিষয়ভিত্তিক দেয়াল ভেঙে, ছাত্র নিজেই যখন সত্য ও সৌন্দর্যের মধ্যে সেতু গড়ে তোলে - সেইখানেই শুরু হয় তার নিজস্ব শিক্ষা-যাত্রা।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১০৬

“আলো দৌড়ায়, শব্দ হাঁটে”

সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়ার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিয়াম - পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র, রুবিনা ম্যাডাম - বিজ্ঞানের শিক্ষক।

আকাশের দিকে তাকানোই যেন সিয়ামের নেশা। রোদের ছায়া, মেঘের ভেলা, আর মাঝে মাঝে আকাশচিরা বজ্রপাত—সবকিছুর মধ্যে সে খুঁজে ফেরে কোনো অদেখা রহস্য। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র সিয়াম চুপচাপ হলেও তার চোখে হাজারটা প্রশ্ন।

- “কেন প্লেন আকাশে এতো জোরে যায়?”
- “কেন বজ্রপাত হলে আলো আগে দেখি, কিন্তু শব্দ পরে শুনি?”

একদিন ক্লাসে রুবিনা ম্যাডাম বললেন,

- “আজ আমরা কথা বলবো গতি ও ত্বরণ নিয়ে।”

সবাই হা করে তাকিয়ে রইলো।

রুবিনা ম্যাডাম বোর্ডে একটা রেখা আঁকলেন।

- “গতি মানে হলো তুমি কতদূর, কত সময়ের মধ্যে যেতে পারো। আর ত্বরণ মানে হচ্ছে গতি যদি ধীরে ধীরে বাড়ে। যেমন, শুরুতে তুমি হেঁটে যাচ্ছ, তারপর দৌড়, তারপর দৌড়ের চেয়েও জোরে - এই বাড়তি গতিই ত্বরণ।”

তিনি সিয়াম কে ডাকলেন, “প্রথমে ধীরে হাঁটো... এখন একটু জোরে... এখন দৌড়... হ্যাঁ! এটাকেই বলে ত্বরণ!”

সবাই হেসে উঠলো।

তারপর ম্যাডাম বললেন, “এখন বলি, কেন বজ্রপাত হলে আলো আগে দেখা যায়, শব্দ পরে শোনা যায়। কারণ, আলো চলে অনেক দ্রুত - প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার (২৯৯,৭৯২,৪৫৮মিটার)। আর শব্দ ধীরে চলে– প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩৩০ মিটার।

মানে হলো, ‘আলো দৌড়ায়, শব্দ হাঁটে’।”

একটা নিঃশব্দ বিস্ময় ছড়িয়ে পড়লো ক্লাসে।

রুবিনা ম্যাডাম বললেন, “তোমরা কি জানো? যদি বজ্রপাতের আলো দেখার পর ‘এক শত এক’, ‘এক শত দুই’ বলে গুনো, তাহলে প্রতি সংখ্যাই প্রায় এক সেকেন্ড। তারপর শব্দ শুনলে বুঝবে মেঘ কতদূরে। প্রতি ৩ সেকেন্ড মানেই বজ্রপাত তোমার কাছ থেকে এক কিলোমিটার দূরে।”

সিয়াম উঠে দাঁড়িয়ে বললো, “ম্যাডাম! আমি তো এবার থেকে বজ্রপাত দেখলে নিজেই হিসাব করবো মেঘ কত দূরে!”

রুবিনা ম্যাডাম হাসলেন। বললেন, “তুমি কি জানো, সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড!”

- “আচ্ছা ম্যাডাম, চাঁদ থেকে?”
- “চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো আসে মাত্র ১.৩ সেকেন্ডে। তাহলে সূর্য ও চাঁদ আমাদের থেকে কতো দূর হবে?”

সেদিন ক্লাস যেন ছোট্ট এক অবাকের রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। কেউ কেউ খাতা খুলে দূরত্ব হিসাব লিখছে, কেউ কেউ জানালার বাইরে তাকিয়ে ভাবছে - আলো দৌড়ায়, শব্দ হাঁটে...

রুবিনা ম্যাডাম বললেন, “একজন বড় বিজ্ঞানী বলেছিলেন, ‘যদি তুমি কোনো বিষয়কে সহজ করে বলতে না পারো, তবে তুমি সেটা ঠিকমতো বুঝতে পারোনি।’ তাই আমি চাই, আজ তোমরা বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে বোঝাও - গতি মানে কী, ত্বরণ মানে কী।”

সিয়াম বলল, “আমি আমার ছোট ভাইকে আজই বোঝাবো! সে শুনলে বলবে - ভাইয়া তো একেবারে বিজ্ঞানী!”

সেইদিন থেকেই সবাই সিয়ামকে ডাকতো - ‘ছোট্ট বিজ্ঞানী’। কারণ সে বুঝেছিল, বিজ্ঞান মানে শুধু বড় বড় নাম নয় - সত্যিকারের বিজ্ঞান হলো সহজ করে বোঝা।

একজন বিজ্ঞানের শিক্ষক শুধু বইয়ের পাতায় থেমে থাকেন না, তিনি শিশুদের চোখে আকাশের ঝলকানি, কানে বজ্রপাতের গর্জন, আর মনে জন্ম নেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে দিতে ভালোবাসেন।

বিজ্ঞান শেখানো মানে শুধু তথ্য জানানো নয়, বরং

- কল্পনাকে ডানা দেওয়া,
- জটিল বিষয়কে সরল ভাষায় বলা,
- আর প্রতিটি শিশুর ভেতরে “ছোট্ট বিজ্ঞানী”কে জাগিয়ে তোলা।

রুবিনা ম্যাডামের মতো শিক্ষকরা জানেন, সবচেয়ে বড় পাঠ হলো কৌতূহল জাগানো। কারণ যে শিশু প্রশ্ন করতে শেখে, একদিন সে-ই হয় আবিষ্কারক।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১০৫

“ছোট্ট দোকান, বড় শিক্ষা”

(একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু উদ্যোক্তা চেতনার গল্প)

রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার একটি ছোট্ট গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রোহান (পঞ্চম শ্রেণি), মিলি (চতুর্থ শ্রেণি), রেজাউল স্যার (সহকারী শিক্ষক)। স্কুলের পাশের ঘরটায় এখন আর কেউ ঢোকে না। জানালার কাঁচ ভাঙা, বেঞ্চগুলো মাকড়সার জালে ঢাকা। অথচ রেজাউল স্যারের চোখে সেটা ছিল সম্ভাবনার ঘর—শুধু একটু সাহস আর কল্পনা চাই। স্যার একদিন বললেন, “এই ঘরটাকে আমরা যদি কাজে লাগাই? ধরো, তোমরাই একটা ছোট্ট দোকান চালাও?”

সবাই হেসে ফেলল।

রোহান বলল, “স্যার, আমরা দোকানদার হবো?”

স্যার হাসলেন, “হ্যাঁ, কিন্তু টাকার জন্য নয়, শিখবার জন্য!”

রেজাউল স্যার বিশ্বাস করেন, শিক্ষা শুধু চাকুরি পাওয়ার পথ নয় - বরং নিজের চিন্তা দিয়ে পথ বানানোর সাহস শেখানো। তিনি জানেন, চাকুরির মানসিকতা আর উদ্যোক্তার মানসিকতা আলাদা - একটা নিশ্চয়তার দিকে, আরেকটা সম্ভাবনার দিকে হাঁটে।

কিশোর-কিশোরী ছাত্রদের ব্যবসার চেনানো মানে কর্ম জীবনের জন্য বিকল্প কিছু দেখানো, স্কুল যা দেখাতে অপারগ। একই সঙ্গে ছোট ছাত্রদের উদ্যোক্তা সম্পর্কে মজা, শেখা এবং সম্ভাবনা দেখানো যা তাদের নিজস্ব পথ তৈরি করতে উৎসাহিত করবে। অবশ্যই "ব্যবসা, একটি খেলা যা বাচ্চারা খেলতে পারে," কেননা, বাচ্চাদের ভালো করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল তাদের খুশি রাখা।

পরদিন থেকেই শুরু হলো “শিখি ও শেখাই দোকান”। নামটা দিলো মিলি।

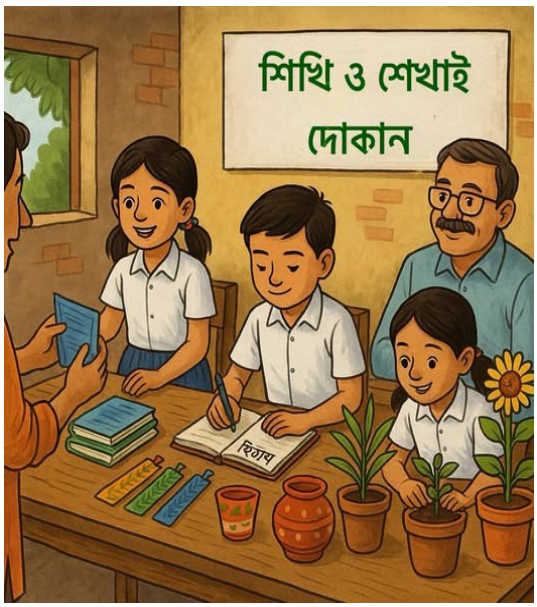

প্রথমেই সবাই মিলে ঠিক করল, কী বিক্রি করবে:

- পুরনো গল্পের বই (যারা পড়েছে তারা বিনামূল্যে দান করল)
- কচি হাতে বানানো কিছু হস্তশিল্প
- অঙ্কের খাতা নিজে বানিয়ে
- মাটির কলসি আঁকা
- বীজ ও গাছের চারা (প্রাণবিজ্ঞানের ক্লাসের অংশ)।

স্কুলের শেষে ৩০ মিনিট, সপ্তাহে ৩ দিন দোকান চলবে।

দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হলো, রোহান হিসাব রাখবে, মিলি বই বুঝিয়ে দেবে, অনন্ত গাছ নিয়ে ব্যস্ত, লিজা আঁকার জিনিস বানায়।

তিন সপ্তাহের মাথায় দোকানে বেশ ভিড়, অনেক অভিভাবকও এলেন। একদিন ইউএনও স্যার এলেন হঠাৎ!

তিনি দোকান দেখে চমকে গেলেন।

- “তোমরা এই বয়সেই বাজেট, রসিদ, লাভ-ক্ষতি বুঝো?”

রোহান মুচকি হেসে বলল,

- “স্যার, আমরা পড়াশোনা ও বুঝি। ”

একদিন এক মজার ঘটনা ঘটল।

মিলি ও রোহান ঝগড়া করল এই নিয়ে যে, কে কাস্টমারকে বেশি হাসিয়ে কথা বলতে পারে!

রেজাউল স্যার তখন বললেন, “তোমাদের মধ্যে এক একজন তো ব্যবসায়ী না, বরং সেবক! শুধু টাকা নয়, হাসিও একটা বিনিয়োগ।”

এই স্কুলে দোকান শুধু পণ্য বিক্রি করে না, শেখায় - সৃজনশীলতা, সহমর্মিতা আর দায়িত্ববোধের পাঠ।

উদ্যোক্তা হওয়া মানে বড়লোক হওয়া নয়, বরং নিজের মনের ভাবনা দিয়ে জগতকে একটু সুন্দর করে তোলা। যেমন, একদিন ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নেয়, স্কুলের সামনে থাকা পুকুরে ভাসমান সবজির বাগান বানাবে, সেই সবজি বিক্রি হবে দোকানে।

স্কুলে বাচ্চাদের জন্য উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ একটি আশাব্যঞ্জক এবং সময়োপযোগী উন্নয়ন।

উদ্যোক্তা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলভাবে চিন্তা করতে, সমস্যা সমাধান করতে এবং উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করে - যা একবিংশ শতাব্দীর অপরিহার্য দক্ষতা। শিশুরা পাঠ্যপুস্তক ছাড়িয়ে ব্যবহারিক, হাতে-কলমে শিক্ষা পায়, একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিকতার পরিবর্তন, যা উদ্দেশ্য-চালিত শিক্ষাকে উৎসাহিত করে।

এই গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়—একটা ছোট্ট দোকান থেকেই শুরু হতে পারে বড় কোনো পরিবর্তনের গল্প, যদি শিক্ষক হন অনুপ্রেরণার বাতিঘর আর শিশুরা হয় কল্পনার নাবিক।

“প্রতিযোগিতা নয়, অনুপ্রেরণা হোক চালিকা শক্তি”

পাবনার আতাইকুলা ইউনিয়নের একটি ছোট্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রেণিশিক্ষক সালেহা ম্যাডাম এবং সহকারী শিক্ষক রায়হান স্যার।
প্রতিযোগিতা শিশুদের মধ্যে “নিজেকে ছোট ভাবা”, “হিংসা”, “দুশ্চিন্তা”, এমনকি চেষ্টা বাদ দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। পিছিয়ে পড়া বা কম আত্মবিশ্বাসী শিশুরা চিরতরে নিজেকে “অযোগ্য” ভাবতে শেখে।
(উদাহরণ: “সে ৯৮ পেয়েছে, তুমি কেন ৭৫?” - এই তুলনা শিশুকে শেখায়, ভালো হওয়া মানে অন্যকে হারানো।)
শিক্ষকের উৎসাহ সাধারণত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়, প্রতিটি শিশুকে তার অবস্থান থেকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। ভয় নয়, ভালোবাসার ভিত তৈরী হয়, ছাত্ররা শিখে, ভুল করলে কিছু যায় না, চেষ্টা করাই বড় কথা। একজন শিক্ষকের একটি ছোট্ট ইতিবাচক মন্তব্য ছাত্র মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে যা একটি জীবন বদলে দিতে পারে।
গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুরা এমন কথাগুলো জীবনভর মনে রাখে:
- “তোমার চোখে আমি একজন বড় মানুষ দেখি”
- “তুমি চেষ্টা করেছো, সেটাই সবচেয়ে বড় কথা”
- “তুমি যেভাবে অন্যকে সাহায্য করো, সেটা অসাধারণ”
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বিষয়ের গভীরে ডুবে পড়তে হয় না - পাঠ্যবিষয় খুবই মৌলিক। কিন্তু তাদের কাজ সবচেয়ে গভীর - একটি শিশুর ভরসা, সাহস, এবং নিজেকে ভালোবাসার বীজ বোনা। তাই ‘শিক্ষক’ শব্দটি এখানে মানে শুধু পাঠদাতা নয়, বরং আশ্রয়, আলোর দিশা। বিষয়বস্তু যতই সহজ হোক, দায়িত্বটা সবচেয়ে প্রগাঢ়।
সালেহা ম্যাডাম ক্লাসে ঢোকার আগেই প্রতিদিন কয়েকটি জিনিস সঙ্গে আনতেন – কিছু ছোট্ট স্টিকার, কিছু রঙিন কালি আর স্ট্যাম্প, যার গায়ে লেখা –
“অসাধারণ!”
“তুমি চেষ্টা করেছো, এটাই সেরা!”
“তুমি পারো!”

আর একটি ছোট্ট খাতা – যেটিকে তিনি যার নাম দিয়েছেন, “মনে রাখার খাতা”।
এই খাতাটিতেই তিনি রোজ লেখেন: “আজ লাবিবা প্রথমবারের মতো শব্দগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করেছে - আমি তার আত্মবিশ্বাস দেখে অভিভূত!” “রায়েদ আজও কিছু লেখেনি, কিন্তু ক্লাসে চুপ করে মনোযোগ দিয়েছে - এটাই তো শুরু। কাল তাকে বলবো ‘তোমাকে দেখেই বুঝি, চেষ্টা চলেছে।’”
সপ্তাহে একদিন এই খাতার থেকে বেছে তিনি ছাত্রদের নিজের খাতার পাতায় একটুখানি চিরকুট লিখে রাখেন: “প্রিয় ফাহিম, তুমি আমার চোখে একজন ছোট্ট বৈজ্ঞানিক। তোমার ‘কেন’ প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কখনো থেমো না।” “জান্নাত, তুমি হয়তো ধীরগতি, কিন্তু তোমার লেখার মধ্যে গভীরতা আছে - একদিন তুমি গল্পকার হবে।” “রুবেল, আজ তুমি কাউকে না ঠেলে বেঞ্চে বসেছো, এটাই তো বড় মানুষ হওয়ার পথে প্রথম ধাপ।”
রায়হান স্যার প্রথম দিকে একটু অবাক হয়ে সালেহা ম্যাডামকে বলেছিলেন, “এইসব লিখে কি কাজ হবে? ওরা তো পড়ে বুঝেই না।”
সালেহা ম্যাডাম হেসে বলেছিলেন, “বুঝবে না এখন। কিন্তু একদিন যখন জীবন কঠিন হবে, তখন এই একটি বাক্য ওদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে।”
বছরের শেষে সালেহা ম্যাডাম প্রতিটি ছাত্রকে একটি করে ছোট্ট চিঠি দেন, হাতে লেখা। যেমন: “সাবিনা, তুমি কখনো কারো মতো হতে চেয়ো না। তুমি নিজেই যথেষ্ট। তোমার ভিতর আছে এমন আলো, যা সবাই দেখে না, কিন্তু আমি দেখেছি।” “রিফাত, তুমি যদি কখনো হতাশ হও, এই চিঠিটা পড়ে নিও—তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত।”
এই চিঠিগুলো অনেক ছাত্র পরে মোড়ানো পেন্সিল বাক্সে, ডায়েরির পাতায়, এমনকি ঘুমানোর বালিশের নিচে রেখে দেয়।
একটি ছাত্র যখন কলেজে উঠে, একদিন ফিরেও আসে স্কুলে। সে সালেহা ম্যাডামকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, “ম্যাডাম, সবাই যখন বলতো আমি কিছু হবো না, আপনি লিখেছিলেন ‘তুমি আলো, কেবল সঠিক জায়গায় পৌঁছাও।’ আমি তাই এখনো চলছি, আপনার লেখার আলো নিয়ে।”
স্কুল শেষে চা খেতে খেতে রায়হান স্যার বললেন, “শুধু নম্বর দিলে কি হয়, সালেহা আপা। এই ভালোবাসার ভাষা শিখিয়ে দিয়েছেন আপনিই।”
সালেহা ম্যাডাম হেসে বললেন, “আসল শিক্ষা তো ভালো লাগার শিক্ষা। একটা ছোট্ট স্ট্যাম্প দিয়েই তো বদলে দেওয়া যায় একটা মন।”
“তা ঠিক। আমরা যদি না দেখি, কে দেখবে ওদের ছোট ছোট চেষ্টার আলো!”
শ্রেষ্ঠ শিক্ষক সে-ই, যে প্রতিযোগিতার নাম করে কাউকে পিছিয়ে ফেলে না, বরং উৎসাহ দিয়ে প্রত্যেককে এগিয়ে নিয়ে যায় - যার চোখে সবচেয়ে চুপচাপ ছেলেটাও একদিন আলো হয়ে উঠতে পারে।

“জীবনের একমাত্র ধ্রুবক হলো পরিবর্তন”

ঠাকুরগাঁও জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা, নিশাত চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী এবং রুবাইয়া ম্যাডাম তাদের শিক্ষক।

নিশাত সবসময় ছিলো শহরের মেয়ে। বাবার সরকারি চাকরির বদলিতে নিয়ে এলো গ্রামে। নতুন স্কুল, নতুন বন্ধুরা, পুরনো কোনো মুখ নেই। ওর চোখে ভেসে ওঠে শহরের মাঠ, পুরনো স্কুলের গেট, প্রিয় বান্ধবী শর্মিলার হাসিমুখ।

প্রথম দিন গ্রামের স্কুলে এসে তার মনে হয়, “আমি এখানে মানিয়ে নিতে পারবো না!”

বাথরুমে পানি নেই, বেঞ্চ ভাঙা, দেয়ালে পলেস্তার খসে পড়া। ক্লাসে স্যারের কণ্ঠেও শহরের চেনা ঝংকার নেই।

কিন্তু রুবাইয়া ম্যাডাম, নতুন ক্লাস টিচার, লক্ষ্য করেন নিশাতের অস্বস্তি। তিনি একদিন ক্লাসে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, “পরিবর্তন কাকে ভয় পায়?”

সবাই চুপ।

রুবাইয়া ম্যাডাম হেসে বলেন, “পরিবর্তন ভয় পায় সেই মানুষকে, যে সাহস করে বলে - আমি চেষ্টা করবো!”

তিনি নিশাতকে পাশে বসালেন। বললেন, “তুমি পারবে, যদি তুমি নিজের মনে গেঁথে রাখো, নতুন জিনিস মানেই নতুন সম্ভাবনা।”

নিশাত চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। ওর চোখে কেবল চিন্তা আর দ্বিধা, “নতুন বন্ধু কাকে করবো? কী বললে হাসবে, আর কী বললে পাত্তা দেবে না?”

নতুন জায়গায় আসা মানেই যেন এক অদৃশ্য দেয়ালের ভেতরে আটকে যাওয়া। ক্লাসে কারও সঙ্গে চোখ মেলাতে সাহস হয় না তার।

সবাই জানে, “নতুন ছাত্র মানেই যেন বাইরের কেউ, যার জায়গা এখনো তৈরি হয়নি।”

রুবাইয়া ম্যাডাম সেটাই বুঝলেন, নিশাতের শুধু সঙ্গ নয়, দরকার একটা গল্প, যেটা সে অনুভব করতে পারে।

ম্যাডাম একদিন ক্লাসে ছোট্ট একটি মাটির টব আনলেন। তার মধ্যে একটি ছোট বীজ পুঁতে বললেন,

- “এইটা কী হতে চায়?”
- “গাছ!” সবাই চিৎকার করে বলল।
- “ঠিক তাই,” ম্যাডাম হাসলেন। “কিন্তু ভাবো তো, যদি এই বীজ বলত, ‘আমি তো মাটি ভয় পাই, আমার আলো ভালো লাগে না, তাহলে কি গাছ হতে পারত?”

সবাই মাথা নাড়ল।

তিনি বোর্ডে লিখলেন, “যে বীজ মাটি ভয় পায়, সে কখনো গাছ হতে পারে না।”

তারপর নিশাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, “নিশাত এই স্কুলে এসে নতুন মাটিতে নিজের শিকড় ছড়িয়েছে। এখন সে গাছ হতে পারবে।”

নিশাত চুপ করে বসে থাকলেও তার চোখে তখন ছিল আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি।

পরদিন, নিশাত নিজের ছোট্ট শহরে জ্ঞান নিয়ে বন্ধদের দেখালো - কিভাবে কাগজের পাখা বানাতে হয়। সবাই হাততালি দিল।

তৃতীয় দিন সে ক্লাসে প্রথম হাত তুলল।

সপ্তাহ শেষে, সে মাঠে খেলায় নামল, গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে দৌড় লাগাল। এক মাস পরে, নিশাত বন্ধুদের বলল, “আমার শহর যেমন ছিল, এই গ্রামটাও তেমন - শুধু একটু আলাদা আর একটু ফাঁকা ফাঁকা ও সবুজ।”

এক বন্ধুর উত্তর, “তুমি আমাদের মাঝে আসাতে বদলটা সুন্দর হলো!”

শিক্ষকের ভূমিকা কেবল পাঠদান নয়, বরং শিশুদের জীবনের গল্পে আলোর রেখা হয়ে ওঠা। শিশুরা যখন নতুন পরিবেশে পড়ে - নতুন স্কুল, নতুন বন্ধুর দল, অপরিচিত নিয়ম - তখন তারা নিজের চারপাশকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না। দ্বিধা, সংকোচ আর ভয় তাদের ভেতরে জমে ওঠে।

এই সময় শিক্ষকই হতে পারেন সেই মানুষ, যিনি কোমলভাবে শিশুকে বুঝিয়ে দেন -

“পরিবর্তন মানেই ভয় নয়, বরং নতুন শিখরে ওঠার সিঁড়ি। জীবন তো নিজেই এক পরিবর্তনের গল্প।”

শিক্ষকের একটি কথায়, একটি গল্পে, কিংবা একটি প্রতীকী কার্যক্রমে শিশু খুঁজে পায় সাহস ও দিশা। যেমন একজন শিক্ষকের হাতে ধরা ছোট্ট একটি টব - তার ভেতরে পুঁতে রাখা বীজ - এক শিশুর মনে তৈরি করে এমন বিশ্বাস: “আমিও গাছ হতে পারি, মাটি ভয় পেলে চলবে না।”

শিক্ষকের অনুপ্রেরণাই শিশুকে শেখায় - নিজেকে সময় দাও, নতুনকে ভয় পেও না, আর নিজের জীবনের পথে নিজের মতো করেই শিকড় ছড়াও।

“পুড়ে না যাওয়া পাঠশালা”

ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার ছোট্ট গ্রাম শিবনগর। গ্রামের একমাত্র স্কুল, শিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। খড়ের চাল, বাঁশের বেড়া আর মাটির মেঝে, তবু স্কুলটি ছিল প্রাণের জায়গা।

শিশু ছাত্ররা প্রতিদিন সকালে উঠত, খাতা পেন্সিল গুছিয়ে নিত, তারপর ছুটে যেত তার স্কুলে। বন্ধুদের সঙ্গে ছড়া পড়া, হাসাহাসি, আর সবচেয়ে প্রিয় রফিক স্যারের গল্পের ক্লাস।

কিন্তু এক রাতে ঘটে গেল এক ভয়ংকর ঘটনা।

গভীর রাতে হঠাৎ আগুন। গ্রামের এক মাতাল লোক ভুল করে আগুন লাগিয়ে দেয় স্কুলের পাশের খড়ের গাদায়। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে স্কুলে। চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ছেলেমেয়েদের প্রিয় স্কুলটা।

আগুনে ছাই হয়ে যাওয়া স্কুল দেখে ছাত্রদের মুখে বিষণ্নতা আর চোখে অনিশ্চয়তা। খালি মাঠ, পোড়া কাঠ, ছাইয়ের স্তূপ, এসবের মাঝেও শিক্ষকরা ভাবছিলেন, “কোথা থেকে শুরু হবে এই ভাঙাচোরা স্বপ্নের পাঠ?”

রফিক স্যার, যিনি শুধু শিক্ষক নন, এই গ্রামের নীরব পথপ্রদর্শক, দুদিন পরেই রামবাসীদের সভা ডেকে বললেন,

- “আমরা সময় নস্ট করতে চাইনা, কাল থেকেই স্কুল শুরু হবে। প্রথম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি - ক্লাস হবে চাঁচড়া মসজিদে। চতুর্থ ও পঞ্চম - ক্লাস হবে শিবনগর মন্দিরে।”

ঘরে ঘরে গুঞ্জন, “মুসলিম বাচ্চারা যাবে মন্দিরে? হিন্দু ছেলেমেয়েরা মসজিদে ক্লাস করবে?”

ভ্রু কুঁচকানো, চুপচাপ চায়ের দোকানে ফিসফাস।

এসব দেখে রফিক স্যার আবার ডাকলেন সবাইকে। শুরুতে সোজা কিছু বললেন না। তিনি শুধু জিজ্ঞেস করলেন,

- “আপনারা কি চান আমাদের বাচ্চারা তাদের স্বপ্ন নিয়ে ঘরে বসে থাকুক?”

তারপর চোখে কোমল দৃঢ়তা নিয়ে বললেন,

- “আমরা তো মসজিদে শুধু নামাজ পড়ি না, জ্ঞান অর্জনের কথাও বলি। আর মন্দির তো শুধু প্রার্থনার নয়, ভালোবাসা ও কল্যাণের আশ্রম। এই দুর্যোগে যদি মসজিদ ও মন্দির শিশুদের আশ্রয় না দেয়, তাহলে তারা কার আশ্রয় পাবে?”

কেউ কিছু বলল না। তবে পরদিন সকালে দেখা গেল এক অপূর্ব দৃশ্য, মসজিদের বারান্দায় পাটি পেতে বসে আছে প্রথম শ্রেণির ছোট ছোট মুখ, হাত তুলে ছড়া বলছে। আর মন্দিরের গা ঘেঁষে গাছতলায় দাঁড়িয়ে রঞ্জনা ম্যাডাম ক্লাস নিচ্ছেন চতুর্থ শ্রেণির অঙ্ক। গ্রামের অভিবাবক রা তাদের ছেলে মেয়েদের মসজিদে আর মন্দিরে পাঠিয়েছেন স্কুলের পড়াশুনা করবার জন্য।

এক বৃদ্ধা বললেন চোখ মুছতে মুছতে,

- “এই দৃশ্য আগে দেখিনি, কিন্তু দেখলাম বলেই মনে হলো - ধর্ম তো আলাদা নয়, আশ্রয় দেয়ার জায়গাটাই সবচেয়ে পবিত্র। এ যেন এক সহাবস্থান, শিক্ষার প্রতি ভালোবাসা, আর ধর্মীয় সম্প্রীতির এক অপূর্ব প্রতীক।”

এক বছর কেটে গেছে। ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে, কষ্ট আর অপেক্ষার ভিতর দিয়ে— আজ সেই স্কুলে পাকা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলো। নাম রাখা হয়েছে: “আশার পাঠশালা”।

কিন্তু নতুন ভবনের চেয়েও মহার্ঘ হয়ে রইলো একটা অদৃশ্য সম্পদ - শিশুদের হৃদয়ে জন্ম নেওয়া এক ধর্মাতীত বন্ধন, এক ভালোবাসার সমাজ, যেখানে পরিচয়ের দেয়াল নেই, আছে কেবল মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা। সেই শিক্ষা বইয়ে নেই, সিলেবাসে নেই - তা জন্ম নেয় চোখের জলে, শ্বাসের ভেতর, হাত ধরার সহানুভূতিতে।

প্রধান শিক্ষক মৃদু কণ্ঠে বললেন,

—“আমরা শুধু একটা ভবন গড়ছি না, গড়ছি একটা চেতনার বাতিঘর।”

এই স্কুল আর ইট-পাথরের বস্তু নয়। এটি হয়ে উঠেছে মানুষের স্বপ্ন, সাহস ও সংহতির এক আলোকশিখা। ঝড় আসে, নদী ফুলে ওঠে, মাটিও দুলে যায় - কিন্তু যখন শিক্ষক, ছাত্র আর সমাজ একত্র হয়, তখন কোন দুর্যোগই তাদের আশার মশাল নিভিয়ে দিতে পারে না। এই স্কুল শুধু পড়ায় না, শেখায় - “কীভাবে মানুষ হওয়া যায়।”

"শান্ত থাকো; তবুও দৃঢ় থাকো। ভদ্র হও; তবুও সাহসী হও। সদয় হও; তবুও শক্তিশালী হও।"

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাজিয়া পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী এবং রিজওয়ান স্যার সহকারী শিক্ষক। ভদ্র মেয়ের গন্ডির মধ্যে আটকে আছে নাজিয়া। ওকে সবাই চেনে "ভদ্র" মেয়ে হিসেবে। ক্লাসে কারো পাশে বসতে না দিলে চুপ করে থাকে, কেউ তার বই ছিঁড়ে ফেললেও বলে না কিছু। একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে সে বলে,

- "মা, ক্লাসে কেউ পাশে বসতে চায় না।"
- "তুই কিছু বলিস না মা। ভালো মেয়েরা বেশি কথা বলে না।"

নাজিয়ার মা সমাজের চাপে নিজেও কথা বলা ভুলে গেছেন অনেক আগে।

শিক্ষকরা ও দেখে শেখেন বা ঠেকে শেখেন, একজন শিক্ষকের অতীত ব্যর্থতা থেকে বর্তমান শিক্ষাদান হয়ে উঠতে পারে অর্থবহ। রিজওয়ান স্যার আগে শহরের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সেখানে এক মেয়ে ছিল, নাম ছিল শিমু। সারাজীবন "ভদ্র" হবার চেষ্টায় সে নিজের সম্মান ও স্বপ্ন দুটোই হারিয়েছিল। আজও রিজওয়ান স্যার মাঝে মাঝে রাতে ঘুমাতে পারেন না, চোখে ভেসে ওঠে সেই মেয়ের নিঃশব্দ কান্না।

এই গ্রাম্য স্কুলে এসে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, এখানে আর কোনো ছেলেমেয়েকে নিঃশব্দ করে রাখা যাবে না। মৌলিক অধিকার আর আত্মসম্মান শেখাতে হলে ক্লাসরুমেই শুরু করতে হবে। বন্ধুত্ব আর ঘটনার মধ্য দিয়েই শেখে শিশুরা।

এমনি সব চিন্তা থেকে, একদিন রিজওয়ান স্যার খাতা দিলেন সবাইকে। লিখতে বললেন: "আমি যদি চুপ না থাকতাম..."

নাজিয়া লিখল: "আমি বলতাম, আমার বই কে ছিঁড়েছে। আমি বলতাম, পাশে না বসলে আমার কষ্ট হয়। আমি বলতাম, আমি মানুষ, পাথর না।"

স্যার বুঝলেন, চুপ থাকা মেয়েটির মধ্যে আগুন আছে, শুধু দগ্ধ না হয়ে জ্বলতে শেখানো দরকার।

রিজওয়ান স্যার একদিন ক্লাসে অভিনয় করালেন - "না বলতে শেখা", যেখানে চোখে চোখ রেখে "না" বলতে হয় দৃঢ় ভাবে।

নাজিয়াকে দিলেন প্রধান চরিত্র। সে প্রথমে অস্বস্তিতে পড়ে যায়, কিন্তু স্যারের উদশাহে আত্মসম্মান খুঁজে পায় নিজের মধ্যে।

সে দৃপ্ত কণ্ঠে বলল:

- "তুমি যদি বলো আমি দুর্বল, আমি বলব না, আমি সাহসী!"
- "তুমি যদি আমার জিনিস নেয়া ঠিক মনে করো, আমি বলব—না, এটা অন্যায়!"

সবাই চুপ হয়ে গেল, নাজিয়া বদলে গেছে।

পরদিন লুচি নামের এক চতুর্থ শ্রেণির মেয়েকে সবাই ঠাট্টা করছিল তার উচ্চারণ নিয়ে। "তুই তো ঠিক করে কথা বলতেই পারিস না" বলে একজন ছেলে তার খাতা ছুড়ে ফেলে দিল।

নাজিয়া তখন উঠে দাঁড়ায়।

- "তুমি ওর খাতা কেন ফেলে দিলে?"
- "তোর আবার কী?"
- "তোমার কথাতেই ভুল আছে। কারও কণ্ঠ নিয়ে ঠাট্টা করা অন্যায়!"

প্রথমবার শিক্ষক ছাড়াই সে অন্যায় প্রতিরোধ করে। পুরো ক্লাস স্তব্ধ। সেই নাজিয়া, যে একসময় চুপ করে থাকতো, আজ একজনের আত্মসম্মান রক্ষা করছে।

বিকেলে বাড়ি ফিরে নাজিয়া সব বলল মাকে।

মা একটুখানি হেসে বললেন "তুই যে কথা বলেছিস, আমি ভাবিনি পারবি। কিন্তু এখন বুঝি, মেয়ে মানুষ কেবল সহ্য করার জন্য না, প্রতিবাদের জন্যও জন্ম নেয়।"

রিজওয়ান স্যারের স্বপ্ন সত্যি হতে শুরু করেছে, আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা, এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ শিক্ষার অংশ। এই শিক্ষা শুধু ক্লাসরুমের নয়, জীবন চালানোর পথ - "শান্ত থেকো, কিন্তু ভেঙে পড়ো না। ভদ্র থেকো, কিন্তু অন্যায়ের সামনে সাহস হারিও না। সদয় থেকো, কিন্তু নিজেকে ছোট ভেবো না।"

ধনুক-ভাঙা পণ – ১১০

“পুড়ে না যাওয়া পাঠশালা”

ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার ছোট্ট গ্রাম শিবনগর। গ্রামের একমাত্র স্কুল, শিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। খড়ের চাল, বাঁশের বেড়া আর মাটির মেঝে, তবু স্কুলটি ছিল প্রাণের জায়গা।

শিশু ছাত্ররা প্রতিদিন সকালে উঠত, খাতা পেন্সিল গুছিয়ে নিত, তারপর ছুটে যেত তার স্কুলে। বন্ধুদের সঙ্গে ছড়া পড়া, হাসাহাসি, আর সবচেয়ে প্রিয় রফিক স্যারের গল্পের ক্লাস।

কিন্তু এক রাতে ঘটে গেল এক ভয়ংকর ঘটনা। গভীর রাতে হঠাৎ আগুন। গ্রামের এক মাতাল লোক ভুল করে আগুন লাগিয়ে দেয় স্কুলের পাশের খড়ের গাদায়। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে স্কুলে। চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ছেলেমেয়েদের প্রিয় স্কুলটা।

আগুনে ছাই হয়ে যাওয়া স্কুল দেখে ছাত্রদের মুখে বিষণ্নতা আর চোখে অনিশ্চয়তা। খালি মাঠ, পোড়া কাঠ, ছাইয়ের স্তূপ, এসবের মাঝেও শিক্ষকরা ভাবছিলেন, “কোথা থেকে শুরু হবে এই ভাঙাচোরা স্বপ্নের পাঠ?”

রফিক স্যার, যিনি শুধু শিক্ষক নন, এই গ্রামের নীরব পথপ্রদর্শক, দুদিন পরেই রামবাসীদের সভা ডেকে বললেন, “আমরা সময় নস্ট করতে চাইনা, কাল থেকেই স্কুল শুরু হবে। প্রথম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি - ক্লাস হবে চাঁচড়া মসজিদে। চতুর্থ ও পঞ্চম - ক্লাস হবে শিবনগর মন্দিরে।”

ঘরে ঘরে গুঞ্জন, “মুসলিম বাচ্চারা যাবে মন্দিরে? হিন্দু ছেলেমেয়েরা মসজিদে ক্লাস করবে?” ভ্রু কুঁচকানো, চুপচাপ চায়ের দোকানে ফিসফাস।

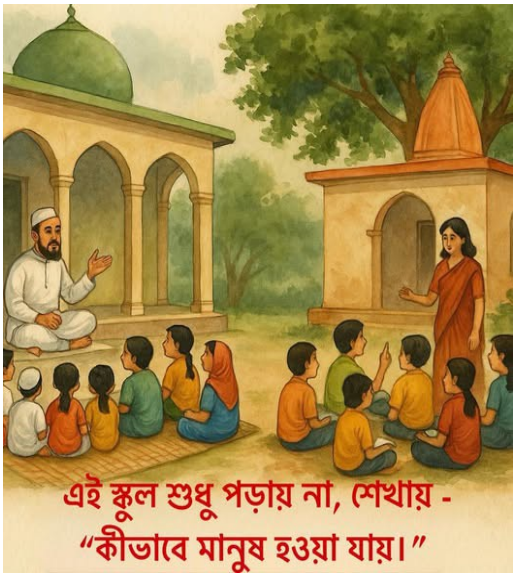

এসব দেখে রফিক স্যার আবার ডাকলেন সবাইকে। শুরুতে সোজা কিছু বললেন না। তিনি শুধু জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা কি চান আমাদের বাচ্চারা তাদের স্বপ্ন নিয়ে ঘরে বসে থাকুক?”

তারপর চোখে কোমল দৃঢ়তা নিয়ে বললেন, “আমরা তো মসজিদে শুধু নামাজ পড়ি না, জ্ঞান অর্জনের কথাও বলি। আর মন্দির তো শুধু প্রার্থনার নয়, ভালোবাসা ও কল্যাণের আশ্রম। এই দুর্যোগে যদি মসজিদ ও মন্দির শিশুদের আশ্রয় না দেয়, তাহলে তারা কার আশ্রয় পাবে?”

কেউ কিছু বলল না। তবে পরদিন সকালে দেখা গেল এক অপূর্ব দৃশ্য, মসজিদের বারান্দায় পাটি পেতে বসে আছে প্রথম শ্রেণির ছোট ছোট মুখ, হাত তুলে ছড়া বলছে। আর মন্দিরের গা ঘেঁষে গাছতলায় দাঁড়িয়ে রঞ্জনা ম্যাডাম ক্লাস নিচ্ছেন চতুর্থ শ্রেণির অঙ্ক। গ্রামের অভিবাবক রা তাদের ছেলে মেয়েদের মসজিদে আর মন্দিরে পাঠিয়েছেন স্কুলের পড়াশুনা করবার জন্য।

এক বৃদ্ধা বললেন চোখ মুছতে মুছতে, “এই দৃশ্য আগে দেখিনি, কিন্তু দেখলাম বলেই মনে হলো - ধর্ম তো আলাদা নয়, আশ্রয় দেয়ার জায়গাটাই সবচেয়ে পবিত্র। এ যেন এক সহাবস্থান, শিক্ষার প্রতি ভালোবাসা, আর ধর্মীয় সম্প্রীতির এক অপূর্ব প্রতীক।”

এক বছর কেটে গেছে। ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে, কষ্ট আর অপেক্ষার ভিতর দিয়ে - আজ সেই স্কুলে পাকা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলো। নাম রাখা হয়েছে: “আশার পাঠশালা”।

কিন্তু নতুন ভবনের চেয়েও মহার্ঘ হয়ে রইলো একটা অদৃশ্য সম্পদ - শিশুদের হৃদয়ে জন্ম নেওয়া এক ধর্মাতীত বন্ধন, এক ভালোবাসার সমাজ, যেখানে পরিচয়ের দেয়াল নেই, আছে কেবল মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা। সেই শিক্ষা বইয়ে নেই, সিলেবাসে নেই - তা জন্ম নেয় চোখের জলে, শ্বাসের ভেতর, হাত ধরার সহানুভূতিতে।

প্রধান শিক্ষক মৃদু কণ্ঠে বললেন, “আমরা শুধু একটা ভবন গড়ছি না, গড়ছি একটা চেতনার বাতিঘর।”

এই স্কুল আর ইট-পাথরের বস্তু নয়। এটি হয়ে উঠেছে মানুষের স্বপ্ন, সাহস ও সংহতির এক আলোকশিখা। ঝড় আসে, নদী ফুলে ওঠে, মাটিও দুলে যায় - কিন্তু যখন শিক্ষক, ছাত্র আর সমাজ একত্র হয়, তখন কোন দুর্যোগই তাদের আশার মশাল নিভিয়ে দিতে পারে না। এই স্কুল শুধু পড়ায় না, শেখায় - “কীভাবে মানুষ হওয়া যায়।”

ধনুক-ভাঙা পণ – ১১৩

“ইতিবাচকতা সংক্রামক ”

নেত্রকোনার হাওরঘেরা এক নিভৃত গ্রামে, যেখানে আকাশটা সবসময় একটু নীল, আর মাঠে হাওয়ার কানে কানে কথোপকথন চলে, সেখানেই “সোনালী আলো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়”।

এই স্কুলে পড়ে সাদিয়া, পঞ্চম শ্রেণির এক অগোছালো, অথচ অপরূপ মেয়ে। ওর চুলে বাতাস খেলে যায়, পায়ের স্যান্ডেলের একপাশ ছেঁড়া, বইয়ের পাতাগুলো ভাঁজে ভরা, যেন পাতায় পাতায় জমে আছে কোনো রহস্য। ওর মুখে সবসময় একরাশ আলো। সাদিয়ার স্কুলে হেঁটে আসা যেন এক ছন্দময় নাচ, মনে হয় যেন শব্দবিহীন কোনো কবিতা ধ্বনিত হচ্ছে চারপাশে - “মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে যায়, বিহ্বল–চঞ্চল–পায়।”

ওর বান্ধবী একদিন বলল, “সাদিয়া, তোর চুলটা তো দেখলে হাঁসের পাখা মনে হয়!”

সাদিয়া হেসে উত্তর দিলো, “আজ মা-র ঘুম ভাঙেনি। আমি আসতে আসতে চুল গুছাচ্ছিলাম, পুরোটা হয়নি... তবে রাস্তায় একরাশ কাশফুল পেয়েছিলাম, তারাই চুলে গেঁথে বসে আছে।”

আরেকদিন, বৃষ্টি নামল হঠাৎ। সবাই অস্থির - জুতো ভিজবে, জামা ময়লা হবে। কিন্তু সাদিয়া পেন্সিলে লেখা থামিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, “আজ না চাইতেই আকাশ গান ধরেছে, ছুটির পর গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির তাল শুনবো!”

সাদিয়ার বইয়ের পাতার ফাঁকে ফাঁকে শুকনো ফুল, আর খাতা বন্ধ করে কালি মাখা সুতোর মাথা টেনে নিলে যে নকশা ভেসে ওঠে, তাতে রঙ মিশিয়ে বানানো শিল্প। প্রকৃতির প্রতি তার ভালোবাসা যেন রঙ, গন্ধ, ছোঁয়ায় বাঁধা।

রুবি ম্যাডাম, সদ্য বদলি হয়ে আসা শিক্ষিকা, সব সময় হাসিখুশি এই মেয়েটিকে দেখে অবাক। যেখানেই হতাশা, সাদিয়া সেখানে খুঁজে নেয় আশা। একদিন ক্লাস এ ম্যাডাম একটা ছেলেকে দুষ্টমি করার জন্য বকা দিচ্ছেন, ক্লাস এ একটা অসহ্য পরিবেশ, তখন সাদিয়া বলে বসলো ম্যাডাম আপনি খুব সুন্দর দেখতে।

রুবি ম্যাডাম ক্লাস শেষে জিজ্ঞেস করলেন “তোমার এই রকম ভাবনার ঝর্ণাধারা কোথা থেকে বয়ে আসে, সাদিয়া?”

সাদিয়া বলল, “আমার দাদি বলেন, ‘যার চোখ ভালো দেখতে শেখে, তার জীবনেও ভালো হয়।’ আমি তাই চেষ্টা করি।”

ম্যাডামের চোখ চিকচিক করে উঠল। এই শিশু যেন তাকে তার নিজের শৈশবের মুখোমুখি দাঁড় করায়, মনে হলো - শিক্ষা শুধু দেওয়ার নয়, শিখবারও।

সেইদিন থেকে শুরু হলো ‘ভালো দেখতে শেখা ডায়েরি’। প্রতিদিন একেকজন লিখে আসতো তাদের দেখা একটুকরো ভালো কথা।

- “আজ পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু নিচে একটা ব্যাঙ ছিল - আমার কারণে বাঁচলো ওটা।”
- “মা আজ বকেছিলেন, কিন্তু রাতে চুপিচুপি পছন্দের বেগুন ভাজি করেছিলেন।”
- “নতুন ছেলেটা আমার পাশে বসলো, আমি ওকে বন্ধু বানালাম।”

এক সপ্তাহ পেরোতেই ম্যাডাম বুঝলেন, বদলে গেছে ছেলেমেয়েদের মন। সাদিয়ার মতো আরও কয়েকজন এখন সব কিছুর মধ্যে আনন্দ এবং রঙ খোঁজে।

শেষে রুবি ম্যাডাম বললেন, “আমরা সবসময় পরিস্থিতি বদলাতে পারি না, কিন্তু নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে নিতে পারি। এবং এই দেখবার ও বুঝবার অনুভূতিই আমাদের জীবনের আলো। এই আলো দেখার জন্যই তো চোখ। কেননা, আমাদের মনই সবকিছু। তুমি যা ভাবো তুমি তাই হয়ে যাও।”

ম্যাডাম জানেন, একজন শিশুর মনে যদি ভালো দেখার চোখ তৈরি হয়, তাহলে সে কেবল নিজের জীবন নয়, আশেপাশের মানুষকেও আলোকিত করে তোলে। যে শিশু ছোট থেকেই শেখে কীভাবে প্রতিকূলতার মধ্যেও ভালো দেখবে, সে কখনোই হতাশ হয় না। ইতিবাচক মানসিকতার শক্তি অনেক, যখন কেউ আনন্দিত হয় এবং চারপাশে ইতিবাচকতা প্রকাশ করে, তখন সে জীবনের উষ্ণতা ছড়ায়। ইতিবাচকতা সংক্রামক - আর এই সংক্রমণটাই হোক আগামী প্রজন্মের শিক্ষা।

“যেখানে প্রশ্ন ফোটে, সেখানে শিক্ষা গড়ে ওঠে”

নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার প্রান্তিক এক গ্রাম, নাম পারুলডাঙ্গা। পাখির কূজন আর হালকা বাতাসে দুলে ওঠা ধানক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট স্কুল, টিনের ছাউনি, মাটির মেঝে, বাঁশের বেঞ্চ আর দেয়ালে ধূসর ধুলো। স্কুলটি যতটা ছোট, ততটাই স্বপ্নে বড়।

সেই স্কুলেই নতুন শিক্ষক হয়ে এলেন মেহেদী স্যার, ঢাকা শহরের এক বিকল্প শিক্ষাচিন্তার মানুষ। চোখে একধরনের স্বপ্নের দীপ্তি, বিশ্বাস করেন—শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া কোনো বিষয় নয়, বরং উন্মোচনের প্রক্রিয়া।

প্রথম দিনেই তিনি বুঝলেন, এই স্কুলে শিক্ষার সুর যেন থমকে গেছে। চতুর্থ শ্রেণির কক্ষে শিশুরা মুখ নিচু করে বসে থাকে, প্রশ্ন করলেই চুপচাপ, যেন কল্পনার ডানা কেউ ছেঁটে দিয়েছে।

পেন্সিল চিবুনোই যেন ওদের একমাত্র স্বাধীনতা!

তবে একদিন...

তিনি ক্লাসে ঢুকে কোনো কথা না বলে একটি বড় বাক্স রাখলেন টেবিলের উপর। বাক্স খুলতেই সবার চোখ বিস্ময়ে গোল - ভেতরে আছে নানা জিনিস: কিছু পাথর, কাঠের টুকরো, সাদা কাগজ, রঙ পেন্সিল, দড়ি, কাঁচি, চাকা, চুম্বক, কিছু লোহা।

ছাত্ররা চেয়ে রইল, নিঃশব্দে।

ফিসফিস শব্দ ভেসে এলো, “স্যার, পড়াবেন না?”

স্যার হেসে বললেন, “না। আজ তোমরাই পড়াবে - তোমার নিজের মনে, নিজের হাতে, নিজের প্রশ্ন দিয়ে।”

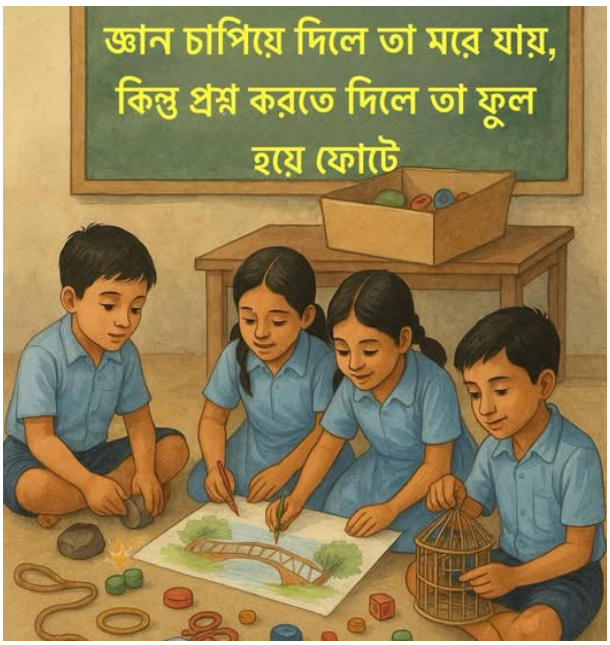

প্রথমে ভয়। তারপর ধীরে ধীরে উঁকি দিল কৌতূহল। রাফি পাথর ঘষে ঘষে আগুনের ভাব ধরালো, নিশাত আর রুহি মিলে আঁকলো এক নদী, তার উপর বাঁশের সেতু, তুহিন বানালো কাঠ ও তারে একখানা ছোট্ট পাখির খাঁচা। কেউ বানালো এক চুম্বক-চালিত খেলনা গাড়ি।

মেহেদী স্যার কিছু বলেন না। শুধু চেয়ে থাকেন—এই নির্মাণই তো শিক্ষা, এই খেলাই তো জ্ঞান।

সপ্তাহখানেক পর, তিনি বোর্ডে একটা বাক্য লিখলেন, “জ্ঞান চাপিয়ে দিলে তা মরে যায়, কিন্তু প্রশ্ন করতে দিলে তা ফুল হয়ে ফোটে।”

পরদিন এক অভিভাবক এলেন - নিশাতের মা। “স্যার, ও তো এখন বই না পড়ে এসব বানায়। সারাক্ষণ রঙ, কাগজ, গোঁজামিল। এটা কি পড়াশোনা?”

স্যার মৃদু হাসলেন। “তিন বছর বয়সে কি ওর মুখ বন্ধ রাখা যেত? কত প্রশ্ন করত! আমরা শুধু শেখাকে আটকে দিই বইয়ের পাতায়। অথচ ওরা তো শেখার জন্যই জন্মায়। খেলতে খেলতেই শেখে, জিজ্ঞাসা করেই বোঝে।”

তিনি আরও বলেন “আমরা যদি তাদের কৌতূহলটাকে রক্ষা করি, ভয় না দিই, ভুলকে ক্ষমা করি, আর অন্বেষণকে উৎসাহ দিই—তাহলেই ওরা নিজেদের শিক্ষক হয়ে উঠবে।”

সেই দিন থেকে স্কুলে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়, সপ্তাহে দুই দিন “মুক্ত অনুসন্ধান ক্লাস”।

কোনো পাঠ্যবই নয়, কোনো নির্দিষ্ট সিলেবাস নয় - শুধু শেখার আনন্দ, প্রশ্নের স্বাধীনতা, এবং নানা উপকরণের একটি “অন্বেষণ বাক্স”। প্রতিটি ক্লাসের জন্য সাজানো হয় বিষয়নির্ভর সরঞ্জাম, যাতে শিশু নিজের হাতে জেনেও না জেনে শিখে ফেলে বিজ্ঞানের সূত্র, গাণিতিক কাঠামো, প্রকৌশল কৌশল কিংবা চিত্রকলার সৌন্দর্য।

স্কুলে তখন আর শুধু ক্লাস নয় - একটি জীবন্ত ল্যাবরেটরি।

আর মেহেদী স্যার? তিনি ক্লাসের কেন্দ্র নন - তিনি হচ্ছেন পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা এক আলো, যিনি বলেন,

“শিক্ষা তখনই সত্যি হয়, যখন তা প্রশ্ন দিয়ে জন্ম নেয় আর অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠে।”

“যে নিজে পারে, সে আত্মবিশ্বাসী হয়”

কুমিল্লার এক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র রায়ান। চঞ্চল, দৌড়ঝাঁপ করতে ভালোবাসে, ক্লাসে বসে থাকতে পারেই না। পড়ার সময় পেন দিয়ে টোকাটুকি, চেয়ার নাড়িয়ে শব্দ, আর বন্ধুদের খ্যাপানো - ওর নিত্যকার কাজ।

শিক্ষকদের মুখে একটাই কথা,

- “রায়ান পড়ায় মন দেয় না, শুধু দৌড়ায়!”

কিন্তু রাশেদ স্যার একটু অন্য চোখে দেখেন রায়ানকে। তিনি ভাবেন, যে দৌড়ায়, তাকে বসিয়ে রাখা নয়, দৌড়ের দিশা দেওয়া দরকার। একদিন তিনি ঘোষণা দিলেন,

- “আমাদের স্কুলে একটা ‘দৈনিক শরীরচর্চা দল’ হবে।

এক জন দায়িত্বে থাকবে -

- সকালের ঘন্টা বাজানো,
- মাঠে দড়ি দিয়ে লাইন করে সাজানো,
- ফুটবল ও কোণ গুছিয়ে রাখা,
- সকালে শ্রেণীকক্ষের জানালা-দরজা খোলা,
- আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবাইকে ‘সকালের শরীরচর্চা’তে জড়ানো।

এই দায়িত্ব পাবে যারা উদ্যমী, কিন্তু নিয়মের মধ্যে কাজ করতে রাজি।”

স্যার জানেন, ছেলেদের শারীরিক কৌতূহল, গতিশীলতা ও গঠনমূলক শক্তিকে ব্যবহার করে যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা যায়, তাহলে তা হবে খুব কার্যকর ও হৃদয়গ্রাহী।

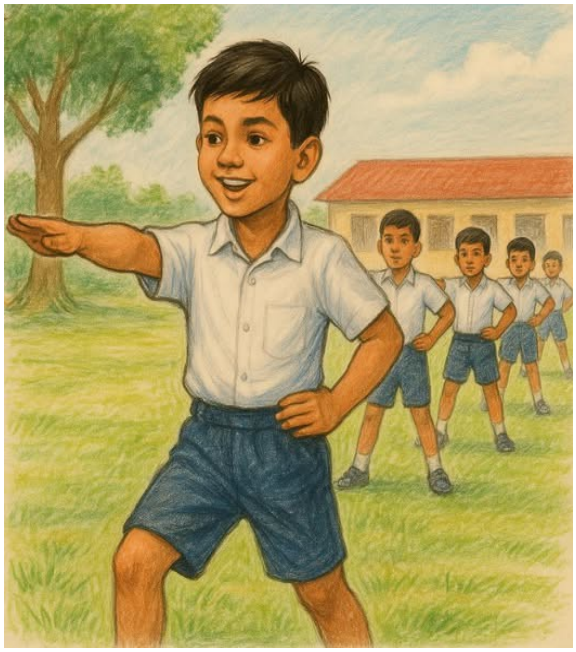

সবার সামনে রাশেদ স্যার বললেন,

- “রায়ান, তুমি কি প্রথম দায়িত্বটা নেবে?”

রায়ান একটু থমকে গেল। ওর চঞ্চলতাকে দায়িত্বে রূপ দেওয়া—এমন তো কেউ কখনো ভাবেনি!

পরদিন সকালে সবার আগে স্কুলে এল রায়ান।

মাঠে গিয়ে দড়ি দিয়ে লাইন করলো, ফুটবল ঝুড়িতে রাখল, নিজেই ঘন্টা বাজাল।

বাকি বন্ধুরা বলল,

- “তুই ঘন্টা দিলি?”

রায়ান বলল,

- “ঘন্টা মানে শুরু। আমি আজকের শুরু।”

ধীরে ধীরে সবাই ওর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল,

- “রায়ান আজ আমাদের স্ট্রেচিং শেখাও না?”

রায়ান বুক ফুলিয়ে বলল,

- “হ্যাঁ, প্রথমে ঘাড় ঘোরাও, তারপর কোমর বাঁকাও, তারপর হাঁপাও না - বরং হাসো!”

সবাই মজা পেল, রায়ান যেন ক্লাসের নতুন এক বিশ্বাস ও নিয়ন্ত্রক।

একদিন নতুন ছাত্র মিজান শরীরচর্চা করতে ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রায়ান গিয়ে বলল,

- “প্রথমে সবাই হারে, তারপরই তো শেখে। এসো আমাকে অনুসর করো।”

রাশেদ স্যার শিক্ষকদের মিটিংয়ে বললেন,

- “ছেলেদের চঞ্চলতা তাদের শক্তি। যদি আমরা ওদের শরীর, মন আর সম্মান একসাথে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে ওরাই হবে স্কুলের সবচেয়ে দায়িত্ববান রূপান্তরের দূত।”

মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশুকে তাদের আত্মবিশ্বাসে দাঁড় করাতে গেলে, ভিন্ন ভিন্ন পথ বেছে নিতে হবে, কারণ ওদের মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক গঠন আলাদা।

ছেলেদের জন্য, যে দৌড়ে বেড়ায়, তাকে পথ দেখিয়ে দিলে সে নিজেই হয়ে ওঠে দৌড়ের গন্তব্য। শিশুর চঞ্চলতাই যদি সম্মানের দায়িত্বে রূপ নেয়, তবে সেই শিশুই হয়ে ওঠে পরিবর্তনের কাণ্ডারি।

“যে নিজে পারে, সে আত্মবিশ্বাসী হয়”

সুনামগঞ্জ শহরের এক ছোট্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেখানে পড়ে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী আনিশা। পরিপাটি করা চুল, পরিষ্কার পোশাক ও জুতো, কাঁধে বইয়ের ব্যাগ - সব মিলিয়ে যেন এক নিঃশব্দ ফুলকুঁড়ি, যাকে এখনো আলো পেতে হয়নি।

আনিশার মা স্কুলে প্রায়ই এসে বলেন,

- “স্যার, ওকে বেশি কিছু দিয়েন না, ছোট তো! কষ্ট হবে।”

রাশেদ স্যার মৃদু হাসেন। তিনি জানেন, কষ্ট নয়, “দায়িত্বই মানুষকে বড় করে।”

আনিশা মেধাবী, কিন্তু মৌন। বোর্ডে ডাকা হলে কান্না আসে, গ্রুপ কাজেও মুখে শব্দ জোটে না।

সে যেন নিজেকে ভুলেই বসে আছে, যেন নিজের জীবনগল্প এখনো লেখা শুরু হয়নি। পরনির্ভরতায় ভরা আত্মবিশ্বাসী ও আত্মমোর্যদার কোন চিহ্ন নেই। একদিন রাশেদ স্যার ক্লাসে নতুন এক নিয়ম চালু করলেন।

- “প্রতিদিন ৫ জন শিশু পাবে ছোট ছোট দায়িত্ব। কেউ বোর্ড মুছবে, কেউ ক্লাস গুছাবে, কেউ গাছে পানি দেবে।”

শিশুরা খুশিতে হইচই শুরু করল। কিন্তু আনিশা নির্বাক।

প্রথম দিনেই তার নাম এলো - গাছগুলোতে পানি দেওয়ার দায়িত্বে।

আনিশার মনে হলো যেন কেউ তাকে চুপচাপ পাহাড়ে তুলে দিয়ে বলছে, “এগিয়ে চলো!”

সে কিছু বলল না, শুধু নিঃশব্দে গাছে পানি দেবার ঝর্ণা টা হাতে নিল।

প্রথম দিন সে হাত কাঁপিয়ে পানি ঢেলেছিল, দ্বিতীয় দিন এক গাছ বাদ পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তৃতীয় দিন সে দাঁড়িয়ে পড়ল সবুজ পাতার সামনে ঠিক এক সেবিকার মতো।

দশ দিন পরে, হঠাৎ কেউ বলে উঠল,

- “গাছগুলো কি আরও সবুজ দেখাচ্ছে না?”

রাশেদ স্যার হেসে বললেন,

- “কারণ ওদের কাছে এখন আনিশা আছে।”

তার কিছু দিন পর তার বেলি ফুলের গাছে যখন সাদা রঙের কমনীয় ছোট ফুলের মিষ্টি সুগন্ধ ছড়ালো, তখন আনিশার মনে এক আত্মবিশ্বাসের জন্ম নিলো, “সে পারে যত্নে ফুল ফুটাতে।”

বেলি ফুলের সুন্দর্যের মতোই আনিশাও পরিস্ফুটিত হওয়া শুরু করল।

ক্লাসে প্রশ্ন করে, ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা দেয়, উপস্থাপনায় দাঁড়ায়।

একদিন সে নতুন এক ছাত্রকে বলল,

- “ডরাইও না, প্রথম দিন সবারই একটু ভয় করে।”

রাশেদ স্যার একদিন শিক্ষকদের মিটিংয়ে বললেন,

- “অনেক সময় আমরা ভালোবাসার নামে শিশুকে আগলে রাখি এতটা, যে সে ডানাও মেলতে পারে না। কিন্তু দায়িত্ব, ছোট হোক বা বড় - শিশুর ভিতরে গড়ে তোলে এক আত্মবিশ্বাসের মশাল। আর এই আলো, তাকে শুধু পড়ায় নয়, মানুষ করেও তোলে।”

শিশুরা ছোট ছোট শেকড় ছড়িয়ে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে যায়, যদি আমরা বিশ্বাস করি, “তুমি পারবে”, তবে একদিন ওরা বলে, “আমি পারি।”

ঘরের কাজ, ছোট দায়িত্ব, এবং শিশুদের নিজের কাজ নিজে করার সুযোগ তাদের আত্মমর্যাদা গড়ে তোলে। অভিভাবক ও শিক্ষক - দুই পক্ষেরই উচিৎ এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে শিশুরা নিজেকে বিশ্বাস করতে শেখে।

ধনুক-ভাঙা পণ -১১৭

“যেখানে শিকড়, সেখানেই আলো”

বগুড়ার এক নদীঘেরা গ্রাম, শীতল হাওয়া, ধানের গন্ধ আর মাঝেমাঝে শোনা যায় ভাটিয়ালির সুর। এই গ্রামের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র নায়ীম।

শিশুর সহজাত আত্মপ্রকাশ অনেক সময় মনের অজান্তেই বলে ফেলে - “আমি যা, আমি তাই।” এই বাক্যটা যেন তার নিজের অস্তিত্বের এক ইতিবাচক ঘোষণা, এক নিঃশব্দ আত্মবিশ্বাস। এই সহজ অথচ গভীর প্রকাশ আসে তার বেড়ে ওঠার পরিবেশ থেকে, যেখানে তাকে গ্রহণ করা হয় তার মতো করেই - শর্তহীনভাবে। এ এক সাংস্কৃতিক চর্চা, যা শিশুর ভেতরে গড়ে তোলে আত্ম-গ্রহণযোগ্যতা ও সত্যনিষ্ঠতা। এই চর্চায় শিশুটি শেখে নিজের স্বকীয়তায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে, সে আর হয়ে উঠতে চায় না অন্যের প্রত্যাশার ছাঁচে গড়া কেউ- বরং হয়ে ওঠে নিজস্ব পরিচয়ে গর্বিত এক আত্মা।

নায়ীম অল্পভাষী। তার কথা বলার ধরণ একটু আলাদা, আঞ্চলিক টানে। বন্ধুরা মজা করে বলত, “তোর ভাষাটা কেমন অদ্ভুত!” এসব শুনে, নায়ীম চুপ করে যেত। নিজের নাম, নিজস্বতা, এমনকি তার দাদুর পালাগান পর্যন্ত লুকিয়ে রাখত সে।

নায়ীম আর ওর দাদু সন্ধ্যায় নদীর পাড়ে বসে গাইতো,

- “এই দেশ আমার, এই মাটি আমার,
এই নদী, এই গাছ, এই ঘ্রাণ আমার...”

মা মাটির পিঁড়িতে বসে পাটের সুতো দিয়ে বুনতেন নকশী, বাবা বাঁশের চটি দিয়ে বানাতেন মাছ ধরার পলো আর খলসানি। নায়ীম তাকিয়ে থাকত, ভাবত, এসব কি কাউকে দেখানো যায়?

সেই স্কুলে নতুন এলেন সুরাইয়া ম্যাডাম। তিনি বিশ্বাস করেন, সংস্কৃতি হলো একটি সামগ্রিক জীবনযাত্রা যা একদল মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং অনুশীলন, ভাষা এবং ঐতিহ্য থেকে শুরু করে শিল্প এবং সামাজিকতায় ও শিক্ষায় সবকিছুতেই প্রতিফলিত হয়। তাই, চাই সংস্কৃতির প্রাধান্য, ব্যবহার ও সচেতনতা।

তিনি বোর্ডে লিখলেন, “আমার ভাষা, আমার মাটি, আমার গল্প”

তারপর বললেন, “আগামীকাল যে যার ঘরের সংস্কৃতি নিয়ে আসবে— গান, গল্প, খাবার, কাপড়, ভাষা... সব!”

পরদিন ক্লাস যেন হয়ে উঠল একখানি উৎসব। কেউ নিয়ে এলো ঘুঁটেপোড়া পিঠা, কেউ গড়ের ধান-ভাজা, কেউ দাদির টুপি, কেউ নদীর পাড় থেকে কুড়ানো কাঁকড়া-রাঙা পাথর।

নায়ীম প্রথমে দ্বিধায় ছিল, কিন্তু শেষমেশ নিয়ে এলো তার দাদুর ডুগডুগি। আর গাইল - “পাখি বলে, গাছ বলে, নদী বলে বারবার, এই দেশ আমার, এই ভাষা আমার।”

সবাই স্তব্ধ। পেছনে জানালা দিয়ে দেখা গেল একটি দোয়েল পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল, ঠিক যেন সুরে সাড়া দিল।

সুরাইয়া ম্যাডাম চোখ মুছলেন। বললেন, “নায়ীম, তুমি শুধু গান গাওনি, তুমি আমাদের মনে করিয়ে দিলে, শিকড় মানেই গর্ব, মাটি মানেই পরিচয়, ভাষা মানেই ভালোবাসা।”

সেদিন থেকে ক্লাসে একটা নতুন দেয়ালচিত্র উঠল, নায়ীমের আঁকা: একটি গাছ, যার শিকড় নদীর পাড়ে, পাতায় লেখা— “আমি বাংলায় গান গাই, বাংলায় স্বপ্ন দেখি।”

প্রকৃতি, ভাষা ও সংস্কৃতি, এই তিনে গড়ে ওঠে একটি শিশুর আত্মপরিচয়। একজন শিক্ষক যদি শিশুকে তার শিকড়ের দিকে তাকাতে শেখান, তবে সে কেবল শিখে না - সে জেগে ওঠে। মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা আর জন্মভূমির সঙ্গে সংযোগ শিশুর আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার ভিত্তি গড়ে দেয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় সংস্কৃতি একটি অপরিহার্য উপাদান। এটি শিশুর মনে আগ্রহ জাগায়, শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলে এবং তাদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশকে উৎসাহিত করে। যখন পাঠ্যক্রম ও স্কুল পরিবেশে স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও মূল্যবোধকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন শিক্ষার্থীরা নিজেদের শিকড়কে জানতে শেখে, ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করে এবং অন্যের সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহনশীল হয়ে ওঠে।

এই প্রক্রিয়া তাদের বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর জন্য তৈরি করে - একটি এমন পৃথিবী যেখানে আত্মপরিচয় এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা দুইই গুরুত্বপূর্ণ।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১১৯

“প্রথম পাঠশালা”

(“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প: পর্ব – ১)

মানুষ গড়ার প্রথম ছোঁয়া আসে এক শিক্ষকের হাত থেকে। আর সেই হাতে যদি জুড়ে যায় তারুণ্যের প্রেরণা ও সাহস, তবেই শিক্ষা হয়ে ওঠে জাতি গঠনের প্রকৃত শক্তি। বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা একটি সাংবিধানিক অধিকার—সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদের (ক), (খ), ও (গ) ধারায় যা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত। এই শিক্ষা শুধু পুঁথিগত জ্ঞানের বিস্তার নয়, এটি মানবিকতা, নৈতিকতা ও নাগরিক সচেতনতার বীজ বপনের ক্ষেত্র। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও মানসিক উপস্থিতি। শিশুদের মনে প্রশ্ন জাগাতে হলে, প্রথমে তাদের হৃদয়ে স্থান করে নিতে হয়। সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে একটি যুগান্তকারী নীতি:

“BCS পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে প্রার্থীদের অন্তত এক বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।”

সারাদেশে এ ঘোষণা নিয়ে শুরু হলো আলোচনা, তর্ক আর বিস্ময়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ছিল জাতীয় শিক্ষা সংস্কার নীতি “শিক্ষা-ই-শক্তি”-র অংশ। এর উদ্দেশ্য একটাই—দেশের শিক্ষিত, সচেতন ও তারুণ্যদীপ্ত নাগরিকদের সরকারি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মৌলিক শিক্ষাকাঠামোকে নৈতিকভাবে সংযুক্ত করা। ঢাকার এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যিমতিয়াজ হাসান - BCS প্রশাসন ক্যাডারে যোগদানের স্বপ্নে বিভোর। কোচিং, মডেল টেস্ট, সিমুলেশন ইন্টারভিউ - সবই চলছে কঠোর নিয়মে। কিন্তু নতুন নিয়ম অনুযায়ী ফর্ম তুলতেই বাধা এল, “শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট কোথায়, প্রার্থী?” প্রথমে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল যিমতিয়াজের। “আমি এত কষ্ট করে প্রস্তুতি নিচ্ছি, আর এখন আমাকে কিনা প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে পড়াতে হবে?” তবু ভেঙে পড়েনি সে। নিজের মনকে বুঝিয়ে বলল, “এই এক বছরও যদি কিছু শেখায়, তবে সে অভিজ্ঞতা ফেলে দেওয়ার নয়।” নিয়োগ পাওয়া গেল রাজবাড়ীর গোপালপুর ইউনিয়নের চরসীতারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সুন্দর সরকারি সাশ্রয়ী আবাসন সঙ্গে জাতীয় শিক্ষানবিস স্কেলের সমমানের মাসিক সম্মানী। চরসীতারামপুর নদীঘেরা শান্ত গ্রাম, স্কুল বলতে এক টুকরো টিনের ছাউনি, কাঠের বেঞ্চ, আর সামনে হাতের লেখা সাইনবোর্ড।

প্রথম দিনেই তাকে ঘিরে ধরল দশ-বারোটা খুদে ছাত্রের দল। “স্যার, আপনার ব্যাগটা আমি রাখি?” “স্যার, আপনি ঢাকায় থাকেন?” “স্যার, আপনি কি BCS দেবেন? BCS মানে কী, স্যার?” যিমতিয়াজের গলায় প্রথমে একটু কাঁপুনি ছিল। ক্লাসে ঢুকে বোর্ডে লিখল, “আমার নাম যিমতিয়াজ হাসান”

তৎক্ষণাৎ এক ছাত্রী বলল, “স্যার, ‘নাম’ শব্দে ন-কার কোথায়?”

ঘরে হাসির রোল উঠল। যিমতিয়াজ বুঝল, এখানে শিক্ষক মানে শুধু একজন জ্ঞানদাতা নয়, একজন মানুষ, যার উপস্থিতি শিশুদের চোখে আলো ছড়ায়। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার মাঝে রয়েছে এক গভীর পার্থক্য। একজন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যখন জ্ঞান বিতরণ করেন, তখন শিক্ষার্থী প্রস্তুত থাকে গ্রহণে। কিন্তু একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে আগে শোনাতে হয়, বোঝাতে হয়, আগ্রহ জাগাতে হয় - তারপর জ্ঞান বপন করতে হয়।

দিন পেরোতে লাগল। সে আবিষ্কার করল, • কেউ অসাধারণ ছবি আঁকে, • কেউ মুখস্থ করতে না পারলেও কল্পনায় গল্প বানাতে পারে, • কেউ গানের সুরে গুনে গুনে অঙ্ক মিলিয়ে নেয়। একদিন এক বাচ্চা তার হাত ধরে বলল, “স্যার, আপনি না থাকলে আমরা তো কিছুই বুঝতাম না!” সেদিন রাতে সে খাতা বন্ধ করে বসে ছিল স্কুলের পেছনের মাঠে। মাথার ওপরে মেঘলা চাঁদ, পাশে বয়ে চলা পদ্মা। নিজেই নিজের মনকে জিজ্ঞেস করল, “আমি তো ভেবেছিলাম এই এক বছর হবে শাস্তির মতো। অথচ এই স্কুল আমাকে চিনিয়ে দিল - আমি কে, কী পারি, আর কী হতে চাই।” এক বছরের মেয়াদ শেষে যিমতিয়াজ ফিরে গেল ঢাকায়। এবার পরীক্ষার ফর্ম তুলল—সাথে শিক্ষকের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট। কিন্তু শুধু সেটুকুই নয় - সে বয়ে আনল আরও অনেক কিছু: • শিশুদের চোখ দিয়ে দেশকে দেখা, • পাঠ্যপুস্তকের বাইরের জগৎ, • দায়িত্ব ও ভালোবাসার আনন্দ। ফর্মের শেষ পাতায় নিজের নামের নিচে যিমতিয়াজ গর্বের সাথে লিখে দিল - “চরসীতারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন শিক্ষক” আগামী যেকোনো দিন এই তরুণ যখন হয়ে উঠবে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা - ম্যাজিস্ট্রেট, সচিব, বা নীতিনির্ধারক, তখন তার চোখে থাকবে এক আলাদা দৃষ্টি। কারণ সে জানে, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকের আতুরঘর।

“আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে সহানুভূতির দিকে“

কুড়িগ্রামের এক প্রত্যন্ত হাওরবেষ্টিত গ্রামের স্কুল নাম তিনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানে পড়ে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র সাব্বির। সাব্বির পড়াশোনায় ভালো, পোশাকে-চলনে পরিপাটি, নিজের বইখাতা গুছিয়ে রাখে, আর প্রতিটি পরীক্ষায় সেরা হয়।

কিন্তু একটা ব্যাপার ছিলো - সাব্বির সব সময় নিজের গল্প করে।

- “স্যার, আমি তো প্রথম!”
- “আমি তো আমার কাজ শেষ করে ফেলেছি!”
- “আমার খাতা দেখেন, একটাও ভুল নেই!”

রফিক স্যার বুঝলেন - শুধু ভালো ছাত্র হলেই চলবে না, সাব্বিরকে গড়ে তুলতে হবে পূর্ণ মানুষ হিসেবে। শুধু তথ্য নয়, দরকার অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি।

স্যার একদিন ক্লাসে নিয়ে এলেন একটা আয়না আর একটা পুরনো জানালার কাঁচ।

তিনি চুপচাপ দুটি বস্তু জানালার সামনের টেবিলে রাখলেন।

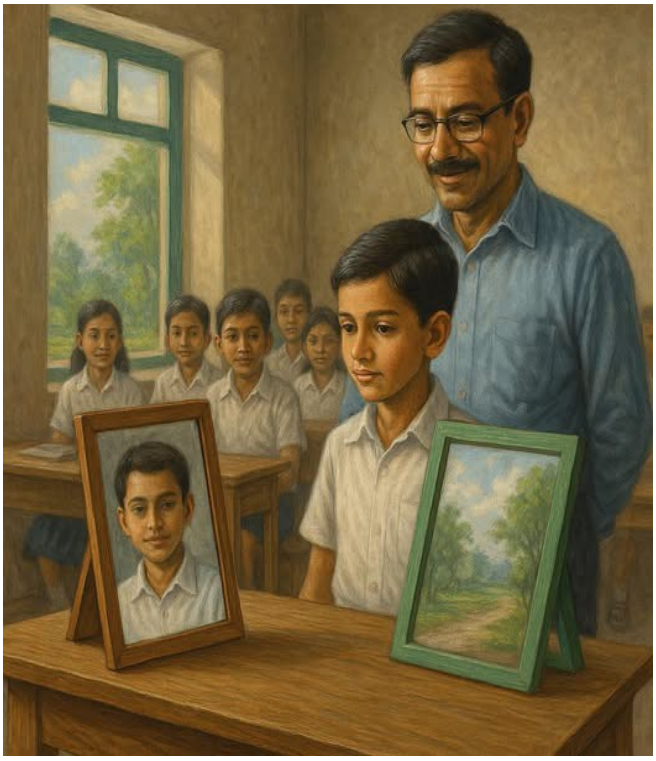

তারপর বললেন,

- “এই আয়নায় তাকাও। কী দেখো?”

সবাই বলল, “নিজেকে দেখি।”

- “আর এই জানালায়?”
- “বাইরের গাছ, মেঘ, পথঘাট দেখি!”

তারপর স্যার ক্লাস কে বললেন, “দেখ এই আয়না ও জানালা - দুটোই কাঁচ। শুধু আয়নায় পেছনে থাকে একটুকরো রূপালী প্রলেপ, যেটা শুধু নিজের প্রতিচ্ছবি দেখায়। আর জানালা? সেটাতে কোনো প্রলেপ নেই, তাই আমরা দেখতে পাই বাইরের দুনিয়া। আমাদের মনেও মাঝেমাঝে সেই প্রলেপ পড়ে - আমরা দেখি শুধু নিজেকে। মনে রেখো, ব্যক্তিগতভাবে, আমরা এক ফোঁটা পানি, কিন্তু একসাথে আমরা একটি সমুদ্র।”

রফিক স্যার এবার সাব্বিরকে বললেন, “তুমি কোনটা হতে চাও।”

সাব্বির বললো, “স্যার আমি কাঁচ হবো, জানালার মতো, অন্যদেরও দেখবো, কারো পিছিয়ে পড়া, কারো সাহস - এসব দেখলে আমার সহানুভূতিময় মন হবে এবং দায়িত্বশীল হবো।”

সাব্বিরের পরিবর্তন স্যার দেখলেন, শুধু বন্ধুদের সাহায্য করতে শুরু করল। যার খাতা ছিল এলোমেলো, তার পাশে গিয়ে বসল। যার স্যান্ডেল ছেঁড়া, তাকে সাহায্য করলো। সাব্বির এখন জানালা, সে অন্যকে দেখায় এমন কিছু, যা সে নিজে দেখতে পায় না। কেননা, জানালা খোলা থাকলে শুধু আলোই ঢোকে না, হাওয়া, রং আর জীবনের শব্দও আসে।

একদিন এক পরীক্ষায় প্রথম হলো না। কিন্তু তাতে মুখ ভার করলো না।

রফিক স্যার জিজ্ঞেস করলেন,

- “মন খারাপ না?”

সাব্বির হেসে বলল,

- “আমি তো এখন জানালার মতো, স্যার! আমি শুধু নিজের দিকে তাকাই না।”

আয়না কেবল নিজের প্রতিবিম্ব দেয়, কিন্তু জানালা অন্যের জীবনে আলো ঢুকতে দেয়। একজন শিক্ষার্থীকে শুধু নিজের ভালোতে নয়, অন্যের পাশে দাঁড়াতেও শিখতে হয়।

আয়না আমাদের শেখায় আত্মচর্চা, কিন্তু জানালা শেখায় সহানুভূতি। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু নিজের উন্নয়ন নয়, বরং অন্যের আলোতেও নিজেকে দেখতে শেখা। একদিন আয়না ছিল সাব্বির। এখন সে জানালা - আলোকিত, খোলা, সহানুভূতিসম্পন্ন। এমন শিক্ষার্থীর মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে আগামী দিনের মানবিক সমাজ।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১২১

“আমি ক্লাসে শিখেছি”

(“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প: পর্ব – ৩)

“প্রশাসন শেখায় কীভাবে কাজ হবে। কিন্তু একটি শ্রেণিকক্ষ শেখায় কেনো কাজ করা উচিত।”

নাজমুল আরিফ, বর্তমানে একজন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। স্মার্ট শার্ট, নির্ভুল নির্দেশনা, ঠোঁটের কোণে শীতল আত্মবিশ্বাস। কিন্তু একটা সময় ছিল, যখন তাকে কেউ চিনতো না, জানতো না। সে-ই আরিফ, যে একদিন নিজের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠ নিয়েছিল এক অজপাড়াগাঁয়ের ছোট্ট স্কুলঘরে। ২০২৬ সালে BCS পরীক্ষার আগে সরকার চালু করেছিল “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প। শর্ত ছিল, “পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে একবছরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।” অনেকে এই নিয়মে বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু আরিফ ভেবেছিল, “যাই হোক, এই এক বছর কাটিয়ে আসি।”

পোস্টিং এল মাদারীপুরের শিবচরের এক প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে। বিদ্যালয়ের নাম: চরমল্লিকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পাঁচটি শ্রেণি, ছয় জন শিক্ষক আর ৭৫ জন ছাত্র/ছাত্রী, কাঁচা রাস্তা, শুধু সাইকেলেই যাওয়া যায়, সবই আরিফের জীবনে ছিল একেবারে নতুন বাস্তবতা। কিন্তু তার তারুণ্য ও মনের স্পৃহা তাকে থামতে দেয়নি, এই বাস্তবতাকে অনুসন্ধান করা ও আস্বাদন গ্রহণ করাই ছিলো তার অদম্য ইচ্ছা। আরিফের কিছুটা গবেষণা করেছে প্রাইমারি স্কুল নিয়ে, যা ওকে শিখিয়েছে শিশু ছাত্রদের প্রশ্ন করতে শেখাতে হবে। প্রথম দিন ক্লাস ফাইভে ঢুকে আরিফ বললেন, “আজ আমরা শিখব কীভাবে প্রশ্ন করতে হয়। তোমরা কী জানতে চাও?” রুমে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। হঠাৎ পেছনের বেঞ্চ থেকে রাজীব বলে উঠল, “স্যার, প্রশ্ন তো আপনি করেন, আমরা উত্তর দিই! আমরা কেন প্রশ্ন করব?”

আরিফ একটু হেসে বললেন, “ভালো প্রশ্ন, রাজীব। তুমি জানো, প্রশ্ন করা মানে নিজের মনের দরজা খোলা। তুমি যদি প্রশ্ন না করো, তাহলে কীভাবে জানবে পৃথিবীটা কীভাবে চলে?”

রাজীব একটু ভেবে বলল, “তাহলে স্যার, আপনি এই চরে কেন এলেন? শহরে তো আরও ভালো চাকরি আছে!” ক্লাসে হাসির হিড়িক পড়ে গেল। আরিফ থমকে গেলেন। এই সরল প্রশ্নটি তার নিজের উদ্দেশ্যকেও প্রশ্নবিদ্ধ করল। তিনি বললেন, “রাজীব, আমি এসেছি কারণ আমি বিশ্বাস করি, তোমাদের মতো ছাত্রদের মধ্যে এই দেশের ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে। এখন বলো, তুমি কী হতে চাও?”

রাজীব লাজুক হেসে বলল, “ম্যাজিস্ট্রেট, স্যার। কিন্তু কাউকে ভয় দেখাব না।”

আরিফের বুকটা ধক করে উঠল। এই ছোট্ট ছেলেটির স্বপ্ন তার নিজের লক্ষ্যের প্রতিধ্বনি। তারপর ধীরে ধীরে স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে শুরু করলেন - Professional Learning Community গঠন। প্রতিসপ্তাহে একদিন সহশিক্ষকদের নিয়ে বসতেন -

- কে কোন ক্লাসে কী পদ্ধতি ব্যবহার করছে,
- কোন ছাত্র কেন পিছিয়ে যাচ্ছে,
- কীভাবে গল্প, খেলা বা প্রকৃতি দিয়ে পড়ানো যায়।

সবকিছু লিপিবদ্ধ করতেন, সমালোচনা করতেন এবং ব্যাবহারিক দিকটাতে দেখতেন। এই চর্চা তাকে শেখালো - সহযোগিতা মানেই দুর্বলতা নয়, বরং শিক্ষা গঠনের ভিত্তি। একবছর পর BCS পরীক্ষা দিল সে। উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসনে ঢুকে গেল। কিন্তু আজও তার অফিসঘরে সেই খাতার পাতা ফ্রেম করে রাখা আছে। কয়েক বছর পর, একদিন আরিফ অফিসের গাড়ি নিয়ে এক দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত করতে গেল চরমল্লিকপুরে, সেই জায়গা যেখানে একদিন সে শিক্ষকতা করত।

থানা ঘুরে, বিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ শুনল কারও ডাক - “স্যার!” পিছন ফিরে দেখল, রাজীব। এখন সে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র, চোখে আত্মবিশ্বাস, কথায় স্পষ্টতা। রাজীব বলল, “আপনি বলেছিলেন, ভয় না দেখিয়ে নেতৃত্ব দিতে হয়। আমি এখন ক্লাস ক্যাপ্টেন, আর সবাইকে বলি— ভুল করলে শেখা যায়, লুকিয়ে রাখা ঠিক না।”

আরিফ কিছু বলল না। শুধু মাথায় হাত রেখে বলল, “তুই এখন আমার শিক্ষক।”

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা তাকে বদলে দিয়েছে একজন মানুষ ও প্রশাসক হিসেবে। শিক্ষক হয়ে শেখার অভিজ্ঞতা, শিশুর চোখ দিয়ে দেশকে দেখা, আর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে মানবিকতা আনার যে প্রজ্ঞা তা এসেছে “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের সেই এক বছরের পাঠশালা থেকেই।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১২০

“ঘরের আলো - ঘরের বাইরে”

(“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প: পর্ব – ২)

“যে আলো জানালার ভিতরেই বন্দি থাকে, সে কখনো অন্যের পথ দেখাতে পারে না।”

তামান্না আফরিন, ঢাকার ধানমন্ডিতে বড় হওয়া, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন সদ্য। সারা জীবন এয়ারকন্ডিশনড ক্লাসরুমে ক্লাস করেছেন, কফির কাপ হাতে নোট বানিয়েছেন, ওয়ার্কশপে গিয়ে বলেছিলেন - “Education means empowerment.” তবে ২০২৫ সালের জুলাইয়ে যখন সরকার ঘোষণা করল, “BCS পরীক্ষার যোগ্যতা অর্জনে কমপক্ষে একবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা বাধ্যতামূলক”, তখন তামান্না একটু দমে গেলেন। মনে মনে বললেন, “গ্রামে গিয়ে পড়ানো! আমি তো ওদিকে কখনো গেছি না! ভালো করে বাংলাই তো বলতে পারি না।”

তবু পরিবারের অনুরোধ, নিজের স্বপ্ন, আর একরকম সামাজিক দায়িত্ববোধে সাড়া দিয়ে ফর্ম পূরণ করলেন। দুই সপ্তাহ পরে পোস্টিং এল, “শান্তিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলা”। তামান্না ভেবেছিলেন, কোথায় থাকবেন? আশেপাশে তো আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই! সেখানেই সরকারি প্রকল্প “শিক্ষা-ই-শক্তি” এর সঙ্গে আবাসনের জন্য একটা সহায়ক প্রকল্প আছে “শিক্ষক পাশের দরজার”। বিদ্যালয়ের পাশেই একটি সাদামাটা টিনের ঘর, দোতলা নয়, কিন্তু তাতে ছিল আলো, পাখা, পানি আর নিরাপত্তা। প্রথমবারের মতো নিজের ঘরের বাইরে একা থাকা। ভয়, কষ্ট, অথচ অদ্ভুত একটা মুক্তি।

প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকেই বুঝলেন, এখানে কেউ ইংরেজি কবিতা মুখস্থ করতে চায় না, কেউ বলে না “Ma’am, may I go to the washroom?” একটা ছোট্ট মেয়ে খালি পা নিয়ে এসে বলল, “আপা, আপনি শহর থেকে এসেছেন? আপনি কি চুল খোলা রাখেন সবসময়?” সেই প্রশ্নে তামান্নার ভেতর যেন কিছু নড়ে উঠল। দিন গড়াতে লাগল।

- দুপুরে এক বাটি খিচুড়ি ভাগ করে খাওয়া,
- বাচ্চাদের সঙ্গে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখা,
- রাতের ঘুম ভাঙা কুকুরের ডাক আর ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা গান।

একদিন ক্লাস ফোরে ঢুকে তামান্না আপা বোর্ডে লিখলেন:

“Sun” তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা জানো, এটা কী?”

সবাই চুপ। কেউ কেউ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বোর্ডের দিকে তাকাচ্ছে। তামান্না হালকা হেসে বললেন, “এইটা হচ্ছে সূর্য। সূর্যের আলো যেমন গরম দেয়, তেমনি আমাদের পথও দেখায়। আজ আমরা সবাই নিজের ‘সূর্য’ আঁকবো!” তিনি সবাইকে কাগজ দিলেন। কেউ আঁকল বড় হলুদ গোল বল, কেউ আঁকল আগুনের শিখা, কেউ কেউ লিখে দিল, “Sun gives light.” একটা মেয়ে লিখল, “Sun see me”, তামান্না লেখাটা দেখে কিছু না বলে তার খাতার নিচে ছোট করে লিখে দিলেন, “Sun sees me.” আর পাশে একটা ছোট্ট হাসিমুখ এঁকে দিলেন।

মেয়েটি খাতা নিয়ে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড, তারপর বলল, “আপা, আজ আমি ইংরেজি লিখেছি!”, “না রে, তুমি তো আলো লিখেছ!” ক্লাসের একপাশে বোর্ডে সে লিখে রাখল, “My students taught me how to see.” একদিন সন্ধ্যায় পেছনের উঠোনে বসে থেকে চিঠি লিখলেন নিজের ছোটবেলার বন্ধুকে: “স্নিগ্ধা, জানো? আমি যে তামান্না ছিলাম - সেই মোমবাতির মতো আলোয় নিজেকে সাজানো তামান্না, এখন মাঠে হাঁটি খালি পায়ে, বাচ্চাদের সঙ্গে হেসে উঠি তাদের বানানো ভুল বাক্যে, আর বুঝি, এই ভুলই তো শেখার শুরু। আমি একটা নতুন মানুষ হচ্ছি। জানালার আলোকে বাইরে এনেছি, এখন সেটা ছড়িয়ে দিতে চাই।”

একবছর পর BCS-এর ফর্ম তুললেন। সহযোগী শিক্ষকরা তাঁকে বিদায় দিলেন ফুল দিয়ে, চোখের পানি লুকিয়ে। ছোট্ট সেই মেয়ে বলল, “আপা, আপনি আমাদের মিস করবেন তো?” তামান্না জবাব দিলেন না, চোখের ভাষাই যেন যথেষ্ট ছিল।

“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প শুধু একজন শিক্ষকের কর্মস্থল বদলায় না, বদলায় তার দৃষ্টিভঙ্গি, উপলব্ধি, এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা।

তামান্নার মতো অনেকেই এখন বুঝতে শিখছে, আলো তখনই সত্যিকার অর্থে মূল্যবান হয়ে ওঠে, যখন তা কেবল ঘরের মধ্যে নয়, ঘরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। আজ প্রয়োজন দেশের প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি আনাচে-কানাচে, বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষিত তরুণদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি, ভালোবাসা ও শিক্ষার দীপ্ত আলো নিয়ে।

“শিক্ষক মর্যাদার নতুন দিগন্ত ”

(“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প: পর্ব – ৫)

“একজন শিক্ষক শুধু পাঠ্য পড়ান না, মানুষ গড়েন। আর তাই, সমাজ যদি সত্যিই গড়ে উঠতে চায়, প্রথমে শিক্ষকে পাশে নিতে হবে।”

জাহিদুল ইসলাম স্যার, বয়স তিরিশ ছুঁইছুঁই। ছোটবেলায় শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন শুধু মানুষের জন্য কিছু করবেন বলে, কিন্তু চাকরিতে ঢোকার পর টের পেয়েছেন - শিক্ষকের জীবন শুধু শ্রেণিকক্ষের নয়, একাকীত্ব আর আত্মত্যাগের পথ।

গঙ্গাচড়ার একটি প্রত্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যেখানে তিনি গত পাঁচ বছর ধরে কাজ করছেন। পরিবার থাকে ঢাকায় - স্ত্রী ও ছোট মেয়ে লাবিবা। মাসে একবার দেখা হয়। ভিডিও কলে মেয়ের ঘুমন্ত মুখ দেখে দিন কাটে। একদিন স্কুলে “মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক” একটি PLC- Professional Learning Community কর্মশালা হলো। সবারই অংশগ্রহণ, কিন্তু জাহিদ স্যার চুপ করে বসে থাকেন। মিতু ম্যাডাম একটি অনুশীলন করালেন, “একটা কাগজে লিখুন, আপনি আজ কী অনুভব করছেন।”

জাহিদ স্যার লিখলেন, “আমার দুই বছরের মেয়ে লাবিবার অনুপস্থিত আমাকে পিড়া দেয়, স্কুলে সন্তান তুল্য ছাত্র/ছাত্রীদের সঙ্গে থাকাতে ওর কথা সবসময় মনে পরে।” মিতু ম্যাডাম সে কাগজ কাউকে দেখালেন না, শুধু পাশে বসে বললেন, “আপনার কণ্ঠ শুধু আপনার মেয়ের না, এই স্কুলের সব বাচ্চার ভরসা।”

এরপর মিতু ম্যাডামের উদ্যোগে স্কুলে তৈরি হলো Work-Life Balance চর্চা:

- শুক্রবারে শিক্ষক-পরিবার দিন,
- সপ্তাহে একদিন সকল শিক্ষক মিলে রাতের খাবার,
- সহকর্মীদের মাঝে “Feel Check-in” রুটিন,
- শিক্ষকদের শিশুদের জন্য প্লে-জোন, যাতে তারা পরিবারসহ স্কুলে সময় কাটাতে পারেন।

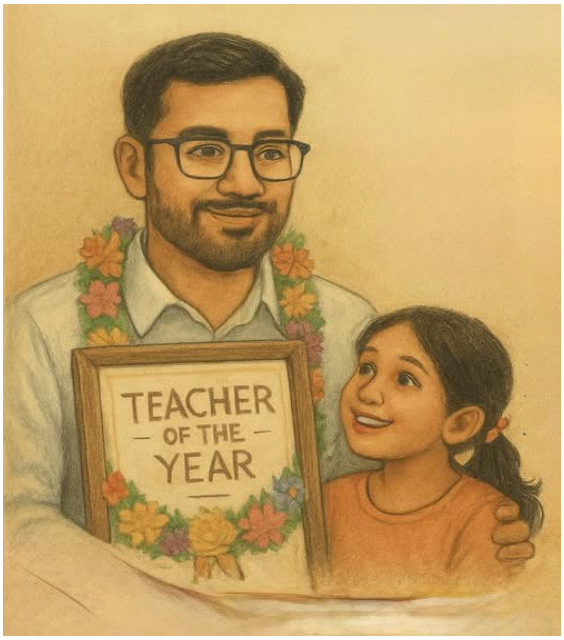

একদিন উপজেলা অফিস থেকে একটা চিঠি এলো, “শিক্ষা-ই-শক্তি Excellence Grant”-এর আওতায় স্কুলের তিনজন শিক্ষককে শিক্ষক আবাসন ভাতা ও পরিবহন ভাতা দেওয়া হবে। জাহিদ স্যার অবাক হয়ে বললেন, “আমি তো ভাবতাম, শিক্ষক মানেই সমাজে মাথা নিচু করে থাকা মানুষ।” মিতু ম্যাডাম হেসে বললেন, “না স্যার, এখন শিক্ষক মানে— একজন সম্মানিত, দক্ষ ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত পেশাজীবী।”

সেই বছরের ডিসেম্বর, এক নতুন সকাল। গঙ্গাচড়া উপজেলা মিলনায়তনে “Teacher of the Year” পুরস্কার নিতে মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন জাহিদ স্যার। সাদা পাঞ্জাবি, গলায় ফুলের মালা। হঠাৎ মঞ্চের নিচে কোলের উপর বসে থাকা মেয়েটি দাঁড়িয়ে বলল, “বাবা, তুমি আমার হিরো!” সবাই হাসল, কেউ কেউ চোখ মুছল।

এর মাঝে কিছু ছোট ছোট শিক্ষক বান্ধব প্রীতিশ্রুতি এলো সরকার থেকে,

- জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে “Teacher Next Door” ফান্ডে লোন মওকুফ,
- পিতৃত্বকালীন ছুটি, শিক্ষকদের সন্তানদের জন্য বৃত্তি, ও সহকর্মী সহায়তা নীতিমালা,
- স্কুলের শিক্ষককে দিয়ে শিক্ষানীতি উপদেষ্টা ফোরামে ডাক,
- কমিউনিটি রেডিওতে “শিক্ষকের দিনলিপি” নামে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান।

একদিন স্কুলের টিফিন ব্রেকে শিক্ষক কক্ষে হাসির রোল। মিতু ম্যাডাম চা ঢালছেন, আর পাশ থেকে এক নতুন শিক্ষক বললেন, “স্যার, শুনলাম আপনি এবার উপজেলা উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন?”

জাহিদ স্যার মাথা নেড়ে বললেন, “হ্যাঁ, ‘শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সামাজিক সম্প্রীতি’ নিয়ে মতামত নিতে ডেকেছিল। ভাবিনি কখনো, শিক্ষক হিসেবে প্রশাসনের মিটিংয়ে জায়গা পাব।”

মিতু ম্যাডাম বললেন, “আমরা তো সমাজের ভিতরে কাজ করি, তাই ভিতরের কথা জানি। স্যার, শিক্ষক মানেই এখন আর কেবল ক্লাস নয়, সমাজের সামনে দাঁড়ানো মানুষ, এটি রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ।”

পরে মাসিক সম্মেলনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বললেন, “শিক্ষকদের বেতনকে এখন ‘সম্মানভাতা’ বলা হয় - কারণ তারা জাতির সম্মানের প্রতিনিধিত্ব করেন। বর্তমানে একজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাসে ৫০,০০০ টাকার উপরে সম্মানী পান, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আবাসন ভাতা, পরিবারভিত্তিক পোস্টিং, বার্ষিক মানসিক স্বাস্থ্য ছুটি ও শিক্ষাসহায়ক অনুদান।”

একজন শিক্ষকও মানুষ - যার হাসির পেছনে থাকে প্রতিদিনের লড়াই, যার মনেরও নিরাময় প্রয়োজন। “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প শুধু ছাত্রদের জন্য নয় - এটা শিক্ষকদেরও নতুনভাবে বাঁচার পথ দেখায়। কারণ যদি একজন শিক্ষক ভেঙে পড়েন, তাহলে অনেক শিশুর মনের ভেতরেও ধ্বস নামে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১২২

“অভিজ্ঞতার হাত ধরে”

(“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প: পর্ব – ৪)

“একটা আলো আরেকটাকে জ্বালায়। আর যদি সেই আলো হাত ধরে হাঁটে, তবে স্কুল হয় আলোয় ভরা ঘর।”

পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামে, কুয়াশা ঘেরা সকাল পেরিয়ে সূর্য যখন হালকা গায়ে রোদ মেলে, তখন এক নতুন মুখ হাজির হলো গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উঠোনে।

সাবিহা তানজীম, সদ্য B.Ed শেষ করা তরুণ শিক্ষিকা। শহুরে পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ, পরিপাটি চুলে খোঁপা, চোখে একরাশ আশঙ্কা আর বুকভরা স্বপ্ন। “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের আওতায় তার প্রথম পদচারণা এই প্রাইমারি স্কুলে। উদ্দেশ্য? এক বছরের শিক্ষকতা শেষে BCS-এর পরীক্ষা দেওয়া।

প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকে সে যেন ভিন্ন গ্রহে এসে পড়েছে। কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ চেয়ার ঘুরাচ্ছে, কেউ বন্ধুকে কানে কানে কিছু বলছে। বই খোলা নেই, মন খোলা নেই। সাবিহা ম্যাডাম বোর্ডে লিখেই শুনতে পেলেন রব, শব্দ তো নয় যেন একটা অরণ্য।

কিছুক্ষণ পর শিক্ষক কক্ষে এসে চুপচাপ বসে কাঁদতে লাগল। সেদিনই পাশে এসে দাঁড়ালেন রোকন স্যার, এই স্কুলের ২৬ বছরের অভিজ্ঞ শিক্ষক। গলার স্বরে কোমলতা, চোখে জ্ঞানগম্ভীরতা, হাতে কলম নয়, সহানুভূতির স্পর্শ।

তিনি হেসে বললেন, “ছাত্ররা আগে মানুষ চেনে, তারপর বই। তুমি আগে ওদের নাম জানো, নাম ধরে ডাকো। দেখবে ক্লাস নিজেই শান্ত হয়ে যাবে।”

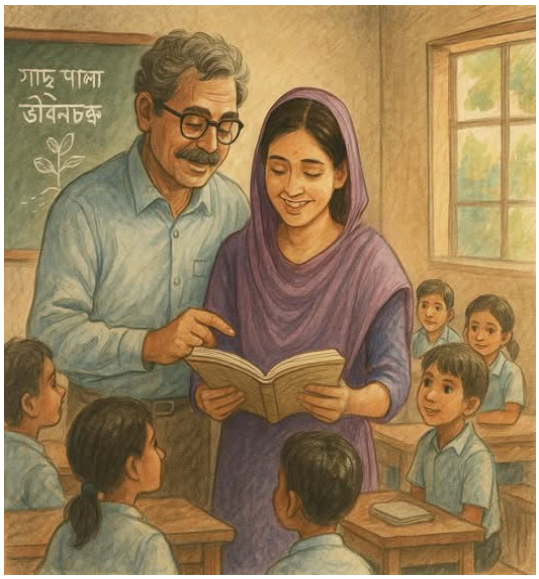

এরপর শুরু হলো এক অন্যরকম অধ্যায় - Mentorship।

প্রতিদিন দুপুরে দুই শিক্ষক বসেন একসাথে:

- পাঠ পরিকল্পনা করেন,
- শিশুদের আচরণ বিশ্লেষণ করেন,
- গল্প, খেলা ও প্রকৃতির সংলাপ দিয়ে পাঠ শেখার পদ্ধতি বের করেন।

একদিন “গাছপালার জীবনচক্র” পড়ানো হচ্ছিল।

রোকন স্যার ক্লাসে ঢুকে নাটকের মতো বললেন, “আমি এক বীজ, কিন্তু কেউ যদি পানি না দেয়, আমি কীভাবে বড় হব?”

সব শিশুরা হইহই করে বলে উঠল, “আমি দেব!”

সাবিহা মৃদু হেসে বলল, “আমি আলো দেব।”

ক্লাসটা যেন বইয়ের পাতা থেকে উঠে এল মাটির ঘ্রাণে।

সেদিন বিকেলে সাবিহা ম্যাডাম ধীরে ধীরে বলল, “স্যার, আপনি যদি আমার মেন্টর না হতেন, আমি হয়তো ভুলেই যেতাম কেন শিক্ষক হতে চেয়েছিলাম।”

রোকন স্যার শুধু বললেন, “তুমি তো এখন নিজেই এমন একজন, যার হাত ধরে কেউ একদিন শিক্ষকতা শিখবে।”

“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প, একটি দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্লব। এই প্রকল্প শুধু একটি প্রশাসনিক শর্ত নয় - এ এক নতুন উপলব্ধির দরজা।

আগে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রেরা সরাসরি রাষ্ট্র চালাতো, এখন তারা প্রথমে শিশুদের পাশে দাঁড়ায়। শুধু শাসনের ভাষা নয়, মানবিকতা শেখে। একজন ভবিষ্যৎ ম্যাজিস্ট্রেট যখন প্রথম শ্রেণির এক শিশুকে শেখায় কিভাবে কলম ধরতে হয়, তখন সে নিজের হাতকেও নরম করতে শেখে।

দেশ গড়ার আগে দেশকে ছুঁয়ে দেখা জরুরি। আর সেই ছোঁয়া আসে একটি শিশুর খাতা ধরার মুহূর্তে। “শিক্ষা-ই-শক্তি” যেন সেই প্রথম ছোঁয়া - যেখানে তরুণেরা কেবল জ্ঞানের কারিগর নয়, ভালোবাসার বাহক হয়ে ওঠে।

নবীন শিক্ষকদের পাশে অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাত মানেই শেখার গতি কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়া।

Mentorship মানে শুধু নির্দেশনা নয় - মানে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, এবং সেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জ্ঞান হস্তান্তরের স্পন্দন। সেই স্পন্দনই তো একদিন একটি শ্রেণিকক্ষ থেকে গোটা জাতির হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১২৫

“গ্রীষ্মের ছুটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা”

(“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প: পর্ব – ৭)

“যেখানে কল্পনা নেই, সেখানে প্রযুক্তি শুধু যন্ত্র। কিন্তু যেখানে স্বপ্ন জাগে, সেখানে গরম ধুলো মাখা মাঠেও জন্ম নিতে পারে ভবিষ্যৎ।”

মাদারীপুর জেলার এক সরকারি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, এই বছরের গ্রীষ্মে বদলে গেল চিত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চারজন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র - তানভীর, রাকিব, মিশু ও রাফসান - ‘শিক্ষা-ই-শক্তি’ প্রকল্পের আওতায় এক অভিনব উদ্যোগ নিলো: “Summer AI Bootcamp” নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ১৪ দিনের এক আকর্ষনীয় শিক্ষা শিবির।

তাদের লক্ষ্য ছিল পরিষ্কার, “শুধু ছুটি নয়, প্রযুক্তির মাধ্যমে চিন্তা জাগাও। শুধু পাঠ নয়, কল্পনায় শেখো - এটাই হোক এই গ্রীষ্মের নতুন যাত্রা।”

মাদারীপুরের সরকারি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি কম্পিউটার ঘর আছে যেখানে সরকার থেকে দেওয়া ২১ টি কম্পিউটার, প্রিন্টার ও স্মার্ট বোর্ডে আছে।

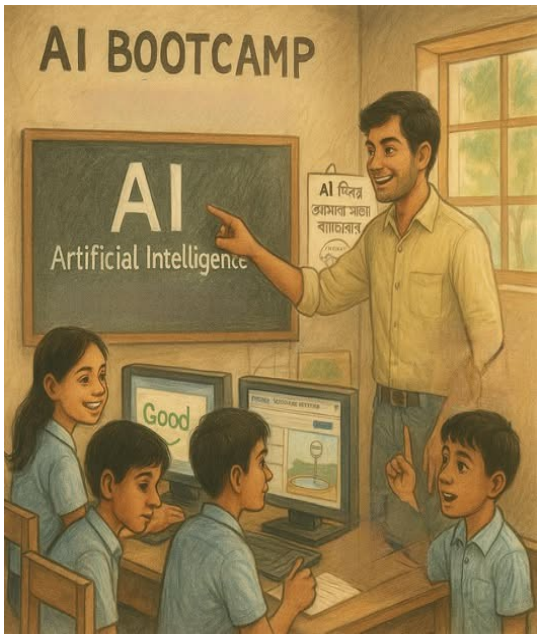

প্রথম দিন, স্মার্টবোর্ডে তানভীর লিখল:

“AI মানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু বুদ্ধি কি শুধু মানুষের থাকে?”

ক্লাস স্তব্ধ। সুমাইয়া বলে উঠল, “স্যার, মোবাইলে যখন বলি গান চালাও—এটাও কি AI?”

তানভীর হেসে বলল, “তুমি তো আমাদের ক্লাসের প্রথম এই বিজ্ঞানী!”

প্রতিদিনের ক্লাসে ছিল না শুধু লেকচার - ছিল প্রশ্ন, কল্পনা, খেলা আর সমাধান খোঁজার আনন্দ।

• কেউ প্রশ্ন তুলল“কোন রাস্তা দিয়ে রিকশা গেলে সময় কম লাগে?”

• কেউ বলল“ কৃষক চাচার জন্য একটা অ্যাপ দরকার, কবে কোন ফসল বপন করতে হবে।”

তারা Google Teachable Machine-এ নিজেরা বানালো AI মডেল।

ক্লাসে হাসলে স্ক্রিনে লেখা আসে– “Good”, আর কান্না করলে —“Support”।

চতুর্থ দিনে শিক্ষার্থীরা করল প্রকল্পভিত্তিক উপস্থাপনা:

• পুকুরে মাছের খাবার ছিটানোয় AI টাইমার,

• স্কুলে উপস্থিতি মাপতে মুখ শনাক্তকরণ সফটওয়্যার!

তানভীর বলল, “তোমরা এখন প্রযুক্তি শেখো, কারণ তোমরাই একদিন নীতিনির্ধারক হবে। ‘শিক্ষা-ই-শক্তি’ প্রকল্প শুধু চাকরির শর্ত না, এটা সমাজে ফিরে আসার দরজা।”

শেষ দিনে দেয়ালে সবাই একসাথে লিখল,

“আমরা শুধু ছাত্র না, আমরা চিন্তার কারিগর। প্রযুক্তি আমাদের হাত, কিন্তু স্বপ্ন - সেটাই আমাদের চোখ।”

গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে, কক্ষভর্তি জ্বলন্ত চোখ আর জিজ্ঞাসা যেন বলে দিলো, স্কুলের কিশোর/কিশোরীদের মাঝে অঙ্কুরিত হয় প্রযুক্তির বীজ, যদি শিক্ষক হয় তরুণ, আর শিক্ষা হয় উৎসব।

তরুণ BCS প্রার্থীরা যখন শিক্ষক হয়ে ফিরে আসেন, তখন তারা শুধু পাঠ পড়ান না, একটা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেন।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১২৪

“এক বছরের শিক্ষা, এক জীবনের দর্শন”

(“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প: পর্ব – ৬)

“যে এক বছর শ্রেণিকক্ষে কাটিয়েছিলাম, সেই একটি বছরই আমাকে মানুষ চিনতে শিখিয়েছে। আর সেই শেখাটাই আমার রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তি।”

আমার নাম আবরার হোসেন, BCS প্রশাসন ক্যাডার ৪৭তম ব্যাচ। বর্তমানে আমি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কাজ করছি। এই লেখা আমি লিখছি আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক বছরের কথা মনে করে, সেই এক বছর, যখন আমি ছিলাম একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

২০২৬ সালে সরকার চালু করেছিল “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প। ঘোষণা ছিল - “BCS পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে, অন্তত একবছরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।”

শুরুতে আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। ভাবলাম, “এইটুকু সময় হাতে, তার মধ্যে আবার প্রাইমারি স্কুল?”

তবু বাধ্যতামূলক বিধি মেনে পোস্টিং নিলাম, ভোলার দক্ষিণ চরবংশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। নদীর ধারে, বাতাসে কাদার গন্ধ, আর কিছু নিষ্পাপ দৌড়ানো ছোট ছোট শিশু যেন দেবদূত।

প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকে বোর্ডে লিখেছিলাম - “আমার নাম আবরার।”

একটা ছোট্ট ছেলে কৌতূহলী চোখে জিজ্ঞেস করল, “স্যার, আপনি কি আমাদের নতুন ‘বড় স্যার’?”

আমি হাসলাম, আর ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, “হ্যাঁ, তবে তোমাদের সঙ্গে ছোট হয়ে থাকবো।”

তারপর একে একে ওদের নাম জানতে লাগলাম। প্রতিটা নাম যেন এক একটা মুখ হয়ে উঠলো, ওরা, হাসতে হাসতে বলে “রাহাত”, গম্ভীর গলায় বলে “মিথুন”, কারো নাম শুনেই বোঝা যায়, সে রঙ খেলার মতো চঞ্চল।

নাম আর মুখ, একসময় আলাদা ছিল না, একসাথে গেঁথে গেল মনে, যেন প্রতিটি নামের ভেতরেই একটা গল্প লুকিয়ে আছে।

তাদের চোখে ‘স্যার’ মানে এক মহামানব, যিনি সব জানেন।

কিন্তু সেদিন আমি বুঝলাম, আমি যতটা না জানি, তার চেয়ে বেশি জানি না।

সেই এক বছরে যা শিখেছি, তার কিছুর তালিকা নিচে দিলাম,

• দায়িত্বের মানে শুধু নিয়ম মানা নয়, মন ছুঁয়ে যাওয়া,

• প্রশাসনের কাজ কাগজে সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত,

• একজন শিশু কীভাবে ভাবছে, সেটাই নীতিনির্ধারণের সূচনা হতে পারে। কারণ শিশুর ভাবনায় ন্যায়ের আহ্বান ও সমতার বোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জায়গা করে নেয়।

আজ আমি যেসব নীতিগত বিষয়ে সুপারিশ করি, যেমন,

- গ্রামে স্কুলভিত্তিক টিফিন প্যাকেজ,
- পাঠ্যবইয়ে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার,
- বা পিতৃত্বকালীন ছুটি শিক্ষকদের জন্য।

সবকিছু আমার সেই এক বছরের অভিজ্ঞতার ফল।

আমি তখন বুঝেছিলাম, শিশুরা শুধু পাঠ নয়, অবসরের সময়, খেলার পরিবেশ, এক কাপ দুধ, একটা গাছের নিচে গল্প - এসব দিয়েও শিক্ষা নেয়। একদিন আমাকে ঢাকায় একটি শিক্ষানীতি সংশোধনী উপদেষ্টা কমিটিতে ডাকা হয়।

আমি বললাম, “নীতিনির্ধারকদের প্রথমত একবছরের শিক্ষকতা করা উচিত। কারণ শ্রেণিকক্ষকে না ছুঁয়ে যিনি শিক্ষানীতি তৈরি করেন, তিনি হয়তো গঠন করেন কাঠামো, কিন্তু গড়তে পারেন না মানুষ।”

এক বছরের শিক্ষকতা আমাকে যা শিখিয়েছে, তা দশ বছর প্রশাসনে থেকেও আমি পাইনি।

এখন আমি যখন একটি ফাইলে স্বাক্ষর করি, আমি মনে করি. “এই সিদ্ধান্ত যদি আমার ছাত্র ফারদিনকে ব্যাখ্যা করতে হতো, আমি কীভাবে করতাম?”

এই একটি ভাবনাই আমার নৈতিক ভিত্তি।

“শিক্ষা-ই-শক্তি” আমাকে শুধু একটি শর্ত দেয়নি, আমাকে দিয়েছিল একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যা দিয়ে আমি দেখি মানুষ, রাষ্ট্র, এবং ভবিষ্যৎ।

“লেখার পরিমার্জন চিন্তার গভীরতা গড়ে তোলে”

কিশোরগঞ্জের এক গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র তানভীর। চুপচাপ, কিন্তু ভেতরে কল্পনায় ভরপুর। তার হাতে কলম দিলে লেখা আসে, তবে এলোমেলো।

শ্রেণিশিক্ষক আনোয়ার স্যার লক্ষ্য করেন, তানভীর যে ভাবছে, সেটা বোঝা যায় তার দৃষ্টি আর নড়াচড়া থেকে, কিন্তু লেখা ঠিক জমে না।

স্যার একদিন ক্লাসে সবাইকে বললেন, “আজ একটা ছোট রচনা লিখবে, ‘আমার সকালের শুরু’। কিন্তু আমরা আজ এক লেখা দিয়ে চারটি ধাপ পার হবো। লেখা শুধু নয়, ভাবনার রূপান্তরও হবে।”

তানভীর কলম তোলে।

ধাপ ১: সরল ভাষা (শুধু ঘটনা):

“আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠি। মা নাস্তা ও পানি দেন, তারপর স্কুলের জন্য রেডি হই।”

আনোয়ার স্যার হাসলেন। বললেন, “এবার ভাবো, এই বাক্যগুলো যেন কেউ পড়ছে না, বরং দেখছে। ভাষা শুধু কাজ বলার নয়, ছবি দেখানোর মাধ্যম।”

ধাপ ২: ভাষার প্রকাশ ও সাহিত্য:

তানভীর আবার লিখলো, “ভোরের আলো চোখে পড়তেই আমি ঘুম থেকে উঠলাম। মা এক গ্লাস ঠান্ডা পানি হাতে দিলেন - যেন ভোরটা জেগে উঠলো আমার মুখে। জানালার ফাঁক দিয়ে তাকালাম—পাখিরা গানের স্কুলে যাচ্ছে যেন!”

আনোয়ার স্যার চোখ বড় করলেন। “তানভীর, এইবার কিন্তু তুমি শুধু বলোনি, তুমি দেখিয়েছো।”

ধাপ ৩: প্রকৃতির সংযোগ: স্যার বললেন, “এবার ভাবো, তুমি একা নও। তুমি প্রকৃতির একটা অংশ। তুমি তোমার জাগরণকে প্রকৃতির সঙ্গে মেলাও।”

তানভীর ভাবলো, লিখলো:

“সকালের আলো আসলে কেবল জানালায় পড়ে না, পড়ে মনেও। পাখিরা জানালার রডে বসে ছিল, তারা আমার চোখে তাকায়। বাতাস আমার চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। যেন তারা বলছে ‘তুমি জেগে উঠেছো, আমরাও জেগে আছি।’”

ধাপ ৪: কল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টি:

স্যার এবার আস্তে বললেন, “শেষ ধাপ—তুমি এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবে তোমার লেখাটাকে, যেটা বাস্তব নয়, কিন্তু সত্যের চেয়েও গভীর।”

তানভীর চোখ বন্ধ করলো। তারপর ধীরে ধীরে লিখলো:

“আমি হেঁটে গেলাম জানালার বাইরে - যেখানে ফুলেরা মানুষের মতো কথা বলে, বাতাস বলে, ‘ভয় পেয়ো না, আজকের দিন শুধু তোমার জন্য।’ সেখানে এক গাছ দাঁড়িয়ে, তার পাতা দিয়ে লিখছে - ‘তুমি কী ভাবছো, সেটাই তুমি।’ আমি বুঝলাম, প্রতিদিন সকালে আমি শুধু ঘুম থেকে উঠি না, আমি একটা নতুন পৃথিবীতে জন্মাই।”

আনোয়ার স্যার তানভীরের চারটি স্তরের লেখা ক্লাসে পড়ে শোনালেন। বললেন, “তোমরা দেখলে? একটা ছোট্ট বাক্য, কতদূর নিয়ে যেতে পারে তোমার চিন্তা। এটাই লেখার শক্তি। আর এই ভাবেই আমাদের মনের ভেতরের কুয়াশা সরে যায়।”

স্যার আরও বললেন, “যে নিজের লেখাকে কাটাকুটি করে, সে কেবল শব্দ নয়, নিজের মনকেও পরিষ্কার করে।

আর পরিষ্কার মনই দেখতে পারে পৃথিবীর গভীর রঙ।”

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শুধু লেখা দিতে বললে হবে না, তাদেরকে চিন্তার স্তরভাগ শিখাতে হবে।

“ঘটনা →ভাষা →অনুভব →কল্পনা”

এই পথ ধরে লেখার মধ্য দিয়ে তারা নিজের চিন্তাকেই পরিষ্কার করতে শেখে।

“তোমার লেখার পাতাটা এমনভাবে ভরাও, যেন তা হয় তোমার হৃদয়ের নিঃশ্বাস।” - উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ

“পরিষ্কার লেখা মানেই পরিষ্কার চিন্তা”

শীতের সকাল। নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেয়ালে শিশির জমে আছে। বাঁশের বেড়ার ফাঁক গলে রোদের আলোর ফালি ঢুকছে ক্লাসে, আর বেঞ্চে বসে অপু নামের এক পঞ্চম শ্রেণির ছেলে চুপচাপ নিজের খাতায় তাকিয়ে আছে।

কিন্তু ভাবনারা যেন এলোমেলো লতাগুল্ম হয়ে জড়িয়ে আছে মাথার ভেতরে। একবার “মা” বিষয়ক রচনা লিখতে বললে অপু লিখেছিল: “আমার মা রান্না করেন। আমার মা ভালো। সে আমায় ডাকে। আমি ভালো থাকি। মা হাসেন। রান্না ভালো লাগে।” এই লেখায় সব ছিল - শব্দ, বাক্য, এমনকি অনুভবও। তবু শ্রাবন্তী ম্যাডাম তা পড়ে একটানা চুপ করে বসে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর খুব ধীরে বলেছিলেন, “তুমি তো লিখছো, কিন্তু লিখে যাচ্ছো শুধু শব্দ। একটা লেখা যেন নদীর মতো হয় - যেখানে ভাবনার স্রোত বয়ে চলে, বাঁক নেয়, ঢেউ তোলে।” সেদিন থেকে শ্রাবন্তী ম্যাডাম ঠিক করেন, অপুর লেখার ভিতর ঢুকতে হবে। ভাবনা যদি কুয়াশায় ঢাকা থাকে, তবে শব্দই হবে আলো। সেদিন ক্লাসে তিনি বললেন, “আজ আমরা সবাই চিঠি লিখবো। ঠিক যেমন মনে হচ্ছে, তেমনই - যার কোনো নিয়ম নেই। আগে যা খুশি লিখো, পরে আমরা তাকে সাজাবো।” অপু চুপচাপ কলম তুলল। জানালার কাঁচটা কুয়াশায় ঝাপসা, বাইরে পাখির ডাক যেন দূর থেকে ভেসে আসা সুর। সেই পরিবেশে অপু লিখল তার, প্রথম খসড়া: আজ সকালটা কুয়াশা ছিল। আমি স্কুলে এলাম। ক্লাসে সবাই লিখছিল। আমার ভয় লাগলো। ম্যাডাম বললেন লিখতে। আমি চেষ্টা করলাম। আমি ভয় পেয়েছি, সাহস পেয়েছি। আমি লিখলাম। ম্যাডাম কাগজটি হাতে নিয়ে একবার তাকালেন, তারপর অপুর চোখে চোখ রেখে বললেন, “এই লেখাটা, অপু, হলো তোমার মনের একটা ঘোলা আয়না। এখন আমরা তাতে একটু একটু করে পানি ছিটিয়ে পরিষ্কার করবো। ভাবো তো, কেউ যদি তোমার এই কথাগুলো পড়ে, সে যেন শুধু শব্দ না, অনুভব দেখে। আমরা এবার শব্দে ছবি আঁকবো।” অপুর খাতায় শুরু হলো কাটাকাটি। “কুয়াশা ছিল” - এর পাশে লেখা হলো “কুয়াশার চাদর”, “ভয় লাগলো” - এর নিচে টানা হলো লাল দাগ, পাশে লেখা: “কেন ভয়?”, “আমি লিখলাম”- এর নিচে লেখা: “এটাই কি শুরু?” এল, দ্বিতীয় খসড়া: “সকালে হেঁটে স্কুলে আসছিলাম, চারপাশ ছিল কুয়াশার তুলোর চাদরে মোড়া, যেন প্রকৃতি নিজেই একটা চুপচাপ চিঠি লিখে রেখেছে আমার জন্য। মনে হচ্ছিল, আমি হেঁটে যাচ্ছি এক স্বপ্নপুরীর ভেতর দিয়ে, আর ভয়টা যেন একটা ছায়ার মতো, পা টিপে টিপে আমার পেছনে পেছনে হাঁটছে। ক্লাসে এসে আমি চুপচাপ ছিলাম, মনে হচ্ছিল আমি যেন একটা অব্যক্ত প্রশ্ন, যার উত্তর কেউ জানে না। তখনই শ্রাবন্তী ম্যাডাম বললেন, ‘যা অনুভব করো, তাই লেখো। শব্দ দিয়ে নিজের জানালা খুলে দাও।’ “আমি চোখ বন্ধ করলাম। মনে হলো, ভেতরের একটা দেয়াল ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা ছবি, মেঘের ভেলায় ভাসা এক ভয়, আর তার পাশেই বসে থাকা সাহসের পাখি। আমি ভয় পেয়েছি, হ্যাঁ, কিন্তু সেই ভয়-ছায়া থেকে জন্ম নিয়েছে একটা দীপ্ত আলো।” বোর্ডের দিকে তাকিয়ে শ্রাবন্তী ম্যাডাম বললেন, “এই লেখাটা শুধু তোমার নয়, তোমার ভেতরের ভাবনাগুলোর গুছিয়ে হাঁটার চেষ্টা। বোর্ডে গিয়ে একবার লেখো, ক্লাসটাকে শোনাও।” অপু উঠে দাঁড়াল। প্রথমে একটু কাঁপছিল হাত, কিন্তু লেখার শুরু হতেই হাত থামল না। সাদা বোর্ডের ওপর কালো চকের আঁচড়ে ফুটে উঠল অপুর প্রথম পরিচ্ছন্ন চিন্তা। ক্লাসের সবাই নিঃশব্দ। একটা কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল, একটা ভীতু ছাত্র, আর তার সাহসী শব্দেরা যেন তাদের বুকের ভেতরেও আলো ঢেলে দেয়। শ্রাবন্তী ম্যাডাম বোর্ডের নিচে লিখে দিলেন, “ভয় পেরিয়ে লেখা, সাহসের সিঁড়ি। একটা শিশু যদি নিজের অনুভব শব্দে ঢেলে দিতে শেখে, তবে সে শুধু লেখে না - সে চিন্তা করতে শেখে। পরিষ্কার লেখা মানে - মনের জানালা খুলে দেওয়া।” “লেখা” হলো প্রক্রিয়াজাত তথ্য, স্মৃতি এবং আবেগের উপর ভিত্তি করে আমাদের আচরণ এবং পছন্দ। তাই লেখা শেখানো মানে কেবল বানান বা বাক্য শেখানো নয়। লেখা শেখানো মানে শিশুকে নিজের মন পরিষ্কারভাবে বুঝতে সাহায্য করা। আর সেই কাজটাই শুরু হয় শ্রেণিকক্ষে, শিক্ষক ও ছাত্রের সাহসী সহযোগিতায়। সকল শিশুর মনেই ভাবনা থাকে, কিন্তু সেগুলো এলোমেলো। শিক্ষক যদি সময় দেন, সাহস দেন, কাটাকুটির সুযোগ দেন, তবেই সেই ভাবনাগুলো লেখায় পরিণত হয়। “পরিষ্কার লেখা মানেই পরিষ্কার চিন্তা”, আর পরিষ্কার চিন্তা তৈরির শ্রেষ্ঠ জায়গা - প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ। "লেখার মাধ্যমে, আমরা আমাদের অন্তরের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে এবং অন্যদের সাথে আরও ভালোভাবে সংযোগ স্থাপনের জন্য আমাদের সৃজনশীলতা ভাগ করে নিতে সক্ষম হই।" প্রতিটা স্কুলে “Writer's Club” বা “লেখক ক্লাব” থাকা দরকার।

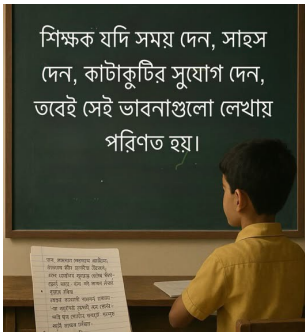

ধনুক-ভাঙা পণ – ১২৯

“সোনার বাংলার ইতিহাস”

মাকসুদ স্যার আজ চতুর্থ শ্রেণিতে পাঠ দিতে এসে, গল্প বলা শুরু করলেন, বললেন গল্পটা মনোযোগ দিয়ে শোন, আমি বার বার বলবো এই গল্প। যতক্ষন না তোমরা সবাই রায়হানের সঙ্গে ঘুরে আসো ওর দাদার ঘড়িটা নিয়ে, আচ্ছা।

স্যার গল্প শুরু করলেন:-

ঢাকার এক পুরনো পাড়ায় থাকে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া ছাত্র রায়হান। তার সবচেয়ে প্রিয় কাজ—ভাঙা ঘড়ি, পুরনো রেডিও, টিভি খোলাখুলি করা। সবাই তাকে ডাকে “টোকাই বিজ্ঞানী”। একদিন রায়হান তার দাদার পুরনো ট্রাঙ্ক ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা অদ্ভুত ঘড়ি খুঁজে পেল। ঘড়িটার পেছনে লেখা, “টাইম মেশিন – সময়ের দরজা খোলো!”

রায়হান খেলতে খেলতেই ঘড়ির বোতাম টিপে ফেললো। ঝট করে চারপাশ ঝাপসা হয়ে গেল। সে চোখ খুলে দেখে, চারদিকে কালো-সাদা ছবি যেমন পুরনো টিভিতে হয়, তেমন দৃশ্য!

এক ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কোথা থেকে এসেছো? এখন ১৯৫২ সাল! আমরা বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন করছি।”, রায়হান হা করে তাকিয়ে রইলো।

—“আপনারা তো বাংলায় কথা বলেন! তাও আন্দোলন?”

—“হ্যাঁ বাবা,” তিনি বললেন, “পাকিস্তানের শাসকেরা চায় আমরা শুধু উর্দু বলি, কিন্তু আমরা বাংলায় কথা বলি, বাংলাই আমাদের মা!”

রায়হান দেখলো, কিছু ছাত্র-যুবক রাস্তায় “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই” লিখে প্ল্যাকার্ড ধরেছে। কিছুক্ষণ পর পুলিশের বাঁশি, ধাওয়া... হঠাৎ গোলাগুলি। শহীদ হলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার... সে দিনটি ছিলো অমর ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২।

রায়হান ভয় পেয়ে গেল, আর তখনই টাইম মেশিনের বোতাম আবার বাজলো।

এইবার সে পৌঁছে গেল ১৯৭১ সালে।

চারদিকে যুদ্ধের ধ্বনি, রেডিওতে ঘোষণা: ২৭ মার্চ ১৯৭১ “আমি মেজর জিয়া বলছি, আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।”

এক মুক্তিযোদ্ধা তাকে বললো,

— “১৯৫২ ভাষা আন্দোলণে শুরু, তারপর আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের গান, আমাদের ভোট, সব কেড়ে নিচ্ছিল। তাই আমরা ৯ মাস যুদ্ধ করে স্বাধীন দেশ বানিয়েছি, ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগে, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে। এ যুদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার জন্য। আর এই আন্দোলনের নেতা কে জানো?”

রায়হান মাথা নাড়ে।

— “তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান। মানুষ তাকে ডাকে বঙ্গবন্ধু বলে। তিনি বলেছেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!’ এই কথাতেই আমরা সাহস পেয়েছি। জয় বাংলা, জয় বাংলা আমাদের মুক্তির জয়ধ্বনি।”

রায়হান বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। সে দেখে একটা বিশাল জনসভা, লাখো মানুষ, আর মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মানুষ, সাদা পাঞ্জাবি, কালো কোট, আঙুল তুলে বলছেন: “বাংলার মানুষকে আর কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না।” ৭ মার্চ, ১৯৭১ স্থান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

রায়হান মনে মনে বলে,

—“শেখ মুজিব ছাড়া বাংলাদেশ হয় না।”

রায়হান দেখে, কাঁধে রাইফেল নিয়ে এক তরুণ গাইছে , “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।”

এরপর টাইম মেশিন আবার ঘুরলো। রায়হান ফিরে এলো তার নিজের ঘরে, আধুনিক বাংলাদেশে। স্কুলের ইউনিফর্ম পড়ে সে বই খুলে বসলো। তার ইতিহাস বইতে লেখা, “বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের পূর্বসূরীরা জীবন দিয়েছেন। বাংলাদেশ আমাদের ভালোবাসা ও দায়িত্ব।”

রায়হান ফিসফিস করে বললো, “দাদুর ঘড়িটা যদি সত্যিই আবার কাজ করতো... আমি সবাইকে নিয়ে যেতাম, যেন নিজের চোখে দেখে আসে আমাদের দেশের জন্মকথা!”

বাংলাদেশের ইতিহাস কেবল বইয়ের পাতা নয়, এটি সাহস, ভাষা ও ভালোবাসার গল্প। আর এই গল্প আমাদের সবাইকে জানতে, বুঝতে ও ভালোবাসতে হবে, এমন ভাবে যে বাংলাদেশী হিসাবে ১৯৭১ এর ৯ মাসের অভিজ্ঞতা যেন হয় মনের গভীরে যত্নে ও সাহসে।

মাকসুদ স্যার ছাত্রদের চোখ মুখে যতক্ষন না দেখছেন দৃঢ়তা ও সংকল্প, ততো বার আবার গল্প বলছেন প্রথম থেকে।

“ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা” তাত্ত্বিক নয়, ব্যবহারিক“

ঠাকুরগাঁও জেলার সীমান্তঘেঁষা একটি উচ্চ বিদ্যালয়, ফারজানা ম্যাডাম (ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষিকা) আর জুয়েরা ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। জুয়েরা এক নীরব মেয়ে। কারো চোখে পড়ে না, কেউ ডাকলে ধরা গলায় “জ্বি” বলে। কিন্তু খাতার পাতায় সে আঁকে এমন সব দৃশ্য, যা শব্দ ছাড়াও কথা বলে।

একদিন ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ক্লাসে ফারজানা ম্যাডাম বললেন, “আজ তোমরা এমন কিছু আঁকবে, যার দাম নেই, কিন্তু প্রভাব অনেক!”

জুয়েরা আঁকে একটি ছবি। ছবিতে একটি মেয়ে হাত বাড়িয়ে রেখেছে, তার হাতে একটুকরো বিস্কুট, পাশে এক ক্ষুধার্ত বন্ধু।

ছবিটি দেখে পুরো ক্লাস নিঃশব্দ। ফারজানা ম্যাডাম ধীরে বলেন, “জুয়েরাবের আঁকা এই ছবি শুধু সৌন্দর্যের কথা বলে না, এটাতে আছে সহানুভূতি, সাহায্যের ইচ্ছে, আর নমনীয়তা, যে গুণগুলো আমাদের মানুষ করে।”

তারপর তিনি বললেন, “আজ থেকে সবাই এক নতুন চর্চা করবে, প্রতিদিন কম করে হলেও গুনে গুলে ১০ বার হাসি মুখে ধন্যবাদ বলে অন্যের কাছ থেকে হাসি নেবো, কি পারবে না!”

ছাত্রদের মাঝে শুরু হলো এক নতুন অভ্যাস।

জুয়েরা, যে আগে কখনো কারও সামনে কথা বলতো না, একদিন সাহস করে এক বন্ধুকে বলল, “তুই আমার ছবি দেখে বলেছিলি ভালো হয়েছে… ধন্যবাদ।”

বন্ধুটি অবাক, খুশি, আর বলল, “তুই দারুণ আঁকিস।”

ফারজানা ম্যাডাম আরও বললেন, “‘ধন্যবাদ’, একটা সহানুভূতির হাত, আর নমনীয় মনের শক্তি, এগুলো টিফিনের মতন ভাগ করলে শেষ হয় না, বরং ছড়িয়ে যায়।”

শিক্ষা তখনই প্রাণ পায়, যখন তা মন গড়ার উপাদান হয়। সাফিনুর নামের এক ছাত্র, বট গাছের পাতায় অনেকগুলো “ধন্যবাদ বন্ধু” লিখে ক্লাস এর সবাইকে দিলো। এই ধন্যবাদ স্টিকার টি যেন স্কুলে ছড়িয়ে দিলো ভদ্রতা, আন্তরিকতা, নম্রতা আর বন্ধুত্বের আলো।

এটাই তো নৈতিক শিক্ষার প্রকৃত সূচনা, যা হৃদয়ে গেঁথে থাকে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ক্লাসে ম্যাডাম একদিন বললেন, “জানো তো, জাপানে একটা সংস্কৃতি আছে, ওরা বলে ‘Kawaii Practice’।

ওরা বিশ্বাস করে - ‘মিষ্টি ব্যবহার, কোমলতা, ধন্যবাদ বলার অভ্যাস, আর নম্রতায় জীবনের বড় সৌন্দর্য লুকানো।’ আমরাও তো তা-ই চাই, তাই না?”

“তোমাদের হাসিমুখ, বন্ধুকে সাহায্য করা, ভুল করে ‘দুঃখিত’ বলা, এগুলো সবচেয়ে বড় শিক্ষা, যেটা বইয়ে থাকে না, কিন্তু জীবন গড়ে।”

Kawaii প্র্যাক্টিস এর উপর একটা ছোট নাটিকা হয়ে গেল ক্লাস এ একদিন।

- এক শিশু বন্ধুর হাত ধরে হাসছে, কারো ভুল হলে আরেকজন বলে “চিন্তা করো না!”, একজন ছাত্র একটুকরো চিঠি দিচ্ছে: “ধন্যবাদ, তুমি পাশে ছিলে” সঙ্গে একটা ফুল, এমন সব দৃশ্য।

ছাত্র/ছাত্রীদের অনেক উদসাহ, ওরা নিজেরাই আরও অনেক কিছু যোগ করলো, যা ম্যাডাম চিন্তাও করেন নি, যেমন শারীরিক ভঙ্গিমা, হাত মিলানো, আলিঙ্গন, চোখে চোখ রেখে হাসি বিনিময়, আরও কতো মানবিক যোগাযোগ।

ম্যাডাম দেখলেন, বিশেষ করে নৈতিক শিক্ষা, কৃতজ্ঞতা, সহানুভূতি, আর নমনীয়তা শেখানোর ক্ষেত্রে শারীরিক প্রকাশভঙ্গি অনেক বড় ভূমিকা রাখে।

জুয়েরার ছবির সেই আলো এবার সত্যিই স্কুলের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে - ভাষা ছাড়াও শরীর দিয়ে, চোখের দৃষ্টিতে, কোমল স্পর্শে।

স্কুল শুধু শেখার স্থান নয়, হৃদয় গড়ার জায়গা, যেখানে ধর্ম মানে মমতা, আর নৈতিকতা মানে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো।

“ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা” তাত্ত্বিক নয়, ব্যবহারিক হয়ে উঠলো ঠাকুরগাঁও এর এই স্কুল এ। একটা জাতি তখনই উন্নত হয়, যখন তার শিশুরা নম্রতা নিয়ে বড় হয়। আর সেই কাজ শুরু হয় স্কুল থেকে।

“হাঁপিয়ে যাওয়া মানে ক্লান্তি নয়”

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ স্কুল, দরিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চারপাশে খালি মাঠ, তালগাছ আর সবুজ ধানখেতের সমারোহ।

৬ থেকে ১০ বছরের শিশুদের নিয়ে এক সাধারণ সমস্যা, ওরা ক্লাসে মন দেয় না। খেলায় থাকলে বইয়ের কথা ভুলে যায়, আর ক্লাসে বসে ভাবতে থাকে, “কখন খেলবো?” চেয়ার টেনে বসে কলম ঘুরানো, জানালায় পাখি দেখা, এসবেই কেটে যায় সময়। যেন ওদের জন্মই হয়েছে ক্লাসরুমের বাইরে থাকার জন্য।

প্রধান শিক্ষক নাফিস স্যার একদিন ভাবলেন, “মন আটকাবো না, বরং চালাবো যতক্ষণ না নিজেরাই থেমে যায়। গভীর আগ্রহই মানসিক স্বাস্থ্যের খোরাক।”

স্কুলের পেছনে ছিল ঝোপঝাড় ঘেরা এক পরিত্যক্ত জায়গা। স্যার সেটাকে পরিষ্কার করে বানালেন এক বিশেষ মাঠ, নাম দিলেন “শেষ ক্লাস”। নিয়ম ঠিক হলো, সপ্তাহে দুই দিন, প্রতিটি শ্রেণী পালাক্রমে যাবে এই মাঠে, স্কুল ছুটির দুই পিরিয়ড আগে। এখানে কোনো বই নেই, পড়া নেই, শুধু খেলা, যতক্ষণ না শিশুরা নিজেরা বলে, “আজকের মতো শেষ।”

সেখানে রয়েছে—

- দড়ি লাফ ও টানাটানি
- বাঁশ বেয়ে ওঠা
- গর্ত পেরোনোর দৌড়
- বাঁধ ভেঙে জল টানা
- মাটি খুঁড়ে লুকানো জিনিস খোঁজা

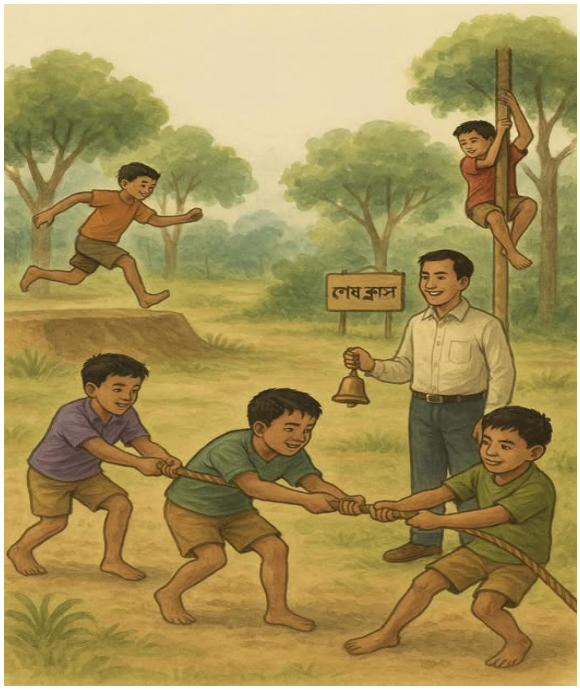

প্রথম দিনেই রাফি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, “স্যার, আর পারছি না... বুক ধড়ফড় করছে।”

মিহান মাটিতে বসে পড়লো, গায়ে ঘাম চুঁইয়ে পড়ছে, তবু মুখে তৃপ্তির হাসি।

নাফিস স্যার হেসে বললেন, “হাঁপিয়ে যাওয়া কোনো দুর্বলতা না, এটা তোমার মনোযোগ গড়ার শুরু। যে দেহ জানে কতদূর পারা যায়, সেই মনও জানবে কখন মনোযোগ ধরে রাখতে হয়।”

এক মাস পরে দেখা গেল, একই ছেলেরা এখন ক্লাসে বসে মন দিয়ে পড়ছে। রাফি নিজের খাতায় লিখেছে, “মন বসানো কঠিন, কিন্তু আমি পারি, কারণ আমি নিজেকে চিনি।”

নাফিস স্যার জানেন, “শেষ ক্লাস” এ শেখানো কিছুই বইয়ের পাতায় নেই, কিন্তু এখানেই গড়ে উঠছে জ্ঞান গ্রহণের ভিত। এই বয়সে পর্যাপ্ত শারীরিক খেলা শুধু শরীরকে সুস্থ রাখে না, বরং মনকে করে স্থির, দৃঢ় এবং আত্মবিশ্বাসী।

খেলার সময় তারা সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধান, সমালোচনামূলক চিন্তা, সামাজিক দক্ষতা, আত্ম-সংকল্প, আত্মসম্মান ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শিখে নিচ্ছে। হাঁপিয়ে যাওয়া মানে ক্লান্তি নয়, বরং মন-প্রাণ ঢেলে দেওয়া। এর ভেতরেই আছে সেই তৃপ্তি, যা চার দেয়ালের ভেতরে পাওয়া যায় না।

যে শিশু একটানা দৌড়াতে পারে, সে একদিন সোজা দাঁড়াতেও শিখবে, শুধু চাই তার প্রাণের খোরাক বোঝা।

আজকের Internet যুগে, যেখানে মনোযোগ ধরে রাখা ক্রমশ বিরল দক্ষতায় পরিণত হচ্ছে, “শেষ ক্লাস” শিশুদের শেখায় কোনো কাজের মধ্যে বিক্ষেপ ছাড়াই গভীরভাবে নিমগ্ন থাকা। এ বয়সে এই অভ্যাস তৈরি হলে, তারা জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে শিখতে পারবে কীভাবে মনোযোগ ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে হয়।

পরিশেষে, “শেষ ক্লাস” শুধু খেলা নয়, এটা এমন এক ক্ষেত্র, যেখানে শিশুরা শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের অবস্থান বোঝে, আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় শেখার ইচ্ছা ও সৃষ্টিশীলতার বিকাশ।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৩০

“কাগজের ভাঁজে ভাঁজে অংকের জাদু”

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার একটি গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষক মঈন স্যার। মুখে সবসময় হাসি, চোখে আলো। অংকের ক্লাস নিলেও, তিনি বোঝেন - শুধু গাণিতিক চিহ্ন দিয়ে শিশুরা শেখে না, শেখে গল্প, খেলা আর হাতেকলমে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

কিন্তু তার ক্লাসে একটা সমস্যা ছিল - “ভগ্নাংশ”। যতবার তিনি বোঝাতে চেষ্টা করতেন, শিশুরা কেবল খাতা ঘেঁটে দেখে, মুখে বলে, কিন্তু মাথায় খেলাতে পারে না। স্যার এটা বোঝেন, কেননা যখন কোন মৌখিক ভগ্নাংশের অংক দেওয়া হয় তখন মাথায় ছবি আসেনা।”

তানজিম একদিন বলেই বসলো, “স্যার, ১/২ আর ১/৪ মানে বুঝি, কিন্তু দেখি না তো, তাই বুঝিনা না!”

স্যার ভাবলেন, পরদিন তিনি ক্লাসে এলেন একটা রঙিন বাক্স হাতে। ভিতর থেকে বের করলেন রঙ-বেরঙের চারকোনা বর্গক্ষেত্র কাগজ। হাসতে হাসতে বললেন, “আজ অংক নয়, আজ আমরা শিল্পী!”

শুরু হলো অরিগামির ক্লাস।

প্রথমেই সবাইকে বললেন একেকটা বর্গক্ষেত্র কাগজ নিতে। তারপর ধাপে ধাপে শেখাতে লাগলেন, একবার ভাঁজ করো মাঝখানে, বলো এখন কটা ভাগ?

- “দুই ভাগ!”
- “তবে এটা কিসের সমান?”
- “অর্ধেক - মানে ১/২ বা ০.৫ !”
- “খেয়াল করে দেখ, দুটো সমান আয়তক্ষেত্র মিলে একটি বর্গক্ষেত্র হলো। আবার কোণাকুণি ভাজ করলে দুইটি সমান রিভুজ একটি বর্গক্ষেত্র বানাবে, তাই না।”

আবার উল্টো দিক থেকে ভাঁজ করালেন, বললেন,

- “এবার?”
- “চার ভাগ।”
- “তাহলে প্রতি খণ্ড?”
- “১/৪ ভাগ বা অর্ধেক ০.৫ এর অর্ধেক ০.২৫!”
- “এবার দেখো, এই চারটা এবার সমান বর্গক্ষেত্র।”

মঈন স্যারকে অবাক করে তানজিম বলে বসলো একটা কঠিন সম্পর্ক, “স্যার, কোণাকুণি দুই বার ভাজ করলে চারটি সমান ত্রিভুজ হয়।” তার পর বলল আসল কথা, “স্যার, ত্রিভুজটা ১/৪ ভাগ, বর্গক্ষেত্রটাও ১/৪, নিশ্চয় ওদের আয়তন ও একই হবে?”

এমন একটা প্রশ্ন স্যারকে চমৎকৃত করলো, মনে মনে বললেন, এইতো হাতে ধরে অংক শিক্ষার উপকারিতা। স্যার, ত্রিভুজ কেটে, দুটা ত্রিভুজ দিয়ে বর্গক্ষেত্র বানিয়ে প্রমান করে দেখালেন, তানজিমের চিন্তা সঠিক, সঙ্গে আয়তন মেপে দেখালেন।

ক্লাস এক অন্য রকম উদ্দীপ্তনায় চলে আসল।

তারপর স্যার বললেন, একটা ভাগ কেটে ফেলো। কাগজটা এখন কেমন?”

“৩/৪ বা ০.৭৫ !”

ক্লাসে যেন ম্যাজিক শুরু হলো। কেউ বানালো ‘নৌকা’, কেউ ‘রকেট’, কেউ আবার বানাল ‘পাখি’। আর প্রতিটি স্টেপে মঈন স্যার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছেন -

- “এইখানে কয়টা ত্রিভুজ হলো?”
- “এই পাখিটার পাখা দুই ভাগে ভাঙলে কটা কোণ হবে?”
- “এই কি সমকোণ?”
- “তিনটা কাগজ একসাথে ভাঁজ করলে ভগ্নাংশ কিভাবে ভাগ হয়?”

ছাত্ররা যেন এখন কেবল অংক করছে না, অনুভব করছে অংক। ভাঁজে ভাঁজে তারা দেখতে পাচ্ছে ভাগ, অনুপাত, কোণ, প্রতিসাম্যতা।

তানজিম শেষে বললো, “স্যার, আজ বুঝলাম ‘১/৩’ মানে শুধু সংখ্যা না, এটা আমার কাগজের একটা অংশ!”

সবার চোখে বিস্ময় আর আনন্দ। শুধু ভগ্নাংশ নয়, স্যার জানতেন এই অরিগামি দিয়ে আরও অনেক কিছু শেখানো যাবে - সমান্তরাল রেখা, বাহুর দৈর্ঘ্য, একাধিক কাগজ দিয়ে গাণিতিক সম্পর্ক, এমনকি বীজগণিতের প্রাথমিক ধারণাও।

শেষে তিনি বললেন, “গণিত কোনো অদেখা জিনিস নয়, এটা আমাদের চারপাশে। কিন্তু আমাদের চোখ তৈরি করতে হয় তা দেখতে। আজ তোমরা সেই চোখ পেয়েছো।”

সেইদিনের পর থেকে অংক ক্লাস মানেই শিশুদের কাছে ছিল এক নতুন কল্পনার মাঠ - যেখানে কাগজ, কাঁচি আর কল্পনা মিলে গড়ে তুলত বাস্তবতা, যুক্তি আর আনন্দ।

মঈন স্যার প্রমাণ করলেন - গণিত কেবল সমীকরণ নয়, এটি স্পর্শযোগ্য আনন্দও। সব স্কুলে একটি অরিগামি গণিত কর্নার থাকলে কেমন হয়!

“সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা”

প্রথমে বলে নিই সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ক্লাস ৬-১০ এর ছাত্রছাত্রীদের জন্য। ছাত্রদের উচিৎ অন্ধভাবে কোনো কিছু বিশ্বাস না করা, বরং প্রশ্ন করে, প্রমাণ খুঁজে এবং যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করা। আজকের দুনিয়ায়, ভুল তথ্য ও খবর ছড়িয়ে আছে, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা সত্য-মিথ্যা চিনতে সাহায্য করে। স্কুলের পাঠক্রমে বিজ্ঞান বা গণিতের সমস্যা সমাধানে জন্যই পড়ানো হয়, যা গাণিতিক ভাবে বা বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে। কি, কেন, কোথায় এই প্রশ্নগুলো করার দক্ষতা ও সাহস ছাত্রদের থাকতেই হবে।

রাজশাহীর একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, অষ্টম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী। সালমান স্যার – বিজ্ঞান শিক্ষক, যিনি বিশ্বাস করেন, “শেখা শুরু হয় প্রশ্ন থেকে।” সত্য যাচাইয়ের জন্য।

একদিন বিজ্ঞান ক্লাসে সালমান স্যার ব্ল্যাকবোর্ডে শুধু একটি বাক্য লিখলেন, “পানি বাষ্পীভূত হয় ১০০± সেলসিয়াসে।”

সবাই মনে মনে ভাবল, স্যার হয়তো আবার পাঠ শুরু করবেন, কিন্তু তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, “এটা কি সব সময় সত্যি?”

শিক্ষার্থীরা হেসে ফেলল। “স্যার, এটা তো বইয়ে লেখা আছে!”

স্যার মাথা নাড়লেন, “বইয়ের কথা মানতে হবে, কিন্তু চোখ বন্ধ করে না। ভাবো তো, পাহাড়ের ওপরে বা সাগরের তীরে কি একই রকম হবে?”

রিমা হাত তুলল, “স্যার, পাহাড়ে হয়তো একটু কম তাপমাত্রায় পানি বাষ্পীভূত হয়, কারণ... বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কম?”

“ঠিক!” স্যার বললেন, “তুমি একটি অনুমান করেছ, এখন প্রমাণ খুঁজতে হবে। যাকে আমরা বলবো, ‘সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা‘।”

এরপর স্যার ক্লাসকে তিন দলে ভাগ করলেন,

১. তথ্য খোঁজার দল: বই, ইন্টারনেট ও বিজ্ঞান ম্যাগাজিন থেকে প্রমাণ বের করবে।

২. পরীক্ষা দল: ছোট প্রেশার কুকারে পানি গরম করে তাপমাত্রা মাপবে।

৩. প্রশ্ন দল: “যদি... তাহলে...” ধরনের প্রশ্ন তৈরি করবে, যেমন,

• যদি পানি ফুটানোর সময় ঢাকনা বন্ধ থাকে? • যদি লবণ মেশানো হয়? • যদি পাহাড়ে নেওয়া হয়?

তিন দিন পর প্রতিটি দল তাদের ফলাফল উপস্থাপন করল। দেখা গেল, পাহাড়ে কম চাপের জন্য পানি ১০০±-এর আগেই ফুটে, আর লবণ মেশালে তাপমাত্রা একটু বাড়ে।

অনুশীলন কার্যক্রম হলো সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার প্রধান অনুকরণ। স্যার এরপর পুরো ক্লাসে একটা “Critical Thinking Practice” রুটিন চালু করলেন,

• প্রশ্ন করো – শুধু উত্তর শেখো না, প্রশ্নও শিখো।

• কারণ খুঁজো – উত্তর বলার আগে প্রমাণ দাও।

• বিকল্প ভেবে দেখো – “আর কি হতে পারে?”

• প্রমাণ যাচাই করো – উৎস কতটা নির্ভরযোগ্য?

দুই মাস পর ক্লাসে পরিবর্তন দেখা গেল,

• শিক্ষার্থীরা শুধু বই মুখস্থ না করে কারণ-প্রমাণ-উদাহরণসহ উত্তর দিচ্ছে।

• বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী।

• বিজ্ঞান মেলার প্রকল্পে তারা “পাহাড় বনাম সমুদ্র: পানির ফুটন্ত বিন্দু” নিয়ে পুরস্কার পেয়েছে। এমনকি প্রশ্ন করতে করতে তারা জেনেগেলো সুপ্ত তাপ (latent heat of vaporization) সম্পর্কে যা হলো তরল পানিকে বাষ্পে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি। এই শক্তি পানির অণুগুলিকে একসাথে ধরে রাখা আন্তঃআণবিক বন্ধনগুলিকে ভেঙে দেয়, যা পানির অনুগুলোকে বাষ্প হিসাবে বেরিয়ে যেতে দেয়। ছাত্ররা বুঝলো একমাত্র প্রশ্ন করার জন্যই তারা গভীর জ্ঞানের দিকে এগুলো।

সালমান স্যার শেষে বললেন, “যে শুধু মুখস্থ করে, সে পরীক্ষায় পাস করবে; যে প্রশ্ন করে, প্রমাণ খুঁজে, বিকল্প ভাবতে পারে, সে জীবনে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করবে।”

Critical Thinking বা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা শেখার ফলে,

• ভুল তথ্য চেনা যায়

• সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়

• নিজের মতামত প্রমাণসহ প্রকাশ করা যায়

• ভবিষ্যতের পড়াশোনা ও চাকরিতে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকা যায়।

শ্রেণী ৬-১০ পর্যন্ত স্কুলে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এটি শিক্ষার্থীদের তথ্য বিশ্লেষণ, যুক্তি মূল্যায়ন এবং তথ্য গ্রহণের ক্ষমতা দেয়। ছাত্রদের বুঝাতে হবে যে, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা হল একটি সুশৃঙ্খল চিন্তাভাবনা যা যেকোনো বিষয় বা সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এবং আধুনিক যুগে উন্মুক্ত তথ্য ভান্ডার যাচাই বাছাই এর জন্য এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান দক্ষতায় পরিণত হয়েছে।

“ভাবনার নকশা ক্লাস”

কুমিল্লার দেবীদ্বারের একটি গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পঞ্চম শ্রেণির শ্রেণিশিক্ষক আরিফ স্যার।

সৃজনশীলতা তৈরি হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু বয়সে। পাবলো পিকাসোর মতে, “প্রতিটি শিশুই একজন শিল্পী।” অন্যায়ের অভিজ্ঞতা ও সামাজিক চাপ শিশুদের নেই তাই সৃজনশীলতার মাধমেই শিশুর আত্ম-অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। সৃজনশীলতা সাক্ষরতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রাইমারি স্কুলের কর্মকান্ডে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সৃজনশীলতা (creativity), কল্পনাশক্তি বা সৃষ্টিকর্ম কে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। বর্তমান শিক্ষা পাঠ্যক্রমে এ বিষয়ে কোন বই নেই, নেই কোন উদ্যোগ। মানব সমাজ একবিংশ শতাব্দীতে এমন একটা দিকে যাচ্ছে যেখানে, “উদ্ভাবন হলো নতুন অর্থনীতি”, Internet বলছে “আমার কাছে তথ্য নেই” কথাটা অচল, আর AI বলছে “কাজ সম্পাদনের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই যথেষ্ট”, বর্তমানের এমন একটা পরিবেশে শিশু ছাত্রদের সৃজনশীল উদ্ভাবনি একটি অতি প্রয়োজনীয় বিশেষত্ব।

আরিফ স্যার স্কুল পরিবেশ টা চান এমন, শুধু বই পড়ে পাশ করলে চলবে না, নিজের চিন্তা থেকে নতুন কিছু বের করার ক্ষমতাই আসল শিক্ষা।

তাই তিনি চালু করলেন প্রতিদিনের একটি আলাদা ক্লাস, “ভাবনার নকশা”।

প্রথম দিন স্যার বোর্ডে লিখলেন: “যদি স্কুলের গাছেরা কথা বলতে পারত, কী বলত?”

শিশুরা হেসে ফেলল, তারপর একে একে বলল,

- “আমাকে পানি দাও।”
- “আমাকে কাটো না।”
- “আমার ফুল গন্ধ ছড়াতে চায়।”

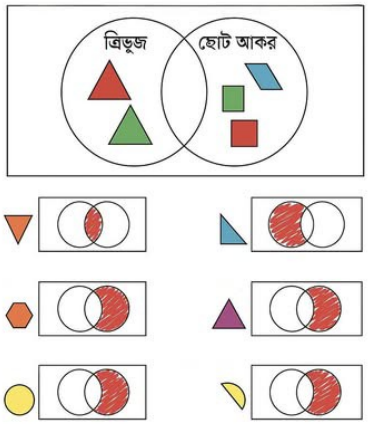

দ্বিতীয় দিন স্যার টেবিলে কিছু জিনিস রাখলেন, একটা ভাঙা কাপ, পুরনো পেন্সিল, মোমের টুকরো আর সুতো।

বললেন, “এগুলো দিয়ে কিছু বানাও, যা তোমার কোনো কাজে লাগবে।”

রাশেদ বানালো পেন্সিলের মাথায় মোম বসিয়ে ‘টেবিল ল্যাম্প’, আর শিউলি বানাল পুরনো কাপে বীজ লাগানোর পাত্র।

তৃতীয় দিন স্যার বললেন:

“তোমরা তোমাদের শ্রেণী কক্ষটাকে অন্য রকম করে সাজাও।” তারা, অংক ক্লাস এর জন্য, বাংলা/ইংরেজি ক্লাস এর জন্য ও বিজ্ঞান ক্লাস এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শ্রেণী কক্ষকে শাজালো, শুধু তাই নয় এই সাজানোর প্রয়োজনীওতাকে ব্যাখ্যা করলো।

এই ভাবনার নকশা ক্লাস চলতে থাকল প্রতিদিন।

সপ্তাহ শেষে স্যার একটা বড় খাতা বের করলেন, তাতে প্রতিদিনের সব আইডিয়া, ছবি, আর ছাত্রদের নাম লিখে রাখেন। নাম দিলেন, “আমাদের সৃজনশীলতার বই”।

এটা সবাই দেখতে পারে, নতুন আইডিয়া যোগ করতে পারে, এমনকি অন্য শ্রেণির ছাত্ররাও এসে পাতা উল্টে শিখে যায়।

কয়েক মাসের মধ্যে স্কুলে এক পরিবর্তন দেখা দিল, শুধু পড়ার বই নয়, শিশুরা এখন চারপাশের সবকিছুকেই নতুনভাবে দেখতে শিখেছে। ভাঙা জিনিসে তারা খুঁজে পায় নতুন ব্যবহার, ক্লাসের গল্পে যোগ করে নিজেদের কল্পনা, আর সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে ভয় পায় না। আরিফ স্যার জানেন, “যে ছোটবেলায় ভাবতে শেখে, বড় হয়ে সে নতুন পৃথিবী গড়তে পারে।”

স্যার, ৩-৫ শ্রেণীর জন্য একটা “সৃজনশীল চিন্তাভাবনা” নামক বই লিখলেন, এবং শিক্ষা বোর্ডে প্রস্তাব করলেন, শিক্ষা কার্যক্রমে সংযুক্ত করবার জন্য, সঙ্গে কেন প্রয়োজন যুক্তি দিয়ে বুঝালেন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে।

ছবিতে সেই বই এর কিছু পাতা দেখানো হলো।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৩৫

“দেশ বিদ্যালয়”

নদীর অববাহিকায় পলিমাটির তটভূমি, ছয় ঋতুর উর্বর মাটি, সুর ও সংগীতে ভরা জীবন, এমন এক সমৃদ্ধ বদ্বীপে দাঁড়িয়ে আছে এক উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়। তার নাম “দেশ বিদ্যালয়”। জীবন এখানে মধুময়, তাই ঘনবসতি; বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা প্রায় সাতশো পঞ্চাশ, কোলাহলে মুখর এই প্রতিষ্ঠান।

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ছিল গান, কবিতা, নৌকাবাইচের কাহিনি, ধানকাটা উৎসব, আর এই মাটির গন্ধ।

কিন্তু একদিন বিদ্যালয়ের ওপর দায়িত্ব এল এক বিদেশি ম্যানেজিং কমিটির হাতে। তারা বলল, “তোমাদের পাঠক্রম বদলাবে। এখানে থাকবে আমাদের ভাষা, আমাদের গান।”

শিক্ষকরা বোঝালেন, “এতে আমাদের কৃষ্টি হারিয়ে যাবে।”

কিন্তু কমিটি অনড়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াল। তারা ঘোষণা করল, “আমরা আমাদের ভাষা, আমাদের গান ছাড়ব না।” এই ভাষা আন্দোলনের লড়াইয়ে জয় এল, বিদ্যালয় তার নিজস্ব কৃষ্টি ফিরে পেল।

এর উনিশ বছর পর হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে এল। চারদিক ঢেকে ফেলল পঙ্গুপালের ঝাঁক, দুঃসময়। মাঠ-ঘাট, নদী, আকাশ - সবকিছুতে ধ্বংসের ছায়া।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্ররা গোপনে পরিকল্পনা করল, “আমরা পঙ্গুপালের হাত থেকে আমাদের বিদ্যালয়কে বাঁচাব।” গ্রামবাসীও এগিয়ে এল। একসঙ্গে লড়ে তারা জয়লাভ করল।

কিন্তু কিছু ধূর্ত পঙ্গুপাল মাটির নিচে লুকিয়ে রইল, সিকাডা (ঝিঁঝিঁ) পোকার মতো - যারা অনেক বছর চুপচাপ থেকে পরে হঠাৎ বের হয়।

৫৩ বছর পর সেই সিকাডারা গর্ত থেকে বের হয়ে এল, উচ্চস্বরে চিৎকার ঝিঁঝিঁ, বিভ্রান্তি, অরাজগতা, শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে অবিশ্বাস ছড়ানো - যাতে বিদ্যালয়ের পাঠদানের পরিবেশ ভেঙে পড়ে।

প্রধান শিক্ষক একজন মুক্তিযোদ্ধা বুঝলেন,

- “এখন দরকার আবার সেই সংহতি, যা আমাদের ছিল ভাষা ও স্বাধীনতার লড়াইয়ের সময়।”

তাই তিনি সবার উদ্দেশে বললেন,

- “আমরা যে ঐক্য দিয়ে দেশ বিদ্যালয়কে রক্ষা করেছিলাম, সেই ঐক্য আজও ফিরিয়ে আনতে হবে। পঙ্গুপাল যতই লুকিয়ে থাকুক, আমাদের কৃষ্টি, আমাদের বিদ্যালয় বাঁচাতে হবে।”

সেদিন থেকে শিক্ষক-ছাত্র-গ্রামবাসী নতুন করে শপথ নিল - “আমরা একসঙ্গে থাকব, সত্য ও স্বাধীনতার জন্য।”

যে বিদ্যালয়ে সবাই মিলে নিজেদের ভাষা, কৃষ্টি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে, সে বিদ্যালয়ই দীর্ঘদিন টিকে থাকে। ইতিহাসে যেমন ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ঐক্যের মাধ্যমে জয়ী হয়েছিল, তেমনি বর্তমানেও বিভাজন, বিভ্রান্তি ও অরাজগতার সময় প্রয়োজন সেই একই সংহতি।

শিক্ষক, ছাত্র ও সমাজ যদি একসাথে থাকে - তাহলেই শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা রক্ষা পাবে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৩৪

“শিক্ষক ক্লাবের আলো”

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট একবার বলেছিলেন,
“আমাকে একজন শিক্ষিত মা (শিক্ষক) দাও, আমি তোমাকে একটি সভ্য, শিক্ষিত জাতির জন্মের প্রতিশ্রুতি দেব।”
এই কথার অনুরণন যেন শোনা গেল নওগাঁ জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের “পদ্মডাঙা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়”-এ। চারপাশে ধানক্ষেত, কাঁচা রাস্তা, আর স্কুলের মাঠের একপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বটগাছ, গ্রামের নিঃশব্দ সাক্ষী।

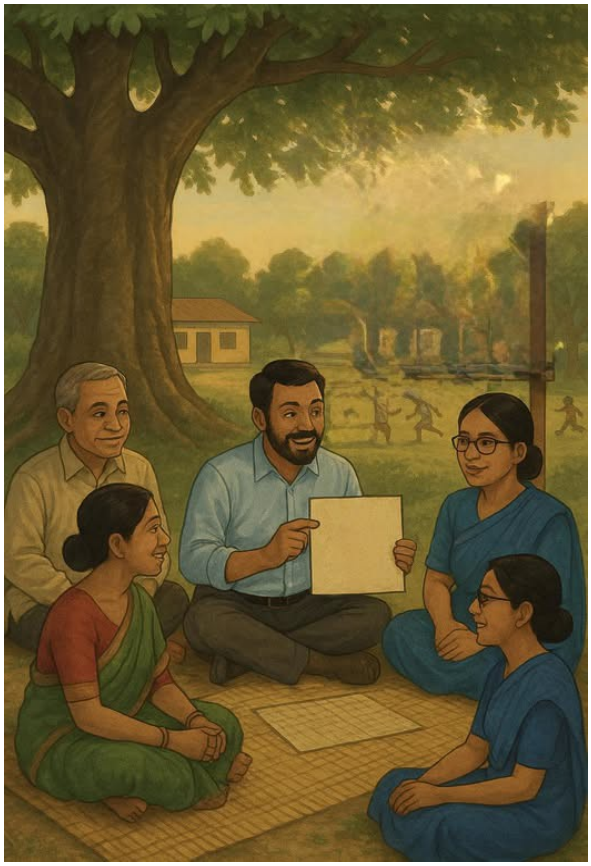

স্কুলের শিক্ষকরা, মোশাররফ স্যার (হেড টিচার), রুবিনা ম্যাডাম (বাংলা), আরিফ স্যার (গণিত), সালেহা ম্যাডাম (বিজ্ঞান) এবং দুইজন নতুন সহকারী শিক্ষক, প্রতিদিন নিজের মতো করে ক্লাস নিতেন। তবে একসঙ্গে বসে আলোচনা করার মতো সময় বা অভ্যাস ছিল না।
একদিন দুপুরে ক্লাস শেষে হেড স্যার বললেন, “আমরা কি শুধু ক্লাসে পড়াবো, নাকি নিজেদেরও একটু গড়বো? যদি আমাদের মধ্যে ঐক্য না থাকে, শিক্ষার্থীরাও তা শিখবে না।”
রুবিনা ম্যাডাম হেসে উত্তর দিলেন, “তাহলে চলুন, একটা ‘শিক্ষক ক্লাব’ করি। মাসে একদিন বসবো, গল্প করবো, শিখবো, পরিকল্পনা করবো।”
প্রথম সভাতেই তারা ঠিক করলেন, এই ক্লাবের মূল মূল্যবোধ হবে:
১. শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতা - প্রতিটি সিদ্ধান্তে ছাত্রের উপকার আগে ভাবা।
২. সহযোগিতা - নিজের নোট, চার্ট, উপকরণ ভাগ করে নেওয়া।
৩. সংস্কৃতির সম্মান - স্থানীয় গান, গল্প, লোকজ জ্ঞান পাঠে ব্যবহার।
৪. ন্যায় ও সমতা - সব ছাত্রের জন্য সমান সুযোগ।
৫. উদ্ভাবন - সীমিত উপকরণ দিয়েও নতুন শেখানোর কৌশল খোঁজা।
মাসে একদিন বিকেলে তারা মাদুর বিছিয়ে বটগাছের তলায় বসতেন। কখনো আরিফ স্যার দেখাতেন কীভাবে ভগ্নাংশ বোঝাতে চকলেট ভাগ করা যায়, কখনো রুবিনা ম্যাডাম শোনাতেন ছাত্রীর লেখা কবিতা, আবার কখনো সালেহা ম্যাডাম গ্রামের মৃৎশিল্পীকে ডেকে আনতেন।
সেদিন শিশুরা কাদামাটি দিয়ে পাত্র বানাতে বানাতে শিখলো বৃত্ত, ঘর্ষণ আর হাতের কাজের বিজ্ঞান।
ধীরে ধীরে এই ‘শিক্ষক ক্লাব’ শুধু শিক্ষকদের নয়, গ্রামেরও হয়ে উঠলো। অভিভাবকেরা সভায় এসে বলতেন, “স্যার, এই গল্পটা আমাদের বাচ্চাদেরও শোনান” বা “ম্যাডাম, মেয়েদের ফুটবল খেলাতেও সুযোগ দিন।”
বছরের শেষে উপজেলা শিক্ষা অফিসার এসে অবাক হয়ে বললেন, “আমি বহু স্কুলে গেছি, কিন্তু এমন ঐক্য আর সহযোগিতা কোথাও পাইনি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, শিক্ষকের মান শিক্ষার্থীর সাফল্যের সবচেয়ে বড় নির্দেশক।”
গ্রাম বুঝতে পারলো,
যেখানে শিক্ষকরা একসঙ্গে শেখে, সেখানে স্কুল শুধু পাঠশালা নয়, একটি জীবন্ত আলোকশালা।

“ভাবনা, সমাধান, আর ছোট্ট জয়”

নোয়াখালীর এক ছোট্ট গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র রুহান, চোখে সবসময় কৌতূহলের ঝিলিক।
তবে একটা ব্যাপার ছিল, কেউ কিছু বললেই রুহান সঙ্গে সঙ্গে শুনে নেয়, কিন্তু নিজের মাথা খাটানোর সাহস করত না।
একদিন বিজ্ঞান ক্লাসে সুমি ম্যাডাম একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, “যদি স্কুলে পানি না আসে, তাহলে তোমরা কীভাবে সমাধান করবে?”
ক্লাসের সবাই চুপ। রুহানও তাকিয়ে রইল ম্যাডামের দিকে, যেন উত্তর আসবে সেখান থেকেই।
ম্যাডাম হেসে বললেন, “আমি উত্তর দেব না, তোমরা ভাবো।”
প্রথমে সবাই একটু অস্থির, কিন্তু ম্যাডাম বোর্ডে লিখলেন,
১. ভাবো।
২. আলোচনা করো।
৩. সমাধান খুঁজে বের করো।
রুহান আর তার দুই বন্ধু মিলে ভাবতে শুরু করল। কেউ বলল - “পুকুর থেকে পানি আনা যাবে”, কেউ বলল - “বালতিতে রাখা যাবে”।
শেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল, স্কুলের পুরনো বৃষ্টির পানির ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করে তাতে বৃষ্টির পানি জমিয়ে রাখা হবে।
ম্যাডাম খুশি হয়ে বললেন, “তোমরা সমস্যা এড়িয়ে যাওনি, সমাধান খুঁজেছো, এটাই আসল শিক্ষা।”
এরপর ছোট্ট একটা দায়িত্ব দিলেন, রুহানকে বললেন, “তুমি প্রতিদিন সকালবেলা ট্যাংকের পানি মাপবে এবং লিখে রাখবে তারিখ ও সময় সহ। কেমন করে মাপবে, সেটা তুমি বের করবে? পাট কাঠিতে দাগ দিয়ে নাকি সুতা আর ওজন দিয়ে সেটা তোমার উপর।”
প্রথমে রুহান ভয় পেল - “আমি কি পারব?”

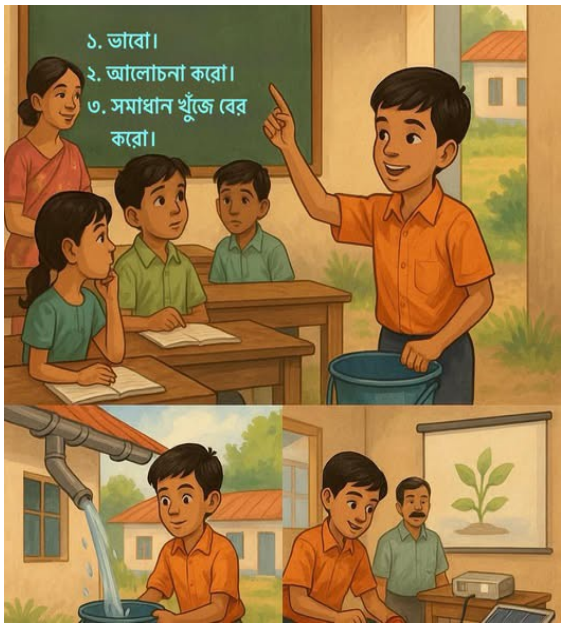

কিন্তু একদিন, দুদিন, তিনদিন, প্রতিদিন ঠিকমতো করে সে কাজটি করল।
এক সপ্তাহ পরে ম্যাডাম সবার সামনে বললেন, “রুহান দারুণ করেছে। ছোট ছোট জয় বড় আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। আমরা রুহানের মাপ থেকে কোন দিন কতো বৃষ্টি হয়েছে তা বলতে পারবো, মজা না।”
রুহানের এই আত্মবিশ্বাস নজরে এলো অন্যদেরও। একদিন দুপুরে স্কুলে বিদ্যুৎ চলে গেল, আর প্রজেক্টরের বিজ্ঞান ক্লাস আটকে গেল। শিক্ষকরা ভাবলেন, “আজ আর হবে না।”
রুহান এগিয়ে এসে বলল, “স্যার, আমরা কি সোলার লাইট দিয়ে প্রজেক্টর চালাতে পারি? আব্বুর দোকানে একটা ছোট ইনভার্টার আছে, আমি এনে দেব।”
সবাই প্রথমে হাসল - “এত ছোট ছেলে কি বুঝবে?”
কিন্তু রুহান বন্ধুরা মিলে পাঁচ মিনিটে ইনভার্টার আর সোলার প্যানেল জুড়ে প্রজেক্টর চালু করে দিল। ক্লাস চলতে লাগল, আর শিক্ষকরা অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকালেন।
সুমি ম্যাডাম মুচকি হেসে বললেন, “যে ভাবতে শেখে, সমস্যা সমাধান করে, আর ছোট জয়কে গুরুত্ব দেয় - সে একদিন বড়দেরও পথ দেখাতে পারে।”
সেদিন রুহান বুঝল, সে আর শুধু শোনার ছেলে নয়, সে ভাবতে পারে, সমাধান করতে পারে, আর বড়দেরও চমকে দিতে পারে।
প্রতিটি শিশুর ভেতরে অগণিত সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু তা খুলে দিতে হয় তিনটি চাবি দিয়ে,
১. তাকে ভাবতে শেখানো, যাতে সে নিজের মস্তিষ্ক ব্যবহার করে।
২. সমস্যা সমাধানে সাহস দেওয়া, যাতে চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে না গিয়ে মোকাবিলা করে।
৩. ছোট জয় উদযাপন করা, যাতে সেই সাফল্য পরবর্তী বড় উদ্যোগের শক্তি হয়।
শিক্ষক যদি ধৈর্য ধরে এই তিনটি চর্চা করেন, তবে একদিন তাঁর ছাত্র এমন কিছু করে দেখাবে, যা সমাজকেও অবাক করবে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৩৬

“মূল্যবোধের গুরুত্ব”

সিরাজগঞ্জ জেলার এক গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, চারপাশে সবুজ ধানক্ষেত, কৃষিজীবী মানুষের এই পাঠশালা। সবার দৃষ্টিতে চাষাভূষা তাঁরা কিন্তু যে জানে সেই জানে মাটিতে মিশে আছে যে জীবন সে জীবনের মূল্যাবোধ ভৌত, মানসিক ও আধ্যাত্মিক!

তানিম পঞ্চম শ্রেণির বুদ্ধিমান ছাত্র, বাড়িতে তার বাবা প্রতিদিন বলেন, “ভালো করে পড়ো, যাতে বড় হয়ে প্রচুর টাকা কামাতে পারো।”

তানিমের মনে একরকম গেঁথে গেছে, শুধু টাকাই জীবনের লক্ষ্য।

তার মাথায় সবসময় একটাই প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায়, “স্যার, এই কাজ করলে কি টাকা পাওয়া যাবে?”

একদিন রুবাইয়া ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকে বোর্ডে লিখলেন তিনটি বড় শব্দ,

ভৌত মূল্য, মানসিক মূল্য, আধ্যাত্মিক মূল্য (Physical value, emotional value, spiritual value)।

তিনি বুঝিয়ে বললেন, “টাকা হচ্ছে মূল্য রাখার থলি। কিন্তু থলি খালি থাকলে এর কোনো মানে নেই। আগে নিজের ভিতর দায়িত্বের অহংকার তৈরি করো, টাকা পরে আসবেই।”

ম্যাডাম তিনটা গল্প শোনালেন,

১. ভৌত দায়িত্ব - (যা তুমি বানাও, সমাধান করো, সৃষ্টি করো) গ্রামের নাজমুল, যে ভাঙা নৌকা মেরামত করে সবাইকে নদী পারাপারে সাহায্য করল।

২. মানসিক দায়িত্ব - (তোমার চিন্তা, বন্ধুত্ব, সহায়তা, অনুভূতি।) নীলা, যে বন্ধুকে পরীক্ষার ভয় কাটাতে প্রতিদিন পড়াশোনায় সাহায্য করেছে।

৩. আধ্যাত্মিক দায়িত্ব - (কিভাবে ভালোবাসো, কিভাবে সৎ পথে বাঁচো, কিভাবে অহং ছেড়ে বড় কিছু ভাবো।) রাশেদ, যে নিজের অহং সরিয়ে গ্রামের সবাইকে একত্র করে মসজিদ-মন্দির পরিষ্কার করল।

এরপর ম্যাডাম বললেন,

“দেখো, যদি তুমি কারো সমস্যা সমাধান করো, কিছু উপকার করো, ভালো কিছু সৃষ্টি করো, মানুষ তার বিনিময়ে তোমাকে টাকা দেয়। টাকা হলো কেবল পুরস্কার। আমরা ‘দায়িত্ব শিকারি’ হবো, যেখানেই মূল্য সৃষ্টি হয়, সেটাই খুঁজে বের করবো।”

পরের সপ্তাহে তানিমের দল নিজেরা স্কুলের ভাঙা বেঞ্চ ঠিক করল, মাঠের আবর্জনা পরিষ্কার করল, আর একটা ছোট প্রদর্শনী করল যেখানে তারা নিজ হাতে বানানো বাঁশের খেলনা বিক্রি করল। টাকা পেলেও সবচেয়ে বেশি আনন্দ হলো, যখন মানুষ হাসিমুখে খেলনা হাতে নিয়ে আনন্দিত হলো আর বলল, “তোমরা সত্যিই ভালো কাজ করেছো।”

ম্যাডাম শেষে বললেন, “তানিম, দেখেছো তো, আমরা টাকা পেয়েছি বলে খুশি হইনি, খুশি হয়েছি কারণ আমরা দায়িত্ব থেকে মূল্য সৃষ্টি করেছি। মনে রেখো, টাকার চেয়ে দামী, তুমি মানুষের জীবনে যে মূল্য যোগ করেছো, সেটা।”

দিনের শেষে তানিম ম্যাডামের কাছে গিয়ে বলল, “ম্যাডাম, আমি এখন টাকা নয়, দায়িত্ব শিকারি হতে চাই। কারণ দায়িত্ব থেকে মূল্য আসে আর মূল্য থাকলে টাকা নিজে থেকেই চলে আসে।”

ম্যাডাম জানেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য সব শিক্ষার নির্যাস এই মূল্য বোধে এসে দাঁড়ায়:-

ভৌত মূল্য; তোমার সৃষ্টি,

মানসিক মূল্য; তোমার হৃদয়ের দান,

আর আধ্যাত্মিক মূল্য; তোমার আত্মার আলো।

যেখানে এই তিন মিলবে, সেখানেই জীবনের প্রকৃত স্বার্থকতা।

“হৃদয়ের সাহস”

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার একটি গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী নীলা - চোখে স্বপ্ন, মুখে হাসি, কিন্তু ভেতরে ভীষণ সংবেদনশীল।
কেউ সামান্য কথায় আঘাত করলে বা তার মতামত উপেক্ষা করলে সে ভেঙে পড়ে।
মানসিক দৃঢ়তা তৈরি:-
একদিন খেলার মাঠে দল হেরে গিয়ে নীলা অঝোরে কাঁদছিল। রুবিনা ম্যাডাম এগিয়ে এসে তার পাশে বসলেন।
মৃদু স্বরে বললেন, “কাঁদা দোষের নয়, কিন্তু কাঁদা যদি তোমাকে থামিয়ে দেয়, তবে সেটাই দোষ। অনুতপ্ত হওয়া মানে শুধু চুপচাপ সহ্য করা নয়, বরং ভেতরে ভেতরে দৃঢ় হওয়া। আজ পারোনি, কিন্তু কাল তুমি পারবে, এটাই সাহস।”
ম্যাডাম তাকে বোঝালেন, ভয় ও কষ্টকে চিনতে হবে, নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে হবে। তিনি মার্ক টোয়েনের কথা মনে করিয়ে দিলেন, “সাহস হলো ভয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, ভয়ের উপর কর্তৃত্ব; ভয়ের অনুপস্থিতি নয়।”
নীলার মনে জন্ম নিল এক নতুন আলো।
প্রত্যাখ্যান মেনে নেওয়া ও উঠে দাঁড়ানো:-
স্কুলের নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের স্বপ্ন দেখেছিল নীলা। কিন্তু নির্বাচিত হলো অন্য এক ছাত্রী। নীলার বুক ভেঙে গেল, মনে হলো আর অংশ নেবে না।

তখন রুবিনা ম্যাডাম বললেন, “নেতৃত্ব মানে শুধু প্রধান চরিত্র হওয়া নয়। তুমি মন দিয়ে ছোট চরিত্র করলেও মানুষ মনে রাখবে।”
নীলা সেই চরিত্রে অভিনয় করল এমন প্রাণ ও আবেগ দিয়ে, নাটক শেষে পুরো হল দাঁড়িয়ে হাততালি দিলো।
ম্যাডাম হাসলেন, “সাহসী সে-ই, যে প্রত্যাখ্যানের মাঝেও নিজেকে চিনে নেয় এবং আবার উঠে দাঁড়ায়।”
সবাইকে সম্মান, কাউকে ভয় নয়:-
একদিন বাজারে নীলা দেখল, দোকানদার এক ছোট্ট ছেলেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বকছে।
নীলা শান্তভাবে এগিয়ে গিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া, আমাদের সবারই সম্মান আছে। কথা বললে ভালোভাবে বলুন।”
দোকানদার প্রথমে বিস্মিত হলো, তারপর হেসে বলল, “ঠিক বলেছো মা, সত্যিই ঠিক বলেছো।”
রুবিনা ম্যাডাম তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “নীলা, আজ তুমি শিখেছ কিভাবে মন শক্ত করতে হয়, প্রত্যাখ্যানকে সুযোগে বদলাতে হয়, আর সম্মান রেখে সাহসী হতে হয়। এই শেখাগুলোই তোমাকে সারা জীবনের জন্য শক্তি দেবে।”
নীলার ঠোঁটে ফুটল এক দীপ্ত হাসি— একটা হাসি, যার ভেতরে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের আত্মবিশ্বাস।
প্রতিদিনের শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষকের উপদেশ ও সহমর্মিতা— এসবই ছাত্রদের জীবনে অনুশাসন ও শিষ্টাচার তৈরি করে। আর সেই শিক্ষাই তাদের হৃদয়ের সাহস গড়ে তোলে। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী নীলার এই সাহস মনের অকুতোভয়তা, যা এই বয়সেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, এখানেই একজন স্কুল শিক্ষকের স্বার্থকতা।

“হার, রক্ষা আর হিসাব”

রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলার একটি গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র রাফি, ফুটবল খেলায় দারুণ, কিন্তু পড়াশোনায় মাঝারি মানের। মাঠে ওর হাসি-আনন্দ লেগেই থাকে, কিন্তু বইয়ের পাতায় মন টেকে না।

তার মা প্রায়ই বলে, “পরীক্ষায় হারিস না যেন।”

ব্যর্থতা থেকে শেখা:-

স্কুলের অঙ্ক প্রতিযোগিতায় রাফি অনেক আশা নিয়ে অংশ নিল, কিন্তু শেষে নামও উঠল না পুরস্কার তালিকায়। মন খারাপ করে বলল, “আমি আর চেষ্টা করবো না।”

রাশেদ স্যার তাকে পাশে ডেকে বললেন, “রাফি, হারা মানে শেষ নয়, হারা মানে শেখা। বল তো, কোথায় ভুল করেছ?”

খাতা দেখে রাফি বুঝল, সে সহজ অঙ্কগুলো পরে রেখেছিল, আর সময় শেষ হয়ে গেছে।

স্যার মৃদু হেসে বললেন, “একমাত্র আসল ভুল সেই ভুল, যেটা থেকে আমরা কিছুই শিখি না। এবার আগে সহজগুলো করো।”

তারপর স্যার আলবার্ট আইনস্টাইনের কথা সহজ ভাষায় বোঝালেন, “ব্যর্থতা হলো সাফল্যের দিকে অগ্রগতির ধাপ।”

রাফির মনে ভর করল এক নতুন সাহস - নতুন কিছু চেষ্টা করার ভয় আর নেই, ব্যর্থতার ভয়ও নেই।

আত্মরক্ষার পাঠ:-

একদিন বিকেলের খেলার সময় বড় ক্লাসের কয়েকজন দুষ্টু ছেলে ছোটদের বল ছিনিয়ে নিল। রাফি একটু এগিয়ে গেলেও ভয়ে থেমে গেল।

রাশেদ স্যার বুঝলেন - এখনই সময় তাদের আত্মরক্ষার পাঠ দেওয়ার।

পরের সপ্তাহে স্কুলে হলো “সেলফ-ডিফেন্স দিবস”, দুই ঘণ্টা সবাই শিখল কীভাবে জোর না করে দৃঢ়ভাবে কথা বলতে হয়, কিভাবে শরীরের ভর ব্যবহার করে বিপদে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

স্যারের কথাগুলো রাফির মনে গেঁথে গেল, “আত্মরক্ষা শুধু অধিকার নয়, কর্তব্যও।”

রাফি বুঝল, আত্মরক্ষা মানে শুধু মারামারি নয়; বরং নিজের অবস্থান দৃঢ়ভাবে বলা, চোখে চোখ রাখা, আর শান্তভাবে ‘না’ বলতে পারা।

টাকার হিসাব শেখা:-

বর্ষশেষের মেলায় প্রতিটি গ্রুপকে দেওয়া হলো ২০০ টাকা - এই টাকা দিয়ে স্টল সাজাতে হবে, বিক্রি করতে হবে, আর শেষে হিসাব দিতে হবে। রাফি দলনেতাদের সঙ্গে হিসাবরক্ষকের দায়িত্ব নিল। প্রথমেই সে তালিকা করল, কি কিনবে, কত দামে বিক্রি করবে। মেলায় বিক্রি হলো ৩৫০ টাকার, খরচ বাদে লাভ ১৫০ টাকা।

রাফি হিসাবের খাতা স্যারের হাতে দিল, সব পরিষ্কার লেখা। স্যার হাসলেন, “তুমি আজ যা শিখেছ, তা সারা জীবন কাজে লাগবে।”

দিন শেষে রাফি ভাবল:-

হার মানে শিক্ষা, আত্মরক্ষা মানে আত্মসম্মান, আর টাকা মানে শুধু খরচ নয়—পরিকল্পনা ও দায়িত্বও।

রাফি বুঝল, জীবনে হার, আত্মরক্ষা আর হিসাব - এই তিনটি জিনিস কেউ বই পড়ে শেখায় না। কিন্তু সঠিক শিক্ষক পাশে থাকলে, প্রতিদিনের ছোট্ট ছোট্ট অভিজ্ঞতা থেকেই এগুলো শেখা যায়। আর এই শেখাগুলোই একদিন বড় জীবনের বড় জয় এনে দেবে।

“প্রচেষ্টার জয়”

কুমিল্লার একটি গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ক্লাসে এসেছে নতুন শিক্ষক, মাহির স্যার। সদ্য নিয়োগ পাওয়া ভবিষ্যৎ BCS ক্যাডার, চোখে স্বপ্ন, মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে শিক্ষার্থীদের পরিবর্তন ছোট থেকে শুরু হয়। তিনি পড়েছেন Physiology-তে, তাই জানেন, শরীর যেমন ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, তেমনি মানসিক শক্তিও প্রতিদিন একটু একটু করে গড়ে তুলতে হয়।

চতুর্থ শ্রেণির শ্রেণিকক্ষে সেদিন একটি ভিন্ন দৃশ্য। তৃষা প্রথমে অংক সমাধান করতে গিয়ে ভুল করে ফেলল। আগে সে ভয় পেত, কারণ শিক্ষকরা কেবল সঠিক উত্তরকেই বাহবা দিতেন। কিন্তু মাহির স্যার বললেন, “তৃষা, তুমি যতবার চেষ্টা করেছ, ততবারই তুমি শিখেছ। এটিই তোমার আসল জয়।”

তৃষার চোখে ভরসার আলো ফুটলো।

স্যার, এই চতুর্থ শ্রেণির শিশুদের মনে গেঁথে দিলেন, “নিয়ম মেনে হাঁটা শেখা যায় না, বরং বার বার পড়ে যাওয়ার মাধ্যমেই শেখা যায়। কারণ, ভুল হলো শেখার অবিচ্ছেদ্য অংশ।”

পরদিন স্যার বললেন, “আগামী সপ্তাহে আমরা ক্লাসের দেয়াল পত্রিকা বানাবো। তোমরাই ঠিক করবে, কে কোন বিষয় লিখবে।”

শিশুরা নিজেদের সিদ্ধান্তে কাজ ভাগ করে নিল, কেউ কবিতা লিখবে, কেউ আঁকবে, কেউ তথ্য সংগ্রহ করবে। তারা বুঝলো, সিদ্ধান্ত নেওয়া মানে দায়িত্বও নেওয়া। স্যার বুঝালেন, “দায়িত্বও মানে প্রতিশ্রুতি, প্রতিশ্রুতি হলো কোন কাজের পরিকল্পনা করা এবং প্রতিশ্রুতি রাখতে হয়।”

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র, শান্ত, সে কখনো কবিতা লিখেনি, সাহস করে বলল, “স্যার, আমি একটা কবিতা লিখতে চাই।”

সবাই অবাক! কিন্তু স্যার উৎসাহ দিলেন,

“নতুন কিছু করার সাহসই হলো বড় শিক্ষা।”

শান্তর কবিতাই শেষে দেয়াল পত্রিকার সেরা আকর্ষণ হলো।

উদাহরণ দিয়ে স্যার বুঝালেন, “সাহসের অনুপাতে জীবন সংকুচিত বা প্রসারিত হয়।”

দেয়াল পত্রিকায় রুবেল ভুল বানান লিখে ফেলেছিল। হতাশ হয়ে বলল - “আমার লেখা কেউ পড়বে না।”

স্যার বোর্ডে বড় অক্ষরে লিখলেন:

“ভুল হলো শেখার সিঁড়ি।”

তিনি রুবেলকে বোঝালেন, ভুল না করলে নতুন শেখা যায় না।

দেয়াল পত্রিকা শেষ হলে সবাই মিলে দেখলো। স্যার বললেন, “মাহিন, তোমার তথ্যগুলো খুব পরিষ্কারভাবে সাজানো হয়েছে।”

“শান্ত, তোমার কবিতায় গ্রামের কথা দারুণ ফুটে উঠেছে।”

“তৃষা, তোমার চেষ্টা ক্লাসকে অনুপ্রাণিত করেছে।”

শুধু “ভালো” না বলে, প্রত্যেককে নির্দিষ্ট প্রশংসা করলেন। ফলে সবাই বুঝলো তাদের আলাদা শক্তি কোথায়।

একজন শিক্ষক যদি শুধু ফলাফল নয়, প্রচেষ্টাকেও মূল্য দেন, তবে ছাত্ররা চেষ্টা করতে ভয় পায় না। যদি তাদের ছোট ছোট সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হয়, তবে তারা দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। যদি ভুলকে শেখার অংশ হিসেবে ধরা হয়, তবে ভয় ভেঙে যায়। আর যদি প্রশংসা সুনির্দিষ্ট হয়, তবে প্রতিটি ছাত্র নিজের ভেতরের আলাদা আলো চিনতে শেখে।

প্রাথমিক শ্রেণিতে শেখা মানেই শুধু বই পড়া নয়, এটি হলো “চরিত্র গড়ার প্রথম ধাপ।” এখানে, শিক্ষক যদি শিশুসুলভ ছাত্রদের খুশি করে, তা হলে ছাত্রদের আত্মা প্রস্ফুটিত হয়।

“সহচর্যের প্রভাবেই বিশ্বাস ও মানসিকতা গড়ে ওঠে।”

শরীয়তপুর জেলার এক প্রান্তিক গ্রামে “আলোর দিশা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।”
চারপাশে নদী, খেত আর কাশবনের বাতাস। এখানে ছাত্রদের স্বপ্ন অনেকটা নদীর ভেলার মতো - কেউ জানে না কোথায় ভিড়বে।
একদিন খবর এল - নতুন একজন শিক্ষক এসেছেন, BCS ক্যাডার, Physiology থেকে সদ্য পাশ করা, নাম তার সায়েম স্যার। বয়সে তরুণ, চোখে স্বপ্ন আর কণ্ঠে দৃঢ়তা। তিনি যখন ক্লাসে প্রথম ঢুকলেন, ছাত্ররা ভেবেছিল, আরেকজন বই-গোঁজামিল স্যার, শুধু নামতা মুখস্থ করাবেন, কিংবা খাতা খুঁটিয়ে লাল দাগ দেবেন।
কিন্তু সায়েম স্যার অন্যরকম।
প্রথমেই তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখলেন,
“তুমি যাদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সময় কাটাও, তুমি আসলে তাদেরই মতো।”
শ্রেণির সবাই অবাক।
সায়েম স্যার বোঝালেন, “শরীরের কোষ যেমন একে অপরের সঙ্গে মিলে রক্ত তৈরি করে, ঠিক তেমনি মানুষও আশেপাশের মানুষের ভাবনা আর অভ্যাস থেকে নিজের ভেতরের রঙ গড়ে তোলে। যদি তুমি পাঁচজন অলস বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাও, তুমি ষষ্ঠ অলস হবে। আবার যদি পাঁচজন স্বপ্নদ্রষ্টা বন্ধুর সঙ্গে থাকো, তুমি ষষ্ঠ স্বপ্নদ্রষ্টা হবে।”
কথাগুলো বাতাসে ভেসে রইলো।

ক্লাসে ছিল তিনজন আলাদা ধরণের ছাত্র,
• রুবেল, সবসময় টিফিনে মারামারি আর দুষ্টুমি করে।
• সালমান, ভালো পড়ুয়া, কিন্তু সবার সঙ্গে মিশে না।
• শুভ্র, মাঝামাঝি— যেদিকে বেশি টানে, সেদিকেই ভেসে যায়।
কিছুদিন পরেই সায়েম স্যার লক্ষ্য করলেন, শুভ্রের চরিত্র পাল্টাচ্ছে। রুবেলের সঙ্গে সময় কাটিয়ে ও খাতা ফাঁকা জমা দিচ্ছে, অজুহাত বানাচ্ছে, এমনকি ছোটদের খেপাচ্ছে।
একদিন স্যার শুভ্রকে ডাকলেন, বললেন, “তুমি কি জানো, পানি যে পাত্রে থাকে, তার আকৃতি নেয়? মানুষও ঠিক তেমন, যাদের সঙ্গে মেশে, তাদের রঙে রঙিন হয়ে যায়।”
শুভ্র চুপচাপ শুনলো।
পরদিন সায়েম স্যার আরেকটা ভিন্ন কৌশল নিলেন। তিনি ক্লাসে সালমানকে দায়িত্ব দিলেন ছোট্ট একটা বিজ্ঞান প্রদর্শনী করতে, কিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্সিজেন শরীরে যায় আর আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। সালমান বোঝাতে গিয়ে উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছিল। শুভ্র পাশে বসে তা দেখছিল।
সেদিন থেকে ধীরে ধীরে শুভ্র সালমানের কাছে টানল। টিফিনের আড্ডায় নতুন আলোচনা হলো - কে কোন বই পড়েছে, কোন পরীক্ষা কেমন হলো, কে কী স্বপ্ন দেখে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শুভ্রর চোখে নতুন আলো দেখা দিল।
একদিন হঠাৎ রুবেলই এসে বলল, “দোস্ত, তুই তো কেমন বদলে গেছিস! এখন তোদের সঙ্গে বসতে আমারও ভালো লাগে।”
সায়েম স্যার দূর থেকে দেখলেন। তাঁর ঠোঁটে হাসি ফুটলো। তিনি জানেন, এটি কেবল একটি ছাত্রের পরিবর্তন নয়, এটি একটি অনুপ্রেরণা, যেটি পুরো শ্রেণিকক্ষে ছড়িয়ে পড়বে।
শিক্ষকরা যেমন পাঠ্যবই শেখান, তেমনি শেখান সহচর্য বেছে নেওয়ার শিক্ষা। “তুমি কার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছ”, এই প্রশ্নটাই হয়ে ওঠে চরিত্র গঠনের আয়না। কারণ, একজন ছাত্রকে গড়ে তোলে শুধু বই নয়, গড়ে তোলে তার চারপাশের মানুষ, বন্ধু, শিক্ষক, পরিবার। আর শিক্ষকই পারেন সেই বৃত্তটিকে আলোকিত করতে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৪৩

“নিজেকে খুঁজে পাওয়া”

গাইবান্ধার এক প্রত্যন্ত গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

চারপাশে সবুজ ক্ষেত-খামার, কাঁচা রাস্তা আর ছোট ছোট কুঁড়েঘর, এই প্রকৃতির মাঝেই সূচনা হলো “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের। এখানে লক্ষ্য একটাই, শিশুর ভেতরের নিজস্বতাকে সম্মান দেওয়া, তার সহজাত স্বপ্ন ও ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া।

এই ছোট্ট বয়সেই গড়ে তোলা হবে ভবিষ্যতের দৃঢ় ভিত্তি।

শ্রেণীর বইয়ের পাতার মতোই যত্ন নিয়ে খুঁজে বের করতে হবে প্রতিটি শিশুর বিশেষ ক্ষমতা, আর তাদের মনে বুনে দিতে হবে আত্মমর্যাদা ও গর্বের বীজ।

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী তানিশা প্রায়ই আঁকিবুঁকি করে, রঙ মিশিয়ে ছোট পোস্টার বানায়। তার চিন্তায় কতো রং কতো আলপনা আসে যায়। একদিন সে বললো, “স্যার, যদি আমাদের স্কুলে সবার আইডিয়া লেখার জন্য একটা দেয়াল থাকে?”

শ্রেণিশিক্ষক রুবাইয়া ম্যাডাম থামলেন না, চিন্তা করে দেখলেন, এইযে আবদার তার পিছনে আছে তানিশার স্বপ্ন ও চিন্তা।

উদশাহ দিয়ে বললেন, “চমৎকার! আমরা বানাবো ‘আইডিয়ার দেয়াল’। তুমি ডিজাইন করবে।”

তানিশা খুব খুশি হলো। কেউ আগে তার আঁকার প্রতি গুরুত্ব দেয়নি। এবার তার আঁকা পোস্টার দিয়েই তৈরি হলো সেই দেয়াল, যেখানে সবাই নিজের আইডিয়া লিখে ঝুলাতে পারলো। ম্যাডাম ছাত্রের এই ছোট আবেগকে সমর্থন দিয়ে, তানিশাকে এক অন্য বাস্তবতায় নিয়ে এলেন, যেখানে সে নিজেকে খুঁজে পেলো।

“আইডিয়ার দেয়াল” হয়ে উঠলো সবার নিরাপদ আশ্রয়। কে কেমন আঁকলো বা লিখলো, সেটা নিয়ে হাসাহাসি নয়, বরং প্রশংসা আর আলোচনা। সবাই জানলো, এখানে কথা বলা মানেই নিজের অস্তিত্বের স্বীকৃতি। ম্যাডাম দেখলেন এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশেই তো জীবন উন্মুক্ত হয় ও নিজেকে চেনা যায়।

একদিন “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে তানিশাকে বলা হলো তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে। মাইকে দাঁড়িয়ে সে বললো, “আগে আমার কথা কেউ শুনতো না, এখন আমি জানি, আমার কণ্ঠস্বর ও চিন্তা ভাবনার মূল্য আছে।”

যে মেয়ে আগে আঁকিবুঁকি করে একপাশে বসে থাকত, আজ সে অন্য বন্ধুদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। স্কুল বুঝলো, শিশুরা যখন নিজেকে খুঁজে পায়, তখনই শিক্ষা সত্যিকার অর্থে শক্তি হয়ে ওঠে।

শিশুকে শোনা, উৎসাহ দেওয়া, সমস্যা সমাধানে সুযোগ দেওয়া এবং নিরাপদ পরিবেশ দেওয়া, এসবের মাধ্যমেই শিক্ষক ছাত্রদের নিজস্বতা খুঁজে নিতে সাহায্য করেন। এটাই “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প এর আসল প্রতিজ্ঞা।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৪২

“আত্মবিশ্বাসের প্রদীপ”

রাজশাহীর এক গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলটি এবার “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প এর আওতায় এসেছে। লক্ষ্য - শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়, বরং ছাত্রদের মনে আত্মবিশ্বাস জ্বালানো।

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ইমরান সবসময় চুপচাপ থাকে। ক্লাসে কথা বলতে ভয় পায়, সবাইকে মনে হয় ওর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান।

একদিন নতুন শিক্ষক, BCS এর জন্য আসা অস্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক কামরুল স্যার ইমরানকে ডাকলেন।

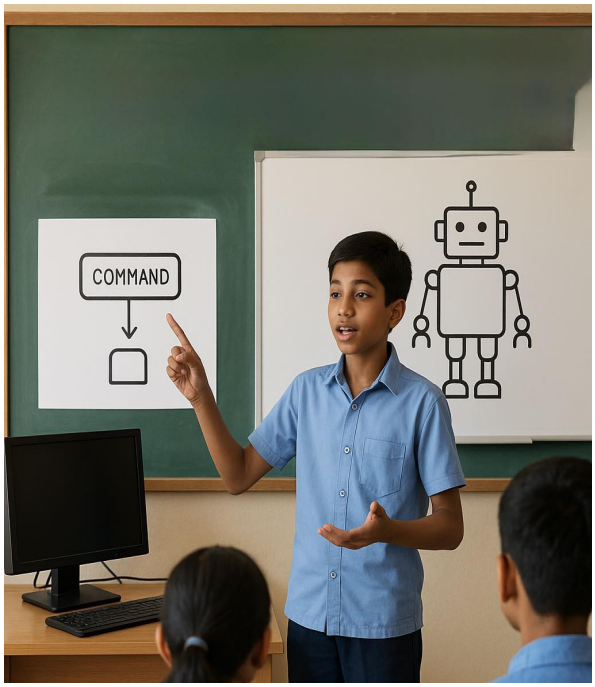

বললেন, “ইমরান, তুমি পারবে। তোমার ভেতরে অনেক শক্তি আছে। শুধু চেষ্টা করতে হবে। তুমি যদি বিশ্বাস করো তুমি পারবে, তা হলেই তুমি অর্ধেক পথ পাড়িয়ে গেছো।” ইমরান প্রথমবার মনে করলো, স্যার সত্যিই ওর উপর ভরসা করছেন।

স্যার তাকে বললেন প্রতিদিন ক্লাসে একটি নতুন শব্দ লিখতে, আর তার মানে সবাইকে বোঝাতে। ছোট কাজ, কিন্তু ইমরানের কাছে বিশাল ব্যাপার। কয়েকদিনের মধ্যেই সে নিজে থেকে খাতা ভরে ফেলল নতুন শব্দে।

ক্লাসে একদিন অন্যরা হাসছিল - “তানভীর তো অনেক দ্রুত লিখে, ইমরান ধীরে।”

স্যার থামিয়ে দিলেন, “প্রত্যেকের নিজস্ব গতি আছে। ইমরান যে চেষ্টা করছে, সেটাই আসল সাফল্য।”

ইমরান তখন বুঝলো– তাকে অন্যের সঙ্গে মাপা লাগবে না, নিজের সাথে নিজের লড়াইই আসল।

স্কুলে একদিন AI ল্যাব খোলা হলো “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প এর অংশ হিসেবে। স্যার ইমরানকে দিলেন দায়িত্ব - প্রতিদিন ল্যাব খোলা, লাইট-কম্পিউটার চালু করা, আর বন্ধ করে তালা দেওয়া। এই দায়িত্বে ওর বুক ভরে উঠল গর্বে।

ছাত্ররা লক্ষ করলো, কামরুল স্যার নিজের কাজেও দেখাতেন আত্মবিশ্বাস। কোনো নতুন সফটওয়্যার না জানলে তিনি বলতেন, “আমি এখনো পুরো জানি না, কিন্তু শিখে ফেলব।”

শিক্ষকের এই মনোভাব দেখে ইমরানও সাহস পেল - অজানা জিনিস ভয় নয়, শেখার সুযোগ।

বছরের শেষে ইমরান দাঁড়িয়ে সবার সামনে AI প্রজেক্টের ছোট একটি প্রেজেন্টেশন দিল, “কীভাবে রোবট নির্দেশ মানে।”

একসময় যে ছেলে বোর্ডে লিখতেও কুঁকড়াতো, আজ তার গলায় স্পষ্ট আত্মবিশ্বাস।

শিশু ছাত্রদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে বড় কৌশল নয়, বরং ছোট ছোট কাজেই পরিবর্তন আসে। বিশ্বাস, ছোট লক্ষ্য, তুলনাহীন শিক্ষা, দায়িত্ব এবং শিক্ষকের নিজস্ব উদাহরণ - এগুলোই “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প এর সত্যিকার শক্তি।

“স্কুল শিক্ষা ও পরিবারের নিয়ম”

রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার একটি গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র রুহান। তরুণ ও চিন্তাশীল মজিদ স্যার, নুতন এসেছেন বাগমারায় “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে পাস করা, মজিদ স্যারের শেষ বর্ষের গবেষনা ছিলো, “প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার ভিত্তি ও সামাজিক নৈতিকতা”। স্যার মনে করেন, একটি জাতির শক্তি আসে পারিবারিক শিক্ষা থেকে। পরিবার হলো প্রথম স্কুল এবং বাবা-মা হলেন প্রতিটি শিশুর জন্য আদর্শ। কিছু মৌলিক “পরিবারের নিয়ম” কেবল ঘরের জন্য নয়, স্কুলের জন্যও সমান দরকারি ও সমান ভাবে প্রযোজ্য। যেমন,

১. সম্মান দিয়ে কথা বলা।
২. অন্যের গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা রাখা।
৩. কোথায় যাচ্ছো তা পরিবারকে জানিয়ে যাওয়া।
৪. সাহায্য করা, অন্যরা সাহায্য না চাইতেই।
৫. অন্যায় দেখলে তার বিরুদ্ধে কথা বলা।

প্রথম ঘটনা:- একদিন ক্লাসে হঠাৎ করে দু’জন ছাত্র, নাফিজ আর আরমান কোনো বিষয় নিয়ে তর্কে জড়িয়ে গেল। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে প্রায় হাতাহাতি হতে যাচ্ছিল। রুহান চুপচাপ বসে থাকেনি, তার মনে পড়লো মজিদ স্যারের “পরিবারের নিয়ম” কথা, “পরিবারের প্রথম নিয়ম - সবসময় সম্মানের সাথে কথা বলবে, এমনকি মতভেদ থাকলেও।”

সে হাত তুলে বলল, “স্যার, ওরা চিৎকার করছে, কিন্তু আসলে সম্মান দিয়ে কথা বললে সমাধান হয়।” স্যার থমকে গেলেন, দুইজনকে ডেকে শান্তভাবে কথা বলার সুযোগ দিলেন। ঝগড়া মিটে গেল।

দ্বিতীয় ঘটনা:- একদিন ক্লাসে নতুন পড়ুয়া ছাত্রী ফারিহা ব্যাগ রেখে বাইরে গিয়েছিল। তার খাতা-কলমে কিছু ছেলে মজা করে আঁকিবুকি করছিল। রুহান তখন মনে করল দ্বিতীয় “পরিবারের নিয়ম”, “অন্যের গোপনীয়তা ও জিনিসপত্রের সম্মান রাখতে হবে।”

সে গিয়ে বলল, “তোমরা ওর খাতা নষ্ট করছো, এটা ঠিক নয়। প্রত্যেকের নিজের জায়গা ও জিনিসের প্রতি সম্মান দিতে হবে।” ছেলেরা থেমে গেল।

তৃতীয় ঘটনা:- একদিন স্কুলের পর রুহান বাড়ি না গিয়ে মাঠে খেলছিল। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সে বকা খেল মায়ের কাছে। তখন মনে পড়ল, “সবসময় কাউকে জানিয়ে বের হতে হবে, কোথায় যাচ্ছি।” পরের দিন থেকে সে ঠিক করে নিল, স্কুল বা খেলার মাঠে যেতে ও বাবা-মাকে জানাবে।

চতুর্থ ঘটনা:- ক্লাসে একদিন স্যারের হাতে বোঝা বই ছিল। কারো সাহায্যের অপেক্ষা না করেই রুহান দৌড়ে গিয়ে বইগুলো স্যারের টেবিলে রেখে দিল। স্যার অবাক হয়ে বললেন, “বাহ, রুহান! সাহায্য করতে তো কেউ ডাকতেই হয়নি।” রুহান হাসল, মনে মনে বলল, আমি জানি, “চতুর্থ নিয়ম হলো– সাহায্য করবে, জিজ্ঞাসার অপেক্ষা করবে না।”

পঞ্চম ঘটনা:- একদিন ক্লাসে এক সহপাঠীকে অন্যরা কটুকথা বলছিল। সবাই চুপ করে দেখছিল। রুহান দাঁড়িয়ে বলল, “এটা অন্যায়! কাউকে কষ্ট দেয়া উচিৎ নয়”, স্যার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিলেন।

মজিদ স্যার শেষে ক্লাসে বললেন,

“দেখেছো বাচ্চারা, আমি যে পাঁচটি ‘পরিবারের নিয়ম’ বলেছিলাম, সেটা শুধু পরিবারের নিয়ম নয়, আসলে আমাদের শ্রেণীকক্ষেরও নিয়ম। আমরা সবাই সবাইকে সম্মান দিয়ে কথা বলবে, অন্যের গোপনীয়তায় শ্রদ্ধা করবো, কোথায় যাচ্ছি সেটা বলে যাবে যেন আমাদের নিয়ে কেউ চিন্তায় না থাকে, সাহায্য করবে নিঃশর্ত ভাবে আর অন্যায় দেখলে রুখে দাঁড়াবো।”

স্যার বোঝালেন, “পরিবার আর শ্রেণিকক্ষ আলাদা নয়, দুটোই শেখার জায়গা। ঘরের নিয়ম যদি মেনে চল, ক্লাসেও তা কাজে লাগবে। এভাবেই আমরা ভালো মানুষ হয়ে উঠবো।”

পরিবার শেখায়, শ্রেণিকক্ষ তা অনুশীলন করে। এভাবেই শিশু বড় হয়ে ওঠে মানুষ হিসেবে।

“পড়া (শোনা) ও লেখা (বলা)”

মাদারীপুরের এক গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্ররা সকালবেলা ক্লাসে বসেছে। বই খোলা, খাতা-কলম সাজানো। নতুন শিক্ষক, ভবিষ্যতের BCS ক্যাডার তাই এক বছরের জন্য এই স্কুলে এসেছেন, রাশেদ স্যার। তিনি বিশ্বাস করেন, “পড়া আর লেখা মানুষের Operating System। শোনা মানে পড়াআর বলা মানে লেখা।” ঠিক android OS এর উপর সব Apps গুলো চলে, তেমনি আমাদের লেখা আর পড়ার উপরেই সব চিন্তা, আবেগ ও যোগাযোগ চলে।

একদিন স্যার সবাইকে বই থেকে গল্প পড়তে দিলেন, “ঘাসফড়িং ও পিঁপড়ার গল্প”। “ঘাসফড়িং সারাদিন খেলাধুলা করলো, আর পিঁপড়া ব্যস্ত থাকলো খাবার জমানোয়। শীত এলে ঘাসফড়িং কষ্ট পেল, কিন্তু পিঁপড়া নিশ্চিন্তে থাকলো।”

ছোট্ট সুন্দর গল্প, শিশুরা মন দিয়ে পড়লো। জানলো, শরৎ ঋতু - ভাদ্র ও অশ্বিন মাস মিলে, শীত ঋতু - পৌষ ও মাঘ মাস মিলে যে ঋতু।

তারপর স্যার বললেন,

“চোখ বন্ধ করো, এখন তোমরা স্বপ্নের জগতে চলে যাচ্ছ। ভাবো, তোমরা মাঠে দাঁড়িয়ে আছো। সামনে ঘাসফড়িং লাফাচ্ছে, হাসছে। আর পিঁপড়া খাবার টেনে নিচ্ছে। হঠাৎ ঘাসফড়িং তোমাদের ডাকলো, ‘এসো খেলি!’ তোমরা কী করবে?”

শিশুরা হাসতে লাগলো। কেউ বললো, “আমরা খেলবো।”

কেউ বললো, “না, আগে কাজ শেষ করবো।”

স্যার হেসে বললেন, “খেলাধুলা দরকার, কিন্তু আগে কাজ, তারপর খেলা। যেমন পিঁপড়া আগে প্রস্তুতি নিয়েছিল।”

এরপর স্যার বললেন, “এবার তোমরা লিখবে, এই গল্প থেকে কী শিখলে।”

ছাত্র রাফি লিখলো: “আমি শিখেছি, পড়াশোনা হলো খাবার জমানোর মতো। এখন না পড়লে ভবিষ্যতে কষ্ট হবে।”

ছাত্রী মায়া লিখলো: “খেলতে হবে, তবে সময়মতো পড়তে হবে। তাহলে ঘাসফড়িংয়ের মতো কষ্ট হবে না।”

স্যার বোর্ড এ লিখলেন, “একটি বীজ মাটির ভেতরে পড়ে অন্ধকারে থাকে। কিন্তু পানি ও আলো পেলে সে ধীরে ধীরে গাছ হয়ে ওঠে।”

ছাত্রদের চিন্তা করতে বললেন, তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র রাফি খাতায় লিখলো, “আমরা বীজের মতো। এখন অন্ধকারে আছি, কিন্তু পড়া ও লেখা আমাদের আলো দেবে। তখন আমরা গাছের মতো বড় হবো।”

স্যার চাচ্ছেন, ক্লাসকে চিন্তার সাগরে ভাষাতে, তাই এবার লিখলেন, “নদী সবসময় চলতে থাকে। পাথর বা গাছ তার পথ আটকাতে চাইলেও, নদী নতুন রাস্তা বানিয়ে সামনে এগিয়ে যায়।” ক্লাস কে বুঝালেন, “মানুষের জীবনেও বাধা আসবে, কিন্তু পড়া-লেখা দিয়ে নতুন পথ খুঁজতে হবে।”

স্যার, থামতে চাচ্ছেন না, এবার লিখলেন, “একটি ছোট মোমবাতি অন্ধকার ঘরকে আলোকিত করতে পারে। আলো যতই ছোট হোক, তবুও অন্ধকারকে হারিয়ে দেয়।”

মায়া বললো, পড়া-লেখা সামান্য হলেও, সেটাই ভবিষ্যতের বড় আলো।

শেষে স্যার বললেন, “দেখো বাচ্চারা, পড়া মানে বাইরের জ্ঞান ভেতরে নেওয়া। শোনা মানে অন্যের চিন্তা গ্রহণ করা। স্বপ্ন মানে সেই জ্ঞানকে নিজের করে নেওয়া। আর লেখা বা বলা মানে তোমার কল্পনা ও চিন্তা প্রকাশ করা।”

বোর্ডে তিনি বড় অক্ষরে লিখলেন, Input (পড়া + শোনা) → স্বপ্ন (নিজের করে নাও) → Output (লেখা + বলা)

শিশুরা হাততালি দিল।

শিক্ষক, শিশু ছাত্রদের মনের গভীরে গেঁথে দিলেন, পড়া মানে জানা, শোনা মানে বোঝা। স্বপ্ন মানে নিজের করে নেওয়া, আর লেখা-বলা মানে পৃথিবীকে জানানো।

“সন্তুষ্ট মন – আসল ধন”

রাজশাহীর একটি গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের আজ বিশেষ ক্লাস। তাদের নতুন শিক্ষক, ফারহান স্যার, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাস করে “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পে এসেছেন। ফারহান স্যারের বিশ্বাস, জীবন আসলে সহজ, কিন্তু আমরা নিজেরাই সেটিকে কঠিন করে তুলি। কারণ আমরা সন্তুষ্টির আসল পরিমাপ জানি না।

তিনি প্রায়ই বলেন, “যদি কেউ তার যা আছে তা নিয়ে খুশি না থাকে, তবে সে যা পাবে, তা নিয়েও খুশি হবে না।”

এই সহজ অথচ গভীর বাণী নিয়েই স্যার ভাবনায় ডুবে থাকেন। শুধু নিজের জন্য নয়, তিনি চান তার ছোট্ট ছাত্রছাত্রীরাও যেন এই সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করে। যাতে তাদের জীবন হয় সহজ এবং আনন্দময়।

স্যার ক্লাসে ঢুকে বললেন, “আজ তোমাদের একটি গল্প বলবো। গল্প শুনে শেষে তোমরা বলবে, আমরা কী শিখলাম।”

একটি গ্রামে ছিলো দুই বন্ধু— রুবেল আর সাব্বির।

রুবেলের ঘরে ফ্রিজ নেই, দামি জামাকাপড়ও নেই, কিন্তু মায়ের রান্না করা ভাত, ঝুপড়ি ঘরের ছাদ, আর বাবার বানানো খাটে ঘুমানোর জায়গা ছিলো। সে সবসময় খুশি থাকতো।

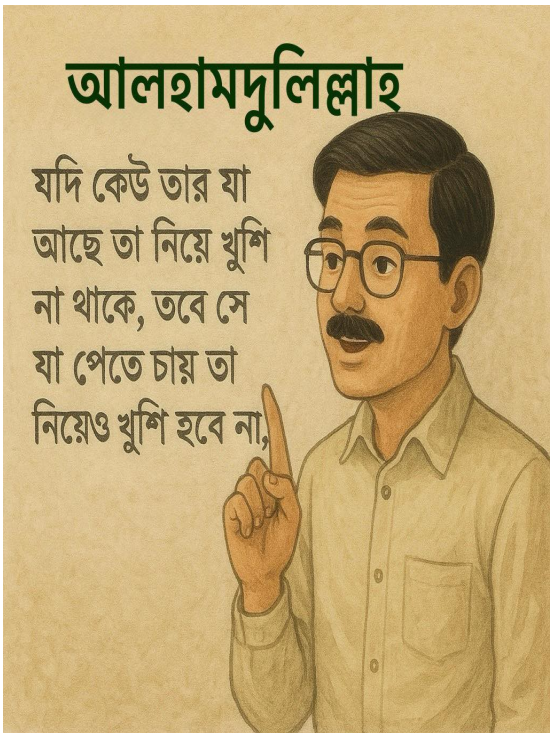

অন্যদিকে সাব্বিরের বাড়িতে ছিলো টেলিভিশন, বাইসাইকেল, এমনকি সুন্দর বিছানা। তবুও সে সবসময় কাঁদতো, “আমার কেন নতুন মোবাইল নেই? কেন শহরের মতো বড় বাড়ি নেই?”

স্যার বুঝিয়ে বললেন, “তৃপ্তি হলো প্রাকৃতিক সম্পদ; বিলাসিতা হলো কৃত্রিম দারিদ্র্য।”, দেখো, “চাওয়ার কোন শেষ নেই। তাই কেবল তৃপ্তিই সুখের সর্বোত্তম উপায়।”

এক ছাত্র বলে উঠলো, “স্যার, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমি সন্তুষ্ট থাকতে শিখেগেছি।”

ছাত্রের কথা শুনে, ফারহান স্যার অন্য একপ্রকারের সন্তুষ্টিতে চলে গেলেন।

একদিন গ্রামের স্কুলে শিক্ষক সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের শরীর কি সুস্থ? তোমাদের চোখ কি দেখে, কান কি শোনে, পা কি হাঁটে?”

সবাই বললো, “জি স্যার।”

তখন স্যার হেসে বললেন, “তাহলে তোমরা কতো ভাগ্যবান জানো? এই পৃথিবীতে কতো মানুষ আছে, যাদের এগুলো নেই। খাওয়ার খাবার, পরার জামা আর ঘুমানোর বিছানাই হলো আসল ধন।”

রুবেল আনন্দে মাথা নেড়ে বললো, “তাহলে আমি তো ধনী!”

সাব্বির একটু চুপ করে থেকে বুঝলো, সত্যিকারের ধন মানে শুধু টাকা নয়, বরং সুস্থ শরীর, পরিবার, খাবার আর হাসিখুশি মন।

ফারহান স্যার বললেন, “শিখে রাখো, সন্তুষ্টি ছাড়া কোনো মানুষ সুখী হতে পারে না। প্রতিদিন সকালে খেতে বসে, স্কুলে আসতে, বা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে মন থেকে বলবে - আলহামদুলিল্লাহ, ধন্যবাদ প্রভু।”

ছাত্ররা হাততালি দিয়ে বললো, “আমরা শিখেছি, যা আছে তাতেই খুশি থাকা - এটাই জীবনের আসল আনন্দ।”

শিশু ছাত্ররা জীবনের শিক্ষা পেলো, সুখ বিলাসে নয়; কৃতজ্ঞতায় ও সন্তুষ্টিতেই হলো আসল ধন। কেননা, একজন মানুষের এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ হলো সন্তুষ্ট মন।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৪৬

“শিক্ষকদের নৈতিক অনুশীলন”

কুমিল্লার দেবীদ্বারের একটি গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। রাশেদ স্যারের প্রথম কর্মক্ষেত্র এই দেবীদ্বার, উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগ থেকে মাস্টার ডিগ্রী করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, "নৃত্য মানুষের অন্তরের আনন্দ, সাহস আর ভালোবাসার প্রকাশ। নৃত্যের মতোই কিছু সহজ বাক্যও মানুষের ভেতর আলো জ্বালাতে পারে।"

এই চিন্তা গুলো কাজে লাগায়ে, রাশেদ স্যার দেবীদ্বারের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকে একটি প্রস্তাব দিলেন, স্কুলের সকল শিক্ষকদের নৈতিক অনুশীলনের, “প্রতিটি শিক্ষক যদি প্রতিদিন অন্তত একটি বাক্যও বলেন, শিশুদের মন ও চরিত্র বদলে যাবে।” রোকন স্যার, প্রধান শিক্ষক মনে মনে ভাবলেন, ঠিক এই জন্যই তো “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পে ইউনিভার্সিটি পাস আর BCS পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক দের যুক্ত করা হয়েছে, যাতে নতুন এবং প্রয়োগযোগ্য কর্মকান্ড উদ্ভাবন করা যায়। শিশু ছাত্ররা দেখে শেখে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উদাহরণ হয়ে থাকবে ছাত্রদের জন্য। একই সঙ্গে রাশেদ স্যার এটাও বিশ্বাস করেন যে, ছাত্রদের মনোযোগ দিয়ে পাখির কাকলি শুনতে হবে এবং রঙিন সূর্যাস্ত উপভোগ করতে হবে।

অনুশীলন এ ছিলো অভিনয় ও নাটকের মতো করে উপস্থাপন করা। স্যার বললেন, “আজ আমরা খেলতে খেলতে এই ২০টি বাক্য শিখবো। তবে শুধু শোনা নয়, আমরা একে একে দেখাবো স্কুলে কেমনভাবে এগুলো ব্যবহার করা যাবে।” এ বিষয়ে একটা ভিডিও পাঠ ও তৈরী করা হলো।

১. তুমি খুবই সহায়ক, ধন্যবাদ:- প্রথমে নিশাত পানির বোতল ফেলে দিয়েছিল। আরিফ তাড়াতাড়ি সেটা তুলে দিল। স্যার হাসলেন, বললে, “তুমি অনেক সাহায্য করলে, ধন্যবাদ।” আরিফ বুঝল, কেউ সাহায্য করলে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। স্যার বুঝালেন, ধন্যবাদ জানানো শুধু ভালো ব্যবহার নয়, এটি ভালো সহমর্মিতা। ২. তোমার দারুন চিন্তা ভাবনা আছে:- গণিতের খেলায় শিমুল বলল, “স্যার, ভগ্নাংশ বুঝাতে আমরা কাগজ ভাঁজ করবো।” স্যার বললেন, “তোমার চিন্তা দারুণ!” ক্লাসে সবাই খুশি। বললেন, প্রশংসা একটি অসাধারণ জিনিস: এটি অন্যদের মধ্যে যা চমৎকার তা আমাদেরও করে তোলে। ৩. আমি তোমার জন্য খুব গর্বিত:- তানিয়া কাল সাহস করে কবিতা আবৃত্তি করেছিল। স্যার বললেন, “তোমার জন্য আমি গর্বিত।” তানিয়ার চোখ ঝলমল করে উঠল। আর একটু উদশাহ দিয়ে বললেন, “তুমি একটা রত্ন। উজ্জ্বল থেকো সব সময়।” ৪. ভুল করলেও, তুমি তা ঠিক করতে পারো:- রুবেল অংকের উত্তর ভুল করেছে। স্যার শান্তভাবে বললেন, “ভুল করলে কোনো অসুবিধা নেই, তুমি আবার ঠিক করতে পারবে।” রুবেল আবার চেষ্টা করে সঠিক উত্তর বের করল। স্যার বললেন, দেখলে - আমরা সাফল্য থেকে নয়, ব্যর্থতা থেকে শিখি। ৫. আমাদের ক্লাস তোমাকে পেয়ে খুবই ধন্য:- শ্রেণীটাকেই রাশেদ স্যার “একটি পরিবার” বলে ডাকেন। তিনি বললেন, “এই ক্লাস আমাদের পরিবারের মতো, তোমাদের জন্যই এই পরিবার ধন্য।” ৬. এটা একটা দারুন প্রশ্ন:- ফারিহা জিজ্ঞেস করলো, “স্যার, গাছের পাতায় কেন সবুজ রং হয়?” স্যার উচ্ছসিত হয়ে বললেন, “কি দারুণ প্রশ্ন!” ৭. আমি তোমার সাথে সময় কাটাতে পেরে ধন্য:- রোববারে ক্লাসে গল্প বলার সময় স্যার বললেন, “তোমাদের সঙ্গে সময় কাটাতে আমি ভীষণ আনন্দ পাই।” ৮. তুমি অনেক সাহসী কাজ করেছো:- খেলাধুলার সময় নাজমা পড়ে যাওয়া সহপাঠীকে ধরল। স্যার বললেন, “তুমি যা করলে, সেটা খুব সাহসী কাজ।” ৯. তোমার জন্য আমি গর্ববোধ করছি:- সকালবেলার অ্যাসেম্বলিতে ছাত্ররা খুব সুন্দর করে জাতীয় সঙ্গীত গেলো, স্যারের চোখ ভিজে উঠল। তিনি বললেন, “তোমরা আমার মন ভরে দিলে।” ১০. সবাই তোমাকে পছন্দ করবে না, ঠিক আছে:- জয়ন্ত একটু চুপচাপ বলে সবাই তাকে নিয়ে হাসে। স্যার বললেন, “সবাই তোমাকে ভালোবাসবে না, কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা নেই।” ১১. তোমার পছন্দ খুব ভালো:- শিশির ওর পুরস্কার সবার মধ্যে ভাগাভাগি করার সিদ্ধান্ত নিল। স্যার বললেন, “এটা তোমার একটি চমৎকার সিদ্ধান্ত।” ১২. এটা তোমার সিদ্ধান্ত:- তানভীর আঁকায় রং বেছে নিচ্ছে। স্যার বললেন, “এটা তোমার সিদ্ধান্ত।”

১৩. আমি জানি তুমি এটা পারবে:- মাহি ইংরেজি বাক্যে বারবার ভুল করছে। স্যার বললেন, “হাল ছাড়বে না, তুমি পারবে।” ১৪. অন্য কারো সাথে নিজেকে তুলনা করো না, তুমিই যথেষ্ট:- সাজিদ তার বন্ধুর চেয়ে ধীরে পড়ছিল। স্যার বললেন, “নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা কোরো না, তুমি যথেষ্ট।” ১৫. তুমি যেভাবে বলেছো, তা আমার খুব ভালো লেগেছে:- রুবিনা পরিষ্কার উচ্চারণে গল্প বলল। স্যার প্রশংসা করলেন, “তুমি যেভাবে বললে, সেটা দারুণ লাগল।” ১৬. তোমার হাসিটা খুব সুন্দর:- খেলা জেতার পর মেহেদীর হাসি দেখে স্যার বললেন, “তোমার হাসি সত্যিই সুন্দর।” ১৭. তুমি খুব ভালো বন্ধু:- আনিস তার বন্ধুকে বই ধার দিল। স্যার বললেন, “তুমি সত্যিই চমৎকার বন্ধু।” ১৮. তোমার হাত ধরে থাকতে আমার খুব ভালো লাগে:- বৃষ্টি ভেজা দিনে ক্লাসের শিশুরা হাত ধরে মাঠ পার হলো। স্যার বললেন, “তোমাদের হাত ধরে হাঁটতে ভালো লাগে।” ১৯. তোমার মনোভাব যেকোনো পরিস্থিতি বদলে দিতে পারে:- ইউসুফ বিরক্ত না হয়ে ধৈর্য ধরে কাজ শেষ করল। স্যার বললেন, “তোমার ইতিবাচক মনোভাব সব কিছু বদলে দেয়।” ২০. আমি তোমাকে বিশ্বাস করি:- শিক্ষক দেখলেন, সামিয়া কান্না করে বলছে— “ স্যার আমি সত্যিই পড়েছি।” স্যার শান্তস্বরে উত্তর দিলেন, “আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।”

এই অনুশীলন বদলে দিলো স্কুলের পরিবেশ, এই ২০টি বাক্য স্কুলে শিক্ষকরা প্রতিদিন বললেন আর ছাত্ররা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সাহসী, আত্মবিশ্বাসী ও ভালো মানুষের পথে এক ধাপ এগিয়ে গেল। ওরা বুঝল, ভালোবাসা, সম্মান আর উৎসাহই হলো সবচেয়ে বড় শিক্ষা। বিদ্যালয়ের দেয়াল, খাতা বা বই যতটা শেখায়, এই ২০টি বাক্য তার চেয়ে অনেক গভীরে গিয়ে শিশুদের মানুষ করে তোলে।

“আত্ম-সচেতনতা”

বরিশালের এক গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৫ম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের আজ নতুন শিক্ষক রিদওয়ান স্যারের সাথে ক্লাস। স্যার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, “যে নিজেকে বুঝতে পারে, সে-ই পৃথিবীকে সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারে।” “To know oneself is the beginning of wisdom”, attributed to Socrates and Aristotle. ক্লাসে ঢুকে স্যার ব্ল্যাকবোর্ডে বড় করে লিখলেন, “আমি কে?” ছাত্ররা অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকালো।বললো, “স্যার, এটা তো খুব সহজ! আমি রুবি, আমি সুমন, আমি জামিল।”

স্যার হেসে বললেন, “শুধু নাম নয়, নিজেকে চেনা মানে তোমার ভেতরের অনুভূতি, স্বপ্ন আর শক্তি জানা। আজ আমরা শিখব, আত্ম-সচেতনতা (Self-awareness)।”

স্যার প্রথম প্রশ্ন করলেন,

“আজ তোমরা সবচেয়ে বেশি কোন আবেগ অনুভব করেছো? খুশি, দুঃখ, নাকি ভয়?” রুবি বললো, “আমি খুশি, কারণ সকালে বাবা আমাকে স্কুলে নামিয়ে দিয়েছেন।” জামিল বললো, “আমি দুঃখ পেয়েছি, কারণ বন্ধুর সাথে ঝগড়া হয়েছে।” স্যার বললেন, “দেখো, আবেগ চিনতে পারাই হলো প্রথম আত্মসচেতনতা।” এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কোন কাজ বা দক্ষতা নিয়ে তুমি গর্বিত?”

সুমন হাত তুললো, “আমি সুন্দর ছবি আঁকি।” মীরা বললো, “আমি গল্প ভালো বলতে পারি।”

স্যার হঠাৎ ক্লাস থামিয়ে বললেন, “আমরা অনেক সময় ভুল করি, ভেঙে পড়ি, বা কাউকে ভুল বুঝি। তখন যদি আমরা থেমে নিজেকে জিজ্ঞেস করি, ‘আসলে আমি কেমন অনুভব করছি?’, তাহলেই ঝগড়া কমে যাবে, ভয় কমে যাবে।”

মীরা মাথা নেড়ে বললো, “তাহলে আমি যদি আমার রাগকে চিনতে পারি, আমি তো ঝগড়ার বদলে শান্ত থাকতে পারবো! তাই না স্যার।”

স্যার হাসলেন, “ঠিক তাই। আত্মসচেতন মানুষ নিজের আবেগকে চিনতে পারে, তাই সে অন্যকেও ভালোভাবে বোঝে।”

দিনের শেষে স্যার বললেন, “তোমরা যদি প্রতিদিন এক মিনিট ভেবে লেখো, আজ আমি সবচেয়ে বেশি কী অনুভব করেছি, কী শিখেছি, আর কী ভালোবাসি নিজের মধ্যে, তাহলেই ধীরে ধীরে তোমরা নিজেকে চেনার শক্তি পাবে।”

ছাত্ররা হাততালি দিলো। আজ তারা শুধু পড়াশোনা নয়, নিজেদের ভেতরের একটা দরজা খুলে দেখলো।

আত্মসচেতনতা শেখানো মানে শিশুদের ভেতরে একটা আয়না বসিয়ে দেওয়া, যেখানে তারা নিজেদের আবেগ, স্বপ্ন আর শক্তি দেখতে পায়। এই দক্ষতা যত আগে তারা শিখবে, তত বেশি দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী আর সহমর্মী মানুষ হয়ে উঠবে। মনোবিজ্ঞানের ছাত্র রিদওয়ান স্যার জানেন এই বয়সে মনের সচেতনতাকে মন দিয়ে দেখতে চাইলে, তা কার্ড এ পড়তে হবে তার পর চিন্তা করতে হবে। তাই ৫ম শ্রেণির জন্য ৫টি সহজ “আত্ম-সচেতনতার প্রশ্ন” কার্ড বানালেন যা, প্রতিদিন ক্লাসে ৫ মিনিট ব্যবহার করে ছাত্ররা তাদের মনের অনুভূতি বহিঃপ্রকাশ করবে।

কার্ড ১: আজকের আবেগ “আজ আমি সবচেয়ে বেশি কোন অনুভূতিটা করেছি? (খুশি, দুঃখ, ভয়, রাগ, উত্তেজনা ইত্যাদি)”

কার্ড ২: আমার গর্বের জায়গা “আমার কোন কাজ বা দক্ষতা নিয়ে আমি সবচেয়ে খুশি বা গর্বিত?”

কার্ড ৩: স্বপ্নের জানালা “আমি বড় হয়ে কী হতে চাই? কেন?”

কার্ড ৪: ভুল থেকে শেখা “কোন সময় আমি ভুল করেছি কিন্তু শিখেছি কিছু?”

কার্ড ৫: নিজের ভালোবাসা “আমার নিজের মধ্যে কোন বিষয়টা আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি?”

ক্লাস এ কার্ড ব্যবহার নীতিমালা হলো, প্রতিদিন ক্লাসে একটা কার্ড বেছে নেওয়া। সবাইকে ২ মিনিট ভাবতে দেওয়া, লিখতে দেওয়া। ২-৩ জন ছাত্রকে বলতে দেওয়া, যাতে সহপাঠীদের কথা শুনে সহমর্মিতা তৈরি হয়। এবং সপ্তাহ শেষে একদিন সবাই মিলে আলোচনা।

দিনের শেষে রিদওয়ান স্যার খেয়াল করলেন, শিশুদের চোখে যেন নতুন এক আলো জ্বলছে। তারা নিজেদের অনুভূতি চিনতে শিখেছে, ভুল থেকে শিক্ষা নিতে শিখেছে, আর নিজের ভেতরের ভালো দিকগুলো খুঁজে নিতে শুরু করেছে। তাদের আত্মবিশ্বাস আগের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়। স্যার মনে মনে ভাবলেন, এটাই আসল শিক্ষা, যা শুধু বই থেকে নয়, একজন শিক্ষকের স্নেহ আর অনুপ্রেরণা থেকেই সম্ভব। একজন অনুপ্রেরণাদায়ী শিক্ষক শিশুর হৃদয়ে এমন একটি দরজা খুলে দেন, যেটা সারা জীবন খোলা থাকে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৪৮

“ছড়ার পুনরাবৃত্তি”

গাইবান্ধার এক গ্রামীণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সকালবেলা তৃতীয় শ্রেণির ক্লাস চলছে। একটা আনন্দমুখোর পরিবেশ, শিশু ছাত্রদের মুষ্টিমেয় উচ্ছাস মিলে গেল তাদের গাওয়া ছড়ায়,

“আম পাতা জোড়া জোড়া,
মারবো চাবুক চড়বো ঘোড়া।...”

এই যে শুরু হলো, আর থামছেই না।

বার বার, আবার বার বার। প্রায় পঞ্চাশবার গাওয়ার পরও তাদের উৎসাহ কমছে না।

পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে তারা এটি উপভোগ করছে, কারণ তারা জানে যে এরপর কী আসছে;

“ওরে বুবু সরে দাঁড়া,
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে,
চাবুক ছুঁড়ে মেরেছে।”

সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি, এই মজাদার আচরণ স্মৃতিশক্তি ও নিজের নিয়ন্ত্রণ কে শিক্ষা দেয়, মস্তিষ্কের নিউরনগুলোতে আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রী রিনা ম্যাডাম জানেন, এই অভ্যাসটি শৈশবের ভাষা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মানুষের বুদ্ধিমত্তার ক্রোমোবিকাশে এর অনেক প্রয়জোন আছে, এই বয়সে শিশুরা তাদের নিজস্ব গানের সংস্করণ তৈরি করতে পছন্দ করে, যা নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের একটি শক্তিশালী কাজ।

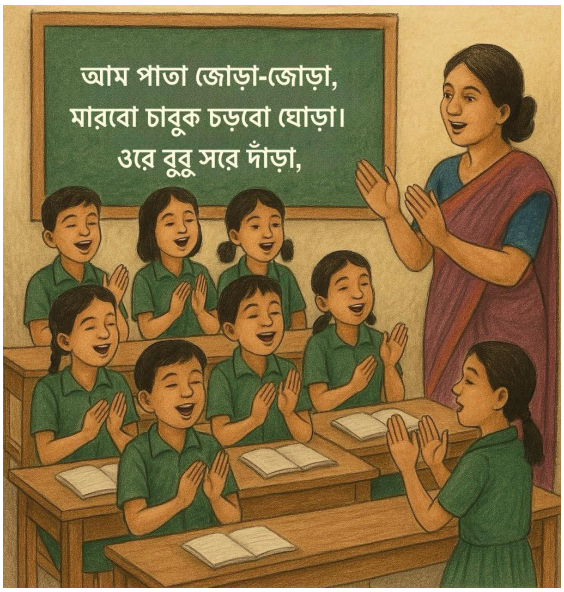

ম্যাডাম যেহেতু “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পে যোগ দিয়েছেন, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখে আসা একটা বিষয় মনে পড়লো। শিশুর মস্তিষ্ক শেখে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে। একই শব্দ, একই ছড়া যতবার বলা হয়, ততবার মস্তিষ্কের ভাষা, স্মৃতি আর আবেগের কোষগুলো সক্রিয় হয়। এটি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিরাপদ ভিত্তি তৈরি করে।

তাই তিনি রাগ না করে বললেন, “আচ্ছা, এবার আমরা সবাই তিনটি ছড়া গাইবো। যতবার গাইতে চাইবে, গাইতে পারো।”

বোর্ডে লিখলেন ছড়াগুলো—

১. আম পাতা জোড়া জোড়া ...
২. আয়রে আয় টিয়ে, নায়ে ভরা দিয়ে ...
৩. চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে ...

ছাত্রছাত্রীরা দলে দলে গাইতে শুরু করলো। ছন্দে হাততালি, হাসাহাসি, আনন্দ। বারবার গাওয়ার পরও কারো ক্লান্তি নেই। বরং শব্দগুলো তাদের মনে গেঁথে গেল।

একজন ছাত্র হেসে বললো, “ম্যাডাম, এখন তো মনে হয় আমি চোখ বন্ধ করলেও পুরো ছড়াটা মুখস্থ বলতে পারবো।”

ম্যাডাম বুঝলেন, এই যে ওরা বার বার গাইছে, এভাবেই শিখছে ভাষা, স্মৃতি, আর সাহস।

সেদিনের ক্লাস শেষে শিশুরা শুধু ছড়া শিখলো না, শিখলো আরও বড় শিক্ষা, “বারবার বলা মানে বিরক্তি নয়, বরং শেখার শক্তি।”

প্রাথমিক শ্রেণিতে বাংলা ছড়া শিশুদের ভাষা, কল্পনা ও আবেগ গঠনের এক অসাধারণ উপায়। শিক্ষকরা চাইলে ছড়াকে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পাঠে যুক্ত করলে শেখা হবে আনন্দময় এবং গভীর।

“একটা সাধারণ পেন্সিলের শিক্ষা”

চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাট ইউনিয়নের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠদান করবেন নওরোজ স্যার, বিষয় সাধারণ জ্ঞান। স্যার দেখলেন “প্রাথমিক বিজ্ঞান” বই এর ১৪ টি অধ্যায় আছে, তাতে অনেক কিছুই আছে, যা নেই তা হলো অর্থনীতি, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, দেশ থেকে দেশে বাণিজ্য, পৃথিবীকে সমতা এনেছে। ছাত্রদের জানা ও বোঝা দরকার, বিশ্ব বাণিজ্য কি এবং কীভাবে কাজ করে!

আজকের এই বিশেষ ক্লাসে নওরোজ স্যার টেবিলে একটি সাদামাটা হলুদ পেন্সিল রাখলেন।

স্যারের প্রশ্ন - “বাচ্চারা, তোমরা কি জানো, এই ছোট্ট পেন্সিলটা কীভাবে তৈরি হয়?”

জিসান বললো, “স্যার, দোকান থেকে কিনে আনি!”

স্যার হেসে বললেন, “ঠিক বলেছো, কিন্তু দোকানদার কি পেন্সিল বানায়?”

ছাত্ররা একসাথে মাথা নেড়ে বলল, “না।”

নওরোজ স্যার বোঝাতে শুরু করলেন, “এই পেন্সিল বানাতে হাজার হাজার মানুষ কাজ করেছে, যাদের একে অপরকে দেখা তো দূরের কথা, নামও জানে না। এই মানুষগুলো একে অপরের সাথে সংযুক্ত এই পেন্সিলের মাধ্যমে।”

ক্লাস স্তব্ধ, ওরা জানতে চায় কেমন করে সম্ভব ওদের প্রতিদিনের ব্যাবহার করা এই পেন্সিল থেকে, কি ভাবে?

স্যার বললেন, “তোমরা তোমাদের পেন্সিল হাতে নিয়ে তার দিকে তাকাও। পেন্সিলের এই কাঠ এসেছে কানাডার জঙ্গল থেকে ‘ধূপ-সিডার’ নামের কাঠ যা পোকামাকড় প্রতিরোধী বা ‘বাসবুড’ নামের কাঠ যা সাদা থেকে ক্রীম রঙের হয়।এই কাঠ গুলোর কান্ড নরম ও সমান এবং সরল গিঁট বা দাগ থাকে না, দেখো তোমাদের পেন্সিলের কাঠেও কোন দাগ নেই।”

ছাত্ররা তাদের পেন্সিলকে পরীক্ষা করতে শুরু করলো।

স্যার বললেন, “কাঠ কাটার জন্য করাত লাগে যা ইস্পাত দিয়ে বানানো হয়, সেই ইস্পাত বানানোর জন্য লোহা এসেছে রাশিয়ার কোন খনি থেকে, সেই লোহাকে শক্ত ইস্পাত বানিয়েছে আবার অন্য কারখানা, হয়তো জার্মানিতে। এবার দেখো, পেন্সিলের কালো অংশ আসলে গ্রাফাইট, যা দক্ষিণ আমেরিকার কোনো খনি থেকে আনা। যে রাবারটি লাগানো আছে সেটা এসেছে মালয়েশিয়ার কোন রাবারের গাছ থেকে। পেন্সিলের হলুদ রং, এইযে টিন দিয়ে মুড়ানো রাবার পেন্সিলের সঙ্গে, এই রং এই টিন এসেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে।”

স্যার বললেন মানুষের কর্মকান্ড, “গাছ কেটে পেন্সিলের কাঠ, খনি থেকে গ্রাফাইট আর রাবার গাছ থেকে রাবার, রং ও টিন কিন্তু এমনি এমনি আসে নি, সব কিছুর পিছনে মানুষের মেধা ও পরিশ্রম জড়িত - তাই না। বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজারো মানুষ, ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন ভাষার, একে অপরকে হয়তো কখনো দেখবেও না - তবুও সবাই একসাথে কাজ করেছেন যেন তোমরা এই সস্তা পেন্সিল কিনতে পারো।”

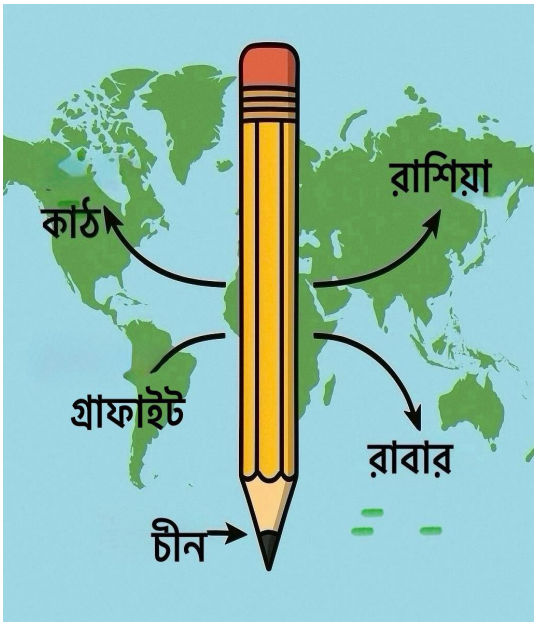

রবিন অবাক হয়ে বলল, “স্যার, তাহলে তো পুরো দুনিয়ার মানুষ একসাথে কাজ করেছে এই ছোট্ট পেন্সিলের জন্য!”

হাসিব বলল, “কেউ তো তাদের জোর করে একসাথে আনেনি?”

স্যার মাথা নেড়ে বললেন, “ঠিক তাই! তাদের একসাথে এনেছে বিশ্ব বাণিজ্য (‘ফ্রি মার্কেট’ বা ‘স্বাধীন বাজার’) দোকানদার, কারখানা, খনি, জাহাজ, ট্রাক - সবাই তাদের নিজের লাভের জন্য কাজ করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কাজ মিলেমিশে আমাদের জন্য শান্তি আর সুবিধা তৈরি করেছে। এটাকেই বলে বিশ্ব বাণিজ্য।”

নওরোজ স্যার ব্ল্যাকবোর্ডে লিখলেন, “বিশ্ব বাণিজ্য হলো, যেখানে সবাই নিজের কাজ করে, কিন্তু সবার কাজ মিলেমিশে একে অপরকে সাহায্য করে। যেমন তোমরা ক্লাসে একসাথে কাজ করো, কেউ ছবি আঁকে, কেউ গল্প লেখে, কেউ গান গায় - তেমনি পৃথিবীর মানুষও একে অপরকে সাহায্য করে। আমরা ভিন্ন হলেও, বাজার আমাদের সবাইকে শান্তি আর সহযোগিতায় বেঁধে রাখে। তোমরা দেখছো, পৃথিবীর মানুষ একে অপরকে না চিনলেও একসাথে কাজ করছে। এই কাজ আমাদের শুধু জিনিস দেয় না, আমাদের শেখায়, পৃথিবী আসলে একটা বড় পরিবার।”

সেদিন থেকে, ছাত্ররা যখনই নতুন খাতা বা পেন্সিল ব্যবহার করত, তারা মনে করত -

“এই জিনিসে হাজারো মানুষের সহযোগিতা লুকিয়ে আছে।”

“ছেলেদের বাল্যকাল”

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কানসাট ইউনিয়নের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষক নওরোজ স্যার “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের একজন উদ্যমী নতুন শিক্ষক, যিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি বিভাগ থেকে পড়াশোনা করেছেন। স্কুলে একদিন দুপুরবেলা, টিফিনের খেলার সময় শেষ হলেও মাঠে তিনজন ছাত্র দৌড়াদৌড়ি করে যাচ্ছে - জিসান, রবিন আর হাসিব। জুতা খুলে, পা মাটি আর ঘাসে, ওদের যেন অফুরন্ত দম। একবার গাছে ওঠে, আবার লাফিয়ে নামে। কখনো মাটি খুঁড়ে কিছু একটা খুঁজে, আবার একে অপরকে ধুলো মেরে হাসে। রুবিনা ম্যাডাম দেখছেন আর ভাবছেন এরা কতো দুরন্ত। ম্যাডাম ভ্রু কুঁচকে নওরোজ স্যারকে বললেন, “স্যার, এরা কোনোদিন ও ঠিক হবে না। মাথায় শুধু দুষ্টামি আর দৌড়ঝাঁপ।”

নওরোজ স্যার হেসে বললেন, “ঠিক হবার দরকার নেই ম্যাডাম, বুঝবার দরকার। ওরা ভেতর থেকে এভাবেই তৈরি , চলাফেরা, বাহিরে খেলা, লাফঝাঁপ এটা কোনো অসভ্যতা না, এটা ছেলেবেলারই অংশ।”

স্যার জানেন, ছেলেরা প্রাথমিক বয়সে মেয়েদের তুলনায় তুলনামূলকভাবে বেশি গতিশীল ও উচ্ছল - বিষয়টি বৈজ্ঞানিক গবেষণায়ও প্রমাণিত। এর পেছনে রয়েছে জৈবিক গঠন, মস্তিষ্কের বিকাশের পার্থক্য এবং সামাজিক পরিবেশের প্রভাব। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের একই ছকে, একই নিয়মে পরিচালনা করার ফলে অনেক সময় ছেলেদের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা তৈরি হয়। ছোটবেলায় ছেলে ও মেয়েদের আচরণগত বৈচিত্র্য একেবারে স্বাভাবিক, ছেলেদের মধ্যে টেস্টোস্টেরনের প্রভাব তাদের মধ্যে কিছুটা ‘বন্যতা’ ও চঞ্চলতা তৈরি করে। এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য কিছু সময় ও অনুশীলন আলাদাভাবে পরিকল্পনা করাই সমীচীন হবে বলে মনে করেন নওরোজ স্যার। এতে উভয় লিঙ্গের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সম্মান জানানো হবে এবং শেখার পরিবেশও আরও কার্যকর হবে।

স্যার লক্ষ করেছেন,

- ছেলেরা অধিকাংশ সময় বসে না থেকে নড়াচড়া করতে চায়,
- তারা ক্লাসে প্রশ্ন কম করে কিন্তু কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহী,
- তারা খেলার সময় আরও বেশি শিখে।

তাই শিক্ষক মিটিং এ নওরোজ স্যার কিছু প্রস্তাব করলেন,

১. ছেলেদের জন্য বেশি গতি ও হাতে-কলমে শেখার সুযোগ থাকা উচিত।

২. কিছু সময় পৃথক অনুশীলন, যেমন - ছেলেদের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবহার, মেয়েদের জন্য অভিব্যক্তিপূর্ণ শিল্পকলা।

৩. পাঠের মধ্যে শারীরিক গতি যুক্ত করা - হাঁটতে হাঁটতে পড়া, উঠ-বস দিয়ে গণিত, প্রশ্ন ছুড়ে উত্তর খোঁজা। প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট বাইরে খেলার ব্যবস্থা।

৪. শিক্ষক হিসেবে আমাদের কাজ, তাদের “শান্ত” বানানো নয়, বরং তাদের “বোঝা” ও “নির্দেশনা” দেওয়া।

ছেলেরা বসে না থাকলে সেটা শাস্তির বিষয় নয়, বরং বিকাশের একটি রূপ। আর মেয়েরা চুপচাপ থাকলেও সে যে অনুভব করে, সেটাও বিকাশের একটি রূপ।

স্যার শিক্ষক মিটিং এ প্রশ্ন করলেন,

- আপনার ক্লাসে ছেলে-মেয়েদের আচরণগত ভিন্নতা কীভাবে প্রকাশ পায়?
- আপনি কি কখনো লিঙ্গভিত্তিক পৃথক অনুশীলনের চেষ্টা করেছেন?
- ভবিষ্যতের পাঠ পরিকল্পনায় আপনি কীভাবে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন?

স্যার, শেষে বলেন, “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পে আমরা প্রতিটি শিশুর স্বতন্ত্রতা মেনে নেওয়ার জন্য শিক্ষক হিসেবে আমাদের মানসিকতা পরিবর্তনে অগ্রাধিকার হলে ভালো হয়। মজার ব্যাপার হল, নওরোজ স্যার এটিও জানেন, বাচ্চা ছেলেদের ভেতরে থাকে সবচেয়ে নরম মন। আজ ওরা মাটি ছুঁড়ে খেলছে, কাল হয়তো একটা ফুল এনে দিবে - এই হলো ছেলেবেলা।

তিনদিন পর এক ঘটনা ঘটে। স্কুলের পেছনের ঝোপ থেকে রবিন একটি অদ্ভুত বুনো ফুল আনলো - “ম্যাডাম এটি আপনার জন্য, শুকিয়ে গিয়েছিলো, আমি পানি দিয়ে তাজা করেছি।”

রুবিনা ম্যাডাম মুগ্ধ হয়ে বললেন, “এই তো! এই ভালোবাসা তো কোনো বইয়ে শেখানো যায় না!”

নওরোজ স্যার বললেন, “ম্যাডাম, এই ছেলেগুলোই বড় হয়ে হবে আমাদের সমাজের সাহসী আর কোমল হৃদয়ের মানুষ।”

“জীবনের ৫টি সহজ নিয়ম”

কুমিল্লার দেবীদ্বারের একটি গ্রামীণ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রিয়াদ –চুপচাপ, ভদ্র, তবে ভেতরে ভেতরে ভয় পায়। নতুন কিছু চাইতেও সাহস করে না, বন্ধুদের সামনে কথা বলতেও লজ্জা পায়।

একদিন রাশেদ স্যার (শিক্ষা-ই-শক্তি প্রকল্পের নতুন শিক্ষক, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে পড়েছেন) ক্লাসে এসে বোর্ডে লিখলেন বড় অক্ষরে: “জীবনের ৫টি সহজ নিয়ম” তিনি বললেন, “আজ আমি তোমাদের এমন কিছু বলবো, যা শুধু পরীক্ষায় না, পুরো জীবনে কাজে লাগবে।”

১. যদি তুমি জিজ্ঞাসা না করো, উত্তর সবসময়ই "না" হবে। স্যার বুঝিয়ে দিলেন, “ধরো রিয়াদ তোমার মনে প্রশ্ন আছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করছ না। তাহলে উত্তর কখনোই পাবে না। সাহস করে হাত তুলতে হবে।” রিয়াদ কিছুটা চিন্তা করলো, এবং সবাইকে অবাক করে প্রথমবার সাহস করে বলল, “প্রশ্ন করবার সময়ই শুধু আমরা বোকা থাকি, আর যখন উত্তর পেয়ে যাই, আমরা সারাজীবনের জন্য চালাক হয়ে যাই, তাই নয়কি স্যার।” সবাই তাকিয়ে রইল, আর স্যার তাকে প্রশংসা করলেন। রাশেদ স্যার আবার বললেন, “তোমরা কি জানো, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি সঠিক উত্তর দেন না, তিনি সঠিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। তাই তোমরাও সব সময় প্রশ্ন করবে।”

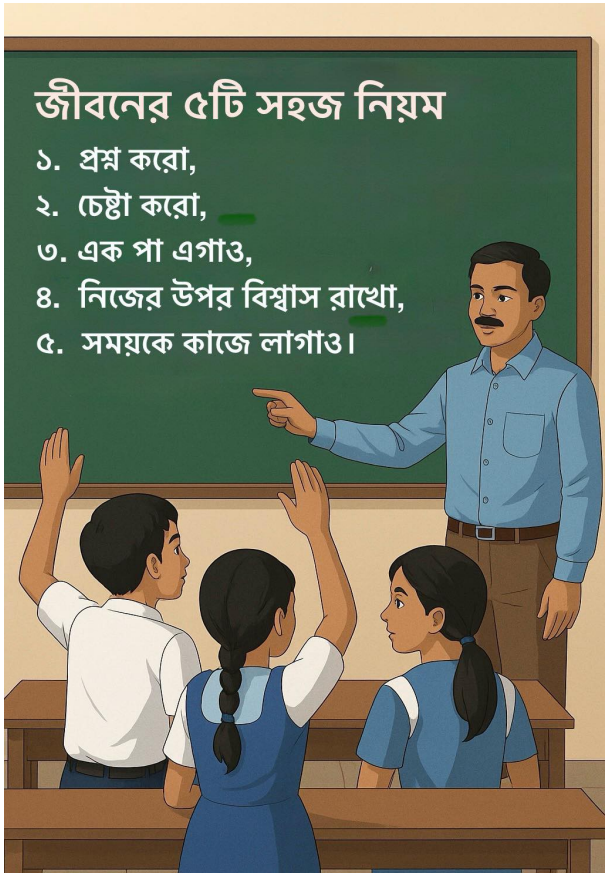

২. “তুমি যা চাও তার পিছনে না ছুটলে তা তুমি কখনোই পাবে না।” একদিন স্কুলের বিতর্ক দলে নাম লেখাতে চাইল রিয়াদ, কিন্তু দ্বিধায় ছিল। স্যার বললেন, “চেষ্টা না করলে অর্জনও হবে না।” রিয়াদ নাম লিখিয়ে নিল, আর পরে সেরা বক্তা নির্বাচিত হলো। রাশেদ স্যার ক্লাস এ বললেন, “আমাদের জন্য সন্দেহ হলো বিশ্বাসঘাতক এবং আমরা প্রায়শই যে ভালো জিনিসটি জিততে পারি তা হারাতে বাধ্য করে, চেষ্টা করার ভয়ে। শুধু কি তাই, আমাদের ব্যর্থতা যতটা স্বপ্নকে ধ্বংস করে, সন্দেহ তার চেয়েও বেশি স্বপ্নকে ধ্বংস করে।” স্যারের কথা শুনে, অষ্টম শ্রেণি এতটা উদজীবিত হলো যে তাঁরা “দ্বিধায় ও সন্দেহ বিশ্বাসঘাতক” নামে দেয়াল পত্রিকা বানালো।

৩. “তুমি যদি এগিয়ে না যাও, তাহলে তুমি সবসময় একই জায়গায় থাকবে।” রিয়াদ খেলাধুলায়ও পিছিয়ে থাকত। স্যার তাকে উৎসাহ দিলেন – “এক পা এগোলেই নতুন দিগন্ত খুলবে।” সে তার ক্লাস এর হয়ে ফুটবল খেলল, আর প্রথম গোলটি দিল। স্যার ক্লাস এ বললেন, “উপরে উঠবার জন্য, তোমাকে পুরো সিঁড়িটা দেখতে হবে না, শুধু প্রথম ধাপটা নাও।” এই উদ্দীপনা ছাত্রদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এলো, তারা একটা “Science Club” নাকি নুতন Bussiness Start-up খুলবে এই নিয়ে ভাবছে।

৪. “তুমি যদি নিজের উপর বিশ্বাস না রাখো, তাহলে অন্য কেউও তোমার উপর বিশ্বাস রাখবে না।” স্যার সবাইকে বললেন, “তোমরা যদি নিজের উপর আস্থা না রাখো, কেউই রাখবে না।” রিয়াদ আয়নায় তাকিয়ে বলল – “আমি পারবো।” সেই বিশ্বাসই তাকে বদলে দিল। স্যার বললেন, “তুমি যদি শুধু বিশ্বাস করো তুমি পারবে তাহলেই তুমি অর্ধেক করে ফেলেছো।” ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝালেন, “ভবিষ্যৎ তাদেরই যারা তাদের স্বপ্নের সৌন্দর্যে বিশ্বাস করে।”

৫. “যদি তুমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য সময় না বের করো, তাহলে জীবন এমন জিনিস দিয়ে ভরে যাবে যা গুরুত্বপূর্ণ নয়।” অবশেষে স্যার বললেন, “সময় সবচেয়ে বড় সম্পদ। যদি পড়াশোনার জন্য সময় না দাও, তা হলে মোবাইল বা টিভি সে সময় কেরে নিবে।” রিয়াদ পড়াশোনার পাশাপাশি প্রতিদিন অল্প সময় বই পড়া, খেলা আর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো শুরু করল। ক্লাস এ সময় নিয়ে আলোচনা হলো, “সময় বিনামূল্যে এক অমূল্য সম্পদ। তুমি এটার মালিক হতে পারো না, কিন্তু তুমি এটা ব্যবহার করতে পারো। তুমি এটা ধরে রাখতে পারো না, কিন্তু তুমি এটা ব্যয় করতে পারো। একবার হারিয়ে ফেললে আর কখনোই তা ফিরে পাবে না।” রাশেদ স্যার ক্লাস শেষ করে বললেন, “জীবনের এই ৫টি সহজ নিয়ম তোমাদের অস্ত্র, ভয় ভেঙে এগোতে হবে। মনে রেখো – প্রশ্ন করো, চেষ্টা করো, এক পা এগাও, নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, আর সময়কে কাজে লাগাও। তাহলেই তোমাদের জীবন জয়ী হবে।”

শুধু একজন অনুপ্রাণিত শিক্ষকই পারেন উচ্চ-প্রাথমিক শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বয়স ও মানসিক পরিপক্বতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দিকনির্দেশনা দিতে। অষ্টম শ্রেণির সময়টাই তাদের জন্য মোড় ঘোরানোর মুহূর্ত, এই বয়সেই তারা জীবনের প্রতি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে এবং পৃথিবীতে তাদের দৃঢ় পদক্ষেপের সূচনা করে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৫২

“জীবনের জন্য নিয়ম”

মাদারীপুর জেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

নতুন এসেছেন এক তরুণ শিক্ষক, তন্ময় স্যার। তিনি সবে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি অনেক আন্দোলন আর অবরোধে অংশ নিয়েছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতা তার মনে এক দৃঢ় বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছে, “প্রত্যেক মানুষকে জানতে হবে, কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল। নিয়ম আছে, কিন্তু প্রয়োজনে নিয়ম ভাঙার সাহসও থাকতে হবে।”

তিনি চান, তার ছোট ছাত্রছাত্রীরাও যেন এই শিক্ষা বোঝে। যাতে তারা জানে, নিয়ম মানুষকে চালায়, আর মানুষের কল্যাণই নিয়মের আসল উদ্দেশ্য।

একদিন দুপুরে ক্লাসে পড়া চলছে। হঠাৎ পাশের মাঠ থেকে কান্নার শব্দ এল। তন্ময় স্যার দেখলেন, ছোট্ট এক বাচ্চা গাছে আটকে কাঁদছে।

স্কুলের নিয়ম হলো - “ক্লাস চলাকালীন বাইরে যাওয়া যাবে না।”

সবাই একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী মিমা হঠাৎ বলে উঠলো, “স্যার, ওকে সাহায্য করতে হবে। আমি বাইরে যাচ্ছি।”

সে ছুটে গিয়ে গাছে উঠলো, ছোট্ট শিশুটিকে নামিয়ে আনলো।

ক্লাসে সবাই ভাবছে মিমা তো নিয়ম ভেঙেছে!

তন্ময় স্যার হাসলেন, ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, “আজ মিমা নিয়ম ভেঙেছে, কিন্তু ভুল করেনি। নিয়ম আছে আমাদের সুরক্ষার জন্য। কিন্তু যখন কারও জীবন বা নিরাপত্তা প্রশ্নে আসে, তখন মানুষের কল্যাণই সবচেয়ে বড় নিয়ম।”

তন্ময় স্যার বোর্ডে লিখলেন,

“নিয়ম মানো, কিন্তু মানুষের জন্য প্রয়োজনে নিয়ম ভাঙতে শিখো।”

সব ছাত্রছাত্রী হাততালি দিল। তারা উপলব্ধি করলো, নিয়ম মানুষকে পথ দেখায়, কিন্তু নিয়মের আসল উদ্দেশ্য হলো মানুষের মঙ্গল। এই উপলব্ধি চতুর্থ শ্রেণির ছোট্ট ছাত্রছাত্রীদের মনে এক নতুন স্বকীয়তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র জাগিয়ে তুললো, যেখানে সকল নিয়মের উর্ধ্বে স্থান পেলো মানবিকতা।

প্রাইমারি ক্লাস এর শিক্ষক তন্ময় স্যার ছাত্রদের বললেন, “তোমরা যদি হৃদয়ের কথা শোনো আর সাহস দেখাও, তাহলে পৃথিবী হবে নিরাপদ।”

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৫৫

“ছোট স্বপ্ন, বড় পরিবর্তন”

সিরাজগঞ্জ জেলার এক গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
অষ্টম শ্রেণির ছাত্রি লাবণী – চুপচাপ, লাজুক, কিন্তু তার চোখে অন্যরকম দীপ্তি।
লাবণী প্রতিদিন স্কুল শেষে গ্রামের ছোট্ট বাচ্চাদের নিয়ে বসে, ওদের সাথে লাবনীর অনেক ভাব।
কেউ ক্লাস টু-থ্রি, কেউ আবার পড়াশোনায় একেবারেই দুর্বল। তাদের করো খাতা নেই, কেউ পেন্সিল পায় না। তবুও লাবণী মাটিতে দাগ কেটে লিখতে শেখায়।

একদিন রুবিনা ম্যাডাম (শিক্ষা-ই-শক্তি প্রকল্পের শিক্ষক) তাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, “লাবণী, তুমি এত কষ্ট করে অন্যদের পড়াচ্ছ কেন? তোমার তো নিজের পড়াই অনেক।”
লাবণী মাথা নিচু করে বলল,
“ম্যাডাম, আমার ছোট ভাইও আগে পড়াশোনা করতে চাইত না। আমি তাকে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে পড়িয়েছিলাম, এখন সে নিয়মিত পড়ে। তখনই ভাবলাম, যদি অন্যদেরও একটু সাহায্য করি, তাহলে ওরাও হয়তো স্কুল কে ভালোবাসবে।”
রুবিনা ম্যাডাম হাসলেন। তিনি জানেন, এটাই আসল শিক্ষা, নিজে শিখে অন্যকে শেখানো।
পরের সপ্তাহে শিক্ষক ক্লাবে ম্যাডাম লাবণীর গল্প শোনালেন।
শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রতি শুক্রবার বিকেলে একটি “ছাত্র-শিক্ষক শেখার আসর” হবে, যেখানে বড়রা ছোটদের পড়াবে, আর শিক্ষকরা শুধু পথ দেখাবে।
ধীরে ধীরে গ্রামের অনেক অভিভাবকও এ কাজে যুক্ত হলো। মাঠে বসে সবাই মিলে পড়ার নতুন উৎসব শুরু হলো। এই পড়ার সঙ্গে যুক্ত হলো, “আমাদের পাঠাগার”, নামে এ লাইব্রেরি।
রুবিনা ম্যাডাম বললেন,
“আমরা যদি অপেক্ষা করি বড় কিছু করার জন্য, তবে হয়তো সুযোগ আসবে না। কিন্তু ছোট ছোট স্বপ্ন - যেমন লাবণীর মতো কারো হাত ধরা, তা-ই একদিন বড় পরিবর্তন এনে দেয়।”
ছাত্রীর সাহস, শিক্ষকের সমর্থন, এবং গ্রামের সম্মিলিত প্রয়াস - সব মিলে পড়ালেখা হয়ে উঠলো খেলাধুলা।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৫৪

“উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া বুদ্ধিমত্তা ডানা ছাড়া পাখির মতো”

পাবনার একটি গ্রামীণ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। অভিনব “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের আওতায় আজ স্কুলে আয়োজন হলো একটি বিশেষ বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বিষয়: “একজন প্রকৌশলী কি চাকরি খুঁজবেন, নাকি উদ্যোক্তা (Entrepreneurship) হবেন?”

এই বিতর্কের উদ্দেশ্য হলো ৯–১০ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সামনে কর্মজীবন ও শিক্ষার প্রকৃত সামঞ্জস্য তুলে ধরা। বিশেষ করে প্রকৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে - শিক্ষার আসল লক্ষ্য কি শুধু চাকরি পাওয়া, নাকি উদ্যোক্তা হয়ে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করা - তা নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করা। তরুণ শিক্ষক নওশাদ স্যার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছেন, পরে শিক্ষকতা পেশায় এসেছেন। তিনি জানেন, গ্রামের ছাত্ররা অনেকেই স্বপ্ন দেখে ইঞ্জিনিয়ার হবে, কেউ চায় সেতু বানাবে, কেউ সফটওয়্যার তৈরি করবে, কেউ রোবট বানাবে।

ক্লাসে ঢুকেই স্যার বোর্ডে লিখলেন বড় অক্ষরে: “প্রকৌশলী মানে সমস্যা-সমাধানকারী।”

বুঝায়ে বললেন, প্রকৌশলী বলতে বোঝায় সেই পেশাদার ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞান ও গণিতের নীতি প্রয়োগ করে সিস্টেম, কাঠামো এবং প্রক্রিয়া নকশা করেন, তৈরি করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ইঞ্জিনিয়াররা মূলত সমস্যা-সমাধানকারী। আর সব চাইতে যেটা বড় কথা, সেটা হলো তোমরা যা কিছু দেখছো, প্রকৃতি ছাড়া সব কিছু কোন না কোন প্রকৌশলীর তৈরী। প্রকৌশলীরা তৈরী করেন, অন্য আর সকল পেশা সেই তৈরী জিনিস ব্যবহার করেন বা সেই জিনিস নিয়ে ব্যাবসা করেন। সেই জন্যই এই বিতর্ক প্রতিযোগিতা, “একজন প্রকৌশলী কি চাকরি খুঁজবে, নাকি উদ্যোক্তা হবে?”

তিনি বললেন, - “আজকের বিতর্ক তোমাদের ভবিষ্যতের পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। কেউ বলবে চাকরি কেন ভালো, কেউ বলবে উদ্যোক্তা কেন দরকার। আসো, শুনি তোমাদের যুক্তি।”

প্রথম দল: চাকরির পক্ষে:- তাহমিদ দাঁড়িয়ে বললো, - “ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে যদি ভালো সরকারি চাকরি বা কোনো বড় কোম্পানিতে স্থায়ী চাকরি পাওয়া যায়, তাহলে পরিবার নিশ্চিন্ত থাকে। মাস শেষে নিয়মিত বেতন আসে, সমাজে সম্মান থাকে। আর চাকরিতে থেকে আমরা দেশের বড় বড় প্রজেক্টে কাজ করতে পারি, যেমন সেতু, রাস্তা, বিদ্যুৎকেন্দ্র। এটা দেশের জন্যও দরকারি।”

তার সহপাঠী রুবি যোগ করলো, - “চাকরিতে অভিজ্ঞতা হয়, দক্ষতা বাড়ে। পরে চাইলে তখন ব্যবসা শুরু করা যায়। তাই চাকরি হলো নিরাপদ প্রথম ধাপ।”

দ্বিতীয় দল: উদ্যোক্তার পক্ষে:- অন্যপাশে দাঁড়ালো মেহেদী। তার চোখে উজ্জ্বল স্বপ্ন। - “আমরা যদি শুধু চাকরি খুঁজি, তবে আমরা কেবল অন্যের নির্দেশে কাজ করব। কিন্তু উদ্যোক্তা শুরু করলে আমরা নিজেরাই নতুন কিছু তৈরি করতে পারবো যা এক জন প্রকৌশলীর কর্তব্য। ছোট উদ্যোক্তা থেকেই বড় বড় কোম্পানি তৈরী হয়।” তানিয়া বললো, - “উদ্যোক্তা মানে শুধু নিজের জন্য নয়, আরও অনেক মানুষের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করা। একজন প্রকৌশলী যদি সমস্যা সমাধানকারী হয়, তবে তার নিজের উদ্যোগে নতুন নতুন সমাধান আসতে পারে। এতে দেশও এগিয়ে যাবে। এই একবিংশ শতাব্দীতে, AI আর Internet এর যুগে, ‘উদ্ভাবন হলো নতুন অর্থনীতি’, আমরা চারদিকে তাকালে দেখবো, নতুন নতুন উদ্ভাবন দিয়েই আমরা অর্থনীতিকে চালু রেখেছি। বিনিয়োগ, শ্রম এবং উদ্ভাবন অর্থনীতির স্তম্ভ, উদ্ভাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এতে নতুন প্রযুক্তি এবং ধারণা তৈরি হয়, যা অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ। প্রকৌশলী উদ্যোক্তা একজন উদ্ভাবক।”

শিক্ষক-এর সমাপ্তি: সবাই উচ্ছ্বসিত তর্ক করেছো। কেউ চাকরির পক্ষে, কেউ উদ্যোক্তার পক্ষে। শেষে নওশাদ স্যার শান্তভাবে বললেন, “দেখো, ইঞ্জিনিয়ার হলো সমস্যা সমাধানকারী। চাকরিতে থেকে সে দেশের বড় সমস্যার সমাধান করতে পারে, চাকরির সুযোগ সীমিত হলেও, উদ্যোক্তা হয়ে সুযোগ তৈরি করা যায়। আসল বিষয় হলো - তুমি কোন পথে নিজের সৃজনশীলতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগাবে। তোমাদের ভবিষ্যৎ পথ শুধু নিরাপত্তা খোঁজা নয়, বরং নিজের মনের ভেতরের ডাকে সাড়া দেওয়া। কেউ চাকরির পথে যাবে, কেউ উদ্যোক্তা হবে - কিন্তু দু’জনের লক্ষ্য একটাই, মানুষের জীবনকে সহজ ও সুন্দর করা।”

বিতর্ক শেষে সবাই হাততালি দিলো। ক্লাস ৯–১০ এর শিক্ষার্থীরা বুঝলো - ইঞ্জিনিয়ার মানে কেবল ডিগ্রি নয়, বরং সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব। তারা উপলব্ধি করলো, চাকরি আর উদ্যোক্তা- দুটোই পথ, আসল ব্যাপার হলো নিজের ভেতরের সাহস আর সৃজনশীলতা খুঁজে পাওয়া।

ছাত্র-ছাত্রীরা শিখল, ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে উভয় পথই খোলা, কিন্তু সাহস, অভিজ্ঞতা এবং উদ্ভাবন দিয়ে সফলতা আসে। বিতর্ক শেষ হলো, কিন্তু ছাত্রদের মনে নতুন স্বপ্ন জাগল।

শেষে ২ জন ছাত্র নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করলো:-

- “স্যার, আমি চাই চাকরির নিরাপত্তা, তবে ভবিষ্যতে হয়তো ছোট একটা ব্যবসাও শুরু করবো।”
- “স্যার, আমি উদ্যোক্তা হবো, কারণ নতুন কিছু তৈরি করার স্বপ্ন দেখি।”

“পরিকল্পনা ছাড়া লক্ষ্য কেবল একটি ইচ্ছা”

নড়াইল জেলার একটি গ্রামীণ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। রাশেদ স্যার চিটাগং বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে পাস করেছেন, স্যারের শেষ বর্ষের গবেষণা ছিলো “Stochastic Modeling for human life”, যেটা গণিত এবং সম্ভাব্যতা তত্ত্বের একটি শাখা যা সময়ের সাথে সাথে এলোমেলোভাবে পরিবর্তিত ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করে। তাই রাশেদ স্যার সময়ের মূল্য বুঝেন ও জীবনের গোলকধাঁধায় এই সময়ের মূল্যায়ন করতে আগ্রহী।

স্যার মনে করেন, সময় ব্যবস্থাপনা (Time Management) নিয়ে সরাসরি বললে ৯–১০ শ্রেণীর ছাত্ররা হয়তো গুরুত্বটা বুঝবেনা, কিন্তু যদি তাদের হাতে কোনো ব্যবস্থা (যেমন Gantt Chart বা PERT Chart) তুলে দেওয়া যায়, তাহলে তারা সেটা খেলনার মতো উপভোগ করবে এবং অজান্তেই প্রকল্প পরিকল্পনা, দলগত সময় ব্যবস্থাপনা শিখে যাবে।

৯ম–১০ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রাশেদ স্যার একটি বিশেষ ক্লাস নিচ্ছেন। স্যার ব্ল্যাকবোর্ডে বড় করে লিখলেন – “পরিকল্পনা ছাড়া লক্ষ্য কেবল একটি ইচ্ছা।” তারপর বললেন, “শোন, লক্ষ্য নির্ধারণ করা মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হলো তুমি কী কী ধাপে এটি অর্জন করবে এবং সেই অনুসারে পরিকল্পনার সাথে থাকবে।”

ছাত্ররা অবাক হয়ে তাকালো। কেউ ফিসফিস করে বলল, “পরিকল্পনা মানে কী সময়?” স্যার হাসলেন। তারপর হাতে চক নিয়ে বোর্ডে টানলেন কয়েকটি কলাম আর সারি। বললেন, “তোমরা কি জানো, কোনো ব্রিজ বানাতে বা কোনো রোবট বানাতে ইঞ্জিনিয়াররা কীভাবে কাজ ভাগ করে নেয়?”

সবাই মাথা নেড়ে বললো, “না স্যার।” স্যার বললেন, “তাহলে আজ তোমাদের আমি দুইটা কার্যকরী মানচিত্র দেখাবো, Gantt Chart আর PERT Chart।”

Gantt Chart:- স্যার প্রথমে ব্ল্যাকবোর্ডে একটি লম্বা ক্যালেন্ডার লাইন আঁকলেন। তারপর লিখলেন – অংকের প্রাকটিস, বিতর্কের অনুশীলন, খেলাধুলার সময়, বিজ্ঞান মেলার জন্য প্রজেক্ট। প্রতিটি কাজের পাশে তিনি ছোট ছোট বার এঁকে দেখালেন, কোন দিনে কোন কাজ চলবে। “এটাই Gantt Chart। এতে তোমরা দেখতেপারবেএক কতগুলো কাজ চলছে এবং কোনটার আগে কোনটা শেষ করতে হবে।”

ছাত্ররা অবাক হয়ে দেখল, আসলেই যেন কাজগুলো এখন চোখের সামনে সাজানো!

স্যার বললেন, “এই সাজানো কাজ গুলোই বলে দেবে তুমি কোথায় যাচ্ছ, তা না হলে তুমি অন্য কোথাও পৌঁছে যাবে, যা তোমার লক্ষ নয়।”

PERT (Program Evaluation Review Technique) Chart:- তারপর স্যার আরেকটি চিত্র আঁকলেন, গোল ঘর, তার ভেতরে কাজের নাম, আর তীরচিহ্ন দিয়ে একটার সাথে আরেকটা যুক্ত।

স্যার বললেন, “এটাই PERT Chart। এতে বোঝা যায়কোন কাজ শেষ না করলে পরেরটা শুরুই করা যাবে না।”

উদাহরণ দিলেন, “যেমন বিজ্ঞান মেলার জন্য আগে দল ভাগ হবে → তারপর কাজ ভাগ হবে → তারপর গবেষণা → তারপর মডেল তৈরি→ শেষে প্রদর্শনী” রুবি বলল, “স্যার, তাহলে তো আমরা পড়াশোনার কাজও এভাবে ভাগ করে নিতে পারি!” মাহিন যোগ করল, “স্যার, আমরা গ্রুপ প্রোজেক্ট করলে কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। চার্টেই ধরা পড়ে যাবে!”

স্যার হাসলেন আর বললেন, “ঠিক তাই। সময়কে চিত্রে ধরতে পারলে, কাজ আর স্বপ্ন, দুটোই সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।”

রাশেদ স্যার ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আজ তোমরা সবাই একটা বিশেষ কাজ করবে। তোমাদের এক দিনের সময় কাগজে Gantt Chart আকারে সাজাতে হবে।

ধাপগুলো হবে, ঘুম থেকে ওঠা, নাশতা, স্কুলে আসা, পড়াশোনা, খেলাধুলা, হোমওয়ার্ক, পরিবারকে সময় দেওয়া, ঘুমানো। দিনের শেষে কী অর্জন হলো, যেমন “আজকের হোমওয়ার্ক শেষ করা” বা “বিজ্ঞান মেলার প্রোজেক্ট অর্ধেক এগিয়ে নেওয়া”।

স্যার দেখালেন, “যদি পরীক্ষার আগে পড়াশোনার সময় Gantt Chart দিয়ে ভাগ করো, তাহলে কোন অধ্যায় কবে শেষ হবে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।”

স্যার বললেন, “যখন তোমরা চার্ট আঁকবে, তখন তোমারা বুঝবে, সময় ঠিকমতো ব্যবহার করলে কত কাজ করা সম্ভব। মনে রেখো, সময় হলো সেই চিত্র যা তোমাদের লক্ষ্য পর্যন্ত নিয়ে যাবে।”

রুবি বললো, “স্যার, তাহলে তো আমরা নিজেদের কাজের রূপরেখা বানাতে পারব!”

মাহিন যোগ করলো, “আর যদি সময় নষ্ট করি, তাহলে চার্টে ফাঁকা জায়গা থেকে যাবে, মানে লক্ষ্যও পিছিয়ে যাবে।”

শেষে রাশেদ স্যার বললেন, “তোমরা যদি এখন থেকেই পরিকল্পনা শিখে যাও, তবে জীবন তোমাদের হাতে আরও সহজ হবে। শুধু ইচ্ছে করে লক্ষ্য পূর্ণ হয় না, তাকে পূর্ণ করে পরিকল্পনা আর ধারাবাহিক প্রয়াস। আজকের এই চার্ট আঁকা হয়তো ছোট্ট অনুশীলন, কিন্তু এর ভেতরেই লুকানো আছে ভবিষ্যতের সেতু বানানোর ক্ষমতা।”

ক্লাসের সবাই নীরবে মাথা নেড়ে স্যারের কথা মনে গেঁথে নিলো, “পরিকল্পনা ছাড়া লক্ষ্য কেবল একটি ইচ্ছা”, এবার তাদের কাছে কেবল একটি কথা নয়, বরং জীবন চালানোর পথনির্দেশ হয়ে উঠল।

ধরিত্রী দিবস - "আমাদের শক্তি, আমাদের গ্রহ"

সিলেট জেলার একটি গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজকের ক্লাসে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বাহিরে ক্লাস নিচ্ছেন নতুন শিক্ষক রুবাইয়াত স্যার। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, তার লব্ধ জ্ঞান থেকে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, “এক গ্রহ, এক সুযোগ, এক ভবিষ্যৎ”। আর তাই, ছাত্রদের ক্ষেত্রে ভাবেন, তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হবে, তবেই তারা প্রকৃতি প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং প্রকৃতি রক্ষা করবে। এই ভবিষ্যতের প্রজন্ম যদি রক্ষা না করে, তাহলে কে করবে? রুবাইয়াত স্যার জানেন এই পৃথিবীর পরিবেশের মৌলিক উপাদানগুলি। একটা জটিল সমীকরনে এই পৃথিবীর পরিবেশ ভারসাম্য অবস্থায় আছে।

স্যার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্কুলের পাশের ছোট্ট নদীর ধারে গেলেন। শীতল বাতাস বইছে, গাছে গাছে শালিকের ডাক। স্যার সবাইকে বললেন,

“তোমরা যদি শুধু বইয়ে পড়ে জানো নদী মানে পানি, গাছ মানে অক্সিজেন - তাহলে প্রকৃতিকে বোঝা হবে না। প্রকৃতিকে বোঝা মানে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। তোমরা যদি নদীর কাছে না আসো, পাখিদের ডাক না শোনো, গাছের ছায়া না অনুভব করো - তাহলে প্রকৃতিকে ভালোবাসা শিখবে কেমন করে?”

এক ছাত্রী, তৃষা, দ্বিধা নিয়ে বলল, “স্যার, আমরা তো জানি গাছ কেটে ফেলা ক্ষতি করে। কিন্তু গ্রামের অনেকেই তো কেটে ফেলে।”

স্যার মৃদু হাসলেন। “তারা জানে, কিন্তু বোঝে না। বুঝলে তারা গাছকে নিজের পরিবারের মতো মনে করত। মনে রেখো, যদি তোমরা প্রকৃতিকে রক্ষা না করো, কেউ করবে না। প্রকৃতি যতটুকু টিকে থাকবে, তোমাদের ভবিষ্যৎও ততটুকু টিকে থাকবে।”

সবাই নদীর তীরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসে দুলতে থাকা পাতা আর জলের কলকল ধ্বনি যেন নতুন প্রতিজ্ঞা শোনাল, “আমরা বুঝব, তাই রক্ষা করব।”

প্রতি বছর ২২ এপ্রিল “ধরিত্রী দিবস” (Earth Day), স্যার অনেক কিছু দিয়ে বুঝালেন, বাসযোগ্য গ্রহর উপাদান ও রক্ষণাবেক্ষণ। বায়ুমন্ডল, জলমন্ডল, ভূমি, জীবমন্ডল মূলতো অপরিহার্য বাসযোগ্য গ্রহের জন্য। সঙ্গে আছে, শক্তি প্রবাহ (সূর্য) উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে সৌরশক্তি গ্রহণ। আছে, জলচক্র বাষ্পীভবন, ঘনীভবন এবং বৃষ্টিপাতের একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, চৌম্বক ক্ষেত্র, ভূতাত্ত্বিক (টেকটোনিক্স প্লেট) ইত্যাদি।

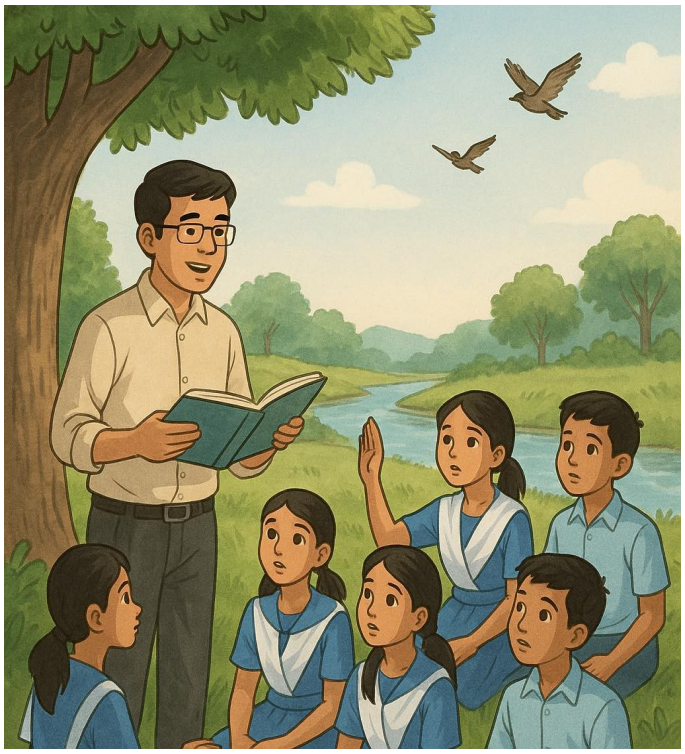

আবার স্যার একটা মজার তথ্য দিলেন, “তোমরা কি জানো, ১৯৯৭ এ জাপানের কিয়োটো শহরে ‘Carbon Trading’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি।”

শিক্ষার্থীরা কৌতূহলী হয়ে তাকাল।

স্যার বোঝাতে শুরু করলেন, “ভাবো, দুটি দেশ আছে।

• দেশ ‘ক’ অনেক কারখানা চালিয়ে বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) বের করছে। ফলে পৃথিবী গরম হচ্ছে।

• আর দেশ ‘খ’ প্রচুর গাছ লাগাচ্ছে, বন সংরক্ষণ করছে, যা বাতাস থেকে CO_2 শোষণ করে নিচ্ছে।

এখন দেশ ‘ক’ কে বলা হলো, ‘তুমি অনেক দূষণ করছ, তাই তোমাকে অতিরিক্ত ফি দিতে হবে।’ কিন্তু যদি দেশ ‘ক’ সরাসরি দূষণ কমাতে না পারে, তবে তারা দেশ ‘খ’-এর কাছ থেকে Carbon Credit কিনতে পারে। মানে, দেশ ‘খ’ যেহেতু গাছ লাগিয়ে পরিবেশ রক্ষা করছে, তার সেই কৃতিত্ব বিক্রি করতে পারে। এতে দেশ ‘ক’ সাময়িক ভারসাম্য রাখতে পারে।”

তৃষা নামের এক ছাত্রী বলল,

“স্যার, তাহলে গাছ লাগানোও এক ধরনের টাকা বা সম্পদ হয়ে গেল?”

স্যার হেসে মাথা নেড়ে বললেন, “ঠিক তাই। এক একটি গাছ মানে এক একটি কার্বন সেভিংস। যদি আমরা সবাই মিলে গাছ লাগাই, তবে শুধু পৃথিবীই রক্ষা হবে না, একদিন এগুলো অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবেও গণনা হবে।”

স্যার বললেন, “একটি পূর্ণবয়স্ক তাল গাছ বছরে প্রায় ০.৪৬ টন CO_2 ধারণ করে। বর্তমান কার্বন মূল্যে $২০ থেকে $৩০ এর মধ্যে, মানে ২,৫০০-৩,৫০০ টাকা প্রতি বছর। এভাবেই Carbon Trading কাজ করে এবং ২০০৫ থেকে এটা বাধ্যতামূলক সব দেশের জন্য।”

শেষে সবাই হাত তুলে প্রতিজ্ঞা করল, “আমরা গাছ লাগাব, প্রকৃতি রক্ষা করব, Carbon Credit জমা করব। এটাই আমাদের ভবিষ্যৎ।”

“একজনার ভাষার সীমাবদ্ধতা মানে তার জগতের সীমাবদ্ধতা।”

রাজশাহীর একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। নবম শ্রেণীর ক্লাসে আজকের পাঠ “ইংরেজি লেখা, পড়া এবং বলা”। নতুন শিক্ষক নওশাদ স্যার, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করেছেন, পরে আমেরিকায় এক বছর শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বহুভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, “পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে?” স্যার জানেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই উক্তি তাঁর বহু ভাষা জানার মাধ্যমে এসেছে, কারণ, “একটি ভাষা বুঝতে হলে কমপক্ষে দুটি ভাষা বোঝো দরকার।” আর তাই আমাদের মাতৃভাষার উন্নতির জন্য আমাদের ইংলিশ ভাষা ভালো ভাবে জানতে হবে। এমনি একটা সংকল্প নিয়ে নওশাদ স্যার ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষা দেন।

আজ স্যার ক্লাসে ঢুকেই ব্ল্যাকবোর্ডে লিখলেন: “Reading is the foundation of knowledge, Writing is the bridge, and Speaking with clarity is the power.”

স্যার ইংরেজি ভাষা ক্লাস এ English Environment তৈরি করলেন, সবাই এখন ইংরেজিতে কথা বলবে এবং লিখবে। স্যারের প্রয়াস ছিলো এমন:

- English Newspaper, Magazines, Cartoons দিয়ে পড়া ও লেখা অনুশীলন।
- মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে Audio-Visual Lessons শোনা ও দেখা।
- ক্লাসে Drama & Prompt Speaking খেলা, যেখানে সিগন্যাল দিয়ে আরেকজন ইংরেজিতে ব্যাখ্যা করলো।

স্যার ক্লাসে কিছু ছবি নিয়ে এসেছেন,

- একটি গ্রামীণ দৃশ্য: মাঠে কৃষক কাজ করছে।
- একটি শহরের রাস্তা: বাস, গাড়ি, দোকান।

স্যার বললেন:

- “Look carefully at the picture. Now, describe what you see, but only in English.”

রুবি ছবি দেখে বলল:

- “I see a farmer. He is working in the field. The sky is blue.”

রাশেদ ছবি দেখে বলল:

- “There are many cars. People are walking on the road. This is a busy city.”

এভাবে ছাত্ররা শিখলো– একটি দৃশ্য থেকে ইংরেজি শব্দ বের করে বাক্যে সাজানো। এতে তাদের শব্দভান্ডার বাড়লো, observation skill sharpened হলো, আর লজ্জা কেটে গেল।

Lesson Style এমন ছিলো:

1. Warm-up Talk (Speaking) → ছোট কথোপকথন।
2. Reading & Writing Task → পত্রিকা/ম্যাগাজিন থেকে।
3. Discussion & Reflection → লেখা পড়ে শোনানো।
4. Audio-Visual Practice → ভিডিও/অডিও শোনা ও বলা।
5. Drama & Prompt Speaking → অঙ্গভঙ্গি ও ব্যাখ্যা।
6. Picture Description → ছবি দেখে সাথে সাথে ইংরেজিতে বর্ণনা।

স্যার একটা জিনিস খেয়াল করলেন, ছাত্ররা ইংলিশ বলতে লজ্জা পায়, শুরুতে অনেকেই ছবি দেখে কী বলবে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তারা দেরি না করে prompt ভাবে ইংরেজিতে বলতে শুরু করলো। তাদের শরম একেবারে উড়ে গেল, কারণ তারা এখন দেখলো, ভাষা শেখা মানে কেবল বই নয়, চারপাশের জীবনকেও ইংরেজিতে প্রকাশ করা।

স্যার বোর্ডে লিখলেন: “See, Think, Speak , English is everywhere.”

পত্রিকা, কার্টুন, অডিও-ভিজ্যুয়াল লেসন, ড্রামা আর ছবি - সব মিলিয়ে ক্লাসের পরিবেশ হলো ইংরেজিমুখর। পড়া, লেখা, বলা, শোনা, দেখা - সব দিক থেকেই ইংরেজি হলো তাদের দৈনন্দিন চর্চার অংশ। অনুবাদ ছাড়াই, স্বাভাবিক ব্যবহারে, prompt speaking ও picture description-এর মাধ্যমে ছাত্ররা বুঝলো, ইংরেজি আসলে এক নতুন জগতের দরজা।

শেষ পর্যন্ত নওশাদ স্যারের ক্লাসে ছাত্ররা বুঝলো - ইংরেজি শেখা মানে কেবল পরীক্ষায় ভালো করা নয়, বরং পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত হওয়া। তারা দেখলো, প্রতিদিনের চর্চা, স্বাভাবিকভাবে বলা, লেখা, পড়া আর শোনার মাধ্যমে ইংরেজি তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠছে। আজ তারা আর লাজুক নয়; তারা আত্মবিশ্বাসী, তারা জানে - একজনার ভাষার সীমাবদ্ধতা মানে তার জগতের সীমাবদ্ধতা। তাই নতুন ভাষা শেখা মানে নতুন দিগন্ত জয় করা।

“প্রশিক্ষণ”

কুমিল্লার দেবীদ্বারের একটি গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ নবম শ্রেণীর ক্লাসে নতুন শিক্ষক ফয়সাল স্যার। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান পড়েছেন।

স্যারের শেষ বর্ষের থিসিস ছিলো – “AI based Accuracy, Precision, Randomness, and Repeatability, Consistency regeneration by training for the bipedal walking robot’s dexterity”

(“দ্বিপদ হাঁটার রোবটের দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক নির্ভুলতা, সুনির্দিষ্টতা, এলোমেলোতা, পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা ও ধারাবাহিকতার প্রয়োগ”)। কাজটা ছিলো, একটা রোবটকে হাঁটা শেখানো, ঠিক যেমনটি করে মানব শিশু হাঁটা শেখে, বার বার বিফল হয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে।

বিজ্ঞানমনস্ক ফয়সাল স্যার যখন রোবটের প্রশিক্ষণ নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তখন তিনি একটি গভীর সত্য বুঝেছিলেন, মানুষের এলোমেলো ভুলও কাজে লাগানো যায়, যদি সেটিকে পুনরাবৃত্তি ও ধারাবাহিকতার মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে অনুশীলন করা হয়; তখনই নির্ভুলতা ধরা দেয়।

তিনি ছাত্রদের বললেন,

“কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আসলে মানুষের বুদ্ধিমত্তারই যান্ত্রিক রূপ। এখানে পুরস্কার পাওয়া যায় তখন, যখন কাজটি নির্ভুলের পথে এগোয়, আর যখন ভুলের পথে এগোয় তখন সংশোধন করে নিতে হয়। এটাই প্রশিক্ষণ। ঠিক তেমনি জীবনে তোমাদের শিখতে হবে, ভুল মানে ব্যর্থতা নয়, ভুল মানে শেখার সুযোগ। যদি পুনরাবৃত্তি ও ধারাবাহিকতায় পড়াশোনা করো, তবে একদিন তোমরা নিজেরাই নির্ভুলতার স্বাদ পাবে।”

ফয়সাল স্যারের চোখেমুখে তখন এক ধরনের উত্তেজনা। তিনি চেয়েছিলেন, তার নবম শ্রেণীর ছাত্ররা যেন বুঝতে পারে, শিক্ষা হলো এক ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত অনুশীলন, যেখানে ব্যর্থতা হলো শিক্ষক, আর ধারাবাহিকতা হলো সাফল্যের সেতু।

স্যার বুঝাতে চাইলেন, ভুল আসলে ক্ষতি নয়, যদি সেই ভুলকে পুনরাবৃত্তি ও ধারাবাহিকভাবে সংশোধন করা যায়। রোবট যেমন বারবার পড়ে গিয়ে আবার উঠে হাঁটা শিখে, মানুষও তেমনই শেখে। স্যার হঠাৎ ক্লাসে চক দিয়ে বোর্ডে একটি বড় টার্গেট গোল আঁকলেন।

“এখন আমরা একটা খেলা খেলবো। তোমরা এই বোর্ডে কাগজের বল ছুঁড়বে। দেখি কারা নির্ভুল, কারা সুনির্দিষ্ট, কারা এলোমেলো।”

প্রথম উদাহরণ:

সোহাগ তিনবার বল ছুঁড়লো,

একবার একেবারে মাঝখানে, আর দু’বার ও মাঝখানে।

স্যার বললেন, “এটা হলো accuracy, মাঝখানে লাগলো, সুনির্দিষ্টতা ভাবে।”

দ্বিতীয় উদাহরণ: রুবি তিনবার ছুঁড়লো, প্রতিবার একই জায়গায় লাগলো, কিন্তু মাঝখান থেকে দূরে।

স্যার বললেন, “এটা হলো Precision, সবগুলো একই জায়গায় কিন্তু মাঝখানে নয়। যেমন ধরো, বাসার জ্বর মাপার thermometer এ তাপমাত্রা দেখায় কিন্তু সব সময় ২ ডিগ্রী কম, এখন কী করতে হবে ঐ thermometer টা কে calibrate (মান সম্পন্ন) করতে হবে।”

তৃতীয় উদাহরণ: আশিক তিনবার ছুঁড়লো - একবার বাঁয়ে, একবার ডানে, আরেকবার একেবারে বাইরে। “এটা হলো Randomness —এলোমেলো, কোনো ধারাবাহিকতা নেই। কোন কাজের না।”

এরপর স্যার বললেন, “তোমরা পড়াশোনায়ও একই জিনিস করতে পারো।

- একদিন হঠাৎ ভালো ফল করলে সেটা Accuracy, কিন্তু ধারাবাহিক নাও হতে পারে।
- প্রতিদিন একইভাবে পড়লে সেটা Precision ও Repeatability।
- যদি দীর্ঘমেয়াদে একইভাবে চেষ্টা করো, তাহলে সেটা Consistency।
- আর যদি আজ পড়ো, কাল খেল, পরশু ভুলে যাও—তাহলে সেটা Randomness।”

ফয়সাল স্যার ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বললেন,

“তোমাদের জীবনও আসলে একেকটা প্রশিক্ষণ। এখানে ভুল মানে থেমে যাওয়া নয়, বরং আবার দাঁড়িয়ে ওঠার শক্তি খুঁজে পাওয়া। যে ছাত্র ভুল থেকে শিক্ষা নেয়, নিয়মিত অনুশীলনে থাকে এবং ধারাবাহিকতা ধরে রাখে, তার জীবনও একদিন টার্গেট বোর্ডের মাঝখান স্পর্শ করবে। মনে রেখো - নির্ভুলতা একদিনে আসে না, আসে এলোমেলো ভুলকে শিখায় পরিণত করার মধ্য দিয়ে।”

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৬১

“আত্মবিশ্বাসী সন্তান চাই”

রাজশাহীর বাঘা উপজেলার একটি গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন শিক্ষক মনিরুল। তিনি “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের আওতায় BCS পরীক্ষার্থী হিসেবে এক বছরের জন্য এখানে পাঠদান করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করা মনিরুল স্যার বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো, পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেছেন।

তাঁর গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে, একটি শিশুকে সুষ্ঠু ও মানসম্মত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিবারের অবদান সর্বাধিক। পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গিই শিশুর শিক্ষার প্রতি মনোভাব এবং জীবনের চলার পথ নির্ধারণ করে দেয়।

তাই মনিরুল স্যার মনে করেন, শুধু বিদ্যালয় নয়, অভিভাবকেরাও শিক্ষার বড় অংশীদার। তাঁদের উৎসাহ, সাহস ও দিকনির্দেশনাই সন্তানের ভেতরে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। বিদ্যালয় সমাজেরই একটি অংশ, সুতরাং অভিভাবকদের সঠিক দিকনির্দেশনাও প্রয়োজন, যাতে শিক্ষা হয়ে ওঠে পরিবার ও সমাজের যৌথ প্রয়াস।

আজকের অভিভাবক সভায় যোগ দিয়েছেন মনিরুল স্যার। শিশুদের মানসিক বিকাশ বিষয়ে তাঁর একটি দৃঢ় বিশ্বাস আছে, “অতিরিক্ত অনুগত্য সন্তানকে দুর্বল করে, আর আত্মবিশ্বাস তাকে শক্তিশালী করে।”

অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে মনিরুল স্যার বললেন, “আমরা সবাই চাই আমাদের সন্তান ভালো হোক, ভদ্র হোক। কিন্তু অতিরিক্ত ভদ্রতা আর অন্ধ আনুগত্যে তারা যেন ভীতু হয়ে না যায়। জীবন যুদ্ধক্ষেত্রের মতো, যেখানে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস, স্পষ্ট বক্তব্য আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস।” তিনি বোর্ডে লিখলেন নয়টি পয়েন্ট, আর সেগুলোর সাথে কিছু উদাহরণ দিলেন:-

১. সাহসী কণ্ঠস্বর – “ধরা যাক, ক্লাসে শিক্ষক প্রশ্ন করলেন - ‘এই অংকটা কে করবে?’ যদি আপনার ছেলে/মেয়ে উত্তর জানে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে, কিন্তু ভয় পেয়ে মুখ খোলে না, তাহলে জ্ঞানটাই তার ভেতরে চাপা পড়ে যায়। অথচ জোরে বললে সবাই বুঝতে পারত যে ও জানে।”

২. আত্মপ্রকাশ – সামাজিকতা থেকে ভয় পাবে না, বন্ধুত্বের ছোটখাটো রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করবে না।

৩. না বলার অভ্যাস – যা করতে চায় না, এমনকি শিক্ষক যদি জোর করেন, তবুও সম্মান রেখে না বলতে শিখবে। “যেমন, একজন শিক্ষক যদি বাড়তি খাতা আনার জন্য বলেন, অথচ ছাত্রের খাতাই নেই, তখন ‘না স্যার, আমার খাতা নেই’ বলাটা অপরাধ নয়। এটা ভদ্রতা রেখেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করা। আপনার ছেলে/মেয়েদের বুঝাতে হবে, না বলা অভদ্রতা নয়, বরং সত্যি কথা বলা।”

৪. আত্মরক্ষা – সহপাঠী খারাপ কিছু বললে, শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভাবে জবাব দেবে।

৫. সম্মানজনক লেনদেন – কেউ কিছু চাইলে, যদি না দিতে চায়, শুধু “না” না বলে প্রশ্ন করবে, “এর বিনিময়ে তুমি আমাকে কী দিচ্ছ?”

৬. অভিভাবকের ভরসা – কোনো অন্যায় বা কষ্ট হলে সাথে সাথে বাবা-মাকে জানাবে। বাবা-মাই তার প্রথম আশ্রয়। অভিভাবদের এই ব্যাপারটা তে নিশ্চয়তা দিতে হবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রমান সহ।

৭. শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি – শিক্ষক কী ভাবছেন তা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা না করে, নিজের সত্যিকারের শেখার দিকে মন দেবে।

৮. অন্যায়ের প্রতিবাদ – অন্যায় দেখলে চুপ না থেকে, দৃঢ়ভাবে না বলবে। “যেমন, যদি কোনো সহপাঠী বলে - ‘তুই গাধা’, তখন চুপ করে কান্না করার কোন মানেই হয় না। বরং দৃঢ়ভাবে বলা, ‘আমাকে অপমান করার অধিকার তোমার নেই।’ এভাবেই আপনার সন্তান আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে শিখবে।”

৯. আত্মবিশ্বাস – নিজের ভেতরে সবসময় বিশ্বাস রাখবে, কারণ আত্মবিশ্বাসী মানুষকেই সবাই সম্মান করে। স্যার বুঝায়ে বললেন, তাঁর গবেষণায় একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা সব দেশেই এবং সব সময়েই বয়স, জ্ঞান ও দক্ষতায় পূর্ণাঙ্গ নয়; অনেকাংশেই তারা দুর্বল ও সুরক্ষার প্রয়োজন বোধ করে। ফলে বিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে তাদের আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হয়ে ওঠার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকে না। তাই সন্তানদের জীবনের সংগ্রাম মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি অর্জনের দায়িত্ব প্রধানত পরিবারকেই নিতে হয়।

অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া - মায়েরা মাথা নাড়লেন, বাবারা গভীর মনোযোগে শুনলেন। তারা বুঝলেন, সন্তানকে শুধু “চুপ থাকো, ভদ্র হও” শেখানো যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন, সন্তান যেন নিজের আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে পারে, ভুল হলে প্রতিবাদ করতে পারে, আর প্রতিটি পদক্ষেপে আত্মবিশ্বাসী থাকে।

মনিরুল স্যার সভা শেষ করার আগে বললেন,

“প্রার্থনা করি, আল্লাহ আমাদের সন্তানদের শক্তিশালী, ন্যায়ের পথে দৃঢ়, আর আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন - আমীন।”

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৬০

“লেখো প্রতিদিন - স্মৃতি হবে অমলিন”

গাইবান্ধার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক এসেছেন “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পে। তাঁর নাম রুবেল স্যার, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগে পড়াশোনা করেছেন। আজ তিনি সপ্তম শ্রেণীর “আনন্দপাঠ – বাংলা দ্রুতপাঠন” ক্লাস নিচ্ছেন।

চারুকলার মূল লক্ষ্য হলো নান্দনিক আনন্দ সৃষ্টি, যা মানুষের সুকুমার বৃত্তি, আবেগ আর কল্পনার প্রকাশ ঘটায়। অঙ্কন, চিত্রকলা, সঙ্গীত, ভাস্কর্য কিংবা নৃত্য, সবই মানুষের মনের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে। রুবেল স্যার মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, ছোটবেলা থেকেই হাতে কলমে শিল্পচর্চা করতে হবে। কারণ, “নিজের হাতের লেখায় নিজেকে দেখা যায়।”

ক্লাসে ঢুকেই স্যার বোর্ডে লিখলেন,

“যা লিখি, তা মনে থাকে।” ছাত্ররা কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইল। স্যার বললেন,

“লেখা হলো স্মৃতির তালা খোলার চাবি, আর লেখা অনেকটা হাতে তৈরি শিল্পের মতো।”

এরপর তিনি একটি ছোট গল্প শোনালেন—

একটি কাক গরমে পিপাসার্ত হয়ে কলসিতে পাথর ফেলে পানি উপরে তুলল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কে গল্পটা মনে রাখতে পারবে?”

কয়েকজন হাত তুলল, বাকিরা নীরব।

তখন স্যার বললেন, “এবার তোমরা গল্পটা দুই লাইনে খাতায় লিখে নাও।”

সবাই লিখল,

“কাক পিপাসার্ত ছিল। পাথর ফেলে পানি তুলল।”

পাঁচ মিনিট পরে স্যার আবার জিজ্ঞেস করলেন।

এবার একসাথে পুরো ক্লাস হাত তুলল।

কারণ লেখার মাধ্যমে তারা সহজেই গল্পটি মনে রাখতে পেরেছে।

রুবেল স্যার হেসে বললেন,

“দেখো, লেখা শুধু স্মৃতি ধরে রাখে না, এটা মনের সৌন্দর্যও প্রকাশ করে। হাতের লেখা যত সুন্দর, ততই মনে শান্তি আসে। তাই তো বলা হয়,

Calligraphy is the flower of men’s soul.

লেখা হলো তোমাদের আত্মার ফুল, যা জ্ঞানকে সুগন্ধি করে রাখে।”

স্যার তিনটি মূল শিক্ষা তুলে ধরলেন -

১. লেখা হলো স্মৃতিকে শক্তিশালী করার চাবি।

২. লেখা হলো শিল্প, যেখানে হাত আর মন মিলে আত্মার সৌন্দর্য প্রকাশ করে।

৩. সুন্দর করে লিখতে শিখলে মন হয় শান্ত, আর জ্ঞান থাকে দীর্ঘস্থায়ী।

স্যার চাইলেন, প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা অন্তত ৪ পৃষ্ঠা লিখুক। সেখানে থাকবে স্কুলের পাঠ্যবিষয়ের পাশাপাশি নিজেদের চিন্তা ও অনুভূতিও। তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতের লেখা দেখালেন - যা দেখে ছাত্ররা মুগ্ধ হলো।

পরিশেষে সবাই উপলব্ধি করল, হাতের লেখা শুধু পড়াশোনার মাধ্যম নয়, বরং এক গভীর আত্মপ্রকাশ। প্রতিদিন লেখা তাদের চিন্তাকে ধারালো করবে, মনকে শৃঙ্খলিত করবে, আর আত্মাকে দেবে শিল্পের ছোঁয়া। সত্যিই, নিজের হাতের লেখা পড়তে পড়তে এক বিশেষ ভালো লাগা জাগে, যা অন্তরের গভীরতা, আন্তরিকতা ও স্বকীয়তাকে প্রকাশ করে।

ক্লাসের শেষে রুবেল স্যার দাঁড়িয়ে বললেন,

“মনে রেখো বাচ্চারা, যা কিছু লিখবে, তা-ই তোমাদের মনে গেঁথে থাকবে। লেখা শুধু পাঠ মনে রাখার উপায় নয়, এটা তোমাদের আত্মার সৌন্দর্যের প্রকাশ। প্রতিদিন লিখবে, নিজের চিন্তা লিখবে, নিজের স্বপ্ন লিখবে, তাহলেই তোমাদের জীবন হবে আরও উজ্জ্বল।”

ছাত্রছাত্রীরা করতালি দিল। সেদিন থেকে তারা প্রতিদিন খাতায় কিছু না কিছু লিখতে শুরু করল, কখনও কবিতা, কখনও গল্প, কখনও পাঠের সারাংশ। আর ধীরে ধীরে তারা টের পেল, লেখা সত্যিই তাদের মনের শক্তি আর স্মৃতির ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করছে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৬৩

“কারো দিন উজ্জ্বল কর”

বগুড়ার একটি গ্রামীণ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। অষ্টম শ্রেণির ক্লাসে বসে আছে ছাত্রীরা, চারদিকে নিস্তব্ধতা। মিতু নামের একটি মেয়ে চুপচাপ বসে আছে শেষ বেঞ্চের কোনায়। পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করেছে, বাসায়ও কেউ তাকে উৎসাহ দেয়নি। মনে হচ্ছে, সব দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। মনে মেঘ জমে আছে।

এই সময় ক্লাসে ঢুকলেন নতুন শিক্ষক - নওরোজ স্যার।

তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে মাস্টার্স করেছেন। তাঁর শেষ বর্ষের গবেষণা ছিলো “অনুঘটক - Catalyst” এর উপর। তিনি বললেন,

“রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটক যেভাবে পরিবর্তন আনে, তেমনি মানুষও অন্যের জীবনে অনুঘটক হতে পারে। কেন আমরা নিজেদের জন্য কিংবা অন্যদের জন্য ইতিবাচক অনুঘটক হবো না?”

এরপর ব্ল্যাকবোর্ডে স্যার লিখলেন:

“Be the rainbow to someone’s cloud.”

(কারও জীবনের মেঘে তুমি রঙধনু হও)

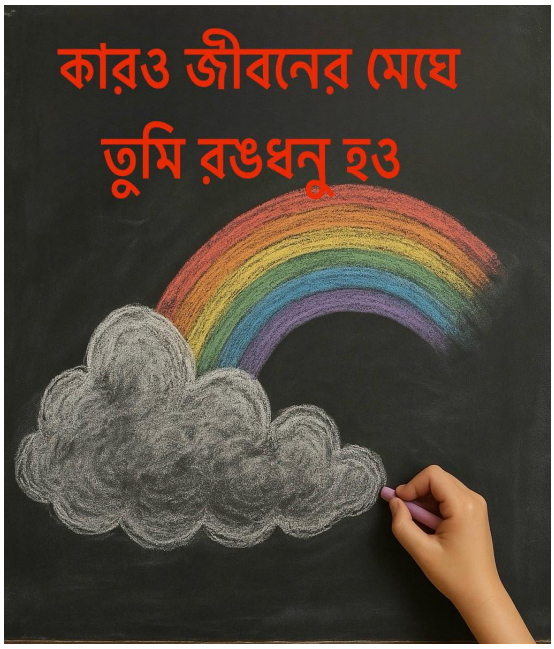

ছাত্রীরা অবাক হয়ে তাকালো।

স্যার বুঝিয়ে বললেন, “মেঘ মানে দুঃখ, ব্যর্থতা আর হতাশা। রঙধনু মানে আনন্দ, আলো আর আশা। তোমাদের ছোট্ট একটি হাসি, একটি উৎসাহ, একটি সুন্দর কথা – অন্য কারও জীবনের অন্ধকার মুছে দিতে পারে।”

স্যার নিজের অভিজ্ঞতা শোনালেন।

ছোটবেলায় প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে তিনি ভীষণ কাঁদছিলেন। তখন তার বন্ধু এসে শুধু বলেছিল, “তুই পারবি।” এই একটি বাক্য তার জীবন পাল্টে দিয়েছিল।

কথা শুনে ক্লাসে নীরবতা নেমে এলো।

হঠাৎ মিতুর পাশের বেঞ্চের রুবিনা বললো,

“মিতু, তুই দারুণ আঁকতে পারিস। আজ স্কুলের দেয়াল পত্রিকায় তোকে ছবি আঁকতেই হবে।”

ক্লাসের সবাই হাততালি দিলো।

মিতুর চোখে পানি চলে এলো, হতাশার মেঘে তার প্রথম রঙধনু দেখা দিলো।

স্যার আরও কিছু উদাহরণ দিলেন:

- “কেউ যখন একা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানোই রঙধনু।”
- “কেউ ক্লাসে কথা বলতে ভয় পেলে, তাকে সাহস দেওয়া রঙধনু।”
- “কেউ নতুন বই কিনতে না পারলে, নিজের বই ভাগ করে দেওয়া রঙধনু।”

নওরোজ স্যার শেষে বললেন,

“তোমরা যদি প্রতিদিন অন্তত একজনের মুখে হাসি আনতে পারো, তাহলে পৃথিবী ধীরে ধীরে বদলাবে। বড় হতে হলে শুধু নিজের আলোতে জ্বলা নয়, বরং অন্যের অন্ধকারে আলো ছড়ানোই সবচেয়ে বড় অর্জন। মনে রেখো, কারও জীবনের মেঘে তুমি যদি রঙধনু হয়ে দাঁড়াও - সেটাই আসল শিক্ষা, সেটাই আসল আনন্দ।”

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৬২

“বিলম্ব নয়, আজই শুরু”

গাইবান্ধার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

দশম শ্রেণীর ছাত্রদের সামনে নতুন শিক্ষক জাকারিয়া স্যার দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর জীবনের মূল বিশ্বাস,

“একদিন” বলে অপেক্ষা করলে সেই দিন আর আসবে না, বরং আজকেই হতে হবে প্রথম দিন।

দশম শ্রেণীর ছাত্রদের ১৫-১৬ বছর বয়স হওয়াতে অনেকটা স্বচেতন ও জীবন মুখি চিন্তা করে। স্যার বোর্ডে লিখলেন,

“পৃথিবী তোমার কাছে কিছুর জন্য ঋণী নয়।”

ছাত্ররা অবাক হয়ে তাকালো। স্যার বললেন,

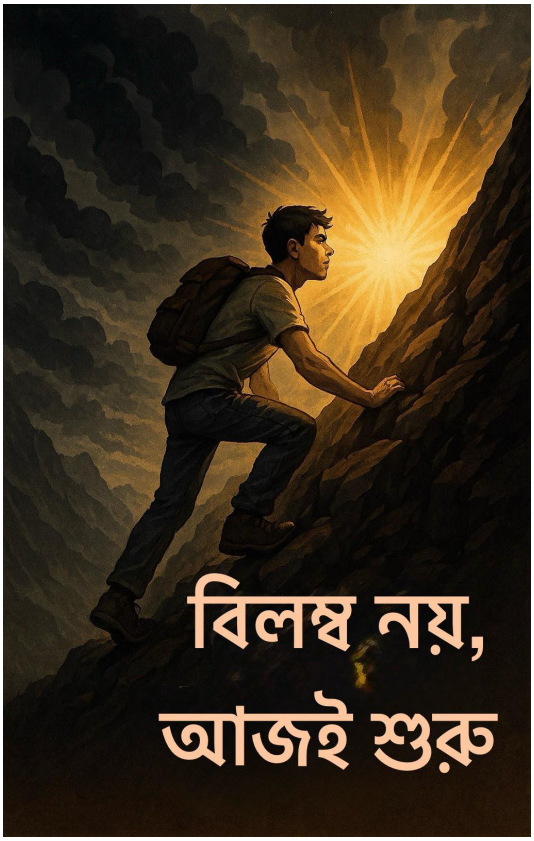

“তোমরা কেউ মনে কোরো না, পৃথিবী তোমাদের জন্য আলাদা করে কিছু রেখে দিয়েছে। যদি কিছু চাই, ঘামে, কষ্টে, ত্যাগে আর নীরবে অর্জন করতে হবে। জীবন তোমাদের পরীক্ষা নেবে, ভেঙে দেবে, কান্না শুনবে না - তবুও তোমাদের উঠতে হবে, বার বার।”

এরপর তিনি উদাহরণ দিলেন গ্রামেরই এক ছেলের, যার বাবা মাঠে কাজ করেন, মা হাঁস-মুরগি পালন করেন।

ছেলেটি বারবার পরীক্ষায় ফেল করেছে, কিন্তু হাল ছাড়েনি। নিজের ভুল থেকে শিখেছে, রাত জেগে পড়েছে, আরেকবার চেষ্টা করেছে। শেষমেষ সে ভালো রেজাল্ট করেছে।

স্যার বললেন,

“সফল মানুষ তাকে বলে, যে সুখের সময় নয়, দুর্দিনে মাথা তুলে দাঁড়ায়।”

দশম শ্রেণীর ছাত্রদের জানা ও বোঝা দরকার - ব্যক্তিগত দায়িত্ব, আত্মনির্ভরশীলতা এবং কৃতজ্ঞতা নিজস্ব ভাবমূর্তি তে আনতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিবে, তারা যা পারে তার উপর মনোনিবেশ করবে এবং তাদের প্রত্যাশা পূরণ না হলে, তিক্ততা বা হতাশার অনুভূতি এড়িয়ে যেতে শিক্ষবে। এইটা বুঝতে হবে কোন বহিরাগত তাদের প্রত্যাশা পুরোনো করতে বাধ্য নয়।

স্যার আবার বোর্ডে লিখলেন, “প্রকৃত শক্তি হলো শান্ত থাকা।”

তিনি ব্যাখ্যা করলেন,

“চিৎকার বা রাগ দেখানো শক্তি নয়। আসল শক্তি হলো নীরবতা, ধৈর্য, আর অন্যকে সম্মান করার মধ্যে। যে মানুষ কাউকে না জানিয়ে, করতালি না চেয়ে পরিবারকে রক্ষা করে, দায়িত্ব পালন করে, সেই আসল শক্তিশালী।”

শেষে স্যার চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন।

তারপর বললেন,

“একদিন তোমরা বড় হবে, বাবা-মা তোমাদের পাশে থাকবেনা। তখন যদি আজকের এই শিক্ষা মনে থাকে, তবে যেখানেই যাও, তোমাদের ভেতরে থাকবে তাদের কণ্ঠ, তাদের সাহস। তাই ‘একদিন’ ও অপেক্ষা কোরো না। আজই শুরু করো, নাহলে হয়ে যাবে অনেক দেরি। কেননা, ভবিষ্যৎ আজ থেকে শুরু হয়, আগামীকাল থেকে নয়।”

ছাত্ররা গভীর নীরবতায় শুনলো। তাদের মনে এক নতুন বীজ বপন হলো,

“আজকের দিনই হবে আমার প্রথম দিন।”

“খোলা আকাশের স্কুল”

সুনামগঞ্জ জেলার একটি গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়।
এখানে এসেছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাবহারিক অংকে নিয়ে মাস্টার ডিগ্রী করা নুরুনবি স্যার।
তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন “গণিত হলো মানব আত্মার সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে শক্তিশালী সৃষ্টি।” শুধু তাই নয় “Nature is written in mathematical language.” - Galileo Galilei. প্রকৃতিকে ধারণ করবার জন্য তার উন্মুক্ত মন, খুঁজে বেড়ায় স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতা।
মজার ব্যাপার হলো, হয়তো কাকতালীয় ভাবেই সুনামগঞ্জ এর এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা যেন প্রকৃতির কোলে খোলা এক আশ্রয়স্থল। এখানে চারপাশে কোনো উঁচু দেয়াল নেই, কেবল ছোট বাঁশের বেড়া, আর তার ওপাশেই মাঠ, পুকুর, গাছগাছালি।
শ্রেণিকক্ষের দেয়ালও আধা-খোলা, যেন ভেতর আর বাইরের কোনো সীমানাই নেই।
পাখির ডাক, বাতাসের শব্দ, কিংবা হঠাৎ মাঠ থেকে আসা হুল্লোড় - সবকিছুই এই স্কুলের শিক্ষার অংশ।
শিশুদের শেখার পরিবেশটা নুরুনবি স্যারের চিন্তার যেন বাস্তব প্রতিফলন।
এখানে ছোট ছোট শিশুরা এক অদ্ভুত মনোযোগে পড়াশোনা করে।
বই পড়ার মাঝেই কারো কারো হঠাৎ বাইরে ছুটে যাওয়া, আবার কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আবার বসা, এসবকেই শিক্ষকরা স্বাভাবিক মনে করেন। কারণ তারা জানেন, শিশুর মনও তো প্রকৃতির মতোই, অবরুদ্ধ করলে ম্লান হয়ে যায়, খোলা রাখলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
তাজা বাতাস শরীরের জন্য যেমন ভালো, তেমনি মনের জন্যও ভালো। প্রকৃতি সবসময় আমাদের সাথে এমনভাবে কথা বলার চেষ্টা করে যেন তার কাছে কোনো বিরাট গোপন কথা বলার আছে।
আর তাই স্কুলের ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা একটু অন্য রকম। এই বিদ্যালয়ের শিশুদের ক্রীড়া দক্ষতা আশেপাশের অনেক স্কুলের চেয়ে বেশি। গাছে চড়া, মাটিতে দৌড়াদৌড়ি, হঠাৎ পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ানো, এসবই তাদের বেড়ে ওঠার অংশ।

শিক্ষকরা বলেন, “তাদের ছোটখাটো আঘাত পেতে দাও, কারণ সেই অভিজ্ঞতাই শেখায়, কিভাবে দাঁড়াতে হয়, কিভাবে জীবনের চ্যালেঞ্জ নিতে হয়।”
বিদ্যালয়টির ভবনও বিশেষভাবে তৈরি। কক্ষগুলো বড় খোলা জানালায় ভরা, বৃষ্টির দিনে রঙিন শাটার নামানো যায়। মেঝেতে রয়েছে কাঠ আর বাঁশের মিশ্রণ, যাতে শিশুরা খালি পায়ে আরামে বসতে পারে।
বই, খেলনা আর ক্রীড়াসামগ্রী রাখা আছে খোলা তাকের শেলফে। পাশে রয়েছে ছোট্ট বাগান, যেখানে প্রতিটি শিশুর নিজের গাছ আছে, ওরা লাগিয়েছে, অঙ্কুরোদগম করেছে, যত্ন নেয়, পানি দেয় ও ফুল ফোটায়। স্কুলটী এমন ভাবে নকশা করা; যেন ছাত্রদের প্রকৃতি থেকে আলাদা করা না যায়।
আজকের ক্লাসে নতুন শিক্ষক নুরুনবি স্যার বললেন, “শিশুদের জীবনের শিক্ষা কেবল বইয়ে নেই, আছে মাঠে, আকাশে, গাছে, বাতাসে। ওরা যখন পড়ে যাবে, তখনই শিখবে উঠে দাঁড়াতে। ওদের স্বাধীনতাই ওদের সবচেয়ে বড় শিক্ষক।”
শিশুরা হাততালি দিল। খোলা আকাশের নিচে, সীমাহীন বাতাসে তাদের শেখা যেন আরও দৃঢ় হয়ে উঠলো।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৬৪

“শিক্ষক দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি”

গাইবান্ধার একটি গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়।
আজ ৫ই অক্টোবর, বিশ্ব শিক্ষক দিবস।
“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের একটা বড় অনুক্রম হলো জনগনের স্বচেতনার অনুভূতি বৃদ্ধি শিক্ষার প্রতি।
তারই ধারাক্রম অনুসারে “শিক্ষক দিবস” পালনের জন্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গ্রামবাসীদের অনুপ্রাণিত করা হয়েছে বিভিন্ন ভাবে।
ভোর থেকে গ্রামের মানুষজন এক অদ্ভুত ব্যস্ততায় আছে। কেউ ফুল তুলছে, কেউ বাঁশ দিয়ে অস্থায়ী মঞ্চ বানাচ্ছে, কেউ আবার পিঠা ভাজছে।
ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাতে রঙিন কাগজ আর কলম নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে, যেন উৎসবের আমেজ।
স্কুল মাঠে সজ্জিত হলো রঙিন বেলুন, কাগজের ফুল আর গ্রাম্য শিল্পীর আঁকা পোস্টার, “শিক্ষক সমাজের আলোকবর্তিকা”।
পঞ্চম শ্রেণীর রুবি আর জামিল মঞ্চে উঠে গলা মিলিয়ে কবিতা আবৃত্তি করলো:
“শিক্ষক তুমি জ্ঞানের প্রদীপ, অন্ধকারে আলো, তুমি চির দীপ। .. ”
নবম শ্রেণীর ছাত্ররা তৈরি করেছে নাটিকা, “একজন শিক্ষক ছাড়া সমাজ অন্ধকার।”
ছোট্ট নাটিকায় তারা দেখালো, শিক্ষক না থাকলে কেমন করে মানুষ দিকভ্রান্ত হয়। দর্শকরা হেসে উঠলো, আবার চিন্তায়ও ডুবে গেল।

গ্রামের প্রবীণ মফিজ উদ্দিন মঞ্চে এসে বললেন, “আমাদের সময়ে শিক্ষক মানে ছিল গুরুজন, বাবা-মায়ের পরেই যাঁদের স্থান।
আজ আমরা খুশি যে আমাদের ছেলেমেয়েরা আবার সেই সম্মান ফিরিয়ে দিচ্ছে।”
তরুণ দোকানদার টিটু মিয়া বললেন,
“শিক্ষক শুধু একজন ছাত্রকে নয়, পুরো জাতিকে গড়ে তোলেন।
তাই তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানানো আমাদের কর্তব্য। শিক্ষকের প্রতি সম্মান জানানো মানেই সমাজকে সম্মান জানানো, কারণ শিক্ষকই গড়ে তোলেন ভবিষ্যতের নাগরিক। শুভ শিক্ষক দিবস।”
মায়েরা ঘরে বানানো নারকেলের নাড়ু, মুড়ির মোয়া, আর পাটিসাপটা নিয়ে এসেছেন শিক্ষকদের জন্য।
তারা বললেন,
“আমরা জানি আমাদের সন্তানদের আপনারাই আলোর পথ দেখাচ্ছেন, তাই এ ক’টা সামান্য উপহার।”
প্রধান শিক্ষক আব্দুল করিম স্যার আবেগে ভরা কণ্ঠে বললেন,
“আমাদের জীবনের আসল পুরস্কার এই ভালোবাসা। আমরা শুধু চাই, তোমরা মানুষ হও, মূল্যবোধ ও মানবিকতার আলো ছড়িয়ে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হও।”
পুরো গ্রাম একসাথে গান ধরলো,
“গুরু বিনে গতি নাই, আলো বিনে জীবন নাই।”
সেদিন গ্রামের প্রতিটি মানুষ অনুভব করলো, শিক্ষক শুধু পড়ান না - তারা সমাজের প্রাণ, নৈতিকতার মূর্তি, আর ভবিষ্যতের শিকড়। আজকের এই উদযাপন প্রমাণ করলো, ‘শিক্ষা-ই-শক্তি’ শুধু স্লোগান নয়, বরং গ্রামের মানুষদের বাস্তব অনুভূতি।

“শিক্ষকের চোখে সম্ভাবনা”

নওগাঁ জেলার একটি গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ নবম শ্রেণির গণিত ক্লাসে নতুন শিক্ষক জসিম স্যার। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। স্যারের বিশ্বাস, শিক্ষাবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে “Labeling Theory” , যা হলো, “শিক্ষক যদি ছাত্রকে বারবার খারাপ বা দুর্বল বলে গণ্য করেন, তাহলে সে সেই পরিচয়ের ভেতরেই আটকে যাবে কিন্তু শিক্ষক যদি তাকে সম্ভাবনাময় মানুষ হিসেবে দেখো, সে একদিন সেই সম্ভাবনা পূরণ করবে।”

স্যার মনে করেন, বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্কুল গুলোতে, এই ব্যাপারে অনেক সচেতনা দরকার। যেমন, নেতিবাচক লেবেল লাগানোর ফলে ছাত্রের স্কুল থেকে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিতে পারে, তখন শিক্ষার্থীরা কম প্রচেষ্টা করে এবং এমন ধারণা পোষণ করে যে লেবেলটি তাদের ক্ষমতা বা ব্যক্তিত্বের সঠিক প্রতিফলন। অন্যদিকে, যখন একজন শিক্ষার্থীকে ইতিবাচকভাবে চিহ্নিত করা হয় (যেমন, "স্মার্ট," "সক্ষম"), তখন তাদের আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায় এবং আরও সফল হয়। বাংলাদেশের স্কুলগুলোতে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের অনেক ছাত্র দরিদ্র পরিবার থেকে আসে, আর তাদের আত্মবিশ্বাসও কম থাকে।

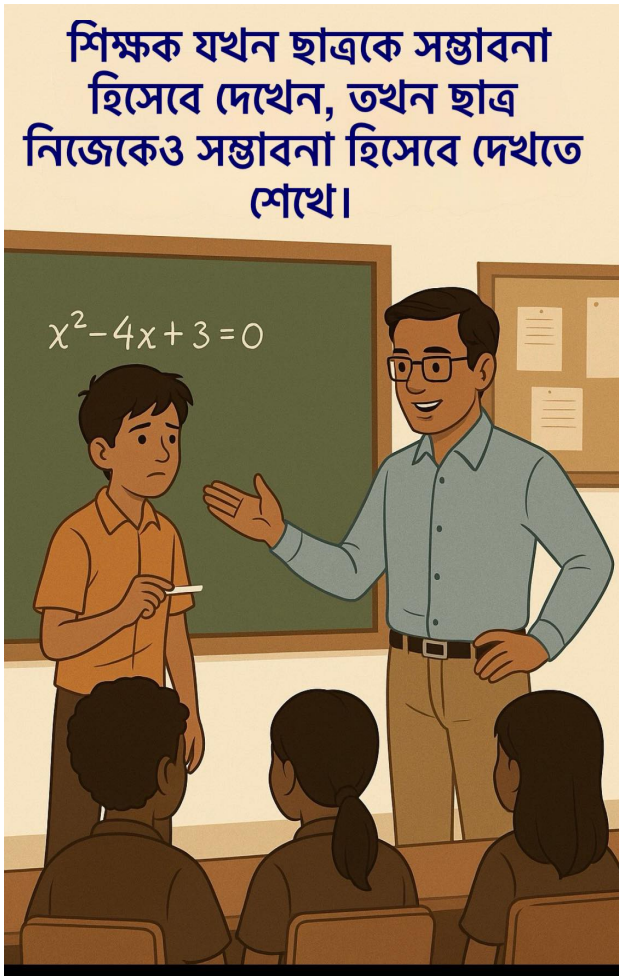

সপ্তম ক্লাসে রাশেদ নামের এক ছাত্র ছিলো। সব শিক্ষকই তাকে “দুষ্টু ছেলে”, “অমনোযোগী”, এমনকি “অবাধ্য এক বেয়াড়া ছেলে” বলে ডাকতেন। ফলে রাশেদ ধীরে ধীরে নিজেকেও তেমনই মনে করতে শুরু করলো। ও যদি হোমওয়ার্ক করে, সবাই সন্দেহ করে বলে, “নিশ্চয়ই নকল করেছে।” খাতা জমা দিলে শিক্ষক বলেন, “তুই তো কিছুই বুঝিস না।”

এমনকি খেলাধুলায়ও তাকে বাদ দেয় ওরা সহপাঠীরা।

ফলাফল, রাশেদ ধীরে ধীরে ক্লাসের একেবারে পেছনে চলে গেলো, আর খারাপ আচরণকে নিজের পরিচয় বানিয়ে ফেললো।

কিন্তু জসিম স্যার ভিন্নভাবে বিষয়টা দেখলেন। একদিন ক্লাসে একটি জটিল অঙ্ক দিলেন। রাশেদ হাত তুললো না, চুপ করে বসেছিলো।

স্যার বললেন, “রাশেদ, আমি জানি তুমি এই অঙ্কটা করতে পারবে। চেষ্টা করো।”

প্রথমে রাশেদ দ্বিধা করলো। সহপাঠীরা হাসাহাসি করতে লাগলো। কিন্তু স্যারের মুখে আত্মবিশ্বাস দেখে সে বোর্ডে উঠে অঙ্ক ধরলো। পুরোটা করতে না পারলেও অর্ধেক পথ ঠিকঠাক করে ফেললো।

স্যার সাথে সাথে হাততালি দিলেন এবং বললেন, “দেখো, রাশেদ শুরুটা করেছে। এর মানে বাকি অংশও শিখতে পারবে।”

সেদিন প্রথমবার রাশেদ নিজেকে “খারাপ ছাত্র” নয়, বরং “শেখার ক্ষমতাসম্পন্ন” মনে করলো। যার ফলে তার আত্ম-চিত্র এবং আত্মবিশ্বাসে পরিবর্তন আসলো।

জসিম স্যার শিক্ষকদের কমনরুমের চা চক্রে তার শিক্ষাবিজ্ঞানে “Positive Label” এর ব্যাবহার নিয়ে নিয়ে কথা বললেন, অন্য সব শিক্ষকদের সাথে। তিনি বাস্তব প্রয়োগের জন্য কিছু প্রচারপত্র প্রিন্ট করে দিলেন সবাইকে। যাতে ছিলো,

১. Positive Label ব্যবহার করুন – “তুমি পারবে”, “তুমি চেষ্টা করছো, এটা দারুণ।”

২. চেষ্টার প্রশংসা করুন, ফলাফলের নয় – চেষ্টা করলে ধীরে ধীরে ফলাফল আসবেই।

৩. আলাদা উদাহরণ দিন – যেসব ছাত্রকে খারাপ বলা হয়, তাদের ক্লাসে ছোট ছোট সাফল্যের সুযোগ দিন।

৪. সহপাঠীদের সংস্কৃতি বদলান – যাতে অন্যরাও হাসাহাসি না করে, বরং উৎসাহ দেয়।

জসিম স্যার সবসময় বলেন,

“শিক্ষক যখন ছাত্রকে সম্ভাবনা হিসেবে দেখেন, তখন ছাত্র নিজেকেও সম্ভাবনা হিসেবে দেখতে শেখে।”

এভাবেই একসময় রাশেদ ধীরে ধীরে বদলালো, আর পুরো ক্লাস বুঝলো, তুমি যেভাবে ছাত্রকে ভাববে, সে সেভাবেই গড়ে উঠবে।

স্কুলে লেবেলিংয়ের বিষয়টি মোকাবেলা করা অনেক কঠিন, যেখানে ক্লাসের রোল নং দিয়ে বাছাই করা হয়, কে ভালো ছাত্র কে খারাপ ছাত্র। সময় এসেছে, প্রথাগত বাছাই পদ্ধতি বর্জনের। উচ্চতর মানের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রদানের জন্য কাজ করার। একটি সহায়ক স্কুল পরিবেশ তৈরির জন্য নেতিবাচক মনোভাবকে যত্নশীল আচরণে রূপান্তরিত করে একটি স্কুল সম্প্রদায়কে গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে শিক্ষক এবং প্রশাসকদের সতর্ক এবং সাহসী হতে হবে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৬৬

“৫ বার প্রশ্ন ও সমাধান”

রাজশাহীর চারঘাটের একটি গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের নতুন শিক্ষক আনিকা ম্যাডাম যুক্তিবিদ্যা বিভাগের ছাত্রী। যুক্তিবিদ্যা চিন্তার বিজ্ঞান, এর মূল লক্ষ্য হলো সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য অসত্যকে বর্জন করা এবং সত্যে পৌঁছানোর পদ্ধতিগুলো শনাক্ত করা। মাধ্যমিক ক্লাস গুলোর বাড়ন্ত বয়সের ছাত্র/ছাত্রীরা পৃথিবীতে নতুন তাই প্রায়ই নানা প্রকারের ব্যক্তিগত/সমজিক সমস্যায় পরে, তখন তারা খেই হারিয়ে ফেলে, নিজেকে কোন অবস্থানে দাঁড় করাবে বুঝে উঠতে পারে না। তার ফলে অন্যায় ও অপরিপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, কার্যত যা ওদের জন্য, ওদের পরিবার ও সমাজের জন্য অপ্রীতিকর হয়। ম্যাডাম চাচ্ছেন ছাত্রদের মাঝে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবার একটা রাস্তা দেখাতে, উদাহরণ দিয়ে। যুক্তিবিদ্যার ছাত্রী ম্যাডাম “পাঁচবার কেন” যুক্তি ওনার পছন্দের। উনি মনে করেন ছাত্র এবং শিক্ষকদের এই নিয়ম অনুসরণ করা দরকার। এতে সমস্যার মূল কারণ শনাক্ত করা সহজ হয়।

আনিকা ম্যাডাম আজ ক্লাসে বোর্ডে বড় করে লিখলেন,

সমস্যা: “রিফাত নিয়মিত বাড়ির কাজ জমা দিতে পারে না।” ম্যাডাম বললেন, “আজ আমরা সমাধান নয়, কারণ খুঁজব, ‘কেন’ প্রশ্ন পাঁচবার করে।”

কেন-১: “রিফাত, তুমি জমা দাও না কেন?” রিফাত মাথা নিচু করে বলল, “রাতে পড়তে পারি না, আলো থাকে না।”

কেন-২: “আলো থাকে না কেন?” “বাড়ির একটাই বাল্ব, মা সেলাই করেন, তাই সেটা ঘরেই থাকে। বাইরে উঠোনে বসে পড়তে গেলে অন্ধকার।”

কেন-৩: “উঠোনে আলো দেওয়া যায় না কেন?” “বিদ্যুতের বিল বকেয়া, লাইন কেটে দিয়েছে; এখন প্রতিবেশীর কাছ থেকে ‘লাইন’ টেনে একটা বাল্ব জ্বালাই।”

কেন-৪: “বিল মেটানো যাচ্ছে না কেন?” “বাবা মৌসুমী কাজ করেন; বর্ষায় নদীতে কাজ কম।”

কেন-৫: “তাহলে পড়ার আলাদা ব্যবস্থা হলো না কেন?” “আমার নিজের কোনো ল্যাম্প নেই; কেরোসিনের টাকা জোটে না।”

আনিকা ম্যাডাম বোর্ডে টিক চিহ্ন দিলেন, মূল কারণ: “রিফাতের পড়ার জন্য নির্ভরযোগ্য আলো নেই।”

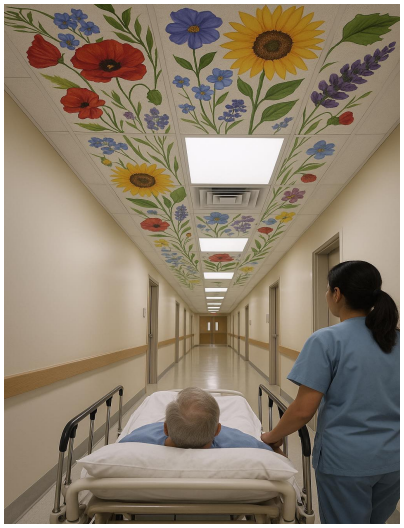

তিনি বুঝিয়ে বললেন, “রিফাতকে বকা দিলে সমস্যা ঢেকে রাখা হয়; অন্য দিকে কারণ ধরতে পারলে সমাধান হয়। আর এই কারণ বের করবার জন্য ৫ টি প্রশ্ন।”

সেদিনই তিনি তিনটি কাজ করলেন:-

১. সোলার স্টাডি-ল্যাম্প লাইব্রেরি: অভিভাবক-শিক্ষক পরিষদের ছোট ফান্ড দিয়ে ১০টি সোলার ল্যাম্প কেনা হলো; যে ছাত্রের ঘরে আলো নেই, পরিক্রমে ল্যাম্প পাবে।

২. ‘হোমওয়ার্ক কর্নার’: মসজিদের বারান্দা ও স্কুলের বারান্দা, দুই জায়গায় সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা করে আলো ও পাখার ব্যবস্থা; দুইজন সিনিয়র “শিক্ষা-সাথী” তদারকি করবে।

৩. সময় ও কাজের নকশা: যাদের সন্ধ্যায় পড়ার অসুবিধা আছে তাদের অ্যাসাইনমেন্টের জমা-সময় পরের দিন দুপুর, কিন্তু ক্লাসেই প্রথম ১৫ মিনিট “ওয়ার্ম-আপ” লিখে শুরু।

এক সপ্তাহ পরেই রিফাত প্রথমবার সময়মতো অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিল। মাসের শেষে সে শুধু গণিতে নয়, বাংলাতেও উন্নতি দেখাল। পুরো ক্লাসের জন্য বোর্ডে রইলো একটি পোস্টার,

“সমস্যা দেখলে থেমে যেও না ‘কেন’ পাঁচবার জিজ্ঞেস করো।”

ম্যাডাম হাসলেন, “আজ আমরা রিফাতের ‘আলো’ জ্বালালাম; কাল তোমাদের যে কারও সমস্যার মূল কারণ ধরবা ঠিক এভাবেই। হতাশ হবার কিছু নেই, সব সমস্যার সমাধান করা যায়, যদি ৫ বার প্রশ্ন করা যায়।”

আনিকা ম্যাডাম ছাত্রদের বললেন, “শোনো, একবার এক হাসপাতালে রুগীদের মন ভালো রাখার জন্য করিডোরের দেয়ালে রঙিন ছবি আঁকানো হলো। ডাক্তার, নার্স, আর দর্শনার্থীরা সবাই খুশি, দেখতে সত্যিই সুন্দর লাগছিল। কিন্তু একজন ডাক্তার মনে করলেন, শুধু সুন্দর বানানো নয়, আসল সমস্যাটা খুঁজে দেখা দরকার। তিনি রুগীদের সাথে ধাপে ধাপে পাঁচবার প্রশ্ন করলেন।

প্রথম প্রশ্ন: ‘আপনারা কি এই ছবিগুলো দেখতে পান?’ রুগীরা বলল, ‘না।’

দ্বিতীয় প্রশ্ন: ‘কেন দেখতে পান না?’ ‘আমাদের ট্রলিতে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।’

তৃতীয় প্রশ্ন: ‘ট্রলিতে শুয়ে থাকলে কেমন দেখেন?’ ‘আমরা উপরের দিকটাই দেখি, পাশের দেয়াল নয়।’

চতুর্থ প্রশ্ন: ‘তাহলে করিডোর দিয়ে যাওয়ার সময় কী দেখতে পান?’ ‘শুধু ছাদ।’

পঞ্চম প্রশ্ন: ‘তাহলে কী করলে আপনাদের মন ভালো হবে?’ ‘যদি ছাদে সুন্দর ছবি আঁকা থাকে।’

ডাক্তার হাসলেন। তিনি বুঝলেন, দেয়ালে ছবি আঁকা যতই সুন্দর হোক, রুগীরা তো সেটা দেখতে পায় না। আসল সমাধান হলো, করিডোরের ছাদে ছবি আঁকা।

খেলার ছলে ছাত্ররা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষণে বসে গেলো। ম্যাডাম ভাবছেন, এই সমাধান বের করার অভ্যাস তাদের জীবনেও কাজে আসবে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৬৯

“প্রতিভাধর ছাত্রের একজন গর্বিত পিতা”

যশোর জেলার একটি গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ সকাল থেকেই গেটের সামনে আলাদা দৃশ্য। সারি সারি বাবারা দাঁড়িয়ে আছেন, গায়ে সবুজ টি-শার্ট, তাতে লেখা “প্রতিভাধর ছাত্রের একজন গর্বিত পিতা”।

ছাত্রছাত্রীরা অবাক হয়ে দেখছে, বাবারা হাসিমুখে স্বাগত জানাচ্ছেন। কেউ বলছেন “তোমাকে আজ সুন্দর লাগছে”, কেউ বলছেন, “আজকের দিনটা হোক নতুন শেখার”, সবাই হাঁসি মুখে অভার্থনা করছেন।

এই গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য এটা একটা নতুন উদ্যোগ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আশা, শিক্ষা-ই-শক্তি প্রকল্প থেকে শিক্ষক মিজান স্যার ঘোষণা করলেন,

“আজ থেকে আমাদের স্কুলে শুরু হলো ‘প্রতিভাধর ছাত্রের একজন গর্বিত পিতা’। বাবারা শুধু সন্তানকে বাসায় পড়াশোনায় সাহায্য করবেন না, স্কুলেও তারা সরাসরি যুক্ত হবেন। এটি একটা অভিবাবক ক্লাব এর সাথে ছাত্রদের সংস্পর্শ আছে, আর তাই স্কুল চাচ্ছে অভিবাবক দের স্থানীয় থানা থেকে চরিত্র সনদপত্র, অথবা স্কুল থানা থেকে সংগ্রহ করে নেবে। যেমনটি স্কুলের সকল শিক্ষকদের প্রতি বছর করতে হয়। এর একটাই কারণ, নিরাপত্তা ও বিশ্বাস নিশ্চিত করা।”

“প্রতিভাধর ছাত্রের একজন গর্বিত পিতা” এর কার্যক্রম:-

১. সকালে গেটে স্বাগত জানানো (যাদের সময় হবে, অগ্রিম স্কুলকে জানাতে হবে) – শিক্ষার্থীরা যেন আনন্দ নিয়ে স্কুলে ঢোকে।

২. রাস্তার নিরাপত্তা, স্কুল আরম্ভর ও স্কুল ছুটির সময় লাল-সবুজ পতাকা দিয়ে ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ করে শিশু ছাত্রদের যাতায়াতের সুবিধা করে তাদের রাস্তার নিয়ম শেখানো এবং দূরঘটনার ঝুঁকি কমানো।

৩. অসচ্ছল শিক্ষার্থীর সহায়তা – পোশাক, বই, ফি এর জন্য তহবিল গঠন।

৪. ক্লাসে অভিজ্ঞতা ভাগ করা –

• আজ দুইজন অভিভাবক ক্লাসে এসে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন: একজন ব্যবসায় ব্যর্থ হয়ে কীভাবে আবার দাঁড়িয়েছেন, আরেকজন চাকরির পাশাপাশি পড়াশোনার গুরুত্ব বোঝালেন।

• আরও একজন বাবা, যিনি পেশায় চোখের ডাক্তার, বোর্ডে চোখের ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিলেন চোখ কিভাবে আলো গ্রহণ করে এবং আমরা কীভাবে পৃথিবী দেখি। ছাত্রছাত্রীরা বিস্ময়ে শুনলো, অনেকেই প্রথমবার বুঝলো চোখ আসলে কত জটিল যন্ত্র।

৫. পরিচ্ছন্নতা ও সবুজায়ন কর্মসূচি – বাবারা সন্তানদের সঙ্গে মিলে স্কুল আঙিনা পরিষ্কার করলেন, নতুন গাছ লাগালেন।

ছাত্ররা খুব খুশি তাদের বাবাকে স্কুলে পেয়ে,

একজন বললো,

“স্যার, আজ আমার বাবা ক্লাসে এসে যখন তাঁর জীবনের গল্প বললেন, আমি সত্যিই গর্বিত।”

অন্যজন বললো,

“চোখের ডাক্তার কাকু যেভাবে আমাদের চোখের কাজ বোঝালেন, আমি এখন বুঝতে পারছি বিজ্ঞানের জাদুটা কত কাছেই আছে।”

মিজান স্যার বললেন,

“শিক্ষা শুধু বই নয়, এটা অভিজ্ঞতা, পরিবার আর সমাজের সম্মিলন। ছাত্ররা বাবা-মা কে নায়ক হিসাবে দেখে, ছাত্ররা বাবা-মাকে সম্মান করে এবং তাঁদের মতো হতে চায়। আবার, সন্তানদের ভালোবাসার একমাত্র বাধ্যবাধকতা হলো বাবা-মায়ের; বাকি পৃথিবী থেকে ভালোবাসা অর্জন করে নিতে হয়।

এই ‘প্রতিভাধর ছাত্রের একজন গর্বিত পিতা’ হলো সেই সম্মিলিত উদ্যোগের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। একসাথে, বাবা এবং শিক্ষকরা একটি শিশুর সাফল্যের পথ দেখানোর জন্য নিখুঁত দল।“

ছাত্রছাত্রীদের করতালিতে পুরো স্কুলমাঠ মুখর হয়ে উঠলো।

“শেখা মানেই শুধু স্কুল নয়”

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কানসাট ইউনিয়নের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজকের ক্লাসে এসেছেন অতিথি বক্তা – লুৎফর রহমান, যিনি পাশের গ্রামের ছেলে হলেও আজ দেশের একজন সফল উদ্যোক্তা। কোনো বড় ডিগ্রি নেই, কিন্তু তিনি নিজের কৌতূহল আর স্বশিক্ষার মাধ্যমে গ্রামে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু করেছেন।

লুৎফর রহমান ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,

“তোমরা জানো, আমি বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করতে পারিনি। অনেকেই ভাবলো, আমার জীবন শেষ। কিন্তু আমি থামিনি। আমি নিজের হাতে যন্ত্রপাতি খুলে আবার জোড়া দিতে শুরু করলাম। ইন্টারনেটে ভিডিও দেখে শিখলাম কিভাবে সোলার প্যানেল বানানো যায়। তারপর নিজের বাড়িতে চেষ্টা করলাম, কাজ হলো! ব্যর্থ হয়েছি অনেকবার, কিন্তু প্রতিবার নতুন কিছু শিখেছি।”

ছাত্ররা বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। তখন তিনি আরও বললেন,

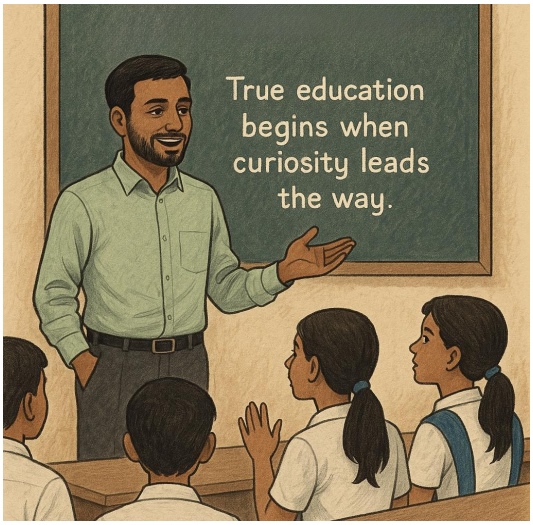

“তোমরা মনে রেখো, স্কুল তোমাকে দিকনির্দেশনা দেয়, কিন্তু শেখার আসল দরজা খুলে যায় তখনই, যখন তুমি নিজে কৌতূহলী হয়ে খোঁজা শুরু করো। শিক্ষা কেবল বই থেকে নয়, আসে হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে, প্রশ্ন করার মাধ্যমে, চেষ্টা আর ভুলের মাধ্যমে।

মনে রেখো সব শ্রেণীকক্ষের চার দেয়াল থাকে না। তোমরা অবশ্যই পৃথিবীর গন্ধ নিতে, বৃষ্টির স্বাদ নিতে, বাতাস স্পর্শ করতে, সূর্যোদয় এবং রাত্রি পতিত হওয়ার শব্দ শুনবে।”

নবম শ্রেণীর রুবিনা হাত তুলল,

“স্যার, তাহলে স্কুল কি জরুরি নয়?”

মিস্টার লুৎফর হেসে বললেন,

“না, স্কুল অপ্রয়োজনীয় বলছি না। স্কুল তোমাকে পথ দেখায়, বুনিয়াদ গড়ে দেয়। স্কুল আমাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির করে এবং আমরা তা অর্জন করি, এখানেই স্কুলের সীমাবদ্ধতা। যেটা দরকার, আমাদের লক্ষ্য খুব বেশি রাখা এবং আমরা সেই লক্ষ্যকে অর্জন করতে পারবোনা, কিন্তু চেষ্টা করবো। স্কুলের বাইরের পৃথিবীটাই হলো তোমার আসল বিদ্যালয়। এখানে তুমি শিখবে সামাজিক দক্ষতা, যোগাযোগ, প্রেরণা, শারীরিক দক্ষতা, জ্ঞান, ধৈর্য, সৃজনশীলতা আর আত্মনিয়ন্ত্রণ।”

শেষে তিনি লিখে দিলেন বোর্ডে:

“True education begins when curiosity leads the way.”

শিক্ষকরা বুঝলেন, শিক্ষার্থীদের শুধু পরীক্ষার খাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে কৌতূহল জাগানো, হাতে-কলমে কাজ শেখানো আর ব্যর্থতাকে শেখার সুযোগ বানানোই আসল শিক্ষা।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৭১

“অমূল্য সম্পদ”

ময়মনসিংহ জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণির গণিত ক্লাস চলছে। ছেলেমেয়েদের চোখে-মুখে টেনশন - বোর্ড পরীক্ষার বছর বলে কথা। হঠাৎ ক্লাসে ঢুকলেন অতিথি বক্তা - ডা. সাইফুল ইসলাম, যিনি এই স্কুলেরই সাবেক ছাত্র। এখন তিনি একজন সফল শিশু বিশেষজ্ঞ। ডা. সাইফুল কথা শুরু করলেন, “আজ আমি তোমাদের সাথে আমার জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করবো। তোমরা জানো, আমার জীবনের শুরুটা খুব কঠিন ছিল। একবার আমাদের বাড়িতে আগুন লাগে, তখন আমার সব বই পুড়ে যায়, এমনকি পড়ার টেবিলও ছিল না। কিন্তু আগুন আমার কৌতূহল, জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা, আমার মানসিকতা - এসব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারেনি। আমি নিজের ভেতরে কাজ করেছি - আমার চরিত্র, পরিশ্রম আর শেখার ইচ্ছাকে তৈরি করেছি।”

তিনি বোর্ডে লিখলেন - “আগুন আমার বই পুড়িয়ে দিতে পারে, পার্থিব সবকিছুই নিতে পারে, কিন্তু তোমার ভেতরের দক্ষতা, জ্ঞান আর চরিত্র কখনো নিতে পারবে না।”

তারপর কয়েকটি উদাহরণ দিলেন -

• দেহ: “আমি যখন কলেজে পড়তাম, অনেক কষ্টের মধ্যেও খেলাধুলা চালিয়ে গেছি। দৌড়ানো, ব্যায়াম - এসব আমাকে শারীরিকভাবে শক্ত করেছে। আজও সারাদিন কাজ করার শক্তি পাই।”

• দক্ষতা: “একসময় মোবাইল রিপেয়ার করে হাত খরচ চালাতাম। ওই ছোট্ট দক্ষতা থেকেই আমি মেশিন নিয়ে কাজ শেখার সাহস পাই। আজ সেই দক্ষতা বড় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টে কাজে লাগছে।”

• জ্ঞান: “যখন টাকা দিয়ে বই কিনতে পারতাম না, তখন আমি স্কুল লাইব্রেরির পুরোনো বই পড়ে যেতাম। সেই জ্ঞান আজও আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।”

• চরিত্র ও পরিশ্রম: “কাজ করতে গিয়ে আমি বারবার ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি। শিক্ষক আর বন্ধুদের কাছে সততা রেখেছি, কখনো চুরি বা শর্টকাট পথ নিইনি। সেটাই আজ আমার সুনাম।”

ছাত্ররা গভীর মনোযোগে শুনছে। তিনি বললেন, “তোমরা শরীরকে শক্ত করো - কারণ স্বাস্থ্যই হলো আসল মূলধন। তোমরা দক্ষতা তৈরি করো - যেটা চাকরি বা ব্যবসা যেখানেই থাকো কাজে লাগবে। তোমরা জ্ঞান বাড়াও - কেউ সেটা তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সবচেয়ে বড় কথা, চরিত্র আর পরিশ্রম গড়ে তোলো - এটাই হবে তোমাদের প্রকৃত সম্পদ।”

ক্লাসের শেষে সাইফুল ভাই শিক্ষার্থীদের বললেন, “এবার তোমাদের জন্য প্রতিদিনের একটা ছোট্ট অনুশীলন থাকবে। প্রতিদিন মাত্র ১০ মিনিট সময় দাও, আর ভেতরের এই পাঁচটি সম্পদ তৈরি করো।”

১. দেহ (শরীর): প্রতিদিন অন্তত ১০ মিনিট দৌড়াও বা ব্যায়াম করো। মনে রেখো, “তোমার মনের উপর তোমার ক্ষমতা আছে, বাইরের ঘটনাবলীর উপর নয়।”

২. দক্ষতা: প্রতিদিন নতুন কিছু শেখো, যেমন আঁকা, রান্না, কারিগরি কাজ বা কম্পিউটার কোড লেখা। ছোট দক্ষতা একদিন বড় সম্পদ হয়ে উঠবে।

৩. জ্ঞান: প্রতিদিন অন্তত ৫ পৃষ্ঠা বই পড়ো, লাইব্রেরি, বন্ধুর বই, কিংবা পুরোনো কোনো তোমার ক্লাসের খাতা হলেও চলবে।

৪. চরিত্র ও পরিশ্রম: আজই প্রতিশ্রুতি দাও - কখনো শর্টকাট পথে যাবে না, সততা বজায় রাখবে, আর ব্যর্থ হলেও চেষ্টা ছাড়বে না।

৫. বিশ্বাস: বিশ্বাস তোমাকে অভ্যন্তরীণ শক্তি, ভারসাম্য ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি দেবে। প্রতিদিন নিজেকে বলো - “আমি পারবো, আমি উন্নতি করবো।”

ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীদের চোখে এক নতুন আলো দেখা গেল। তারা বুঝলো - প্রকৃত ধনসম্পদ সোনাদানা নয়, বরং তাদের ভেতরের গুণাবলী। আগুন যেমন বই পুড়িয়ে দিতে পারে, তেমনি যেকোনো বিপদ বাইরের জিনিস কেড়ে নিতে পারে; কিন্তু ভেতরের শক্তি, জ্ঞান, দক্ষতা, চরিত্র আর বিশ্বাস - এসবই তাদের প্রকৃত অমূল্য সম্পদ, যা কখনো চুরি বা ধ্বংস করা যায় না। এই বিশ্বাস টুকু আজ ছাত্ররা জানলো, স্পর্শযোগ্য পার্থিব বস্তু আর স্পর্শনাতীত অধরা যোগ্যতার মধ্যে কোনটি বেশী প্রয়জনীয়। একদিন এই স্পর্শনাতীত সম্পদই সমাজকে আলোকিত করবে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৭০

“ইতিহাসে বাংলাদেশ”

ঢাকা জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। দশম শ্রেণির ইতিহাস ক্লাস চলছে। নতুন শিক্ষক রাশেদ স্যার, যিনি ইতিহাসে পড়াশোনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে BCS অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস, “যে প্রজন্ম ইতিহাসকে উপেক্ষা করে, তাদের অতীতও নেই, ভবিষ্যৎও নেই।” তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের ইতিহাস বৈচিত্র্যময়, সুন্দর ও ত্যাগে ভরা। এই ইতিহাস জানার মাধ্যমেই বাঙালিরা দেশপ্রেমের মহিমায় উদ্ভাসিত হতে পারে। আজ স্যার ব্ল্যাকবোর্ডে বড় করে লিখলেন, “আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা – ১৯৬৮” ছাত্ররা কৌতূহলী হয়ে তাকালো। স্যার বললেন, “তোমরা জানো, এই মামলাটি শুধু একটা বিচার ছিল না। এটি ছিল আমাদের মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশাল মোড় ঘোরানো ঘটনা। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলোর মধ্যে ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা অন্যতম।”

স্যার বোঝাতে শুরু করলেন – প্রেক্ষাপট: “ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ মারাত্মক বঞ্চিত ছিল। অর্থনীতি, চাকরি, শিক্ষা - সব জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তান প্রাধান্য পেত। তখন শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জন্য ‘ছয় দফা দাবি’ দেন। (আমরা ‘ছয় দফা আমাদের বাঁচার দাবি’ নিয়ে আরেকদিন আলোচনা করব।) এটা ছিলো বাঙালির মুক্তির সনদ। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা ভেবেছিল - এতে দেশ ভেঙে যাবে।”

স্যার বোর্ডে লিখলেন, ষড়যন্ত্রের অভিযোগ: রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ → ভরতীয় সহায়তায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র “সরকার দাবি করল, কিছু বাঙালি সেনা ও বেসামরিক কর্মকর্তা নাকি ১৯৬৭ সালে ভারতের আগরতলায় বৈঠক করেছে। সেখানেই নাকি স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা হয়। আর শেখ মুজিবকে বলা হলো প্রধান ষড়যন্ত্রকারী।”

শ্রেণি থেকে রুবি হাত তুলল, “স্যার, তাহলে কি সত্যিই এমন বৈঠক হয়েছিল?” স্যার মৃদু হেসে বললেন, “না, ইতিহাসে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং অনেক সাক্ষী পরে স্বীকার করেছেন, তাদের নির্যাতন করে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল।”

স্যার বললেন, বিচার ও গণঅভ্যুত্থান: “১৯৬৮ সালের জুন মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু হলো। কিন্তু মানুষ বিশ্বাস করেনি। সবাই বুঝেছিল - এটা শেখ মুজিবকে দমন করার ষড়যন্ত্র। হঠাৎ খবর এলো, মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে সামরিক হেফাজতে হত্যা করা হয়েছে। তখন পূর্ব পাকিস্তান জ্বলে উঠল। ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে স্লোগান দিল, ‘জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।’”

স্যার বোর্ডে লিখলেন: মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধু উপাধি: ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ → মামলা প্রত্যাহার “অবশেষে জনঅভ্যুত্থানের চাপে সরকার হার মানল। শেখ মুজিবসহ সব আসামি মুক্তি পেলেন। মুক্তির পরদিন লাখো মানুষের সমাবেশে শেখ মুজিব পেলেন নতুন উপাধি - ‘বঙ্গবন্ধু’ – বাংলার বন্ধু।”

স্যার বললেন, পরিণতি: “এই মামলাই বাঙালিদের চোখ খুলে দিলো - আমরা আলাদা জাতি, আমাদের স্বাধীনতা চাই। পাকিস্তানি সরকারের ষড়যন্ত্র উল্টে গিয়ে আমাদের শক্তি হয়ে উঠল। আর এ পথ ধরেই এলো ১৯৭০-এর নির্বাচন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীন বাংলাদেশ।”

শেষে স্যার ক্লাসকে প্রশ্ন করলেন, “তোমরা কি মনে করো, কেন আগরতলা মামলা আমাদের ইতিহাসে এত গুরুত্বপূর্ণ?” শ্রেণির সবাই একসাথে বলল— “কারণ এই মামলাই শেখ মুজিবকে জাতির নেতা বানালো, আর স্বাধীনতার পথ খুলে দিলো।”

স্যার মাথা নেড়ে বললেন, “ঠিক তাই। ইতিহাস জানতে হবে, দেশকে বুঝতে হবে। একটা আশ্চর্য বিষয় কি জানো, ভারতের ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস ১৫ ও ১৪ আগস্ট ১৯৪৭, যা তারা ব্রিটিশদের কাছ থেকে পেয়েছে। আর আমাদের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ ১৯৭১ - যা আমরা রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জন করেছি।

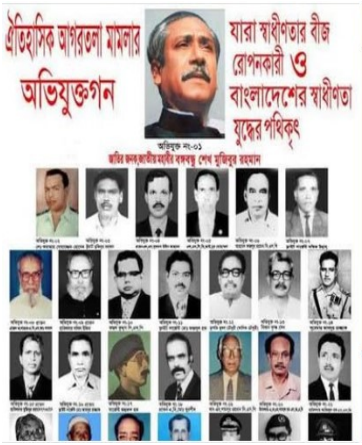

আমাদের পতাকা প্রকৃতির সবুজ, তারুণ্যের প্রতীক। মাঝের লাল বৃত্ত শহীদদের রক্তের প্রতীক। পাকিস্তান ও ভারতের পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীতে ধর্মীয় প্রতীকের ছাপ আছে, কারণ তাদের রাষ্ট্রচিন্তা ধর্মভিত্তিক। কিন্তু বাংলাদেশ গড়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদ ও ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে। আমাদের জাতীয় সংগীতে বাংলার প্রকৃতি, মাটি, নদী, গাছপালা আর মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে - যা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ।”

ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগ: শিক্ষার্থীরা এতটাই অনুপ্রাণিত হলো যে তারা সিদ্ধান্ত নিল - “আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা” বিষয় নিয়ে তারা স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করবে।

রাশেদ স্যার অবাক হলেন, যখন শুনলেন নাটিকাটি ছাত্রছাত্রীরাই নিজেরা লিখবে। তিনি মনে মনে বললেন,

“এই তো আসল ইতিহাস শিক্ষা, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা ইতিহাসকে শুধু পড়ছে না, বরং নিজেদের ভেতরে জীবন্ত করে তুলছে। এইতো দেশের প্রতি ভালবাসার স্বরূপ।”

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৭৩

“ভাষা সমাজকে গড়ে”

গাজীপুর জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ নবম শ্রেণির ক্লাসে নতুন শিক্ষক এসেছেন - ফারহান স্যার। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। ওনার মনে গেঁথে আছে একটি কথা: “সমাজের আসল সৌন্দর্য তখনই, যখন ধনী-গরিব সবার প্রতি সমান সম্মান দেখানো হয়। সম্মান সবার অধিকার।” ফারহান স্যারের আর একটা গুন, উনি কবিতা লেখেন, গল্প উপন্যাস লেখেন, সমাজের চরিত্র ও ভাষার সম্পৃক্ততা তাকে ভাবায়।

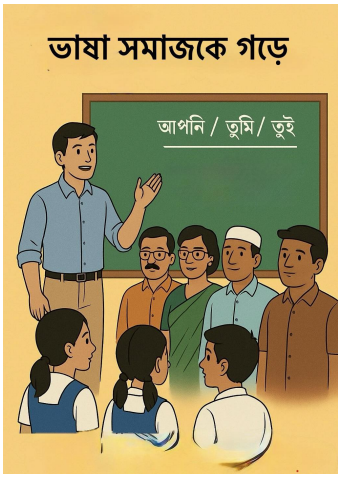

স্যার মনে করেন - ভাষার ভেতর লুকিয়ে থাকে সমাজের চিন্তা, বৈষম্য, শ্রেণি ও সংস্কৃতি। যখন একটা শিশু দেখে একই সমাজে কেউ “আপনি” পায়, কেউ “তুই” শোনে, তখন তার মানসিকতায় অসমতার বীজ বপন হয়। বাংলা ভাষার এই সম্বোধন আসলে একধরনের ঐতিহাসিক বোঝা, যা আজকের সমতার ও ভালোবাসার সমাজে প্রশ্ন তোলার দাবিদার। স্যারের এই চিন্তা গুলো রূপ নিয়েছে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও নিজেকে প্রশ্ন করবার পর।

অনেকে ভাবতেই পারেন, “এটা তো আমাদের ভাষার সৌন্দর্য, এটা বাদ দিলে ঐতিহ্য হারাবে।” স্যার মনে করেন, বাংলায় “আপনি–তুমি–তুই” নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুধু জৌতিকই নয়, বরং জরুরি। এটা করলে ছাত্ররা বুঝবে: “ভাষা ইতিহাস থেকে আসে, কিন্তু ভবিষ্যৎ আমরা ঠিক করব।” ঐতিহাসিক ভাবে বাংলা ভাষায় হিন্দু ধর্মের বর্ণভেদ বড় ভূমিকা রেখেছে যা অনেকাংশেই সামাজিক ক্ষমতার প্রভাব।

ফারহান স্যার বিস্তর গবেষণা করে দেখেছেন, এশীয় ভাষা (জাপানি, কোরিয়ান, হিন্দি, উর্দু) সামাজিক ভাবে সম্বোধনের স্তর আছে, ইউরোপীয় ভাষা (ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ) আছে কিন্তু মলিন প্রায়, আরবি/আফ্রিকান ভাষা আছে, তবে সামাজিক শ্রেণিভেদ নয়, বরং সৌজন্য ও ধর্মীয় কারণে।

প্রশ্ন তোলার মানে শিকড় কাটা নয়, বা মুছে দেওয়া নয়, বরং নতুন প্রজন্মকে বোঝানো - কোন শব্দ কোথায় ব্যবহার করলে তা সমান সম্মান বয়ে আনে, আর কোথায় বৈষম্য তৈরি করে। শিক্ষা হলো সমাজ বদলের পথ, বিদ্যালয় যদি শুধু গণিত, ইংরেজি শেখায় আর সামাজিক অসাম্যের ভিত্তি প্রশ্ন না তোলে, তবে শিক্ষা তার শক্তি হারায়।

স্যার আজ বোর্ডে লিখলেন – “আপনি / তুমি / তুই” আর নিচে লিখলেন – “করেছেন / করেছ / করছিস”

ছাত্ররা অবাক হয়ে তাকালো। একজন বলল, - স্যার, এগুলো তো আমাদের স্বাভাবিক ব্যবহার।

স্যার মৃদু হেসে বললেন, - ঠিকই বলেছ। কিন্তু ভেবে দেখেছো কি, এগুলো মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা দিয়ে ভাগ করে ফেলে? একে অপরকে সমান না ভেবে আমরা ছোট-বড় করি, শ্রেণিভেদ করি।

তিনি একটা গল্প বললেন - “একটি গ্রামে তিনজন বন্ধু ছিলো। একজন ধনী পরিবারের ছেলে, একজন মাঝারি ব্যবসায়ীর ছেলে, আরেকজন দিনমজুরের ছেলে। তারা খেলাধুলা করত একসাথে, স্বপ্নও দেখত একসাথে। কিন্তু স্কুলে এসে শিক্ষক, এমনকি বন্ধুরাও তাদের আলাদা আলাদা সম্বোধন করতো - ‘আপনি’, ‘তুমি’, ‘তুই’। ধীরে ধীরে তাদের ভেতরে দূরত্ব তৈরি হলো। অথচ মানুষের মূল্য কখনো অর্থে নয়, বরং চরিত্রে।”

ক্লাস চুপচাপ শুনছিল। তখন স্যার বললেন, মনে রেখো, মানবাধিকার হলো - সম্মান পাওয়া সবার জন্মগত অধিকার। সমাজে পেশা, টাকা বা অবস্থান ভেদে মানুষকে ছোট বা বড় করা অন্যায়, মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধা করলে সমাজ সুন্দর হয়।

স্যার স্কুলের ভেতরে ভাষার সংস্কৃতি পরিবর্তন করতে চান, তাতে ছাত্রদের ভেতরে সমান সম্মান ও মানবিকতার বোধ জন্ম নেবে। ছাত্রদের বুঝাতে হবে, “আপনি”, “তুমি”, “তুই” শুধু শব্দ নয়, বরং এর ভেতরে থাকে আমাদের মনোভাব। তাই স্কুলে সম্বোধনের নিয়ম মানে হচ্ছে - ভালোবাসা দিয়ে সম্মান দেখানো।

১. সপ্তাহে একদিন সবাই একই খাবার (যেমন কলা বা বিস্কুট) খাবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, পিয়ন ও পরিষ্কার কর্মী। এতে বোঝানো যাবে - খাবারের মতো সম্মানও সবার জন্য সমান।

২. স্কুলের কর্মচারী (পিয়ন, দারোয়ান, ঝাড়ুদার) যারা আছেন, শিক্ষকরা ছাত্রদের বলবেন তাদেরকেও একই সম্মান দিয়ে “আপনি” বলে ডাকতে।

৩. একদিন সেই কর্মচারীরা ক্লাসে আসবেন, ছাত্ররা দাঁড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাবে।

৪. সম্মানের দেয়াল:-

- স্কুলে একটি বোর্ড থাকবে, যেখানে ছাত্ররা লিখবে—
- “আমি সম্মান দেবো...”
- “আমি কখনো কাউকে অপমান করব না কারণ...”
- প্রতি সপ্তাহে নতুন করে লিখবে।

৫. রবীন্দ্রনাথের কবিতা, বা কাজী নজরুলের রচনা থেকে উদাহরণ আনা - যেখানে মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

স্যার বললেন, তাই আজকের শিক্ষা: “সম্বোধনের ইতিহাস বৈষম্যপূর্ণ হলেও, আমরা চাই এর ব্যবহার হোক সমান সম্মান আর ভালোবাসার প্রকাশে। মনে রেখো, ভাষা সমাজকে গড়ে। আমরা যদি সম্বোধনের দেয়াল ভাঙতে পারি, তবে সমাজের বৈষম্যের দেয়ালও একদিন ভেঙে যাবে।” ছাত্ররা বুঝলো, “আমরা এই স্কুলে সবাইকে সমান সম্মান দেবো, যাতে একদিন সমাজও এই নিয়ম শিখে নেয়।”

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৭২

“তুমি একা নও”

একটি গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়। আজ ক্লাসে এসেছেন নতুন শিক্ষক জাহিদ স্যার, উনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র, শেষ বর্ষের গবেষনায় ছিলো, “মানবজাতির জেনেটিক্স বিশ্লেষণ”। তখনি জাহিদ স্যারের মনে দৃঢ় ভাবনা এসেছে, “আমরা কীভাবে জানবো আমরা কারা, যদি আমরা না জানি যে আমরা কোথা থেকে এসেছে।” পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করাই নিজেকে জানার মূল চাবিকাঠি। পরিবার সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এর উপরে। আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্মের স্বপ্নের সমাহার। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ের ছাপ জাহিদ স্যারের ব্যাবহারে, “তিনি জানেন কেন উনুসন্ধান করছেন, এবং তাই নম্রতার সাথে উনুসন্ধান করেন, যাতে মৃতরা আবার জীবিত হয়।”

নবম শ্রেণির ক্লাস এ স্যার বললেন, “তোমরা কি জানো, তোমাদের বাবা-মা (২ জন) আজ এখানে আছেন কারণ তাদেরও বাবা-মা (৪ জন) ছিলেন! আর তাদেরও আবার বাবা-মা ছিলেন (৮ জন)। এভাবে যদি আমরা দশ প্রজন্ম গুনে যাই, তখন দেখব, তোমাদের অনেক দাদা-দাদি, নানা-নানী (৪০৯৬ জন) ছিলেন। আর একশো প্রজন্ম পেছনে গেলে, হাজার হাজার (২^১০০ জন, কিন্তু এখানে কিছু কথা আছে, পরে বলছি) মানুষ বেঁচেছিলেন, শুধু তোমাদের জন্য।”

শিশুরা অবাক হয়ে তাকালো।

স্যার আবার বললেন, “তোমাদের আগে যারা ছিলেন, তারা যুদ্ধ করেছেন, ক্ষুধা সহ্য করেছেন, কষ্ট করেছেন, স্বপ্ন হারিয়েছেন, কিন্তু একটাই কাজ করেছেন - আশা ধরে রেখেছেন। যাতে একদিন তুমি জন্ম নিতে পারো।”

শিশুরা এবার গভীরভাবে শুনছে।

“তাহলে তোমরা কি ভাবো?” স্যার জিজ্ঞেস করলেন। “তোমরা শুধু একজন নও। তোমরা হাজারো মানুষের সাহস, স্বপ্ন আর পরিশ্রমের উত্তরাধিকার। তোমাদের প্রতিটি হাসি, প্রতিটি শেখা - সেটা তোমাদের পূর্বপুরুষদের স্বপ্নের পূর্ণতা। আসলে তুমি আমি আমরা সবাই আমাদের ভেতরে আমাদের পূর্ব প্রজন্ম কে ধারণ করি।”

একটি শিশু চুপচাপ বলল, “তাহলে আমি একা নই, আমার সাথে সবাই আছে!”

স্যার হাসলেন, “হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাই প্রতিটি কাজের মধ্যে সত্য, সাহস আর ভালোবাসা রাখবে। যেন একদিন, যখন তোমাদের নাতি-নাতনিরা পৃথিবীতে আসবে, তারা বলতে পারে - আমাদের দাদু-দিদা, নানা-নানীরা এমন জীবন কাটিয়েছিলেন, যার জন্য আমরা গর্বিত।”

তারপর স্যার একটু থেমে নরম কণ্ঠে বললেন, “তোমরা জানো, ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে মা-বাবা ও পূর্বপুরুষদের সম্মান করতে। যখন তোমরা ছোট ছিলে, তারা দিন-রাত জেগে তোমাদের আগলে রেখেছিলেন। তাই তোমাদেরও কর্তব্য হলো তাদের খেয়াল রাখা, ভালোবাসা দেখানো, আর তাদের জন্য দোয়া করা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন - ‘হে আমার প্রতিপালক! যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন, তুমিও তাদের প্রতি রহম করো।’ (সূরা আল-ইসরা: ২৪)”

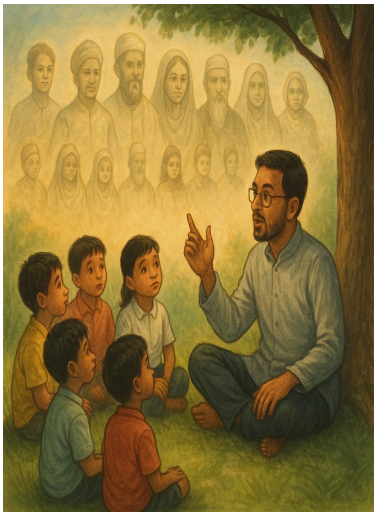

শিশুরা এবার মাথা নেড়ে বোঝার চেষ্টা করল।

স্যার শেষ কথায় বললেন, “তাহলে মনে রেখো, তোমরা শুধু নিজের জন্য বেঁচে নেই, তোমাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে হাজারো মানুষের স্বপ্ন, আর আল্লাহর হুকুম। তাই এমন জীবন যাপন করবে, যাতে আল্লাহও খুশি হন, আর তোমাদের পূর্বপুরুষরাও গর্বিত হন।”

প্রতিটি প্রজন্মকে তার লক্ষ্য আবিষ্কার করতে হবে, তা পূরণ করতে হবে নতুবা বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে পরবর্তী প্রজন্মের সাথে।

মনে রাখতে হবে,

- আমরা একা নই, পূর্বপুরুষদের কষ্ট ও ভালোবাসার উত্তরাধিকারী।
- আমাদের কর্তব্য হলো তাদের প্রতি সম্মান, খেয়াল রাখা ও দোয়া করা।
- জীবনকে অর্থবহ করতে হবে, যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গর্ব করতে পারে।

নবম ক্লাসের ছাত্ররা অনুপ্রাণিত হলো সঙ্গে সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় ভরে উঠলো বিদ্যালয়ের কক্ষ। এই কিশোর বয়সের ছাত্ররা বুঝলো, চিন্তা থেকে দেখা যায়, ভাবনা থেকে অনুভব করা যায়।

বিঃদ্রঃ-

স্যার “মানবজাতির জেনেটিক্স বিশ্লেষণ” এর উপর গবেষনা করতে যেয়ে অনেক কিছুই করেছেন, সেখান থেকে কিছুটা ছাত্রদের কে বুঝানোর চেষ্টা করলেন সহজ ভাবে।

একজনার পিছনে ১০০ প্রজন্মে থাকার কথা, ২^১০০ জন = ১.২৬৭৬৫ e ৩০ এটা একটা খুব বড় নম্বর, এতো জন পৃথিতেও ছিলেন না। তা হলে? বাস্তবে এক পরিবারে চাচাতো বা দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা বিয়ে করেছে, ফলে একই পূর্বপুরুষ বারবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তাই পূর্বপুরুষের সংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী যতটা হওয়া উচিত, বাস্তবে তার চেয়ে অনেক কম।

এক কথায়: তত্ত্বে আমাদের কোটি কোটি পূর্বপুরুষ আছে, কিন্তু বাস্তব ও ইতিহাস আর জেনেটিক্স দেখায়, আমরা সবাই অনেক ছোট ও যৌথ এক পূর্বপুরুষগোষ্ঠী থেকে এসেছি। তাই আমরা সবাই আসলে একে অপরের আত্মীয়। আমাদের সবার শেকড় একই জায়গায় গিয়ে মিশে যায়।

নবম ক্লাস এর ছাত্ররা এক নতুন দিগন্ত পেলো চিন্তা করার, এক পরিসংখ্যাগতো বিজ্ঞান যা নিজেকে জড়িয়ে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৭৫

“আজীবনের শিক্ষক”

মাদারীপুর জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

আজ দশম শ্রেণির বিদায়ী অনুষ্ঠান। স্কুল মাঠে বাঁশ আর রঙিন কাপড় দিয়ে বানানো অস্থায়ী মঞ্চ, ফুলের মালা, রঙিন বেলুন—সবকিছুই উৎসবমুখর। ছাত্রছাত্রীরা আবেগে ভরা, কেউ আনন্দে গান গাইছে, কেউ আবার অশ্রুসজল চোখে ভাবছে - “এই তো শেষ দিন আমাদের এই প্রিয় স্কুলে!”

“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প থেকে নির্দেশ আছে, যা মঞ্চে উঠে প্রধান শিক্ষক আমিনুল হক স্যার বললেন, “আজ তোমাদের বিদায় দিতে গিয়ে আমরাও আবেগে ভেসে যাচ্ছি। তবে মনে রেখো, স্কুল ছাড়লেই আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না। বরং আসল সম্পর্ক তখনই শুরু হয়।”

তিনি একটু থেমে আবার বললেন,

“আজকের ইন্টারনেটের যুগে, প্রত্যেক ছাত্রের জীবনে অন্তত একজন তার মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক থাকবে, যার সঙ্গে আজীবন যোগাযোগ রাখবে, বিশ্বাস করবে, প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে ফোন করবে, ঈদে ও নববর্ষের উৎসবে কার্ড বিনিময় করবে, পারিবারিক ভাবে জানাশোনা থাকবে ও পরামর্শ চাইবে, হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। এই শিক্ষক যেন হয় তোমাদের ‘আজীবনের শিক্ষক’। যে তোমাদের সাফল্য-ব্যর্থতায় পাশে থাকবে। তোমরা এখন হয়তো পুরোপুরি বুঝতে পারছোনা, কিন্তু জেনেরাখো, একজন শিক্ষক অনন্তকালকে প্রভাবিত করেন; তিনি কখনই বলতে পারেন না যে তার প্রভাব কোথায় গিয়ে থামবে - তোমরা জীবনের ধাপে ধাপে অনুপ্রাণিত হবে তোমাদের চেনা মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক থেকে। আর আমরা, তোমাদের মাঝে যে জ্ঞানের বীজ বপন করেছি তা চিরকাল বৃদ্ধি পাক, এই আমাদের কাম্য।”

এরপর স্যার ছোট্ট এক আয়োজন করলেন। তিনি বললেন,

“আজকের দিন থেকে, তোমরা প্রত্যেকে একজন করে শিক্ষক বেছে নাও। যাকে তুমি মনে করবে, এই মানুষটির সঙ্গে আমি আজীবন যোগাযোগ রাখব। ওই শিক্ষকও তোমার পাশে থাকবেন। তোমরা চাইলে এখনই ওনার হাতে একটা ছোট্ট চিঠি লিখে দিতে পারো।”

চারদিকে আবেগঘন দৃশ্য তৈরি হলো।

ছাত্ররা ভিড় করে গিয়ে প্রিয় শিক্ষকের হাতে লিখে দিল, “স্যার, আমি আপনার সঙ্গে আজীবন যোগাযোগ রাখব।”

কেউ আবার খাতার পাতায় লিখে দিল নিজের ফোন নাম্বার, ইমেইল, ঠিকানা। শিক্ষকরা স্নেহভরে তাদের কাঁধে হাত রাখলেন।

এই সময়, দশম শ্রেণির ছাত্র আরাফাত এগিয়ে গেল ইংরেজি শিক্ষক সালমা ম্যাডামের কাছে।

চোখে পানি, কণ্ঠ কাঁপছে -

“ম্যাডাম, আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারি, কিংবা ব্যর্থ হই... তখনও কি আপনি আমাকে মনে রাখবেন?”

সালমা ম্যাডাম স্নেহভরে তার মাথায় হাত রেখে বললেন -

“আরাফাত, তুমি ব্যর্থ হলে কি আমি তোমাকে ভুলে যাব? জীবনে জেতা-হারার চেয়েও বড় হলো চেষ্টা আর সততা। তুমি যদি কখনো পথ হারাও, মনে রেখো - তোমার একজন শিক্ষক সবসময় তোমার পাশে আছে।”

আরাফাতের চোখে অশ্রু ঝরে পড়লো, কিন্তু ঠোঁটে ফুটলো নতুন এক সাহসী হাসি।

সেদিন বিদায়ী অনুষ্ঠান শুধু কান্নার দিন থাকলো না, হয়ে উঠলো নতুন সম্পর্ক গড়ার দিন। শিক্ষক-ছাত্রের বন্ধন যেন এক পরিবারে পরিণত হলো।

মঞ্চ থেকে নেমে আসার সময় প্রধান শিক্ষক আমিনুল হক স্যার ফিসফিস করে বললেন -

“এটাই হলো আসল বিদায়। বিদায় মানে দূরে যাওয়া নয়, বরং এক নতুন বন্ধনের শুরু।”

এদিকে, এই ভিড়ের মাঝেই বসে ছিলো নিশাত। পড়াশোনায় মাঝারি মানের, তবে ভীষণ লাজুক মেয়ে। তার মনে হয়, কেউ হয়তো তাকে খুব একটা খেয়ালই করে না।

কন্তু অনুষ্ঠান শেষে, বাংলা শিক্ষক রুবিনা ম্যাডাম হঠাৎ তাকে ডাকলেন।

“নিশাত, এই ফুলটা তুমি সাজিয়েছিলে না? খুব সুন্দর হয়েছে। তোমাকে ছাড়া আমার বাংলা ক্লাসের আবৃত্তি আসর এত প্রাণবন্ত হতো না।”

নিশাত অবাক হয়ে তাকালো।

সে তো ভাবতো ম্যাডাম শুধু মেধাবী ছাত্রদেরই মনে রাখেন। কিন্তু আজ বুঝলো - ম্যাডাম সবসময় তাকে লক্ষ্য করতেন, ভালোবাসতেন, শুধু তা প্রকাশ করতেন না।

কিন্তু নিশাতের মনে চুপিসারে একটা প্রতিজ্ঞা জন্ম নিলো - “আমি সারাজীবন এই ম্যাডামের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখবো। আমার কষ্ট, আনন্দ, অর্জন - সব খবর ওনাকে জানাবো।”

আর রুবিনা ম্যাডামও জানতেন না, তাঁর সামান্য স্নেহের কথাই একজন ছাত্রীর মনে কত গভীর বন্ধন তৈরি করে দিচ্ছে।

বিদায় অনুষ্ঠানের শেষে, যখন ছাত্রছাত্রীরা একে একে চলে যাচ্ছিল, নিশাত বুকের ভেতর অদ্ভুত এক শান্তি অনুভব করলো।

সে বুঝলো - একজন শিক্ষককে কখনোই বেছে নিতে হয় না। সম্পর্কটা নিজেই তৈরি হয় - অজান্তে, ভালোবাসায়।

আজীবনের শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক কখনো বানাতে হয় না, সেটা তৈরি হয় ভালোবাসা, খেয়াল আর আস্থায় মনের অজান্তে। “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের উদ্দেশ্য এইটাই।

“প্রতিযোগিতা জঞ্জালের নিয়ম, কিন্তু সহযোগিতা সভ্যতার নিয়ম।”

কিশোরগঞ্জ জেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পঞ্চম শ্রেণির ক্লাসে ঢুকলেন নওশাদ স্যার। তিনি শুধু শিক্ষক নন, একজন ভালো খেলোয়াড়ও। ফুটবল আর ব্যাডমিন্টন - দুটো খেলাতেই তিনি পারদর্শী।

স্যার বোর্ডে লিখলেন - “যদি দ্রুত যেতে চাও, একা যাও। যদি অনেক দূরে যেতে চাও, একসাথে যাও।”

তারপর তিনি ছাত্রছাত্রীদের বললেন - “দেখো বাচ্চারা, ব্যাডমিন্টন একক খেলা। এখানে একজন খেলোয়াড়কে একাই সব করতে হয় - নিজের দ্রুত সিদ্ধান্ত, নিজের উদ্যোগ আর নিজের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সীমাবদ্ধতাও আছে - একজন যতই ভালো খেলুক, সে একা সবকিছু করতে পারে না।”

“অন্যদিকে ফুটবল হলো দলগত খেলা। এখানে ১১ জন খেলোয়াড় একসাথে মাঠে নামে। একজনের পাসে অন্যজন গোল করে, কেউ রক্ষণ সামলায়, কেউ আক্রমণ চালায়। সবাই মিলে খেলার কারণেই বড় জয় আসে। এই সহযোগিতা খেলোয়াড়দের শুধু খেলা জেতায় না, বরং একসাথে লড়াই করে বড় স্বপ্ন পূরণ করতে শেখায়।”

স্যার একটু থেমে বললেন - “একক প্রতিভা হয়তো কোনো খেলা জিতিয়ে দিতে পারে, কিন্তু দলগত কাজ আর সহযোগিতাই পুরো চ্যাম্পিয়নশিপ জিতিয়ে আনে।”

তিনি আরও যোগ করলেন - “প্রতিযোগিতা আমাদের শক্তি দেখায়, কিন্তু সহযোগিতা আমাদের দূরে নিয়ে যায়। প্রতিযোগিতার শেষেই সহযোগিতার শুরু।”

ছাত্রছাত্রীরা কিছুটা অবাক হয়ে তাকালো। স্যার বললেন, “আজ আমরা শুধু বই পড়ব না, আমরা একটা ছোট প্রজেক্ট করব। এই প্রজেক্টে তোমরা শিখবে কীভাবে একসাথে কাজ করলে শেখা সহজ আর আনন্দময় হয়।”

প্রজেক্ট: “আমাদের স্বপ্নের বাগান” স্যার ক্লাসকে চারটি দলে ভাগ করে দিলেন। প্রতিটি দলে ৫–৬ জন ছাত্রছাত্রী।

প্রজেক্টের কাজ: স্কুলের উঠানে একটি ছোট্ট কল্পনার বাগানের নকশা বানাতে হবে।

কাজের নিয়ম -

- একজন আঁকবে গাছপালা,
- কেউ লিখবে বাগানের নিয়ম,
- কেউ খুঁজে আনবে ফুল ও ফলের নাম,
- কেউ বানাবে পোস্টার,
- আর সবাই মিলে তা উপস্থাপন করবে।

প্রথমে কয়েকজন ছাত্র বললো, “স্যার, আমি একাই সব করতে পারি!”

কিন্তু কাজ শুরু হতেই বোঝা গেল, একজন একা সব পারে না। কারো আঁকা সুন্দর, কারো লেখা ঝকঝকে, কারো মুখে বলার জোর আছে। তারা বুঝতে পারলো, যদি সবাই মিলে কাজ করে তবে বাগান হবে রঙিন ও সুন্দর। দলটি যখন তাদের “স্বপ্নের বাগান” উপস্থাপন করলো, তখন পুরো ক্লাস হাততালি দিলো। কেউই একা বিজয়ী হলো না, বরং দলের প্রত্যেকে বিজয়ী হলো।

নওশাদ স্যার বললেন, “তোমরা কি বুঝলে? প্রতিযোগিতা আমাদের দ্রুত হতে শেখায়, কিন্তু সহযোগিতা আমাদের একসাথে দূরে নিয়ে যায়। যেখানে ভাগাভাগি আছে, সেখানে জ্ঞানও বেড়ে যায়, আনন্দও বেড়ে যায়।”

নওশাদ স্যার “স্বপ্নের বাগান” প্রকল্পের কথা স্কুল কমিটিকে জানালেন। সবাই খুশি হয়ে স্কুলের আঙিনার এক কোণে বাগান করার জন্য জমি দিলো। ছাত্ররা একসাথে মাটি খুঁড়লো, গাছ লাগালো, পানি দিলো। কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে ফুল ফুটতে শুরু করলো। প্রতিটি ফুল যেন একেকজন ছাত্রের পরিশ্রম ও সাফল্যের প্রতীক।

যখন সবগুলো ফুল মিলে রঙিন বাগান হয়ে উঠলো, তখন ছাত্ররা অনুভব করলো - “একজনের অর্জন হয়তো একটি ফুল, কিন্তু সবার সহযোগিতা মিলেই তৈরি হয় একটি স্বপ্নের বাগান।” সেই বাগানের সৌন্দর্যে তারা আনন্দ পেলো, প্রজাপতির ডানার নাচনে দেখলো জীবনের উচ্ছ্বাস, আর বুঝলো - সহযোগিতার ফল শুধু কাজ নয়, সেটা আনন্দ আর সৌন্দর্যও এনে দেয়।

ছাত্রছাত্রীরা একসাথে বলে উঠলো -

“সহযোগিতাই সভ্যতার আসল শক্তি।”

“প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু, ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলা দিয়ে শেষ।”

সিরাজগঞ্জ জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ অষ্টম শ্রেণির গণিত ক্লাসে ঢুকলেন মোবারক স্যার। গণিত স্যারের প্রিয় বিষয়, স্যার গনিতের মাঝে ধারাবাহিকতা দেখতে পান। গণিতের মধ্যে যে ধারাবাহিকতা এবং শৃঙ্খলা পাওয়া যায় তা মহাবিশ্বের গভীর, অন্তর্নিহিত বুদ্ধিমত্তা বা শৃঙ্খলার প্রতিফলন হিসাবে দেখা দেয়, যা সৃষ্টিকর্তারই রূপ। সবকিছুর মধ্যে আছে এক প্রকারের প্রতিশ্রুতি, ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলা। স্যার বিশ্বাস করেন, সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো ধারাবাহিকতা। আর বর্তমানকে বিশ্বাস করে পদক্ষেপ নেওয়াই হলো ধারাবাহিকতা। এখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্ররা যদি তাদের কাজের ধারাবাহিকতার উৎসাহ পায় তাহলে জীবনের লক্ষে পৌঁছাতে পারবে, তাই তাদের জানা দরকার বোঝা দরকার।

বোর্ডে লিখলেন বড় অক্ষরে:

“Consistency beats talent.”

“ধারাবাহিকতা প্রতিভাকে হার মানায়”

স্যার: বলো তো - কোনটা ভালো, একদিনে অনেক পড়া, নাকি প্রতিদিন অল্প অল্প পড়া?

রুমি: স্যার, নিশ্চয়ই একদিনে বেশি পড়া ভালো! তাতে অনেক কিছু শিখে ফেলা যায়।

স্যার: (হেসে) ঠিক আছে, তাহলে ধরো, একজন একদিনে ১০ ঘণ্টা পড়লো, কিন্তু এরপর এক মাস বই ছোঁয়নি। আরেকজন প্রতিদিন মাত্র ৩০ মিনিট পড়লো। কে এগিয়ে যাবে?

শাওন: (হিসাব করে) স্যার, প্রতিদিন পড়া ছাত্র তো ৩০ দিনে ১৫ ঘণ্টা পড়লো। মানে, সে বেশি শিখলো!

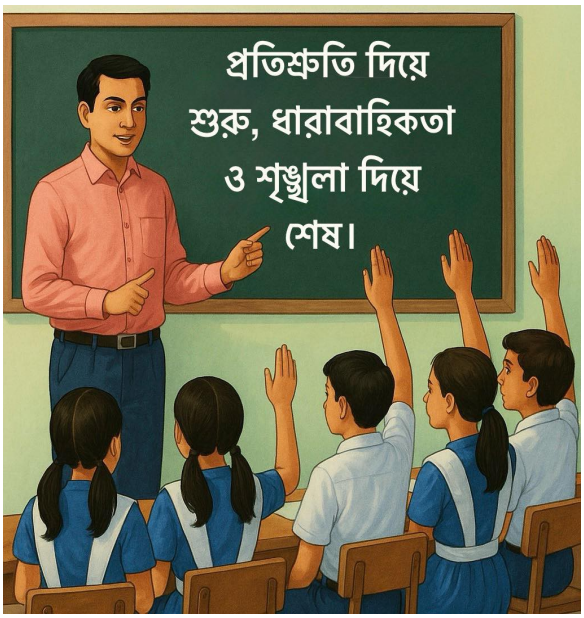

স্যার: দারুণ! দেখেছো, ছোট ছোট নিয়মিত চেষ্টা প্রতিভার থেকেও এগিয়ে যায়।

তোমরা কি জানো, ‘প্রতিভা দরজা খুলে দেয়, কিন্তু ধারাবাহিকতা সেই দরজাকে খোলা রাখে।’ নদীর পানি যেমন ধীরে ধীরে পাথর ক্ষয় করে, তেমনি প্রতিদিনের প্রচেষ্টা বড় ফল আনে। সাফল্য হলো দিনের পর দিন পুনরাবৃত্তি করা ছোট ছোট প্রচেষ্টার সমষ্টি।

মিতু: স্যার, কিন্তু শুরুটা কীভাবে করব? অনেক সময় আলসেমি আসে।

স্যার: খুব ভালো প্রশ্ন। প্রতিটি কাজের শুরু হয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তুমি যদি বলো, “আমি প্রতিদিন পড়ব”—এটাই হলো প্রতিশ্রুতি। এরপর সেটা নিয়মিত করলে সেটাই হলো ধারাবাহিকতা। আর সময় মেনে করলে সেটা হলো শৃঙ্খলা।

স্যার বোর্ডে লিখলেন:

“প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুরু, ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলা দিয়ে শেষ।”

রুমি: স্যার, উদাহরণ দিন না।

স্যার: ধরো, তুমি প্রতিজ্ঞা করলে প্রতিদিন সকালে ১০ মিনিট ইংরেজি শব্দ শিখবে। এটা হলো প্রতিশ্রুতি। এখন তুমি যদি প্রতিদিন করো, সেটি হলো ধারাবাহিকতা। আর নির্দিষ্ট সময়ে করলে সেটাই হলো শৃঙ্খলা। কয়েক মাস পর দেখবে তোমার শব্দভান্ডার অনেক বেড়ে গেছে।

সকল ছাত্র একসাথে: (হাত তুলে) স্যার, আজ থেকে আমরা প্রতিশ্রুতি দেবো, আর ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলা দিয়ে সেটা শেষ করব!

স্যার মৃদু হাসলেন।

“এই প্রতিশ্রুতিই তোমাদের ভবিষ্যতের সিঁড়ি। প্রতিদিনের ছোট ছোট পদক্ষেপ একদিন তোমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্যের দরজা খুলে দেবে।”

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৭৬

“ভালোবাসার শক্তি”

নওগাঁ জেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ষষ্ঠ শ্রেণির ক্লাসে আজ এসেছেন তরুণ নতুন শিক্ষক - কামরুল স্যার। স্যারের মাস্টার করা “Educational Technology” তে, তাই খুব ভালো ভাবেই জানেন “সামাজিক ও আবেগিক শিখন” এর প্রয়োজনীয়তা কতো শিশুদের জন্য। শিশুদের মনে দয়া, সহানুভূতি এবং অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধার মতো সামাজিক আচরণের ভিত্তি স্থাপন করা যায়, এই (Social and Emotional Learning - SEL) এর মাধ্যমে। যা পর্যায়ক্রমে মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষাগত সাফল্য ও সামাজিকতা বয়ে আনবে ইতিবাচক দিক।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে কামরুল স্যার বললেন আজ আমি তোমাদের একটা গল্প বলবো, মন দিয়ে শোন। ছাত্ররা অবাক হয়ে তাকালো। স্যার বললেন, “তোমরা জানো, মানুষ শক্তি ব্যবহার করে তখনই, যখন সে অন্যকে ভয় দেখাতে চায় বা ক্ষতি করতে চায়। কিন্তু যখন আমরা ভালোবাসা ব্যবহার করি, তখন কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়।” তারপর তিনি একটি গল্প শোনালেন, এক গ্রামে দুজন ছেলে ছিলো তারা একই স্কুলে পড়তো, নাম রাহাত আর মিলন। রাহাত সবসময় বলপ্রয়োগ করেই কাজ করত। মিলন ছিলো শান্ত, হাসিমুখে সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত। একদিন স্কুলে বড় একটা গাছ থেকে একটা পাকা কাঁঠাল পড়লো। সবাই ছুটে গেল কাঁঠালটা পেতে। রাহাত জোর করে সবাইকে ঠেলে কাঁঠালটা নিয়ে নিল। বন্ধুরা মন খারাপ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। পরের দিন আরেকটা কাঁঠাল পড়লো। এবার মিলন বললো, “চলো, সবাই মিলে ভাগ করি। টুকরো টুকরো করে সবাই খাই।” সবাই আনন্দে খেল, আর মিলনকে আরও বেশি ভালোবাসতে শুরু করল।

ফলাফল কী হলো? রাহাত শক্তি দিয়ে একা কাঁঠাল পেল, কিন্তু বন্ধুত্ব হারালো। অন্যদিকে মিলন ভালোবাসা দিয়ে সবার মন জিতল, আর সবাই মিলনকে ভালোবাসলো ও কাছের মানুষ ভাবলো, তাই না!

স্যার ভাবলেন, গল্প তো গল্প, ১১-১২ বছরের শিশুদের জন্য চাই উদাহরণ। শিক্ষার্থীরা স্যারদের প্রত্যাশিত আদর্শ হিসেবে দেখে এবং স্যাররা যদি অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে, তাহলে তারাও তা অনুসরণ করবে।

সহানুভূতি: শ্রেণীকক্ষে সহানুভূতি শেখানোর অন্যতম সেরা উপায় হল অন্যদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো। স্যার, স্কুলের আয়া কল্পনা আপাকে ক্লাস এ ডাকলেন এবং তার খোঁজ খবর নিলেন ও স্যারের ব্যাগ থেকে একটা ফুল বের করে দিলেন ও ছাত্রদের হয়ে অনেক ধন্যবাদ জানালেন ক্লাস পরিষ্কার রাখার জন্য। ক্লাস তাদের মনের গভীরে কল্পনা আপার জন্য শ্রদ্ধাশীল ও সদয় আচরণের স্থান করে রাখলো।

প্রশংসা কার্ড: স্যার এবার তাঁর ব্যাগ থেকে ৪০ টি প্রশংসা কার্ড বের করলেন। রঙিন ছবি কম্পিউটারে প্রিন্ট করা। তাতে লেখা আছে, “তুমি খুব ভালো ছেলে”, “তোমার জামাটা সুন্দর”, “তোমাকে আমার ভালোলাগে”, “তোমার চোখ দুটি কি সুন্দর”, ইত্যাদি। একে একে সবাইকে দুটি করে দিলেন, একটা নিজের জন্য আর একটা কোন বন্ধুকে দিবে। অন্যের প্রশংসা করা এবং নিজের প্রশংসা পাওয়া, এই দুয়ে মিলে শিশু ছাত্ররা বুঝলো পাবার ও দেবার আনন্দ।

বন্ধুত্বের উপর জোর: স্যার ক্লাস এ একজন বন্ধু কী করতে পারে, বন্ধুরা কী করবে এবং বন্ধুরা একসাথে কী করতে পছন্দ করে, এর উপর একটা ছক বাধা বিবরণ লিখতে দিলেন। ক্লাস যেন এক মজার জায়গায় পরিণত গেলো, ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় লেগে গেল। উদাহরণ দিয়ে স্যার বললেন, ধরো এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে পেন্সিল ধারালো করতে সাহায্য করলো। স্যার লক্ষ করলেন, যখন সহপাঠীদের মধ্যে একজন সদয় আচরণ করে, তখন সেই আচরণ অন্য সহপাঠীর প্রতি আর একটি নতুন সদয় আচরণ করার প্রেরণা যোগায়, এবং পুরো শ্রেণীকক্ষ একটা বৃত্তে তাদের সকলের উপর সদয় আচরণ অনুভব করে। এইটা একটা মানবিক গুন, এই গুনটাকে শুধু একটু উস্কে দিতে হয়।

স্যার ছাত্রদের কিছু কথা লিখে রাখতে বললেন, আত্মসচেতনতা: “প্রথমে নিজের অনুভূতি চিনতে হবে— আমি রাগ করছি নাকি খুশি? কেন এমন হলো? এটা চিনলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে।” স্ব-ব্যবস্থাপনা: “রাগ হলো বলে যদি সবাইকে ধাক্কা মারি, সেটা ভুল। বরং শান্ত থেকে দায়িত্ব নিতে হবে।” সহানুভূতি: “সহানুভূতি হলো অন্যের চোখ দিয়ে দেখা, অন্যের কান দিয়ে শোনা এবং অন্যের হৃদয় দিয়ে অনুভব করা।”

অন্যদের প্রতি আচরণ এরপর স্যার ক্লাসে বললেন,

- “তোমরা কি কখনও কারও বই পড়ে যেতে দেখেছ? সাহায্য করলে কেমন খুশি হয়, ভেবেছ?”
- “আমাদের ক্লাসে একটা ”দয়ার-পাত্র“ বানানো হবে। যে-যে ভালো কাজ করবে, কাগজে লিখে দয়ার-পাত্রে ফেলবে।”

সুস্থ সম্পর্ক: স্যার আরও শেখালেন,

- “বন্ধুরা কথা বললে মনোযোগ দিয়ে শোনো, চোখে চোখ রাখো।”
- “সবসময় সুন্দর ভাষায় কথা বলো। ‘ধন্যবাদ’, ‘দয়া করে’ - এই শব্দগুলো ব্যবহার করলে সম্পর্ক মজবুত হয়।”
- “কখনো ঝগড়া হলে, আগে অন্যের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করো, তারপর মীমাংসা করো।”

ইতিবাচক স্কুল পরিবেশ: শেষে কামরুল স্যার বললেন,

- “আমরা শিক্ষকরা যদি সবার সঙ্গে ভদ্রভাবে ব্যবহার করি, তোমরাও শিখবে।”
- “আগামী সপ্তাহে আমরা গ্রামে খাদ্য সংগ্রহ কর্মসূচি করব - এটাও ভালোবাসা দেখানোর উপায়।”

ছাত্ররা সবাই বুঝল, ভালোবাসা দিয়ে কাজ করলে শক্তির দরকার নেই। ভালোবাসাই মানুষকে কাছে আনে, বন্ধু বানায়, আর পৃথিবীকে সুন্দর করে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৭৯

“যা ভাঙে, মেরামত করো”

বরিশাল জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

আজ বৃহস্পতিবার, সাপ্তাহিক ক্লাব কার্যক্রমের দিন। ক্লাস শেষে ছাত্রছাত্রীরা ভিড় করেছে এক নতুন জায়গায় - স্কুলে আজ উদ্বোধন হলো “কারিগরি কোন”।

মোবারক স্যার, BUET থেকে ইঞ্জিনিয়ার পাস করা, যার ব্যাকপ্যাকে সব সময় থাকতো একটি টুলকিট আর মাল্টিমিটার।

স্যার BCS পরীক্ষা দিবেন তাই “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের অধীনে এই স্কুলে এসেছেন। তিনি মনে করেন, নাট-বল্ট খোলা সহজ, কিন্তু কোনটা কত জোরে আঁটতে হবে বা কোন ব্যাটারির কত ভোল্ট আর কত অ্যাম্পিয়ার লাগবে, এসব কৌতূহল জন্ম নেয় ছোটবেলা থেকেই। স্যার সবসময় বলেন:

“The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs

বিজ্ঞান হলো জানার বিষয়, আর প্রকৌশল হলো করার বিষয়। তাই তাঁর উদ্যোগে গড়ে উঠেছে এই “কারিগরি কোন”।

কারিগরি কোনটি সাজানো হয়েছে ছোট ছোট হাতের জন্য ছোট ছোট যন্ত্রপাতি দিয়ে।

টেবিলের ওপর সাজানো - স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লায়ার্স, টেপ, সুই-সুতো, আর কয়েকটা ভাঙা খেলনা ও টর্চলাইট। দেয়ালে বড় করে লেখা, “যা ভাঙে, ফেলে দিও না। শিখো, মেরামত করো।”

অষ্টম শ্রেণির রুবেল বলল,

“স্যার, আমার কলমদানি ভেঙে গেছে, আমি কি চেষ্টা করতে পারি?”

স্যার হাসলেন, “অবশ্যই। এ জায়গাটা তোমাদের জন্যই।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই রুবেল ভাঙা অংশে আঠা দিয়ে আবার জুড়ে ফেলল।

ওদিকে নবম শ্রেণির ফারহানা পুরোনো একটা খেলনা গাড়ি খুলে দেখল, ভেতরের ব্যাটারি সংযোগ নষ্ট।

স্যার তাকে দেখালেন কীভাবে তার ঠিক করে আবার চালু করা যায়।

ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে শিখতে লাগল,

কেউ জামার ছেঁড়া অংশ সেলাই করছে,

কেউ ঘড়ির স্ক্রু আঁটছে,

আবার কেউ পুরোনো রেডিও খুলে তার ভেতরের সার্কিট বোঝার চেষ্টা করছে।

মোবারক স্যার শেষে বললেন,

“শোনো বাচ্চারা, প্রকৃত প্রকৌশলী সে-ই, যে সমস্যাকে ভয় পায় না। জিনিস ভাঙবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু জ্ঞানী মানুষ ফেলে দেয় না, বরং দেখে, বোঝে, আর মেরামত করে। তোমরা যদি ছোট থেকে এভাবেই হাতে-কলমে কাজ শিখো, একদিন বড় হয়ে দেশের জন্য নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারবে।”

সেদিন থেকে স্কুলের “কারিগরি কোন” হয়ে উঠল ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতা আর হাতে-কলমে শিক্ষার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা।

“কারিগরি কোন” শুধু ভাঙা জিনিস মেরামতের জায়গা নয়, এটি ছাত্রছাত্রীদের মনে প্রকৌশলচিন্তা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার এক অনন্য শিক্ষালয়। এখান থেকেই শুরু হতে পারে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রকৌশলী, উদ্ভাবক আর বিজ্ঞানীদের পথচলা।

“চেষ্টা–ও–ভুল (Trial and Error Method)”

রাজশাহী জেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আজ তৃতীয় শ্রেণির গণিত ক্লাসে ঢুকলেন নতুন শিক্ষক - জাহিদ স্যার। তিনি আধুনিক চিন্তার মানুষ, বলা যায় Gen Z প্রজন্মের প্রতিনিধি। ইন্টারনেট আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) যুগে দাঁড়িয়ে স্যার বিশ্বাস করেন - শিক্ষা শুধু পাঠ্যবইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়। শিশুদের দরকার নতুন দক্ষতা, সৃজনশীলতা, যুক্তিবিদ্যা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং সমস্যার ভিন্নধর্মী সমাধান খোঁজার ক্ষমতা।

তৃতীয় শ্রেণির ছোট্ট শিক্ষার্থীদের আনন্দ ধরে রেখেই তিনি চাইলেন তাদের ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান শেখাতে, যাতে তারা কল্পনা ব্যবহার করে নিজেদের ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে।

আজকের ক্লাসে জাহিদ স্যার বোর্ডে বড় করে লিখলেন:

ঘর + দর = শহর

শিশুরা অবাক হয়ে বলল,

“স্যার! এটা আবার কেমন যোগ? এখানে তো শুধু অক্ষর!”

স্যার মুচকি হেসে বুঝিয়ে দিলেন:

• প্রতিটি অক্ষর = একটি অনন্য সংখ্যা (০–৯)

• কোনো শব্দের প্রথম অক্ষর শূন্য হতে পারবে না

• আন্দাজ করে, চেষ্টা করে, মিল খুঁজে বের করতে হবে

“এভাবেই চেষ্টা–ও–ভুল করে সমাধান বের করতে হয়। একে বলে Trial and Error Method।”

প্রথম ধাঁধা: ঘর + দর = শহর

স্যার বললেন,

“ধরে নাও, র = ০। যদি ঘ = ৭ আর দ = ৮ হয়, তবে কী হয়?”

শিশুরা কাগজে হিসাব করল:

৭০ + ৮০ = ১৫০ → শহর= ১৫০

ক্লাসে হাততালি পড়ে গেল।

দ্বিতীয় ধাঁধা: কল + কল = বল

সুমি হাত তুলে বলল,

“স্যার, আমি চেষ্টা করেছি। যদি ল = ০, ক = ৪, ব = ৮ হয় তাহলে হয় না?”

স্যার খুশি হয়ে বললেন,

“দারুণ! ৪০ + ৪০ = ৮০ → বল= ৮০ ”

তৃতীয় ধাঁধা: ঘর + দর = খবর

একটি সমাধান:

• র = ০, ঘ = ৪, দ = ৯, ব = ৩, খ = ১

• যাচাই: ৪০ + ৯০ = ১৩০ → খবর= ১৩০

শিশুরা মজা পেতে শুরু করেছে, আনন্দে চিৎকার করে উঠল, “আমরা পেয়ে গেছি! আমরা পেয়ে গেছি!”

স্যার আরও কিছু ধাঁধা দিয়ে বললেন বাবা–মায়ের সঙ্গে মিলে সমাধান করতে: SEND + MORE = MONEY

EAT + THAT = APPLE

শেষে স্যার বোর্ডে লিখলেন:

“ভুল হলো শেখার ধাপ।”

তিনি বললেন, “কেউ একবারেই সমাধান করতে পারেনি। কিন্তু চেষ্টা করতে করতে সবাই উত্তর মিলিয়েছে। এই চেষ্টা–ও–ভুল পদ্ধতি শেখায়, হাল ছাড়া যাবে না। ভুল করতে ভয় পেও না, কারণ ভুলের ভেতরেই সঠিক উত্তর লুকিয়ে থাকে।”

জাহিদ স্যারের এই অক্ষর–সংখ্যা ধাঁধাগুলো তৃতীয় শ্রেণির শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠল। তারা খেলতে খেলতে যোগ–বিয়োগ অনুশীলন করছে, যুক্তি ও ধৈর্য শিখছে, এবং ভেরিয়েবল বা অজানা সংখ্যার ধারণা রপ্ত করছে। ইন্টারনেট ও AI-এর যুগে সমস্যা সমাধানের এই অভ্যাস তাদের ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে।

ধনুক-ভাঙা পণ - ১৮১

“শিক্ষকের জীবন”

যদি কোনো শিক্ষক গাড়ি চালান, ফিসফিস শোনা যায় - “মানে, অন্য কোনো উৎস আছে।”
যদি কোনো শিক্ষক বাড়ি তুলেন, কটাক্ষ শোনা যায় - “বেতনের টাকায় কি সম্ভব?”
যদি কোনো শিক্ষক সুন্দর পোশাক পরেন, প্রশ্ন ওঠে - “টাকা এল কোথা থেকে?”
এভাবে আমরা শিক্ষকের আরামকে সন্দেহের চোখে দেখি, আর তাদের জীবনে আরামকে পাপ বানিয়ে ফেলি।
কিন্তু বাস্তবতা কাঁপিয়ে বলা দরকার, বর্তমান অর্থনীতিতে শুধু বেতনের ওপর ভর করে কোনো শিক্ষকই নিজের বাড়ির স্বপ্ন ছুঁতে পারে না; স্বপ্ন গেলে ঋণের গভীরতায় ডুবে যেতে হয়। আর অতি কমই আমরা দেখতে চাই: রাত জেগে খাতা পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিকক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়ানো, প্রতিদিনের ক্লাশ - এই শ্রমই তো দেশের ভবিষ্যত গড়ে।
এটা নীরব ভন্ডামি - আমরা শিক্ষকের কাছে সব দাবি তুলি, কিন্তু তাদের জীবনে সুফল বিলি করতে নারাজ। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার যখন গাড়ি চালায়, কেউ কিছু বলে না; রাজনীতিবিদ যখন অট্টালিকা বানায়, কারো চোখ কপাল ওঠে না; কিন্তু যে মানুষ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিচারক, রাষ্ট্রনেতা তৈরি করেন, তাকে আমরা কোন এক অদৃশ্য ঘরে বন্দি করে আটকে রাখি। কেন? কী অপরাধ তাঁদের?
শিক্ষকও ক্লান্ত হন, শিক্ষকও চিন্তায় রাতে জেগে থাকেন।
শিক্ষকও বিলের বোঝায় বিষণ্ন হয়।
তাদেরও দরকার উষ্ণ একটা বাড়ি, নিজের বাড়িতে গেট খুলে ঢোকার গর্ব, আর একটুকু অবকাশ, হাসি ও মর্যাদা - কেবল টিকে থাকার জীবন নয়।

শিক্ষক হওয়া দারিদ্র্যের শপথ নয়; গাড়ি রাখা কোনো অপরাধ নয়; সন্তুষ্ট ও স্বচ্ছল জীবন পাওয়া কোনো লজ্জার ব্যপার নয়।
বাংলাদেশে এখন যে সংকট দেখা দিচ্ছে - কর্মক্ষেত্রে অসন্তোষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিচলতা - তার মূল কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষকের মর্যাদা ও জীবিকাগত নিরাপত্তার অভাব। আমরা যদি শিক্ষকদের শ্রদ্ধা ও সম্মান না দিই, আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজের ভবিষ্যতকে দেউলিয়া করে দিচ্ছি।
এখনই ঘুম ভেঙে দাঁড়ানোর সময়। আমাদের কল্যাণে সিদ্ধান্ত নিতে হবে - দেশের নীতি, বাজেট ও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থায় এমন সংস্কার আনতে হবে যা শিক্ষকের জীবিকা ঠিক করবে। বেতন, পেনশন, কাজের পরিবেশ, যোগ্যতার স্বীকৃতি - এসব প্রশ্ন কেবল শিক্ষকদের নয়, এগুলো জাতির ভবিষ্যতের প্রশ্ন।
আমরা “ধনুক-ভাঙা পণ” হিসেবে ঘোষণা করি - শিক্ষককে ঠাঁই দিন সমাজে; তাদের জীবনকে মর্যাদা দিন; তাদের আরামকে অপরাধ মনে করা বন্ধ করুন। শিক্ষকের সম্মানকে সামাজিক নীতিতে রূপান্তর করুন - ন্যায্য বেতন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ও সামাজিক সম্মান।
এটি কোনো রাজনীতির ব্যাপার নয়; এটি দেশের বাঁচার উপায়।
বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে বলছি - যখন আপনি বলেন “শিক্ষকই দেশের ভবিষ্যত গড়ে,” তখন সেটার প্রতিফলন আপনার কাজ ও নীতিতে দেয়া উচিত। শিক্ষককে দারিদ্র্যে আটকে রেখে আমরা একটি কঠিন, অশিক্ষিত ও অস্থির ভবিষ্যৎ বেছে নিচ্ছি। আর তা আমরা চাই না।
এখনই সময় - নীরবতা ভঙ্গ করুন, কণ্ঠ যোগ করুন, নীতি বদলান। শিক্ষককে সম্মান করুন - কারণ তাদের সম্মানেই আছে বাংলাদেশের সম্ভাবনা।

“সহযোগী শিক্ষকতা”

মানিকগঞ্জ জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ অষ্টম শ্রেণির বিজ্ঞান ক্লাস। ক্লাসে ঢুকলেন শিক্ষক সদরুল স্যার, নতুন এসেছেন, নতুন শিক্ষক, নতুন স্কুল ও পরিবেশ। তিনি জানেন, নতুন পাঠ পড়ানো সহজ কাজ নয়। তাই ওনার উদ্যোগ হলো “সহযোগী শিক্ষকতা”। যেখানে দুই বা ততোধিক শিক্ষক একসাথে কাজ করে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেন। এই নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় ক্লাসে একজন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সহায়ক শিক্ষক থাকবেন "ইতিবাচক সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া" এবং সহায়তা প্রদান করার জন্য। এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে শিক্ষক ও ছাত্রদের শিক্ষার পরিবেশকে উৎসাহিত করবে।

সদরুল স্যার অনেক গবেষণা করে এই সহযোগী-শিক্ষকতার একটা মডেল দাঁড় করিয়েছেন। এই শিক্ষণ মডেলের মূল দিকগুলি গেলো, পেশাগত উন্নয়ন, ছাত্র সহায়তা, সহযোগিতামূলক পরিবেশ ও সমান্তরাল শিক্ষাদান।

আজকের ক্লাসে সদরুল স্যারের সাথে বসে আছেন আরও দুইজন শিক্ষক, রুবিনা ম্যাডাম (গণিত) এবং নাসির স্যার (আইসিটি)।

সদরুল স্যার বোর্ডে লিখলেন -

“বিদ্যুৎ প্রবাহ এবং সার্কিট।” সঙ্গে একটা সার্কিটের ছবি দাগালেন, সুইচ, ব্যাটারী ও বাল্ব দিয়ে।

ছাত্ররা একটু কৌতূহলী হলো। তিনি বললেন,

“আজ আমি তোমাদের বিদ্যুৎ প্রবাহ শেখাবো। তবে আমি একা নই। তোমাদের জন্য আরও দুইজন শিক্ষক আমার সাথে আছেন। তারা আমাকে সাহায্য করবেন, আর আমাদের কাজের ভুলত্রুটি ধরবেন।”

রুবিনা ম্যাডাম বললেন,

“দেখো বাচ্চারা, বিদ্যুৎ সার্কিট আসলে অনেকটা গাণিতিক সমীকরণের মতো। যদি একটি অংশ ভুল হয়, পুরো ফলাফল পাল্টে যায়।”

নাসির স্যার বললেন,

“সার্কিট এমন একটা প্রবাহ সেখানে যদি তার কোথাও কেটে যায়, পুরো সার্কিটের প্রবাহ থেমে যায়, মানে সুইচ বন্ধ হওয়ার মতো।”

ছাত্ররা উচ্ছ্বাসে শোনে।

একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো—

“স্যার, যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ থেমে যায় তবে কীভাবে আবার চালু করা যায়?”

সদরুল স্যার উত্তর দিলেন, কিন্তু রুবিনা ম্যাডাম নরম গলায় পরামর্শ দিলেন,

“স্যার, হয়তো এ প্রশ্নের উত্তরকে আরও সহজভাবে বোঝাতে পারি। উদাহরণ হিসেবে পানির পাইপ ব্যবহার করলে?”

স্যার সঙ্গে সঙ্গে পানির পাইপের উদাহরণ দিলেন, ও একটা ছবি একে দেখালেন।

“ভাবো, বিদ্যুৎ অনেকটা পানির মতো, পাইপ ভেঙে গেলে পানি আর পৌঁছায় না।”

সদরুল স্যার এই পানির পাইপ ব্যাবহাত করে ohm's law এর ক্লাস নিলেন, যেখানে পাইপের ব্যাসার্ধ হলো Resistance(R), পানির গতি হলো Current(I) আর পানির উচ্চতা হলো Voltage(V).

ক্লাসে হইচই পড়ে গেল। সবাই বুঝে গেল সহজভাবে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক সভায় এই “সহযোগী শিক্ষকতা” অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা হলো। সদরুল স্যার প্রস্তাব দিলেন, “আমরা যদি সপ্তাহে অন্তত একদিন ‘Team Teaching day’ করি, ওইদিন প্রতিটি ক্লাসে একজন মূল শিক্ষক থাকবেন, আর দুইজন সহযোগী শিক্ষক বসে থাকবেন। শেষে সবাই মিলে আলোচনা করবো, কোথায় ভালো হলো, কোথায় উন্নতির সুযোগ আছে।”

রুবিনা ম্যাডাম হাসি দিয়ে বললেন,

“তাহলে আমাদের শেখা হবে শুধু ছাত্রদের জন্য নয়, আমাদের নিজেদের জন্যও।”

নাসির স্যার যোগ করলেন,

“আর ছাত্ররা দেখবে, শিক্ষকরাও একে অপরকে সাহায্য করেন। এটা তাদের মধ্যে সহযোগিতা আর দলগত কাজের মানসিকতা তৈরি করবে।”

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলো— আগামী মাস থেকে এই “সহযোগী শিক্ষকতা পাইলট প্রোগ্রাম” চালু করা হবে।

এভাবেই ‘সহযোগী শিক্ষকতা’ শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান নয়, বরং সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সমালোচনার ইতিবাচক শক্তিকে বাস্তবে রূপ দেয়। এতে শিক্ষকরা একে অপরের কাছ থেকে শেখেন, ছাত্ররা পায় বহুমুখী দিকনির্দেশনা, আর পুরো বিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে শেখা ও শেখানোর এক নতুন সংস্কৃতি। এই উদ্যোগ প্রমাণ করে - একজন শিক্ষক আলো জ্বালাতে পারেন, কিন্তু একসাথে অনেক শিক্ষক মিলে পুরো বিদ্যালয়কে আলোকিত করতে পারেন।

“শিক্ষাগুরুর মর্যাদা”

কুমিল্লা জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ অষ্টম শ্রেণির বাংলা ক্লাস চলছে। রহমান স্যার খাতা পরীক্ষা করছেন। যত্ন নিয়ে প্রতিটি খাতা দেখছেন, ভুল থাকলে লাল কলমে চিহ্ন দিচ্ছেন, পাশে লিখছেন, “ভালো করে পড়তে হবে”। তাঁর উদ্দেশ্য একটাই: ছাত্র যেন নিজের ভুল বুঝে নেয় এবং আরও ভালো করার চেষ্টা করে।

কিন্তু ক্লাস চলাকালীন হঠাৎ দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন এক ছাত্রের অভিভাবক। চোখে-মুখে রাগ, গলায় বজ্রধ্বনি, “আমার সন্তানের খাতায় এত লাল দাগ দিয়েছেন কেন? এতে কি ওর মনোবল ভেঙে যাবে না? আপনি কি জানেন না বাচ্চাদের মানসিক আঘাত হয়?”

ক্লাস নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ছাত্রছাত্রীরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। রহমান স্যারের হাতে চক কেঁপে উঠল।

তিনি ব্যাখ্যা করতে চাইলেন, “আমি তো কেবল শেখানোর জন্য মন্তব্য করেছি…” কিন্তু অভিভাবকের ক্রোধ থামল না।

সবার সামনে শিক্ষকের প্রতি তীর্যক বাক্য ছুটল, যেন ভুলের দায় শুধুই শিক্ষকের।

শিশুরা কেউ চুপচাপ তাকিয়ে আছে, কেউ ফিসফিস করছে। কেউ আবার লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিচ্ছে।

আর রহমান স্যারের বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে আসছে, এমন অপমান কি প্রাপ্য তাঁর?

পরদিন সকালে আবারও তিনি সবচেয়ে আগে স্কুলে আসেন। ব্ল্যাকবোর্ড মুছে দেন, ক্লাস সাজান, হাসিমুখে ঢোকেন। কারণ তিনি জানেন, অভিভাবকের রাগের বোঝা শিশুরা বহন করতে পারে না। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করা তাঁর পবিত্র দায়িত্ব।

তখন প্রধান শিক্ষক মঞ্চে উঠে বললেন,

“বিদ্যালয় হলো পূজার স্থান, আর শিক্ষক সেই পুরোহিত যিনি জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালান। শিক্ষককে অসম্মান মানে শিক্ষাকে অসম্মান করা, আগামীকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া।”

ক্লাসরুম হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল। অভিভাবকের চোখে অনুশোচনার ছাপ ফুটে উঠল। আর রহমান স্যারের চোখে জ্বলে উঠল নতুন আলো, দুঃখের ভেতর থেকেও দায়িত্ব পালনের দৃঢ়তা।

শিক্ষকের মর্যাদা কেবল ব্যক্তিগত সম্মান নয়, এটি পুরো জাতির শিক্ষার সম্মান।

খাতায় লাল দাগ দেওয়া শাস্তি নয়, এটি শিক্ষার আয়না। শিক্ষককে অবমাননা মানে জ্ঞানের আলোকে নিভিয়ে দেওয়া।

শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর - শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলে তাদের সঠিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন, যা সমাজের জন্য অপরিহার্য। তাঁরা, জ্ঞান ও নৈতিকতার বাহক।

উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষককে ভিআইপি (VIP) হিসাবে গণ্য করা হয়, ফরাসি আদালতে কেবল শিক্ষকদের চেয়ারে বসার অধিকার রয়েছে। জাপানে শিক্ষককে গ্রেফতারের জন্য অনুমতি নিতে হয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় শিক্ষকদের ID কার্ড প্রদর্শন করলেই মন্ত্রীর সমান সুবিধা পাওয়া যায়। চীন, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান ও রাশিয়ায় শিক্ষকদের সর্বাধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত ও তুরস্কে শিক্ষকরা জাতীয় পর্যায়ের সম্মান ভোগ করেন। এমনকি নিউজিল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরেও শিক্ষককে সমাজের পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখা হয়।

বাংলাদেশে শিক্ষকের মর্যাদা প্রদানের জন্য তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, উন্নত ও আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্মানজনক পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, শিক্ষক অপমান বা হয়রানির বিরুদ্ধে কঠোর আইন এবং শিক্ষকদের গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি ও সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৮২

“ভয় জয় করে কথা বলো”

রংপুর জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ নবম শ্রেণির ক্লাসে বিশেষ আয়োজন, “বক্তৃতা অনুশীলন দিন”। স্কুলের হলরুম ভর্তি ছাত্রছাত্রী। মঞ্চে একে একে উঠবে সবাই, সবার সামনে বক্তব্য দিতে হবে। নতুন শিক্ষক নুরুল স্যার বিশ্ববিদ্যালয়ে Public Relations বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের শিক্ষা আসলে জীবনের জন্য - বিশেষ করে কর্মজীবনে সফল হওয়ার জন্য। তাই তিনি মনে করেন, সেই দক্ষতার চর্চা শুরু হওয়া উচিত স্কুল থেকেই।

পাবলিক রিলেশনস তাঁর প্রিয় বিষয়। যেখানে শিল্প আর বিজ্ঞানের এক সুন্দর সমন্বয় আছে।

এর মূল শক্তি হলো কৌশলগত যোগাযোগ - যেখানে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মানুষের সঙ্গে বিশ্বাস ও পারস্পরিক উপকারের সম্পর্ক গড়ে তোলে। এর জন্য দরকার স্পষ্ট চিন্তা, আকর্ষণীয় উপস্থাপনা এবং এমন গল্প বলার দক্ষতা, যা মানুষের মনে গেঁথে যায়।

স্যার বোর্ডে লিখলেন, “Preparation + Courage + Practice = Public Speaking”

তারপর তিনি বললেন, “একজন বক্তাকে শুধু বিষয় জানা যথেষ্ট নয়। বিষয়টা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে, সঠিক শব্দে সাজাতে হবে, আর সাহস নিয়ে উপস্থাপন করতে হবে। তখনই সে আত্মবিশ্বাসী হয়।”

স্যার এবার একটি গল্প বললেন। অনিক নবম শ্রেণির লাজুক ছাত্র। শিক্ষক তাকে একদিন বললেন, “অনিক, কাল তুমি তোমার প্রিয় বই নিয়ে বক্তব্য দেবে।”

অনিক রাতে ভয়ে ঘুমোতে পারলো না। ভাবল, “যদি আটকে যাই? যদি সবাই হাসে?” কিন্তু সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার অনুশীলন করলো। ছোট বাক্যে লিখে রাখলো।

পরদিন মঞ্চে উঠে কাঁপা গলায় শুরু করলো -

“আমার প্রিয় বই হলো কাকের গল্প। আমি এই বই থেকে শিখেছি, বুদ্ধি থাকলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়।”

প্রথমে সবাই চুপ। তারপর করতালি। অনিক বুঝলো - ভয়টা শুধু তার ভেতরেই ছিল। একবার বললেই ভয় আর থাকে না।

গল্প শোনার পর স্যার জিজ্ঞেস করলেন,

“তোমাদের কারও কি কখনো এমন হয়েছে, সবার সামনে কথা বলতে গিয়ে ভয় পেয়েছো?”

রুমি হাত তুললো, “স্যার, আমি একবার বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছিলাম। মঞ্চে উঠেই কথা ভুলে যাই।”

স্যার হেসে বললেন, “এটাই স্বাভাবিক, রুমি। ভয় থাকবেই। কিন্তু প্রস্তুতি আর অনুশীলন থাকলে সেই ভয় কমে যাবে।”

আরেকজন ছাত্র শামীম বলল, “স্যার, আমি তো কথা বলার সময় সবার দিকে তাকাতে লজ্জা পাই।”

স্যার উত্তর দিলেন, “তাহলে প্রথমে শুধু বন্ধুর দিকে তাকাও। ধীরে ধীরে অন্যদের দিকেও তাকাবে। একদিন দেখবে, তুমি পুরো হলরুমের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারছো।”

ছাত্ররা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। স্যার বোর্ডে লিখলেন, পরের সপ্তাহে সবাই যেসব বিষয়ে বক্তব্য দেবে,

১. সোশ্যাল মিডিয়ার ভালো ও মন্দ দিক
২. পরীক্ষায় শুধু নাম্বার নয়, চরিত্র গঠন জরুরি
৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে আমার শিক্ষা
৪. পরিবেশ রক্ষা করা কেন আমার দায়িত্ব
৫. ভবিষ্যতে আমি কেমন নাগরিক হতে চাই
৬. সবার সামনে ভয় জয় করার গল্প।

শেষে নুরুল স্যার পাঁচটি টিপস দিলেন:-

১. প্রস্তুতি নাও – আগে থেকে লিখে নাও, নোট বানাও।
২. আয়নার সামনে বলো – নিজেকে শ্রোতা ভেবে অনুশীলন করো।
৩. চোখে চোখ রাখো – শ্রোতার দিকে তাকাও।
৪. ছোট করে শুরু করো – ছোট বাক্যে বলো, ভুলের ভয় কমবে।
৫. হাসিমুখে কথা বলো – এতে শ্রোতারা স্বাভাবিকভাবে শুনবে।

স্যার বললেন - “ভয় সবসময় থাকবে। কিন্তু ভয় মানেই থেমে যাওয়া নয়। ভয়কে জয় করেই বড় বক্তা হওয়া যায়। আজ তোমরা ছোট্ট অনুশীলন করছো, কাল তোমরাই দেশের বড় মঞ্চে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলবে।”

হলরুমে হাততালি বেজে উঠলো। ছাত্রছাত্রীরা হাসিমুখে পরের সপ্তাহের বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহ পেল।

“মূল্যায়নের নতুন পথ”

গোপালগঞ্জ জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ সপ্তম শ্রেণির ইংরেজি ক্লাস। রিনা ম্যাডাম নুতন যোগ দিয়েছেন “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের অধীনে, তিনি জীববিজ্ঞানের ছাত্রী, ওনার মাস্টার ডিগ্রী তে গবেষণা ছিলো পোকামাকড়ের ফেরোমোন নিয়ে। ফেরোমোন হল রাসায়নিক সংকেত যা একটি প্রজাতির মধ্যে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। রিনা ম্যাডাম মনে করেন, ফেরোমোনের মতোই অদৃশ্য অথচ শক্তিশালী এক সমঝোতা থাকা দরকার ছাত্রদের মধ্যে এবং শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের ভেতরেও। মূল্যায়ন যদি ভয় নয়, বরং সেই অদৃশ্য আস্থার সেতুবন্ধন হয়ে ওঠে, তবে শেখা হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত ও আনন্দময়।

স্কুলে ছাত্রদের মূল্যায়ন (Evaluation) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এর ভালো দিক যেমন আছে, তেমনি নেতিবাচক দিকও আছে। শিক্ষার অগ্রগতি নির্ণয়, প্রেরণা ও প্রতিযোগিতা তৈরি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, এমনকি, ক্রমাগত পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুরা সমস্যা সমাধান, সময় ব্যবস্থাপনা ও আত্মবিশ্বাসের মতো দক্ষতা অর্জন করে।

অন্যদিকে, বারবার পরীক্ষা, গ্রেড বা নম্বর দেয়ার কারণে শিশুদের মনের মধ্যে ভয়, উৎকণ্ঠা ও মানসিক চাপ তৈরি হয়।শিক্ষার আনন্দ কমে যায়, তুলনা ও হীনমন্যতা যা আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিতে পারে, এবং শুধু পরীক্ষায় ভালো করার জন্য পড়তে গেলে শিশুর কল্পনা, প্রশ্ন করার ক্ষমতা ও সৃজনশীল চিন্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ম্যাডাম ভাবেন, শেখাকে আনন্দময় করে তুলতে হলে মূল্যায়নকে সহায়ক প্রতিক্রিয়া ও সৃজনশীলতার সাথে মিলিয়ে নিতে হবে।

ম্যাডাম ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

“বাচ্চারা, আজ আমরা মূল্যায়ন নিয়ে কথা বলবো। প্রতিদিন তোমরা পরীক্ষা দাও, খাতা জমা দাও, শিক্ষকরা মার্ক দেন। এতে কী হয়?”

একজন ছাত্র লাজুক গলায় বললো, “ভয় লাগে ম্যাডাম। যদি কম নাম্বার পাই, সবাই হাসে।”

আরেকজন যোগ করলো, “ভালো করলে খুশি হই, কিন্তু সবসময়ই টেনশন থাকে।”

ক্লাস নিস্তব্ধ। রিনা ম্যাডাম একটু হাঁটলেন, তারপর বোর্ডে লিখলেন “মূল্যায়ণের চাপ ≤ শেখার আনন্দ”

ম্যাডাম বললেন,

“যখন আমরা শুধু লিখিত পরীক্ষা আর গ্রেড দেই, তখন সেটা অনেক সময় বোঝায় না আসলে কে কতটা শিখেছে। বরং অনেকেই ভয়ে চুপ হয়ে যায়, সৃজনশীল চিন্তা কমে যায়।”

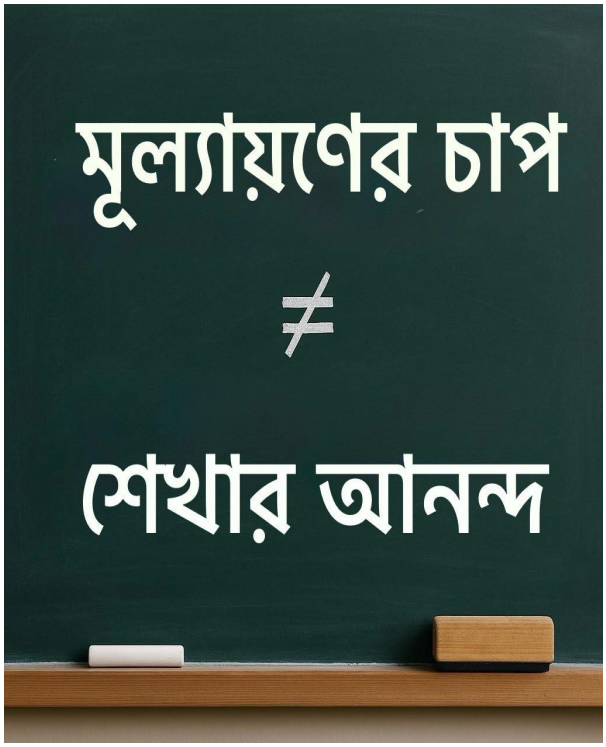

তিনি একটা উদাহরণ দিলেন:

“ধরো, তোমরা সবাই একটা কবিতা মুখস্থ করে এসেছো। পরীক্ষায় যদি আমি শুধু লিখতে বলি, সেটা মুখস্থের দক্ষতা দেখাবে। কিন্তু তোমরা কতোটা বুঝেছো কবিতার সৌন্দর্য, কতোটা অনুভব করেছো - তা বোঝা যাবে না।”

ম্যাডাম তাঁর ক্লাসে নতুন কিছু মূল্যায়ণের নিয়ম চালু করলেন।

১. সহপাঠী মূল্যায়ন – একজন অন্যজনের কাজ দেখে প্রশংসা বা ছোট পরামর্শ দেবে। এতে ছাত্রদের শেখা দ্বিগুণ হবে।

২. আত্ম-প্রতিফলন জার্নাল – প্রতিটি শিশু সপ্তাহে একবার লিখবে: “এই সপ্তাহে আমি কী শিখেছি? কোথায় আটকে গেছি? পরের সপ্তাহে কীভাবে উন্নতি করতে চাই?”

৩. সামগ্রীক মূল্যায়ন – খাতা-কলমের বাইরে, শিশুর আঁকা ছবি, বানানো মডেল, লেখা গল্প - সব একসাথে জমা হবে। এতে দেখা যাবে, একেকজনের অনন্য প্রতিভার রূপ।

৪. খেলা-ভিত্তিক মূল্যায়ন – ক্লাসে কুইজ-খেলা, ধাঁধা বা দলভিত্তিক প্রতিযোগিতা করা হবে, যেখানে সবাই হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে শিখবে।

৫. শিক্ষক-ছাত্র সংলাপ – শুধু খাতা দেখে নম্বর না দিয়ে, শিক্ষক ও ছাত্র মুখোমুখি ছোট্ট আলাপ করবে: “তুমি এই অংশটা কেমন বুঝেছো? কোথায় সাহায্য চাইছো?”

রিনা ম্যাডাম বোর্ড মুছে দিয়ে বললেন,

“মূল্যায়ন মানে ভয় দেখানো নয়, বরং তোমার ভেতরের শক্তি খুঁজে বের করা। সঠিকভাবে মূল্যায়ন দ্বারাই তোমরা নিজের পথ দেখতে পাবে।”

শ্রেণিকক্ষে হঠাৎ হাততালি শুরু হলো।

শিক্ষার্থীরা বুঝলো– মূল্যায়ন চাপের বোঝা নয়, বরং এটি হতে পারে আত্ম-আবিষ্কারের আয়না।

“আমার শরীর, আমার বিজ্ঞান”

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ নবম শ্রেণির জীববিজ্ঞান ক্লাস চলছে। ক্লাস নিচ্ছেন ডা. তাসনিম এম.বি.বি.এস। তিনি স্বপ্ন দেখেন একদিন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে জাতির সেবায় নিজেকে নিবেদন করবেন।

ম্যাডামের বিশ্বাস, স্বাস্থ্যই হলো সব কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। দেশের প্রশাসন কিংবা অর্থনীতি, যেখানেই কাজ হোক না কেন, সুস্থ শরীর আর সঠিক স্বাস্থ্যচেতনা ছাড়া উন্নয়ন অসম্ভব। তিনি মনে করেন, চিকিৎসাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রশাসনের ভেতরে থাকা জরুরি, কারণ জনগণের কল্যাণ মানেই সুস্বাস্থ্য।

ডা. তাসনিম ম্যাডাম বোর্ড এ বড় করে লিখলেন,

“জীবন পাঠ – কিন্তু জীবনের ভেতর থেকেই শুরু।”

ডা. তাসনিম ম্যাডাম বললেন,

“বইয়ের পাতায় তোমরা রক্ত, হরমোন, হৃৎপিণ্ড - সবই পড়ছো। কিন্তু বলো তো, এগুলো কেবল কাগজের অক্ষরে সীমাবদ্ধ, নাকি তোমাদের ভেতরেই বেঁচে আছে?”

ছাত্রছাত্রীরা চুপ করে তাকিয়ে রইল।

ম্যাডাম পকেট থেকে একটি ডিজিটাল মেশিন বের করলেন।

“এটা হলো ব্লাড প্রেসার মেশিন। আজ আমরা শিখব না শুধু রক্তচাপ কী, বরং আমার, তোমার, সবার শরীরে সেটি কত। পাঠ্যবই আর বাস্তব একসাথে আমরা যাচাই করবো।”

আয়শা নামের এক ছাত্রী সামনে এলো। মেশিনে দেখা গেল - ১২০/৮০ mmHg।

ম্যাডাম বললেন,

“এটাই হলো স্বাভাবিক মান। আজকের পাঠের মানে - রক্তচাপ কেবল একটি সংখ্যা নয়, এটি আমাদের শরীরের জীবনযাত্রার আয়না।”

এরপর একে একে পালস, শরীরের তাপমাত্রা, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার মাপা হলো।

ম্যাডাম বোর্ডে লিখলেন:

- রক্তচাপ: ১২০/৮০ mmHg
- হৃদস্পন্দন: ৭০–১০০ bpm
- শরীরের তাপমাত্রা: ৩৬.৮–৩৭± C
- শ্বাস-প্রশ্বাস: ১২–১৬ বার/মিনিট
- হিমোগ্লোবিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন - সব মান।

ম্যাডাম বললেন,

“বইয়ের পাতায় শুধু সংজ্ঞা পড়লে বিজ্ঞান অচল। কিন্তু যখন বুঝবে - এই সংখ্যাগুলো আমার শরীরের, তখন জীববিজ্ঞান হবে সত্যিকার জীবনের বিজ্ঞান।”

ডা. তাসনিম ম্যাডাম ক্লাসের বইয়ের পাঠ্যসূচির বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বাস্তব শরীরের সাথে জীববিজ্ঞানকে যুক্ত করালেন।

তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন,

“বইয়ের বাইরে একটা বড় শিক্ষা আছে - নিজের শরীরকে ভালোবাসতে শেখা। শরীরকে চেনা, বোঝা আর যত্ন নেওয়া। কারণ শরীর যদি সুস্থ থাকে, মনও সতেজ থাকে। মন ভালো থাকলে পড়াশোনায় মন বসে, কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে, আর আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।”

ক্লাসের শিশুরা নিঃশব্দে শুনছিল। তাদের চোখে পড়ল—জীববিজ্ঞান আসলে কেবল বইয়ের পাতার অক্ষর নয়; বরং নিজের শরীরের প্রতিটি শ্বাস, প্রতিটি স্পন্দনের ভেতরকার বিজ্ঞান।

ম্যাডামের কণ্ঠে দৃঢ়তা ভেসে উঠল,

“তোমরা যদি স্কুল থেকেই নিজের শরীরকে চিনতে শিখো, তবে একদিন নিজের ভেতরেই এক অদম্য শক্তি খুঁজে পাবে। এই শক্তিই তোমাদের দেবে আত্মতৃপ্তি, আত্মবিশ্বাস এবং ভবিষ্যতের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সাহস।”

ক্লাসের শেষে সবাই একসাথে শপথ করল -

“আমরা শুধু বই নয়, নিজের শরীরকে বুঝব। স্বাস্থ্য রক্ষা করব আর সুস্থ বাংলাদেশ গড়ব।”

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৮৭

“শিক্ষা-ই-শক্তি প্রকল্প”

ঢাকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ স্কুলে এসেছে এক ভিন্ন ধরনের শিক্ষক, প্রদীপ কুমার। তিনি একজন উচ্চপদস্থ নীতিনির্ধারক – শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব। সাধারণত তিনি প্রস্তাবনা, কাগজপত্র, রিপোর্ট আর সংখ্যার ওপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু আজ তিনি এসেছেন ৬ মাসের জন্য, শিক্ষক হয়ে শিক্ষকদের মাঝে মিলেমিশে যেতে। “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের বিশেষ ব্যবস্থায় তাকে পুরো এক টার্ম একজন শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে হবে। তিনি এখন সপ্তম শ্রেণির ইংরেজি শিক্ষক। এখানে বার্তাটি খুব শক্তিশালী - “যারা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তাদের কমপক্ষে এক পূর্ণ টার্ম একজন শিক্ষকের মতো বেতন নিয়ে ক্লাসে দাঁড়াতে হবে।” এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাস্তবতার সাথে সংযোগ স্থাপনের দাবি। তবেই বোঝা যাবে “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও আনুষঙ্গিক দিক গুলো।

প্রদীপ স্যার প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলেন। প্রায় কুড়ি জন ছাত্রছাত্রীর ভিড়, সবার ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বোঝাপড়া, কারও খাতা নেই, কারও চোখে ক্লান্তি, আবার কেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশ্ন করছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোর্ডে লিখে, পড়িয়ে, তাদের মনোযোগ ধরে রাখা - এটা যে কত কঠিন কাজ, তিনি তখনই বুঝলেন। এর পর আছে ছাত্রদের মূল্যায়ন করা, নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। শিক্ষকরা স্কুলে এসে তাঁদের ক্লাসের প্রস্তুতি নিতে পারেন না, ক্লাস আর ছাত্রদের সঙ্গেই কেটে যায় সময়, ক্লাসের প্রস্তুতি নিতে হয় স্কুল সময়ের পরে, প্রদীপ স্যার বুঝলেন একজন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবকে ও এতোটা সময় ও মেধা ব্যয় করতে হয় না।

একদিন বিকেলে স্টাফ রুমে বসে তিনি বললেন,

“আমরা ফাইলে সই করি, বাজেট তৈরি করি, নীতিমালা লিখি। কিন্তু এখানে এসে বুঝলাম- শিক্ষা হলো জীবন্ত মানুষ গড়ার কাজ। কাগজে যত সুন্দর পরিকল্পনাই থাকুক না কেন, যদি তা ক্লাসরুমে টিকে না থাকে তবে তা অর্থহীন।” ৬ মাস শেষে তিনি লিখলেন এক রিপোর্ট, “নীতিনির্ধারকের ছয় মাসের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে”

সূচনা:-

এতদিন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতাম কেবল কাগজে-কলমে, রিপোর্ট, তথ্য, পরিসংখ্যান, বিদেশি উদাহরণ, প্রকল্প কনসেপ্ট নোট। নীতিনির্ধারক যদি মাটির ঘ্রাণ না জানে, তবে নীতি কখনো শেকড় গাঁথবে না। শিক্ষা নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবে, তাকে অন্তত একবার শিক্ষকের জুতো পরে হাঁটতে হবে। তবেই বোঝা যাবে শিক্ষার আসল শক্তি আর শিক্ষকের প্রকৃত মূল্য। কিন্তু “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের আওতায় গত ছয় মাস আমি একজন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছি। সপ্তম শ্রেণির ইংরেজি ক্লাস নিয়েছি, পরীক্ষা নিয়েছি, খাতা দেখেছি, অভিভাবকের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি, স্কুল স্টাফদের সমস্যায় কাঁধ মিলিয়েছি। এই অভিজ্ঞতা আমার চোখ খুলে দিয়েছে। এখন বুঝি - শিক্ষা কাগজের নীতি নয়, শিক্ষা হলো জীবন্ত মানুষ গড়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ।

সুপারিশ:-

ক. শ্রেণিকক্ষ:- শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, ক্লাস সাইজ সীমিত করা, এবং স্কুল-পরবর্তী সময়ের কাজের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে।

খ. মূল্যায়ন ও পরীক্ষা ব্যবস্থা:- পরীক্ষাভিত্তিক মূল্যায়নের পাশাপাশি অবিরাম শিখনমূলক মূল্যায়ন (continuous assessment) চালু করতে হবে।

গ. শিক্ষকের মর্যাদা ও সম্মান:- শিক্ষককে জাতি গড়ার কারিগর হিসেবে সম্মান দিতে হবে। তাঁদের আর্থিক নিরাপত্তা, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের বিশেষ সুবিধা থাকতে হবে।

ঘ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া:- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি নীতিনির্ধারককে বছরে অন্তত ১ টার্ম একজন শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে হবে। সকল নীতি প্রণয়নের আগে শিক্ষকদের প্রতিনিধি ও শিক্ষার্থীদের মতামত বাধ্যতামূলকভাবে শোনা উচিত। স্কুলের বাজেট নির্ধারণ করতে হবে “শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা”র ভিত্তিতে, শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে নয়।

৩. উপসংহার:-

এই ছয় মাস আমাকে শিখিয়েছে এক মহান সত্য, “শিক্ষার সিদ্ধান্ত কাগজে নয়, শিক্ষকের ঘামে আর ছাত্রের চোখে যেন লেখা হয়।” শিক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে শিক্ষকের কষ্ট, ক্লাসরুমের বাস্তবতা আর ছাত্রের নিরলস চোখের জিজ্ঞাসা বোঝা আবশ্যক। যে নীতিনির্ধারক এই অভিজ্ঞতার স্বাদ পায়নি, সে কখনো সত্যিকার অর্থে শিক্ষার নীতি লিখতে পারে না।

নীতিনির্ধারকরা যদি মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা অনুভব করেন, তবে শিক্ষা ব্যবস্থা বদলাতে শুরু করবে। শিক্ষক শুধু নীতির ভুক্তভোগী নয়, তিনি পরিবর্তনের চালক।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৮৬

“একলা চলো রে”

সুনামগঞ্জ জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ নবম-দশম শ্রেণির বিশেষ আয়োজন – “প্রেরণা দিবস” বা “Motivation Day”। অডিটোরিয়ামে বসে আছে শিক্ষার্থীরা। মঞ্চে উঠলেন তরুণ উদ্যোক্তা – জুবায়ের ভাই। বয়স খুব বেশি না, কিন্তু নিজের স্টার্টআপ দিয়ে দেশের নাম করেছেন বিদেশে।

তিনি কথা শুরু করলেন, “সফলতা মানে সবসময় ভিড়ের সাথে চলা নয়। বরং অনেক সময় একা পথ হাঁটতে হয়। তোমরা লক্ষ্য করবে - কেউ কবিতা লিখছে একা একা, কেউ গান গাইছে নিজের ঘরে, কেউ অংকের সূত্র বা জ্যামিতির প্রমাণ নিয়ে বসে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা, কেউ মাঠে একা অনুশীলন করছে। এগুলো এক ধরনের একলা পথচলা।”

তিনি একটু থেমে বললেন - “তোমরা কি জানো, রবীন্দ্রনাথের সেই গান - ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।’ এ গান শুধু গান নয়, এটা জীবনের দিশারি। একা নিজের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। একা মানে একাগ্রতা, তখন তুমি তোমার শক্তি, তুমি যখন বিশ্বাস করো তুমি পারবে তখন তুমি অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়েছো। অন্ধকারে আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকানির মতো তোমার একাগ্রতা, তোমার পরিশ্রম, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে পথ দেখাবে।মনে রেখো, সুযোগ আসে না, তুমি সেগুলি তৈরি করো।”

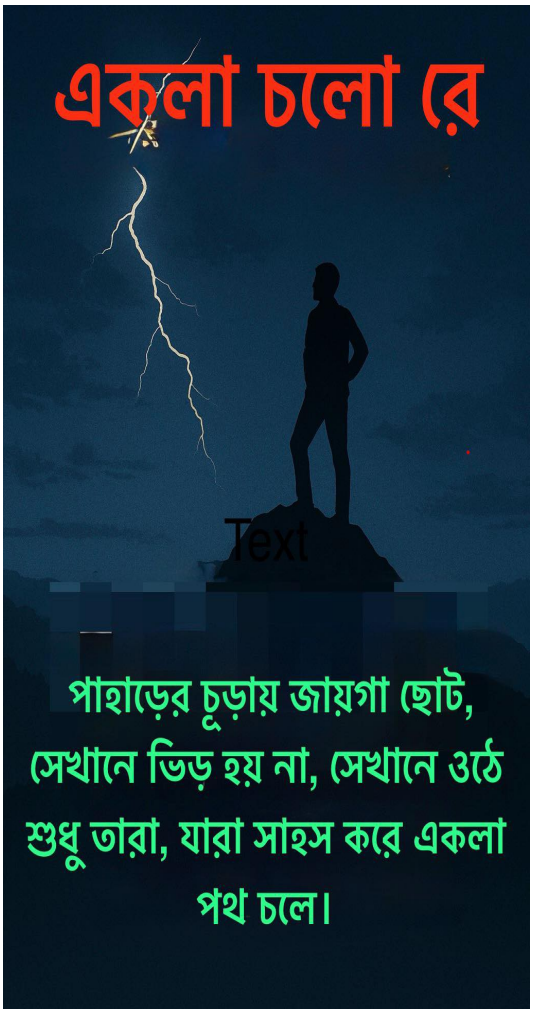

অডিটোরিয়াম একেবারে চুপ। ছাত্রছাত্রীরা গভীর মনোযোগে শুনছে।

জুবায়ের ভাই আবার বললেন,

“যদি তুমি কখনো একা না থাকো, তাহলে তুমি নিজেকে জানতে পারবে না। তোমরা এখন নবম-দশম শ্রেণিতে। এ বয়সেই তোমরা নিজের ভেতরের প্রতিভা খুঁজে পাবে। সেই প্রতিভা যে গান, কবিতা, বিজ্ঞান, গণিত, খেলাধুলা বা যে কোনো কিছুই হোক না কেন - তার যত্ন নিতে হবে। কিন্তু মনে রেখো, পাহাড়ের চূড়ায় জায়গা ছোট, সেখানে ভিড় হয় না। সেখানে ওঠে শুধু তারা, যারা সাহস করে একলা পথ চলে একাকীত্ব একা থাকার গৌরব প্রকাশ করে।”

শেষে সবাই দাঁড়িয়ে হাততালি দিল।

আর অনেকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল - “ভিড়ের সাথে নয়, আমি একলা চলতে শিখবো। কারণ সত্যিকারের আলো জ্বলে একলার পথেই।”

“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের নতুন স্যার এবার বললেন, “মনে রেখো, সাফল্যের লিফটটি নষ্ট, তোমাকে এক ধাপ করে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে।” স্যার, “প্রেরণা দিবস” থেকে ছাত্রদের জন্য কিছু করণীয় নিয়ে এলেন:-

১. নিজেকে খুঁজে বের করো – প্রতিভা মানে দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে রাখা এবং তাতে আনন্দ খুঁজে পাওয়া। আমরা প্রতিভা থেকে এমন কাজ করতে সক্ষম, যা আমাদের নিজেদেরকে অবাক করে দেবে। মনে রেখো, “তোমার প্রতিভা হলো তোমাকে সৃষ্টিকর্তার উপহার, তুমি এটা দিয়ে যা করবে তা হলো সৃষ্টিকর্তাকে তোমার প্রতিদান।”

২. একলা অনুশীলন শিখো – বন্ধুদের সাথে মজা করবে, খেলবে, কিন্তু নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য একা বসে অনুশীলনের সময় রাখবে। মনে রেখো, আমরা করে শিখি।

৩. ভয় পেও না – অন্যরা তোমাকে বুঝবে না বা পাশে থাকবে না, তবুও একা এগিয়ে যাবে।

৪. প্রতিদিন কিছু ছোট লক্ষ্য পূরণ করো – যেমন, প্রতিদিন ১০টা গাণিতিক সমস্যা সমাধান, ১ পৃষ্ঠা লেখা, ৩০ মিনিট ব্যায়াম, বা ৫ মিনিট গান/সঙ্গীত অনুশীলন।

৫. একলা থাকলেও নোট রাখো – প্রতিদিনের চিন্তা, আইডিয়া, বা শেখা বিষয় লিখে রাখলে নিজের ভেতরের অগ্রগতি দেখতে পাবে।

জীবনের ভিড়ে সবাই একসাথে হাঁটে, কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টি করে তারা-ই, যারা সাহস করে একা চলতে পারে। একা মানেই দুর্বলতা নয় – একা মানে নিজের প্রতি বিশ্বাস, একাগ্রতা আর অবিরাম পরিশ্রম। অন্ধকার যত গভীর হোক, তোমার ভেতরের আলোকই পথ দেখাবে। মনে রেখো, সফলতার চূড়ায় সবসময় ভিড় হয় না।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৮৯

"পড়া ও বোধগম্যতা"

দিনাজপুর জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ নবম শ্রেণির বাংলা ক্লাসে শিক্ষক হুমায়ুন স্যার পাঠ দিচ্ছেন। তিনি নিজে বাংলার ছাত্র, প্রতিদিনই পড়েন বিভিন্ন প্রকারের বই—গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা। প্রতিটি বই যেন তাকে নিয়ে যায় একেকটি নতুন জগতে। স্যারের বিশ্বাস, "একজন পাঠক মৃত্যুর আগে হাজার হাজার জীবন বেঁচে থাকে, কিন্তু যে কখনও পড়ে না, সে কেবল একটি জীবনই বাঁচে।" তিনি ছাত্রদের বললেন, "পড়া মানে সময়ের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করা - কখনও ইতিহাসের অতীতে, কখনও ভবিষ্যতের স্বপ্নে। তাই বই পড়াকে শুধু পড়াশোনার কাজ হিসেবে দেখো না, এটিকে দেখো জীবনের এক মূল্যবান উপহার হিসেবে। প্রতিটি বই তোমাদের জন্য একেকটি নতুন দিগন্ত খুলে দেয়।"

স্যার ছাত্রদের মাঝে বই থেকে অনুভূতির সঞ্চালন করানোর চেষ্টা করলেন, "তোমরা হয়তো কারো মুখে শুনেছো- 'নদীভাঙন মানুষের ঘরবাড়ি কেড়ে নেয়।' কিন্তু যদি শুধু শোনো, তার ভেতরকার যন্ত্রণা তুমি বোঝো না। যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' পড়বে, তখন বুঝবে নদী শুধু ভাঙন নয়, মানুষের জীবিকা, সংগ্রাম আর আশা–আকাঙ্ক্ষার গল্প। কাছ থেকে দেখবে অনুভব করবে 'কীর্তিনাশা' বা রাক্ষুসী পদ্মাকে সাথে দীনহীন অসহায় মানুষের ক্ষুধা আর দারিদ্রের সাথে লড়াই। নিজেকে সর্বজনীন করবার জন্য দরকার আছে উপন্যাস পড়ার।"

তিনি ছাত্রদের একটি ছোট অনুচ্ছেদ পড়তে দিলেন, "বই শুধু তথ্য দেয় না, বই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়। যেমন, আমরা শুনি স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু জাহানারা ইমাম রচিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ "একাত্তরের দিনগুলি" বা "শহীদ জননী" পড়লে বোঝা যায়, স্বাধীনতা মানে শুধু রাজনীতি নয়, মানুষের রক্ত, অশ্রু আর আত্মত্যাগ।"

স্যার বললেন,"এখন বলো, এই অনুচ্ছেদ থেকে কী শিক্ষা নিলে?" শাফিন বলল, "স্যার, শুধু শুনে আমরা জানি কী ঘটেছে, কিন্তু পড়লে বুঝতে পারি কেন ঘটেছে আর মানুষের জীবনে তার প্রভাব কী।" মিথিলা বলল, "উপন্যাস বা আত্মজীবনী পড়লে আমরা ইতিহাসের ভেতরের মানুষটাকে দেখতে পাই।"

স্যার গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঠিক তাই। বই শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, জীবনের জন্য পড়তে হয়। উপন্যাস, গল্প, আত্মজীবনী পড়লে তোমাদের চিন্তা গভীর হবে, অনুভূতি সমৃদ্ধ হবে। শোনা অনেক সময় কানে ঢুকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু পড়া আর বোধগম্যতা মনের ভেতর আলো জ্বালায়।"

"তোমাদের জন্য আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের গল্প উপন্যাস পরে সেই ১৯৭১ এর মার্চ-ডিসেম্বর রে ফিরে যাওয়া হবে, আত্মসচেতনতা। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'পথের দাবী' উপন্যাসে পাবে ব্রিটিশরা কেন এই বই নিষিদ্ধ করেছিলো। বিপ্লবী সব্যসাচী ও তার সঙ্গীদের সংগ্রামের একটি সাহসী রাজনৈতিক কাহিনী। যা, পাঠকদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তৈরি করে এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে, যা ব্রিটিশ প্রশাসন সহ্য করতে পারেনি। চলে যেতে চাও সেই দিনগুলোতে ১৯২৬ সালে, যখন আমরা ব্রিটিশ এর পরাধীন ছিলাম। মনে রেখো, ইতিহাসে অনেক সময় নাম ঠিক থাকে, ঘটনা ভুলে যাই। কিন্তু সাহিত্যে হয়তো নাম পাল্টে যায়, অথচ ঘটনার সত্য কখনো হারায় না।"

ক্লাস শেষে স্যার একটা চ্যালেঞ্জ দিলেন—

"এই সপ্তাহে তোমরা প্রত্যেকে একটি গল্প বা উপন্যাস পড়বে। শুধু কাহিনি নয়, ভেতরের শিক্ষা লিখে আনবে। মনে রেখো, বই পড়া মানে কেবল জানা নয়, নিজেকে গড়ে তোলা।"

শোনা আমাদের কানে আসে, কিন্তু সহজেই হারিয়ে যায়। পড়া আমাদের চোখে আসে, কিন্তু সত্যিকার শক্তি পায় যখন তা বোধগম্যতায় পৌঁছায়। গল্প, উপন্যাস, কবিতা বা আত্মজীবনী, এসব শুধু বিনোদন নয়, এগুলো হলো অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। বই আমাদের অন্যের জীবন বাঁচতে শেখায়, কষ্ট আর সংগ্রাম অনুভব করতে শেখায়, নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। তাই ছাত্রজীবনে বই পড়া কোনো বোঝা নয়, বরং এক মহামূল্যবান সুযোগ। যে যত বেশি পড়বে, সে তত বেশি জীবনকে বুঝতে শিখবে।

“প্রাথমিক অর্থনীতি”

চট্টগ্রাম জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান ক্লাসে নতুন আলোচনার সূচনা হলো - বিষয়: “প্রাথমিক অর্থনীতি।” ক্লাস নিচ্ছেন তরুণ শিক্ষক সালেহীন স্যার। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, ছোটবেলা থেকেই অর্থ ব্যবস্থাপনা শেখানো প্রয়োজন, কারণ “টাকা হলো সারের মতো, এটিকে শেষ হয়ে যেতে দেওয়া যাবে না, কিন্তু এটিকে আবার বাগানের প্রধান লক্ষ্যও হতে দেওয়া যাবে না।” এখানে, একটা বড় উদ্দীপনা আছে ছাত্রদের জন্য, “তুমি যত বেশি শিখবে, তত বেশি আয় করবে।” স্যার বোর্ডে লিখলেন চারটি শব্দ: আয় – ব্যয় – সঞ্চয় – সিদ্ধান্ত

“বাচ্চারা, ভাবো তোমরা প্রতিদিন ১০ টাকা পকেট মানি পেলে। যদি পুরোটা খরচ করে ফেল, সঞ্চয় থাকবে না। আবার যদি সবটাই জমাও, জীবনের আনন্দ হারাবে। তাই বুদ্ধিমত্তা হলো - • আয় থেকে প্রথমে কিছুটা সঞ্চয় করো, • তারপর প্রয়োজনীয় খরচ করো, • আর শেষে বিচারিক সিদ্ধান্ত করো, খরচটা সঠিক হলো কি না।”

তিনি উদাহরণ দিলেন: “তোমরা যদি ১০ টাকা থেকে ২ টাকা জমাও, এক মাসে ৬০ টাকা হবে। ছয় মাসে হবে ৩৬০ টাকা। এটা ব্যাংকে রাখলে মুনাফা পাবে, আবার নিরাপদও থাকবে।” স্যার জানালেন, “এই বছর তোমাদের প্রত্যেকের একটি করে ছাত্র-অ্যাকাউন্ট সোনালী ব্যাংকে খোলা হবে। ব্যাংকের কর্মকর্তারা নিজেরাই স্কুলে আসবেন আগামীকাল। তোমরা ৫০-১০০ টাকা জমা দিয়ে শুরু করবে। তোমাদেরকে ব্যাংক কি ভাবে কাজ করে, ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানাবেন এবং তোমার নামে অ্যাকাউন্ট এর বই দিবেন। তোমরা online এ তোমাদের একাউন্ট এর সব তথ্য দেখতে পাবে।” শিক্ষার্থীরা উচ্ছাসে হাততালি দিল।

এরপর স্যার হাতে একটি ৫০০ টাকার নোট তুলে ধরলেন। সবাই বিস্ময়ে তাকাল। “তোমরা কি জানো, নোটের ভেতরে থাকে নিরাপত্তা চিহ্ন - ওয়াটারমার্ক, সিকিউরিটি থ্রেড, মাইক্রোপ্রিন্ট। এগুলো দেখে বোঝা যায় আসল নাকি নকল। স্যার সঙ্গে একটা ইনফরেড (Infrared (IR)) টর্চ এনেছিলেন, সেটা দিয়ে টাকার সিকিউরিটি থ্রেড দেখালেন। জানালেন টাকায় অন্ধদের বুঝবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। টাকার সম্মান মানে দেশের সম্মান। আর দেশের টাকা বিশ্বের অন্যান্য মুদ্রার সঙ্গে তুলনা করা হয় ডলারের মাধ্যমে - যা বৈশ্বিক অর্থনীতি। এজন্য অর্থনীতিকে বলে ‘জাতির শক্তির প্রতীক’।”

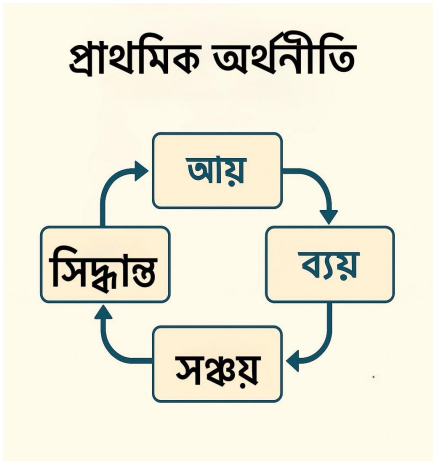

স্যার ক্লাসে কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দিলেন,

১. ডায়েরি লেখা: প্রতিদিন পকেট মানি কত পেল, কত খরচ করলে, কত সঞ্চয় করলে, তা লিখে রাখো।

২. প্রশ্নোত্তর:

• কেন টাকা ছাপানোর জন্য বিশেষ কাগজ ব্যবহার করা হয়?

• মুদ্রার নিরাপত্তা চিহ্ন কয়টি জানো?

• কেন সঞ্চয় জরুরি?

৩. প্রজেক্ট:

• একটি দেয়াল পত্রিকা “প্রাথমিক অর্থনীতি”।

সালেহীন স্যার বললেন, “টাকা নদীর মতো। যদি তা শুধু খরচ করো, নদী শুকিয়ে যাবে। যদি শুধু জমাও, নদী স্থির হয়ে যাবে। কিন্তু সঠিক বিচার-বিবেচনায় খরচ ও সঞ্চয় করলে নদী চলবে, সমাজকে সজীব করবে। মনে রেখো, টাকা তোমাদের কাছে শুধু কেনাবেচার মাধ্যম নয়, দায়িত্বের প্রতীক। একদিন তোমরাই দেশের অর্থনীতির চালক হবে।”

প্রাথমিক অর্থনীতি শেখা মানে কেবল টাকা গোনা নয়, বরং দায়িত্বশীলভাবে জীবন যাপন শেখা। আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও সঠিক সিদ্ধান্ত, এই চারটি নিয়ম ছোটবেলা থেকেই মেনে চললে ভবিষ্যতে তারা শুধু নিজের পরিবার নয়, দেশের অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করতে পারবে। টাকার মূল্য যেমন ব্যক্তিগত জীবনে নিরাপত্তা আনে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা আনে। তাই শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের শিক্ষা হলো - টাকা খরচ করার আগে ভাবো, সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ গড়ো, আর প্রতিটি সিদ্ধান্ত নাও বিবেচনা করে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৯১

“দূরের আলো”

গাইবান্ধা জেলার সীমান্তঘেঁষা এক প্রত্যন্ত গ্রাম। চারপাশে কাশফুলে ভরা মাঠ, মাঝখানে ছোট্ট নদী আর তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটি মাটির স্কুল, “কাঞ্চনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।” বর্ষার সময় স্কুলের মাঠ ডুবে থাকে হাঁটু পানিতে, বৃষ্টির পর ছাদের টিনে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে টপটপ শব্দ করে, তবুও সকাল হলে শিশুরা বই বুকে চেপে দৌড়ে আসে। কারণ একটাই, আজও দেখা হবে রফিক স্যার-এর সঙ্গে।

রফিক স্যার কেবল শিক্ষক নন, তিনি এই গ্রামের শিশুদের কাছে গল্পকার, কবি, জাদুকর। তিনি প্রতিটি বাচ্চাকে আলাদা করে চিনেন – যদি বলেন, “আজ তোমাকে রাজপুত্রের মতো লাগছে,” তবে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাগ থেকে বের হয় সোনালী কাগজে বানানো ছোট্ট মুকুট। যদি বলেন, “তুমি হিরো!” তবে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বানানো বল পেন হাতে দেন। আর যদি বলেন, “তুমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, গর্বিত!” তবে তার হাত থেকে মেলে একটি ফুল, যা তিনি প্রতিদিন নিজের উঠানের গাছ থেকে তুলে আনেন।
আজ ৫ অক্টোবর - বিশ্ব শিক্ষক দিবস। ক্লাস ফাইভের রাশেদ সকালে ঘাসভেজা পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে স্কুলের ফটকে, হাতে নিজে বানানো কাগজের ফুল।

“স্যার আসছে!” চিৎকার করে উঠতেই ছোট ছোট বাচ্চারা দৌড়ে গেল নদীর ঘাটের দিকে। দূর থেকে দেখা গেল, কুয়াশার ভেতর নৌকা ভেসে আসছে ধীরে ধীরে। তাতে বসে আছেন রফিক স্যার -

চোখে পুরু চশমা, কাঁধে পুরোনো ব্যাগ, তাতে কিছু খাতা, চক, আর লাল কাপড়ে মোড়ানো টিফিনবক্স। নৌকা ঘাটে পৌঁছতেই রাশেদ দৌড়ে গিয়ে স্যারের ব্যাগটা নিয়ে বলল, “স্যার, আজ আমরা একটা সারপ্রাইজ রাখছি!”
রফিক স্যার মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, “তোমরাই তো আমার সারপ্রাইজ, রে বাচ্চারা।
তোমরা যখন শেখো, ভাবো, হাসো - ওটাই তো আমার পুরস্কার।”

ক্লাসরুমে ঢুকতেই শিশুরা একসাথে গাইল - “গুরু বিনা জ্ঞানো নহে, গুরু বিনা গতি…”
তাদের কণ্ঠে ছিল ভালোবাসা, ছিল কৃতজ্ঞতা।
শেষে উঠে দাঁড়াল ছোট্ট পারুল, চোখে উজ্জ্বল জল। সে কাঁপা গলায় বলল, “স্যার, আমরা জানি, আপনি ভোরে দুই মাইল হেঁটে আসেন। অনেক দিন আপনাকে দেখি ভিজে কাপড়ে, তবুও হাসিমুখে পড়ান। আপনি কখনও বলেন না, ‘আজ পড়াবো না।’ আমরা শুধু বলতে চাই - আপনি আমাদের জীবনের প্রথম হিরো।”

সেই মুহূর্তে পুরো ক্লাসরুমে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। কেবল বাতাসে ভেসে বেড়ালো চক ঘষার গন্ধ আর শিশুদের নিঃশ্বাসের উষ্ণতা। রফিক স্যার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন - চোখের কোণে অশ্রু, মুখে এক প্রশান্ত, তৃপ্ত হাসি।

বাইরে তখন সূর্য উঠছে মেঘের ফাঁক দিয়ে। আলো এসে পড়ছে ক্লাসের ফাটল ধরা দেয়ালে, যেন প্রকৃতিই বলছে -
“এই মানুষগুলোর কারণেই পৃথিবী এখনও আলোকিত।”

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি প্রান্তে,
এমনই হাজারো রফিক স্যার আছেন - যাদের নাম কেউ জানে না, কিন্তু যাদের ভালোবাসা প্রতিদিন আলোকিত করে একেকটি শিশুর মন।
শিক্ষক দিবস কেবল শহরের অনুষ্ঠান নয়, এটি সেই মাটির গল্প, যেখানে একজন শিক্ষক নিজের জীবনের আলো দিয়ে অন্যের জীবন জ্বালান।

“ফুল, মৌমাছি ও ভবিষ্যৎ”

ময়মনসিংহ জেলার সোনার বাংলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। রুপা ম্যাডাম আজ পঞ্চম শ্রেণির বিজ্ঞান ক্লাস নিচ্ছেন। টেবিলের ওপর আছে রঙিন ফুল, ছোট কাচের বোতল, আর একটি স্বচ্ছ প্লাস্টিক ব্যাগে রাখা কিছু ভেজানো বীজ। ক্লাসে ঢুকেই ম্যাডাম বললেন, “তোমরা কি জানো, পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীব কে?”সবাই চুপ। কেউ বলল, “মানুষ!” ম্যাডাম হেসে বললেন, “না বাচ্চারা, বিজ্ঞানীরা বলছেন - পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী হলো মৌমাছি! কেন জানো, যদি পৃথিবীর বুক থেকে মৌমাছি অদৃশ্য হয়ে যায়, তাহলে মানুষের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য আর মাত্র চার বছর বাকি থাকবে।”

ম্যাডাম বোর্ডে বড় করে লিখলেন:

পরাগায়ন (Pollination)

তিনি হাতে থাকা ফুলটি ঘুরিয়ে দেখালেন, “দেখো, এই ফুলের ভেতরের পরাগ (pollen) এক ফুল থেকে আরেক ফুলে পৌঁছায় মৌমাছির ডানায় ভর করে। এই কাজ না হলে ফল বা বীজ হতো না। তাইতো বলে, মৌমাছির গুঞ্জন হলো বাগানের কণ্ঠস্বর।”

তারপর তিনি একটি ছবি দেখালেন,

একটি মৌমাছি সূর্যমুখী ফুলে বসে আছে।

“এই ছোট্ট প্রাণীটি না থাকলে, তোমাদের খেতে পাওয়া আম, জাম, লিচু, আপেল, ডাল, সরিষার তেল এমনকি চকোলেটও বন্ধ হয়ে যেত!”

“শুধু তাই নয়, কৃষিকাজের বাইরেও, মৌমাছি বন্য উদ্ভিদের পুনরুৎপাদন এবং জীববৈচিত্র্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।”

এবার ম্যাডাম বোর্ডে লিখলেন কয়েকটি তথ্য:

মৌমাছির গুরুত্ব (Bees are the heroes!)

১. পৃথিবীর ৭৫% ফুলগাছ পরাগায়নের জন্য মৌমাছির ওপর নির্ভরশীল।

২. প্রায় ৩৫% খাবার যা মানুষ খায় - ফল, শাকসবজি, ডাল, বাদাম সব মৌমাছির পরিশ্রমের ফল।

৩. প্রতি বছর পৃথিবীতে মৌমাছি ৫০০ বিলিয়ন ডলারের খাদ্য উৎপাদনে অবদান রাখে।

৪. কিন্তু গত ২০ বছরে মৌমাছির সংখ্যা কমে গেছে প্রায় ৪০% - কীটনাশক, ধোঁয়া আর গাছ কাটার কারণে।

ম্যাডাম একটু থেমে বললেন, “তোমরা কি বুঝতে পারছো, যদি মৌমাছি হারিয়ে যায়, আমরা একদিন খাবারও পাবো না?” তারপর ম্যাডাম প্রত্যেক ছাত্রকে একটা করে স্বচ্ছ প্লাস্টিক ব্যাগ দিলেন, যেখানে কিছু মুগডাল বীজ আছে। বললেন, “বীজে একটু পানি দেবে, ব্যাগের মুখ বন্ধ করে জানালার পাশে ঝুলিয়ে রাখবে। কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি দেখবে - বীজ ফেটে শিকড় গজাচ্ছে, কান্ড বেড়ে উঠছে। এভাবেই জীবন শুরু হয় - ফুল, মৌমাছি আর বীজ মিলেই পৃথিবী বাঁচায়।”

ক্লাসের শেষে সবাই একসাথে বলল - “আমরা ফুল রোপণ করব, মৌমাছি রক্ষা করব, আর প্রকৃতিকে ভালোবাসব।”

রুপা ম্যাডাম মৃদু হেসে বললেন, “যে শিশু ফুল আর মৌমাছির মূল্য বোঝে, সে-ই একদিন পৃথিবীকে রক্ষা করবে।”

সেদিন ক্লাস শেষে বাচ্চারা স্কুলের বাগানে গিয়ে ছোট ছোট গাছের চারা রোপণ করল। জানালার পাশে ঝুলছে তাদের স্বপ্নভরা ব্যাগ - যেখানে বীজের ভেতর জন্ম নিচ্ছে নতুন জীবন। বাতাসে ভেসে আসছে ফুলের গন্ধ আর মৌমাছির গুঞ্জন। যেন প্রকৃতি নিজেই বলছে, “তোমরা যদি আমাকে রক্ষা করো, আমিও তোমাদের জীবন রক্ষা করব।”

এইভাবেই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মনে জন্ম নিল পৃথিবী রক্ষার প্রথম অঙ্কুর, একটি ফুল, একটি মৌমাছি, আর একটি জেগে ওঠা সচেতনতা থেকে।

“কেরাম বোর্ড ও নিউটনের সূত্র”

নওগাঁ জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ দশম শ্রেণির বিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষক রফিকুল স্যার, যিনি হৃদয়ে ও চিন্তায় সত্যিকারের পদার্থবিজ্ঞানের মানুষ। তাঁর বিশ্বাস, আমাদের চারপাশের প্রতিটি জিনিসেই বিজ্ঞানের উপস্থিতি রয়েছে; সৃষ্টিকর্তা যেন নিজ হাতে নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রেখেছেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে।

আমরা যা দেখি, শুনি কিংবা অনুভব করি, সবই বিজ্ঞানের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। স্যার সবসময় বলেন, “চোখ খোলো, মন খোলো - তবেই বিজ্ঞানকে দেখা যায়।” তিনি মনে করেন, বিজ্ঞানের জ্ঞান বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়; এটি প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা এক অনন্ত সত্য। ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত একটি ভুল ধারণা - বিজ্ঞান মানেই কঠিন সূত্র ও জটিল অঙ্ক - এই ধারণাটাই তিনি বদলে দিতে চান।

নিউটনের সূত্র শেখানোর আগে রফিকুল স্যার এক অভিনব ঘোষণা দিলেন - “এই সপ্তাহে আমরা কেরাম বোর্ড অনুশীলন করব, আর সপ্তাহের শেষে হবে প্রতিযোগিতা!”

পড়ার বদলে খেলার খবর শুনে ক্লাসে উচ্ছ্বাসের ঝড়। কয়েকদিনেই অনেকেই খেলায় পাকা হয়ে গেল।

প্রতিযোগিতার শেষে স্যার ক্লাসে আনলেন তাঁর নিজস্বভাবে তৈরি করা “Physics Carrom Board” - রঙিন ঘুঁটি, কোণ চিহ্ন, আর ছক করে আঁকা কয়েকটি রেখা।

স্যার হাসলেন, “আজ বই খুলবে না। আজ আমরা নিউটনের সূত্র খুঁজব এই বোর্ডের ভেতর!”

প্রথম সূত্র: জড়তা (Inertia)

স্যার বোর্ডে রাখলেন স্ট্রাইকার।

“না ঠেললে এটি স্থির থাকবে, আর একবার ঠেললে চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঘর্ষণ বা বাধা না আসে।”

দ্বিতীয় সূত্র: F = ma

স্যার আঘাত করলেন; ঘুঁটি গড়িয়ে গেল দূরে।

“বল যত বেশি, ত্বরণ তত বেশি। শক্তি ছাড়া গতি নেই।”

তৃতীয় সূত্র: Action–Reaction

সাবিহা এক ঘুঁটি দিয়ে আরেক ঘুঁটিকে আঘাত করল। প্রথমটি সামান্য পেছালো, দ্বিতীয়টি এগিয়ে গেল। স্যার বললেন, “দেখলে, সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া— নিউটনের তৃতীয় সূত্র।”

শেষে স্যার দেখালেন Angular Velocity ও Rebound।

“কোণ যত কম, প্রতিফলন তত নিখুঁত। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র শুধু মহাকাশে নয়, এই বোর্ডের চার কোণেও কাজ করে।”

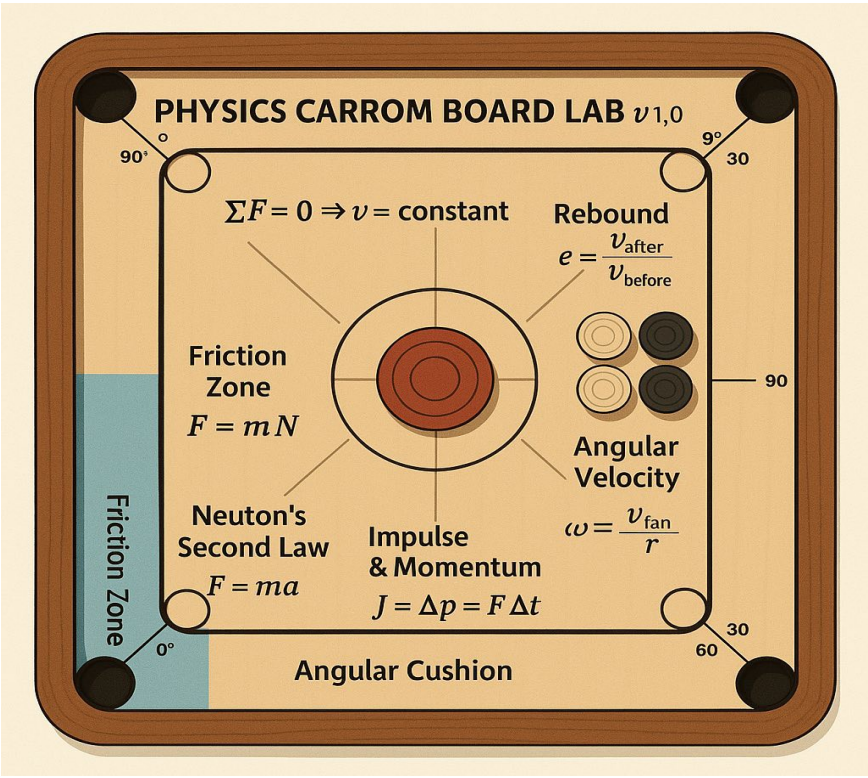

এরপর স্যার বানালেন একটি “Carrom Lab Manual” - আটটি পরীক্ষা নিয়ে। ছাত্ররা আনন্দে হাততালি দিল। কেউ পরিমাপ করছে, কেউ সময় নিচ্ছে।

স্যার বললেন,

“সূত্র শুধু মুখস্থ করার নয়, জীবনের প্রতিটি খেলায় তার প্রমাণ খুঁজে বের করো। আজ থেকে বইয়ের বাইরে চোখ খোলো - পৃথিবীটাই তোমাদের ল্যাবরেটরি।”

এরপর থেকে স্কুলের বিজ্ঞান ল্যাবের নতুন নাম - ‘কেরাম ল্যাব’।

সেখানে খেলা মানে শুধু বিনোদন নয় - গতি, বল, ঘর্ষণ ও শক্তির পাঠ।

ছাত্ররা বলে,

“আমরা এখন শুধু পদার্থবিজ্ঞান পড়ি না, খেলেও বুঝি, নিউটনের সূত্র শুধু বইয়ে নয়, প্রতিটি আঘাতে, প্রতিটি প্রতিফলনে, আমাদের হাতের শক্তিতেও লুকিয়ে আছে।”

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৯২

“বিশ্বাসের বাক্স”

টাঙ্গাইল জেলার কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আজ সোমবার সকালে ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই স্কুলের বারান্দায় কৌতূহলী ভিড় শিক্ষার্থীরা ঘিরে আছে একটা ছোট কাঠের বাক্সকে। বাক্সটার ওপর লেখা, “বিশ্বাসের বাক্স (Trust Box)” আর নিচে ছোট করে লেখা, “তোমার ভয়, কষ্ট বা চিন্তা - লিখে দাও এখানে।” বাক্সটি রাখা হলো স্কুলের এক নিরিবিলি কোণে, এমনভাবে যাতে শুধু কি লেখা হচ্ছে তাই নয়, কে লিখছে সেটিও থাকে সম্পূর্ণ গোপন।

নতুন শিক্ষিকা রুবিনা ম্যাডাম এই উদ্যোগটি এনেছেন। ম্যাডাম মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী, ওনার মাস্টার ডিগ্রীতে গবেষনায় ছিলো “৫ থেকে ১২ বছরের শিশুদের মানুষিক বিকাশের বাধাগুলো নিয়ে আলোচনা”, তিনি বলেন, “প্রতিটি শিশু কথা বলতে চায়, কিন্তু সব কথা সবার সামনে বলা যায় না। কেউ ভয় পায়, কেউ লজ্জা পায়, কেউ ভাবে - কেউ বুঝবে না। কিন্তু শিক্ষা মানে শুধু বই পড়া নয়, শিক্ষা মানে বিশ্বাস করা। ‘না বলা’ এক নীরব মানসিক শাস্তি, যা শিশুর মনে ভয়, একাকিত্ব ও অবিশ্বাসের বীজ বপন করে। এর প্রভাবে আত্মবিশ্বাস ক্ষয় হয়, আর শেখার আগ্রহ ধীরে ধীরে নিভে যায়। বাবা-মা আর শিক্ষক - এই দুই জগতেই শিশুর পৃথিবী। সেখানে যদি ভয় জন্মায়, তবে শেখার আনন্দ মরে যায়।”

বাক্সটি খোলা যাবে প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলে, শুধুমাত্র “শিক্ষক পরিষদ” মিলিতভাবে।

কেউ নাম না লিখলেও সমস্যা নেই - শধু নিজের অনুভূতিটা জানাতে হবে।

একদিন বাক্স থেকে বের হলো একটা কাগজ: “আমার সহপাঠী আমাকে প্রতিদিন নাম ধরে ডাকে, আমি ভয় পাই কিছু বললে আবার সবাই হাসবে।” সব শিক্ষক নীরবে পড়লেন। রুবিনা ম্যাডাম বললেন, “আমরা কেউই জানব না কে লিখেছে, কিন্তু আমরা সবাই জানব - এমন ঘটনা যেন না ঘটে।”

পরদিন থেকেই ক্লাসে শুরু হলো নতুন উদ্যোগ, “বন্ধু আচরণ চক্র (Friendship Circle)”। প্রতিটি ক্লাসে ৫ জন ছাত্রছাত্রীকে বেছে নেওয়া হলো, যারা অন্যদের কথা শুনবে, সহায়তা করবে, এবং সমস্যার কথা শিক্ষকদের জানাবে। ধীরে ধীরে সেই বাক্সটি হয়ে উঠল স্কুলের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা - কেউ তার ভয় জমা দিত, কেউ অনুশোচনা লিখত, কেউ “ধন্যবাদ” জানাত কোনো বন্ধুকে।

বাক্সের পাশে ঝুলে থাকত একটা রঙিন কাগজে লেখা, “বিশ্বাস মানে - আমি বললে তুমি শুনবে, বিচার করবে না।”

রুবিনা ম্যাডাম বলেন, “শিশুরা যখন অনুভব করে যে তাদের ভয়কে কেউ বুঝছে, তখনই তাদের মানসিক বিকাশ পূর্ণ হয়। বিশ্বাস হলো শিক্ষার প্রথম ধাপ।” একটি ‘বিশ্বাসের বাক্স’ বা ‘Trust Corner’ শুধু কাঠের বাক্স নয়, এটি শিক্ষার্থীর মনে নিরাপত্তার প্রতীক, নীরব কণ্ঠের স্বর। যখন একটি শিশু জানে, তার ভয়, কষ্ট, বা অন্যায়ের কথা শোনা হবে, তখনই শিক্ষা পায় প্রকৃত অর্থে মানবিক রূপ। কারণ শেখার আগে প্রতিটি শিশুর জানা দরকার - তুমি একা নও, তোমার কথারও মূল্য আছে।

‘বিশ্বাসের বাক্স’-এর ধারণাটি বাস্তবায়নের পর রুবিনা ম্যাডাম শিক্ষক-অভিভাবক সভায় তুলে ধরলেন শিশুদের মানসিক নিরাপত্তার গুরুত্ব। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, কীভাবে প্রতিদিনের ছোট আচরণ - যেমন মনোযোগ দিয়ে শোনা, প্রশংসা করা, বা কোমলভাবে বোঝানো - শিশুর মধ্যে আস্থা, আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক বিকাশ গড়ে তোলে। তাই তিনি সবাইকে আহ্বান জানালেন - ঘরে ও স্কুলে এমন এক পরিবেশ গড়ে তুলুন, যেখানে শিশুর কথা শোনা হবে বিচার নয়, বোঝার মানসিকতায়।

রুবিনা ম্যাডাম ভাবেন, “বিশ্বাসের বাক্স” শুধু শিশুদের মানসিক নিরাপত্তার প্রতীক নয়, এটি সমাজের ভেতরে থাকা অন্ধকার ও বিকৃত আচরণের বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিরোধ। এটি যেন এক “অদৃশ্য নজরদারি” - সমাজের অশালীনতা, নির্যাতন, অবিচার ও দুষ্ট মানসিকতার বিরুদ্ধে এক সতর্ক সংকেত।

অর্থাৎ, এই ধরনের উদ্যোগ সমাজের মধ্যে একপ্রকার নৈতিক ভয় সৃষ্টি করে - যাতে কেউ শিশুর প্রতি অন্যায় আচরণ করার আগে একবার হলেও ভাবে, “কেউ হয়তো লিখে দেবে,” “কেউ হয়তো দেখছে।” “বিশ্বাসের বাক্স” শিশুদের সুরক্ষা দেয় যেমন, তেমনি সমাজের বিকৃত অংশকে ভয় দেখায় - আর এই ভয়টাই দরকার, যাতে শিশুর নিরাপত্তা টিকে থাকে।

মানসিক নিরাপত্তা (Emotional Safety) যা হল গ্রহণযোগ্যতা এবং বিচার, শাস্তি বা প্রত্যাখ্যানের ভয় ছাড়াই তাদের চিন্তাভাবনা, চাহিদা এবং অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট নিরাপদ পরিবেশ। বিশ্বাসের এই পরিবেশটি শিশুদের তাদের খাঁটি স্বত্বা হতে দেয় এবং স্থিতিস্থাপকতা, সুস্থ আত্মসম্মান এবং শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলে।

“ছেলেটি, মূষিক, শিয়াল ও ঘোড়া”

রাজবাড়ী জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ সপ্তম শ্রেণির ইংরেজি ক্লাসে ঢুকলেন নতুন শিক্ষক - হাসান স্যার। স্যার ক্লাসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই জানালার পর্দা টেনে দিলেন না, বরং খুলে দিলেন। বাতাস ঢুকল, আলো ঢুকল, আর সঙ্গে ঢুকল এক নতুন ভাবনা। হাসান স্যার মনে করেন, শিক্ষা মানে শুধু বইয়ের পাতা নয়, মন খুলে দেওয়া। যে শিক্ষা বোর্ডের বইয়ের সীমানায় আটকে থাকে, সে মনকে খাঁচায় পুরে রাখে। তিনি প্রায়ই বলেন, “কৈশোরে যদি আলো আর বাতাস না পায়, তবে জীবন চিরকাল অন্ধকারে রয়ে যাবে।” আরও বলেন, “শিক্ষাব্যবস্থার সংস্পর্শে এসে মন পচে যাওয়ার আগেই লাইব্রেরিতে যাও, আর যদি সাহস থাকে - তবে নিজেকে সত্যিকারের শিক্ষিত করে তোলো।” কঠিন কথা, কিন্তু গভীর সত্য। এই কথাগুলো শোনার পর থেকেই ছাত্ররা বুঝতে শুরু করল, জ্ঞান শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, নিজের মুক্তির জন্যও। আজ স্যার ক্লাস এ একটি ছোট বই এনেছেন, পাতাগুলো নরম কালি আর আঁকায় ভরা। রুমে ঢুকেই স্যার বোর্ডে লিখলেন - Today’s Lesson: “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse” লেখক: Charlie Mackesy, স্কুল লাইব্রেরিতে ২০ কপি রেখেছেন, ছাত্রদের জন্য। স্যার ক্লাস এ বললেন, বইটি একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সবচেয়ে প্রভাবশালী ও হৃদয়স্পর্শী বইগুলোর মধ্যে একটি। কারণ, বইটির সারমর্ম হলো, আমরা আমাদের সংগ্রামে একা নই, এবং দয়া, বন্ধুত্ব, দুর্বলতা এবং সাহায্য চাওয়া আশা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তির পথ। এই বই আমাদের শেখায়, মানুষ যত বড় হয় জ্ঞানে, ততটাই বড় হতে হয় হৃদয়ে। এই বই শেখায় না কেমন করে সফল হতে হয়, শেখায় কেমন করে মানুষ হতে হয়। এটি শুধুমাত্র একটি বই নয় - এটি হয়ে ওঠে একটি মানসিক সান্ত্বনার প্রতীক, বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির সময়, যখন বিশ্বজুড়ে মানুষ একাকিত্ব ও ভয় মোকাবিলা করছিল। তখন মনে সাহস ও পরিস্থিতি কে জয় করার স্পৃহা পাওয়া যায় বইটির সহজ ও প্রকৃত উদাহরণ থেকে গল্প আকারে। বইটির পুরস্কার ও স্বীকৃতি: • ২০২০ সালে British Book Awards-এ Book of the Year বিশ্বের ৩০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইন্টারনেটে খুঁজে দেখা যেতে পারে! সবাই বইটিকে বলেছেন “একটি নরম আলোর মতো, যা মনের অন্ধকারে সান্ত্বনা দেয়।”

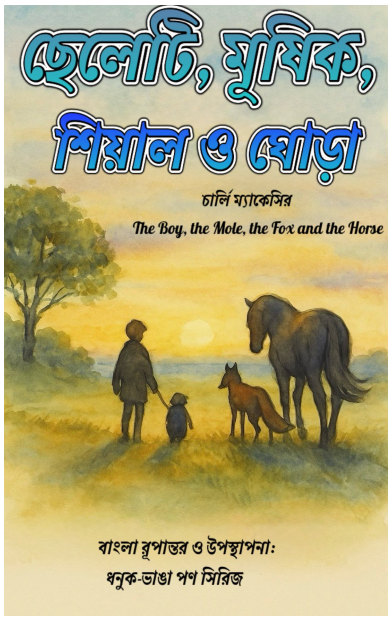

হাসান স্যার, আবার বইটির গল্পে আসলেন, এই বইটি শুধুমাত্র একটি গল্প নয়, এটি এক নিঃশব্দ আত্ম-অনুসন্ধান। একটি ছোট ছেলে, একটি মূষিক, একটি শিয়াল এবং একটি ঘোড়া - চারটি চরিত্র একসাথে হাঁটে জীবনের পথে। তারা ভয় পায়, ভালোবাসে, ভুল করে, ক্ষমা করে - আর শেষ পর্যন্ত বুঝতে শেখে, আলো কখনো বাইরে নয়, আলো সবসময় আমাদের ভিতরেই থাকে। স্যার কেন বাংলা সংস্করণ করেছেন এবং তাৎপর্য কি তা বুঝাতে গিয়ে বললেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বইটি হয়ে উঠতে পারে! একটি “হৃদয়ের পাঠশালা” - যেখানে ছাত্র-ছাত্রী শেখে ভয় নয়, দয়া; প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা; আর নম্বর নয়, মানুষের প্রতি ভালোবাসা। এই সংস্করণের প্রতিটি অধ্যায় বাংলা ভাষার কোমল রূপে সাজানো - যেন আমাদের স্কুলের ক্লাসরুমেও শিশুরা শিখতে পারে: “ভালোবাসা মানে বেঁচে থাকা, আর দয়া মানে আলো।” স্যার বোর্ডে বড় করে লিখলেন—“দয়া মানে দুর্বলতা নয়, শক্তি।” স্যার ক্লাসে গল্প বললেন, একটি ছেলেকে নিয়ে গল্প। একদিন সে বনে হারিয়ে যায়। সেখানে দেখা হয় এক মূষিক এর সঙ্গে। মূষিকটি কেক ভালোবাসে, কিন্তু তার থেকেও বেশি ভালোবাসে মানুষের মনের কথা শুনতে। মূষিক ছেলেটিকে বলে, “তুমি জানো, সবচেয়ে সাহসী কাজ কী?” “না।” “সাহায্য চাওয়া।” ছেলেটি অবাক হয়। কিন্তু পরে যখন ভয় পায়, তখন সে বলে, “আমি ভয় পাচ্ছি।” মূষিক তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, “ভয় পাওয়া মানে তুমি জীবিত, আর সেটিই প্রমাণ যে তোমার ভিতরে সাহস আছে।” পথে তারা দেখা পায় এক শিয়ালের সঙ্গে। শিয়ালটি একসময় ফাঁদে ধরা পড়েছিল, তাই কারও ওপর বিশ্বাস করতে পারত না। কিন্তু একদিন ছেলেটি ও মূষিক তাকে বাঁচায়। তখন শিয়াল বলে, “তুমি আমার প্রতি দয়া দেখালে, অথচ আমি তোমার জন্য কিছুই করিনি।” শেষে তারা দেখা পায় এক ঘোড়ার সঙ্গে। ঘোড়াটি বিশাল, অথচ বিনয়ী। সে ছেলেটিকে বলে, “তুমি কখনো একা নও, এমনকি যখন তুমি মনে করো তুমি একা।” “আর মনে রেখো, নিজের প্রতি কোমল হওয়াটাও দয়া।” হাসান স্যার বইটি বন্ধ করে বললেন, “তোমরা জানো বাচ্চারা, এই গল্পের চারটি চরিত্র আসলে আমাদের মনের চার দিক।

ছেলেটি— কৌতূহল,
মূষিক—সহানুভূতি,
শিয়াল—ভয় আর অভিজ্ঞতা,
আর ঘোড়া— জ্ঞান ও ভালোবাসা।

চারটি প্রাণী, তারা শেখায় - ভয় মানে তুমি জীবিত, দয়া মানে শক্তি, ভালোবাসা মানে আলো, আর সাহস মানে সাহায্য চাইতে পারা।”

“তোমরা যদি একে অপরের প্রতি একটু বেশি দয়া করো, তাহলে এই পৃথিবী একটু বেশি আলোকিত হবে। ক্লাসে যে বন্ধু কম কথা বলে, তার পাশে বসো। যে ভুল করে, তাকে ছোট করো না, শেখাও। এটাই সাহস, এটাই দয়া।”

শেষে স্যার বোর্ডে আবার লিখলেন— “সবচেয়ে সাহসী মানুষ সেই, যে দয়া দেখাতে জানে।”

ক্লাসের সবাই নীরব হয়ে গেল। কেউ কেউ তাকিয়ে রইল স্যারের হাতে থাকা ছোট বইটির দিকে। একটি বই, কিন্তু ভিতরে যেন একটি মহাবিশ্ব। একটি পাঠ, কিন্তু হৃদয়ে গেঁথে থাকার মতো এক সত্য - দয়া মানে দুর্বলতা নয়, সেটাই মানুষ হওয়ার প্রথম প্রমাণ।

“The light of knowledge must never beg for oil.”

রাজশাহী জেলার এক পুরোনো কলেজ, লাল ইটের দেয়ালে এখনো মুক্তিযুদ্ধের গুলির দাগ, সময় অক্টোবর ২০২৫।

১. সকালটা যেমন অন্যদিনের মতো ছিল না:- বেলা ৯টা। ক্লাস শুরু হওয়ার কথা, কিন্তু ক্যাম্পাস নিস্তব্ধ। শিক্ষকেরা বোর্ডে দাঁড়াননি, ছাত্ররা বেঞ্চে বসে নেই। কলেজের গেটে ঝোলানো সাদা ব্যানারে লেখা - “আমরা শিক্ষা বন্ধ করতে চাই না, কিন্তু অবিচারের বিরুদ্ধে নীরব থাকতে পারি না।” অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক, ৩২ বছর ধরে পড়াচ্ছেন। হাতে এক কাপ চা, চোখে ক্লান্তি। তিনি বললেন, “আমাদের দাবি সামান্য - ন্যায্য ভাতা, চিকিৎসা সহায়তা, সম্মান। কিন্তু যেদিন শিক্ষককে লাঠি দিয়ে তাড়ানো হয়, সেদিন জাতির মাথা নুয়ে যায়।” তার পাশে দাঁড়িয়ে ইংরেজি বিভাগের সুমি ম্যাডাম বললেন, “আমরা আর কতোদিন মিছিল করবো, কতদিন প্রমাণ করবো যে শিক্ষকরা ও মানুষ?”

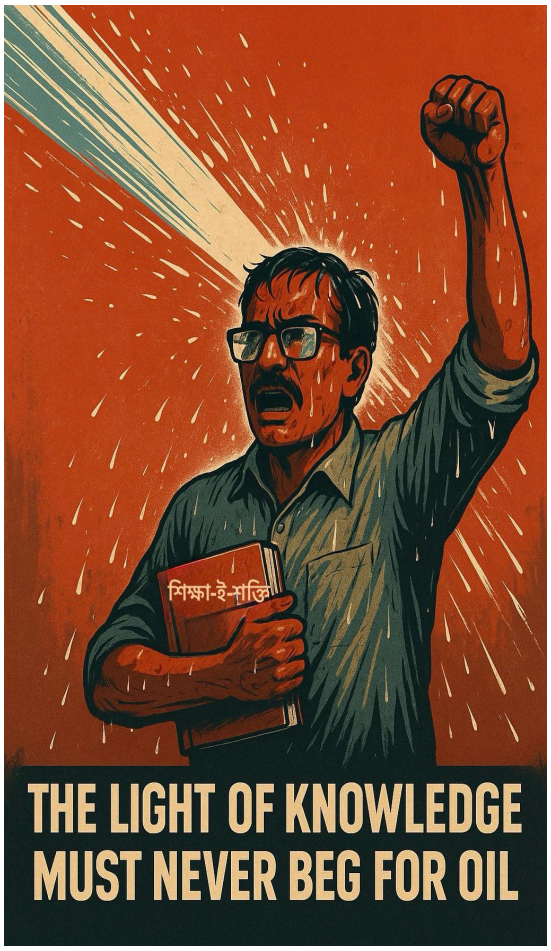

২. শহরের অন্য প্রান্তে: স্কুলপড়ুয়া মেয়ে রুবাইয়া কান্না করছে। “মা, আজও তো স্কুল বন্ধ। আমার তো বোর্ড পরীক্ষা সামনে।” তার মা, একজন গার্মেন্টস কর্মী, জানালার পাশে বসে বললেন, “মা রে, স্যার-ম্যাডামরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন তোমাদের ভবিষ্যতের জন্যই। তুমি শুধু পড়া চালিয়ে যাও।” রুবাইয়া জানে না রাজনীতি কী, কিন্তু জানে তার গণিত স্যার জাহিদ স্যার সকালে পুলিশের জলকামানে ভিজে গিয়েছেন। টিভিতে দেখেছে, স্যারের মুখে রক্ত। সে চুপচাপ খাতার কোণে লিখল - “Sir, I’ll study harder. You just get well soon.”

৩. আন্দোলনের দিনগুলো: ঢাকার প্রেস ক্লাবের সামনে হাজারো শিক্ষক বসে আছেন। মাথায় কাপড়, হাতে প্ল্যাকার্ড - “শিক্ষককে সম্মান দাও, জাতি বাঁচাও।” “আমরা পেনশন চাই না, সম্মান চাই।” “শিক্ষার বাজেট মানে জাতির বিবেকের পরিমাপ।” সন্ধ্যা নামছে। হঠাৎ শব্দ - বুম! সাউন্ড গ্রেনেড। বৃদ্ধ শিক্ষক মাটিতে পড়ে যান। কেউ তাঁর চশমা খুঁজছে, কেউ তাঁর খাতা তুলছে, তাতে লেখা ছিল, ‘Electric field inside a conductor is zero’। কিন্তু আজ সেই শিক্ষক-রাষ্ট্রের সম্পর্কের ভেতর যে বিদ্যুৎচালিত শূন্যতা, তা কেবল বিজ্ঞানের সূত্র নয়, সমাজের এক ভয়ংকর প্রতীক।

৪. ক্লাসে ফিরে না আসা শিক্ষক: সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। ছাত্ররা নিজেরা শ্রেণিকক্ষে বসে গল্প করছে, পাঠ্যবই খুলে রাখে কেউ কেউ, কেউ আবার ব্যানার বানাচ্ছে। তাদের এক বন্ধু বলে, “আমাদের শিক্ষকরা যখন রাস্তায়, তখন আমরা কি শুধু মোবাইল গেম খেলব?” তারা সিদ্ধান্ত নেয় একটা “শিক্ষক সমর্থন ক্লাব” বানাবে। প্রতিদিন এক ঘণ্টা তারা নিজেরা নিজেদের শেখাবে, বোর্ডে লিখবে “Solidarity Class।” তাদের দেয়ালে টাঙানো পোস্টার - “Education is not a favor. It is a nation’s backbone.”

৫. সরকারের ঘরে: সচিবালয়ের বৈঠকে কেউ বলছে, “বাজেটে চাপ পড়বে, ভাতা বাড়ানো এখন সম্ভব নয়।” অন্য কেউ বলছে, “কিন্তু যদি শিক্ষকরা পথে থাকে, আমাদের ভবিষ্যৎ কে গড়ে দেবে?” প্রধান সচিব নীরবে জানালার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাইরে পতাকা উড়ছে, আর ভেতরে এক টুকরো নীরব বিবেক ফিসফিস করে বলছে, “একটি জাতির সম্মান কখনো বাজেটের ভারে মাপা যায় না।”

৬. সন্ধ্যার আলোয় সমাধান: অবশেষে একদিন রাতে সংবাদ আসে, সরকার ২০% বাড়ি ভাতা, চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি, এবং উৎসব বোনাস সংশোধনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। সেই রাতেই ঢাকার শহীদ মিনারে বসে থাকা শিক্ষকদের মধ্যে নিঃশব্দ কান্না ছড়িয়ে পড়ে।

৭. রফিক স্যারের শেষ কথা: পরদিন সকালে রফিক স্যার আবার ক্লাসে দাঁড়ালেন। চোখে ঘুমহীনতা, কিন্তু কণ্ঠে শক্তি। তিনি বললেন, “বাচ্চারা, তোমরা এই আন্দোলনকে মনে রাখবে না রাগ হিসেবে, মনে রাখবে শিক্ষা হিসেবে। একজন শিক্ষক যখন রাস্তায় নামেন, তখন সেটা তাঁর অধিকার নয় - তোমাদের ভবিষ্যৎ রক্ষার সংগ্রাম। আর তোমরা যেন এমন এক সমাজ গড়ো, যেখানে শিক্ষককে আর কখনো নিজের সম্মানের জন্য দাঁড়াতে না হয়।”

অবশেষে: কলেজের দেয়ালে লেখা - “শিক্ষক মানে সমাজের আলোকবাহক। কিন্তু যদি সেই আলো নিভে যায়, তবে পুরো জাতি অন্ধকারে হাঁটে।”

রুবাইয়া খাতার পাতায় লিখে রাখে - “The light of knowledge must never beg for oil.”

এটা বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসের এক কঠিন অধ্যায় - যেখানে শিক্ষকরা রাস্তায় হাঁটেন, ছাত্ররা ঘরে কাঁদে, আর সমাজ শেখে এক চিরন্তন সত্য, “যে জাতি তার শিক্ষকদের সম্মান করে, সে জাতিই একদিন সভ্যতার কালি দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ রচনা করে।”

“একটি টিফিনবক্সের গল্প”

ঝিনাইদহ জেলার এক গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সকাল দশটা। সপ্তম শ্রেণির ক্লাসে বাংলা পড়াচ্ছেন হাফিজ স্যার। স্যার “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের অধীনে এক বছরের জন্য এসেছেন। হাফিজ স্যার অংকের ছাত্র, কিন্তু মনে প্রাণে একজন মানবিক মানুষ, যিনি মনে করেন “মানুষের মানবিক গুনাগুন আছে বলেই সে মানুষ।” স্যারের ভাবনায়, “একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংকীর্ণ সীমানা পেরিয়ে সমগ্র মানবতার বৃহত্তর উদ্বেগের দিকে না এলে বেঁচে থাকতে শুরু করে না।” অংকে মাস্টার ডিগ্রী করলেও এখন স্কুলে বাংলা পড়ান, স্যারের মাতৃভাষা পড়াতে, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলের কবিতা ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ভালোলাগে। অঙ্কে যেমন যুক্তি আছে, সাহিত্যে তেমন হৃদয় আছে— এই দুইয়ের মিলেই মানুষ সম্পূর্ণ হয়।

আজকের পাঠ - “মানবিকতা ও সমাজ।”
বোর্ডে লেখা, “মানবিকতা মানে অন্যের কষ্ট নিজের চোখে দেখা।”
স্যার বললেন, “আমার মানবতা তোমার সাথে আবদ্ধ, কারণ আমরা কেবল একসাথে মানুষ হতে পারি।” বুঝিয়ে বললেন, “জীবনের একমাত্র অর্থ হলো মানবতার সেবা করা।” কিন্তু পড়াতে পড়াতে স্যারের নজর গেল এক ছাত্রীর দিকে - নাম দীপালি ঘোষ। সবসময় প্রাণবন্ত এই ছাত্রীটি আজ মাথা নিচু করে বসে আছে, ক্লাসের কোনো কথাতেই মন নেই। বিরতির ঘণ্টা বাজল। সবাই টিফিন খেতে বেরিয়ে গেল, কিন্তু দীপালি বসে রইল চুপচাপ। হাফিজ স্যার কাছে গিয়ে বললেন,
“তুমি যাচ্ছো না বাইরে?”
দীপালি ধীরে বলল,
“স্যার, আজ টিফিন আনিনি।”
স্যার আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।
নিজের ব্যাগ খুলে নিজের টিফিনবক্সটা ওর হাতে দিলেন,
“চলো, আজ আমরা একসাথে খাই।”
দীপালি প্রথমে দ্বিধায় পড়ল, তারপর মুখে একটুকরো হাসি ফুটল।
দু’জনে মাঠের এক কোণে বসে খেতে লাগল -
একই টিফিনবক্স, অর্ধেক ভাত, অর্ধেক গল্প।
বাকি বন্ধুরা দূর থেকে তাকিয়ে দেখল,
কোনো বক্তৃতা ছাড়াই কীভাবে “মানবিকতা” নামের একটি অধ্যায় জীবন্ত হয়ে উঠল।

সেদিনের ক্লাসে হাফিজ স্যার বলেছিলেন,
“মানুষকে ভালোবাসা কোনো বড় কাজ নয়,
কিন্তু কেউ একা বসে থাকলে পাশে বসে যাওয়া - এটাই বড় কাজ।”

বছর কয়েক পর, এক শিক্ষক প্রশিক্ষণ সেমিনারে কেউ একজন বলছিল,
“আমি শিক্ষক হয়েছি কারণ একদিন আমার টিফিন ভাগ করেছিলেন এক শিক্ষক।” নাম তাঁর দীপালি ঘোষ।

পাঠ্যবই মানবিকতার সংজ্ঞা দেয়,
কিন্তু শিক্ষক সেটি প্রাণ দিয়ে দেখান।
হাফিজ স্যারের সেই অর্ধেক টিফিনই প্রমাণ -
সত্যিকারের শিক্ষা শুরু হয়, যখন শিক্ষক তাঁর মানবিকতা ছাত্রের সঙ্গে ভাগ করেন। মানবিকতা কোনো পাঠ নয়, এটি এক আচরণ।
একজন শিক্ষক কখনো কেবল বিষয় শেখান না, বরং শেখান মানুষ হয়ে উঠতে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ১৯৬

“অঙ্কের ভাষা, যুক্তির জীবন”

রাজশাহী জেলার একটি সরকারি কলেজ। আজ কলেজের বোর্ড মিটিং। উপস্থিত আছেন জেলার শিক্ষা অফিসার, কলেজের অধ্যক্ষ, বিভাগীয় প্রধানরা, এবং কয়েকজন আমন্ত্রিত অতিথি - স্থানীয় শিক্ষা-উৎসাহী ও প্রাক্তন শিক্ষকরা। মিটিংয়ের এজেন্ডা মূলত পাঠক্রম-সংক্রান্ত। শেষে অধ্যক্ষ বললেন, “মেহজাবিন ম্যাডাম কিছু বলতে চান। আমরা তাঁকে ৩০ মিনিট সময় দিয়েছি।” মেহজাবিন ম্যাডাম উঠে দাঁড়ালেন। তিনি শুধু গণিতের শিক্ষিকা নন, একজন গবেষক এবং একজন উদ্বিগ্ন নাগরিক। “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পে এসেছেন এক বছরের জন্য। তাঁর মাস্টার্স গবেষণার বিষয় ছিল Theoretical Mathematics - যেখানে সংখ্যা, প্যাটার্ন, ও যুক্তির সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেছেন। বোর্ডে বড় করে লিখলেন - “অঙ্ক শুধু বিষয় নয়, এটি চিন্তার ভাষা।” ঘরে এক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো। সবার চোখ তাঁর দিকে, কিন্তু কারও মুখে তেমন আগ্রহ নেই - যেন এই আলোচনা তাঁদের দায়িত্বের বাইরে। ম্যাডাম শান্ত গলায় বললেন, “আমরা সবাই জানি, মানবিক শাখায় গণিত এখন আর বাধ্যতামূলক নয়। আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।” তিনি ধীরে ধীরে কথা শুরু করলেন, “গণিত শুধু সূত্র বা সংখ্যার ব্যাপার নয়; এটি মানুষের চিন্তার গঠন। একজন মানুষ যেমন বাক্য গঠনের নিয়মে ভাষা শেখে, তেমনি চিন্তার গঠন শেখে গণিতের মাধ্যমে। আপনি যখন কোনো সমস্যার সমাধান খোঁজেন, তখন আসলে মনের অজান্তে আপনি একটি সমীকরণ তৈরি করছেন - জানা ও অজানাকে মিলিয়ে দেখার এক প্রচেষ্টা। গণিত সেই মিলনের বিজ্ঞান।”

শিক্ষা অফিসার মাথা নেড়ে বললেন, “কিন্তু ম্যাডাম, অনেক ছাত্রছাত্রী গণিতে দুর্বল। মানবিক শাখায় অঙ্ক ঐচ্ছিক করলে তাদের মানসিক চাপ কমবে না?” মেহজাবিন ম্যাডাম থেমে তাঁকে সরাসরি উত্তর দিলেন, “চাপ কমবে হয়তো, কিন্তু শক্তিও কমবে। চাপ কমিয়ে বুদ্ধি বাড়ানো যায় না। যদি আমরা ভাবি কোনো সমস্যা এড়ানোই শিক্ষার লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল পথে চলছি। শিক্ষার কাজ হলো - সমস্যাকে সহজ করে বোঝানো, এড়িয়ে যাওয়া নয়।” তিনি বোর্ডে লিখলেন: ‘গণিত শেখায় শুধু গণনা নয় - শেখায় যুক্তি, ধৈর্য ও সমাধান।’ তারপর বললেন, “আজ যখন আমরা মানবিক শাখা থেকে গণিত বাদ দিচ্ছি, আমরা আসলে সমাজ থেকে যুক্তির চর্চা বাদ দিচ্ছি। একজন ইতিহাসবিদ যুদ্ধের তথ্য বিশ্লেষণ করতে পরিসংখ্যান ব্যবহার করে, একজন সাংবাদিক নির্বাচনের ফলাফল বুঝতে শতাংশের হিসাব জানেন, একজন আইনজীবী আর্থিক প্রমাণ ব্যাখ্যা করতে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করে, একজন সংগীতশিল্পী তাল-লয়ের ভেতরে গণিত খুঁজে পায়। তাহলে মানবিকদের থেকে অঙ্ক কেড়ে নেওয়া মানে যুক্তিকে শাস্তি দেওয়া।”

ঘরের মধ্যে হালকা গুঞ্জন শুরু হলো। একজন অতিথি বললেন, “কিন্তু আধুনিক যুগে তো AI, টুলস আছে, গণনা করে দেয়…” ম্যাডাম দৃঢ় গলায় উত্তর দিলেন, “যন্ত্র গণনা করতে পারে, কিন্তু যুক্তি গঠন করতে পারে না। যন্ত্র উত্তর দেয়, কিন্তু প্রশ্ন তৈরি করে না। গণিত শেখায় প্রশ্ন করতে, কারণ প্রতিটি সমীকরণ এক ধরনের কৌতূহল।” তিনি একটু হাঁটলেন, তারপর বললেন, “যদি সত্যিই আমরা ছাত্রদের সাহায্য করতে চাই, তবে গণিত বাতিল নয় - পুনর্গঠন করতে হবে। শিক্ষাকে জীবনের সাথে যুক্ত করতে হবে। মানবিক ছাত্রদের জন্য গণিত মানে - অর্থনীতির শতাংশ, রাজনীতির পরিসংখ্যান, সাংবাদিকতার তথ্যবিশ্লেষণ, এবং দৈনন্দিন জীবনের আর্থিক বুদ্ধি। গণিতকে প্রাসঙ্গিক করলেই ভয় চলে যাবে।” তিনি বোর্ডে শেষবারের মতো লিখলেন—“গণিত বাদ মানে যুক্তি বাদ। যুক্তি বাদ মানে জাতি দুর্বল।” তারপর বললেন, “আমরা যদি সত্যিই মানবিকতা চাই, তবে তার ভিত হতে হবে যুক্তিসম্পন্ন। অন্যথায় আমরা এমন নাগরিক তৈরি করব, যারা বক্তৃতা দিতে জানবে, কিন্তু পরিসংখ্যান বুঝবে না; যারা যুক্তি ছাড়াই বিচার করবে, সংখ্যা ছাড়াই সিদ্ধান্ত নেবে।”

ঘর নিস্তব্ধ। অধ্যক্ষ মৃদু স্বরে বললেন, “ম্যাডাম, আপনার বক্তব্য শুধু শিক্ষকদের জন্য নয়, আমাদের নীতিনির্ধারকদের জন্যও।” ঘরের মধ্যে হালকা গুঞ্জন শুরু হলো। একজন সিনিয়র সাংবাদিক, যিনি আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কিছুটা দ্বিধা আর কিছুটা পরিসংখ্যানের ভাবনায় বললেন, “ম্যাডাম, একটা কথা বলি? আমি দীর্ঘদিন সংবাদপত্রে কাজ করেছি। দেখেছি - আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে যে অযথা সংঘাতগুলো ঘটে, প্রতিবেশী গ্রামের সঙ্গে, দোকানদার, বাসচালকের সঙ্গে, সেই ভিড়ে বিজ্ঞানের ছাত্র খুব কমই দেখা যায়। হয়তো তারা অঙ্কের সূত্রে অভ্যস্ত বলে, যুক্তিহীন রাগে নয় - সমাধানের পথে ভাবতে শেখে। আমি জানি না, আমি যা বলছি তা পুরোপুরি সত্য কি না, তবু মনে হয় - গণিত মানুষকে শেখায় মানে খুঁজতে, কারণ প্রতিটি সমস্যার ভেতরেই কোনো না কোনো যুক্তি লুকিয়ে থাকে।”

ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ম্যাডাম মৃদু হাসলেন, তারপর বললেন, “আপনি একদম ঠিক বলেছেন। যুক্তিহীন শিক্ষা মানুষকে আবেগী করে তোলে, কিন্তু যুক্তিসম্পন্ন শিক্ষা শেখায় কিভাবে অনুভূতির ভেতরেও ভারসাম্য খুঁজে নিতে হয়। গণিত সেই ভারসাম্যের বিদ্যা। যেখানে চিন্তা যুক্তির পথ হারায়, সেখানে সমাজে সংঘাত জন্মায়। অঙ্ক শেখা মানে শুধু হিসাব নয়, এটি শেখা - কিভাবে জীবনকে মেপে মেপে সঠিকভাবে বুঝতে হয়।” এই কথায় সভাকক্ষে যেন এক নতুন উপলব্ধি নেমে এলো - বোর্ডের সবাই বুঝল, গণিতকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তটা শুধু একাডেমিক নয়, এটি নৈতিক ও মানসিক ক্ষতি। মেহজাবিন ম্যাডাম চুপচাপ বোর্ডের দিকে তাকালেন। লিখে থাকা কথাগুলো যেন ঝলমল করছে - “অঙ্ক শুধু বিষয় নয়, এটি চিন্তার ভাষা।” সেদিন রাজশাহী কলেজের সেই বোর্ড মিটিং-এর আলোচনাটি সারা জেলায় ছড়িয়ে গেল। কারণ এক শিক্ষিকার কণ্ঠে সবাই শুনেছিল এক জাতির ভবিষ্যতের সতর্কবার্তা। শিক্ষার সিদ্ধান্তে যদি শিক্ষক না থাকেন, তবে সিদ্ধান্ত থাকে - শিক্ষা থাকে না। আর যে জাতি যুক্তিকে বাদ দিয়ে স্বস্তিকে বেছে নেয়, সে একদিন বুদ্ধিতে দরিদ্র হয়ে যায়। গণিত শেখা মানে শুধু যোগ-বিয়োগ নয়, এটি শেখা মানে - জীবনের প্রতিটি সমস্যাকে সমাধানের ভাষায় অনুবাদ করা।

“ভদ্রতা ক্লাস (Empathy Hour)”

“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্প-এর অধীনে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবনাপত্র

প্রাপ্যক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

বিষয়: প্রাথমিক শিক্ষায় “ভদ্রতা ক্লাস”(Empathy Hour) এর সংযোজনের প্রস্তাব।

“ধনুক-ভাঙা পণ” প্রকল্পের দ্বারা মানবিক প্রজন্ম গড়ার শিক্ষার প্রয়াস।

সারসংক্ষেপ:- বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞানার্জন নয়, মানবিকতা গঠনও। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মানসিক বিকাশ, সহানুভূতি ও ভদ্রতা শেখানোর জন্য কোনও কাঠামোবদ্ধ কার্যক্রম নেই। এই প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য, প্রতিটি বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একদিন “ভদ্রতা ক্লাস” চালু করা, যাতে শিক্ষার্থীরা সহানুভূতি, সম্মান ও সহযোগিতার অনুশীলন করতে শেখে।

মূল লক্ষ্য: একটি মানবিক, সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতাপূর্ণ প্রজন্ম তৈরি করা। বিশেষ উদ্দেশ্য: ১. শিক্ষার্থীদের সামাজিক-আবেগিক (Social-Emotional Learning) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ২. স্কুলের পরিবেশে সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সম্মানচর্চা প্রতিষ্ঠা করা। ৩. শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ককে মমতাময় ও ইতিবাচক করে তোলা। ৪. ভবিষ্যতের নাগরিকদের দায়িত্বশীল ও মননশীল করে গড়ে তোলা।

কার্যক্রম কাঠামো:- সময়সূচি: প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে ৯টা ৪৫ মিনিট. নাম: “ভদ্রতা ক্লাস” বা “Empathy Hour”

মূল কার্যক্রম: ১. Empathy Circle (সহানুভূতি বৃত্ত): সবাই মিলে কথা বলা ও শোনা। ২. Gratitude Tree (কৃতজ্ঞতা বৃক্ষ): প্রতিদিন একটি ভালো কাজ লিখে পাতায় ঝোলানো। ৩. Helping Day (সহযোগিতা দিবস): একসাথে একটি সামাজিক কাজ করা। ৪. Silent Listening (নীরব শ্রবণ): ৫ মিনিট নীরব থেকে অন্যের কথা শোনা।

মূল শব্দসমূহ:- শোনা – সম্মান – সাহায্য – সহানুভূতি

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন: • শিক্ষকরা ২ দিনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ পাবেন “সহানুভূতি শিক্ষা” বিষয়ে। • ক্লাসে কোনও আনুষ্ঠানিক গ্রেড থাকবে না; বরং শিক্ষক মন্তব্য দেবেন: “আজ সে অন্যকে সাহায্য করেছে”, “সে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে”, ইত্যাদি। • উপজেলা শিক্ষা অফিসার বছরে একবার পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেবেন “মানবিক বিকাশ সূচক”-এর ওপর ভিত্তি করে।

প্রত্যাশিত ফলাফল:- • স্কুলে বিরোধ, মারামারি ও নেতিবাচক আচরণ কমবে। • শ্রেণিকক্ষ হবে শান্ত, সহযোগিতাপূর্ণ ও মনোযোগী। • শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, যোগাযোগ দক্ষতা ও দলগত মনোভাব বৃদ্ধি পাবে। • শিক্ষক হবেন কেবল পাঠদাতা নয়, বরং মানুষ গড়ার কারিগর।• ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীরা নাগরিক হিসেবে দায়িত্বশীল, সহানুভূতিশীল ও নৈতিকভাবে দৃঢ় হবে।

উপসংহার:- “Empathy Education Initiative – ভদ্রতা ক্লাস কর্মসূচি” বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও মানবিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ হবে শুধু পাঠদানের জায়গা নয়, বরং মানুষের মন গঠনের এক প্রশিক্ষণক্ষেত্র।

আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করছি - শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) যেন একযোগে এই প্রস্তাবনাটির পরীক্ষামূলক (Pilot) বাস্তবায়নের অনুমোদন প্রদান করেন। যেখানে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি শিশুরা শিখবে মানুষ হওয়া, যেখানে পরীক্ষার ফলাফলের পাশাপাশি মূল্যায়িত হবে মানবিকতা। “বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নয়, মানবিকতায়ও আলোকিত হবে - যদি আজ থেকেই আমরা শিশুর হৃদয়ে সহানুভূতি বুনে দিই।”

স্বাক্ষর: .....

(প্রেরক নাম ও পদবি) “ধনুক-ভাঙা পণ” প্রকল্প

তারিখ: .....

“ভদ্রতা ক্লাস” (The Kindness Class)

ট্রমসো, নরওয়ে। বরফে ঢাকা সকাল, শিশুরা সারি সারি জুতো খুলে রেখে প্রবেশ করছে এক ছোট্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রতিদিন দিনের শুরু হয় এক অদ্ভুত ক্লাস দিয়ে— “Empathy Hour”। শিক্ষক বলেন “চল আজ অঙ্ক করি।” বরং বলেন, “চল আজ আমরা অন্যের মন বুঝতে শিখি।” এই ধারণাটিই একদিন দূর দেশ পেরিয়ে পৌঁছে যায় বাংলাদেশে - খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার বেলতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-এ। রাবেয়া ম্যাডাম, স্কুলের তরুণ শিক্ষক, একদিন ইউটিউবে জাপানের “Omoiyari” (おもいやり – অন্যের প্রতি সহানুভূতি) ক্লাসের ভিডিও দেখলেন। শিশুরা সেখানে নিজের প্লেট ধুয়ে রাখছে, একে অন্যের জন্য ফুলের টব সাজাচ্ছে, কারও মন খারাপ হলে নীরবে পাশে বসছে। রাবেয়া ম্যাডামের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল - “আমাদের স্কুলেও তো এমন কিছু করা যায়!” পরের সপ্তাহে স্কুলের গেটে নতুন বোর্ড ঝুলল - “ভদ্রতা ক্লাস – প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা” প্রথম দিন ছাত্ররা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “ম্যাডাম, ভদ্রতা কি শেখানো যায়?” ম্যাডাম মৃদু হেসে বললেন, “অঙ্ক শেখানো যায়, ইংরেজি শেখানো যায়, তাহলে ভদ্রতা কেন নয়?”

তিনি বোর্ডে লিখলেন তিনটি শব্দ: শোনা - সম্মান – সাহায্য। তারপর বললেন, “আজ তোমরা যার সঙ্গে বসে আছো, তার একটা ভালো দিক বলো।” একজন বলল, “তাহিয়া সব সময় খাতা ধার দেয়।” অন্যজন বলল, “রোহান ভুল করলে কখনো রাগ করে না।” সেদিন ক্লাসের শেষে রাবেয়া ম্যাডাম বললেন, “আজ থেকে তোমাদের হোমওয়ার্ক— প্রতিদিন অন্তত একটি দয়ালু কাজ করবে। সেটা লিখে আনবে, সেটা হবে তোমার ‘ভদ্রতা ডায়েরি’। ”

এরপর ধীরে ধীরে বদলে গেল স্কুলের বাতাস - কেউ মাঠে পড়ে যাওয়া বন্ধুকে হাত বাড়িয়ে তুলছে, কেউ টিফিন ভাগ করে দিচ্ছে, কেউ নিঃশব্দে অন্যের কথা শুনছে। বিরতির সময় যেখানে আগে হইচই ও ঝগড়া হতো, এখন সেখানে দেখা যায় হাসি, সহযোগিতা, আর একটুকরো প্রশান্তি। শিক্ষকরাও টের পেলেন - বইয়ের পৃষ্ঠা নয়, হৃদয়ের পৃষ্ঠা খুলছে শিশুরা। একদিন উপজেলা শিক্ষা অফিসার হঠাৎ স্কুলে এলেন। ক্লাসে ঢুকে দেখলেন—শান্ত মুখ, মনোযোগী চোখ, আর অদ্ভুত এক স্থিরতা। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাদের ক্লাসে এত শান্ত পরিবেশ কিভাবে সম্ভব?” রাবেয়া ম্যাডাম বললেন, “স্যার, আমরা অঙ্ক, ইংরেজি, বিজ্ঞান—সবই শিখি, কিন্তু সপ্তাহে একদিন আমরা মানুষ হবার অনুশীলন করি। এখানে আমরা প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতাকে বড় করে দেখি।” তিনি আরও যোগ করলেন, “আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক গ্রেড নেই। শিক্ষকরা মন্তব্য ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন দেন - যাতে শিশু ভয় নয়, অনুপ্রেরণায় বেড়ে ওঠে।” অফিসার মাথা নেড়ে বললেন, “এই ক্লাসটাই জাতির ভবিষ্যৎ। বই মানুষ বানায় না, মন বানায়।” রাবেয়া ম্যাডামের “ভদ্রতা ক্লাস” আজ মডেল হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি স্কুলে এভাবেই চালু করা যেতে পারে -

১. Empathy Circle (সহানুভূতি বৃত্ত): সপ্তাহে একদিন সবাই বসে শুনবে অন্যের অনুভূতি - কে কেমন আছে, কেন মন খারাপ বা আনন্দিত। ২. Silent Listening (নীরব শ্রবণ): ৫ মিনিট সম্পূর্ণ নীরব থেকে একে অন্যকে শুনবে, শুধু অনুভব করবে। ৩. Gratitude Tree (কৃতজ্ঞতা বৃক্ষ): ক্লাসরুমে একটি গাছের কাগজ টাঙানো থাকবে, প্রতিদিন শিশুরা পাতার আকারে লিখবে - “আজ আমি কিসের জন্য কৃতজ্ঞ।” ৪. Helping Day (সহযোগিতা দিবস): সপ্তাহে একদিন সবাই একসাথে একটি কাজ করবে, যেমন মাঠ পরিষ্কার, ফুল গাছ লাগানো, বা এক বৃদ্ধাকে রাস্তা পার করানো।

যে স্কুলে বন্ধুত্ব, দয়া ও সহানুভূতি শেখানো হয় না, সেই স্কুলে শিক্ষার আত্মা অনুপস্থিত। আমরা যদি প্রজন্মকে বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি মানবতা শেখাতে পারি, তবে একদিন বাংলাদেশের মানচিত্রে দেখা যাবে জ্ঞানী ও মানবিক জাতি।

“শিশুরা বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এবং ভবিষ্যতের জন্য সেরা আশা।”

মাগুরা জেলার এক গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল, স্কুলে সাপ্তাহিক শিক্ষক সভা। বৃষ্টির পরে মাঠে কাদা, অথচ শিক্ষকরা একে একে এসে জড়ো হচ্ছেন টিনের ঘরে। টেবিলের মাঝখানে রাখা একখানা বই: “Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling”– John Taylor Gatto.

সভা শুরু করলেন প্রধান শিক্ষিকা সালমা ম্যাডাম, “আজ আমি চাই আমরা একটু নিজেদের দিকে তাকাই। আমরা প্রতিদিন কী শেখাচ্ছি - শুধু পাঠ্যবই, না জীবনের পাঠ? কারণ, স্কুলে আমরা আগে পাঠ দিই, পরে পরীক্ষা নিই। কিন্তু জীবনে আগে পরীক্ষা নেয়, তারপর শেখায় পাঠ।”

কিছুটা নীরবতা। তারপর উঠে দাঁড়ালেন নতুন শিক্ষক রাশেদ স্যার, যিনি “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের আওতায় এখানে এসেছেন। রাশেদ স্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কে প্রথম হওয়া ছাত্র ছিলেন, বাংলা তার বিষয় কিন্তু চোখ কান খোলা, অনুন্ধানী চিন্তা।

স্যার বইটা হাতে তুলে বললেন, “আমেরিকার এক শিক্ষক গ্যাটো, ১৯৯২ সালে এই বইয়ে লিখেছিলেন, স্কুলে শিশুরা আসলে সাতটা গোপন পাঠ শেখে, যা আমরা বুঝিই না।” এবার শিক্ষকরা আগ্রহে শুনছেন, স্যার শিক্ষকদের কাছে তুলে ধরলেন গ্যাটোর চিন্তা গুলো - জন টেলর গ্যাটো বহু বছর স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি শিক্ষক হিসেবে জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার শেষে তিনি এক ভয়াবহ সত্য উপলব্ধি করেন, আমাদের স্কুলগুলো শিক্ষা নয়, বরং ‘বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাকে দুর্বল করে দেওয়ার’ এক কারখানায় পরিণত হয়েছে। গ্যাটো মনে করেন, পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে গোপনে সাতটি শিক্ষা স্কুল আসলে শিশুদের শেখায় -

১. বিভ্রান্তি শেখানো (Confusion) পাঠ্যসূচি অগণিত বিষয়, বিচ্ছিন্ন তথ্য - যার কোনো ধারাবাহিকতা নেই। মুখস্থ করা তথ্য টুকুই ছাত্ররা শেখে। ২. শ্রেণি-বিভাজন শেখানো (Class Position) কে ভালো ছাত্র, কে খারাপ - এই ট্যাগিং ব্যবস্থা সমাজে শ্রেণি-বোধ তৈরি করে। ছাত্ররা তাদের নিজস্ব প্রতিভা হারিয়ে ফেলে। ৩. উদাসীনতা শেখানো (Indifference) ঘণ্টা বাজলেই বিষয় বদলে যায়; শিশুর শেখার মধ্যে কোনো স্থিতি নেই। তারা শেখে, কোনো বিষয়ের গভীরে যাওয়া দরকার নেই। ৪. আবেগগত নির্ভরতা শেখানো (Emotional Dependency) শিশুর প্রতিটি পদক্ষেপ শিক্ষক বা কর্তৃপক্ষের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল। তারা নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস হারায়। ৫. বুদ্ধিবৃত্তিক নির্ভরতা শেখানো (Intellectual Dependency) “ঠিক” উত্তর কেবল শিক্ষকই জানেন, এই ধারণা শিশুদের চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট করে। ৬. শর্তাধীন আত্মসম্মান (Provisional Self-Esteem) শিশুর নিজের মূল্যবোধ অন্যের গ্রেড বা মন্তব্যের ওপর নির্ভর করে। ফলে আত্মবিশ্বাসের পরিবর্তে ভয় ও তুলনা জন্ম নেয়। ৭. নিরন্তর নজরদারি (Constant Surveillance) সব সময় পর্যবেক্ষণ, বাচ্চাদের শেখানো হয় যে “গোপনীয়তা” বা স্বাধীনতা বিপজ্জনক কিছু।

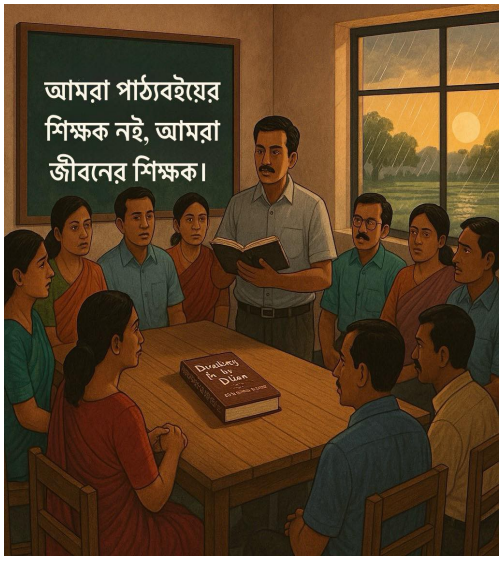

রাশেদ স্যার বইটা বন্ধ করে মৃদু গলায় বললেন, এই চিন্তাগুলো শুধু আমেরিকার জন্য নয়, আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সত্যি প্রযোজ্য। যেখানে সমাজের পরিবেশ ও অর্থনীতি দুর্বল, সেখানে স্কুলের এই গোপন প্রভাব ছাত্রদের মানসিক ভাবে পঙ্গু করে ফেলে। যেমন, এক ছাত্র বাংলা ক্লাস চলা কালীন ভাবলো সূর্যাস্তর একটা সাহিত্য প্রকাশ,“মনোমুগ্ধকর দিগন্ত যেন প্রাণবন্ত রঙের ক্যানভাস। এই সর্বজনীন ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য শান্তি এবং প্রতিফলনের একটি মুহূর্ত, যা বিশ্বের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়।” ঠিক তখনি ঘন্টা বাজলো, আরম্ভ হলো অংকের ক্লাস।

বাংলা ভাষা সাহিত্যে সমৃদ্ধ, প্রাকৃতিক পরিবেশ আর ছয় ঋতুর বৈচিত্র আমাদেরকে ভাবুক করেছে - সেই ছোটকাল থেকে। ছাত্ররা কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করতে সময় নেয়। আমরা যারা শিক্ষকতায় আছি, আমরা জানি এই শিক্ষাব্যবস্থা শিশুদের স্বাভাবিক কৌতূহল, সৃষ্টিশীলতা ও আত্মসম্মানকে ধ্বংস করে দেয়।

স্কুল শিশুদের চিন্তা-ক্ষমতা নষ্ট করে। গল্প, কৌতূহল ও বাস্তব কাজের মাধ্যমে শিক্ষা হতে হবে সমাজ-কেন্দ্রিক, বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রকৃতি ও মানবিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। “শিক্ষা মানে মানুষের স্বাধীনতাকে জাগিয়ে তোলা, তাকে মানিয়ে নেওয়া নয়।” রাশেদ স্যার বললেন, প্রতিটি শিশুর মাঝে প্রতিভা আছে, তার মতো করে। আমরা স্কুলে প্রতিভাকে দমন করি কারণ আমরা এখনও জানি না কীভাবে স্কুলে প্রতিভাকে লালন করতে হয়। তাই আজকের এই সাপ্তাহিক শিক্ষক সভায় আমরা জানার চেষ্টা করবো, ছাত্রদের প্রয়জোন ও আমাদের করণীয়।

ঘরে নীরবতা নেমে আসে। প্রধান শিক্ষক সালমা ম্যাডাম বললেন, “আমাদের শিক্ষা যদি শিশুদের স্বাধীন চিন্তা কেড়ে নেয়, তবে আমরা তো ভবিষ্যৎকে শিকল পরাচ্ছি। গ্যাটো ঠিকই বলেছেন, Education is not about obedience; it’s about awakening.” তিনি জানালেন, পরের সপ্তাহ থেকে স্কুলে “বাস্তব পাঠ দিবস” হবে। প্রতিটি শিক্ষক প্রতি মাসে অন্তত একদিন বইয়ের বাইরে ক্লাস নেবেন - কেউ মাঠে, কেউ নদীর ধারে, কেউ বাজারে। সেদিন কোনো ঘণ্টা বাজবে না। ছাত্ররা নিজের মতো শেখার সময় পাবে।

“আমরা পাঠ্যবইয়ের শিক্ষক নই, আমরা জীবনের শিক্ষক।”

বিকেলের আলো ফুরিয়ে এলে সবাই মাঠের দিকে তাকালেন। কাদা-মাটি শুকোতে শুরু করেছে - হয়তো ঠিক তেমনি শুকোচ্ছে পুরোনো নিয়মের ভার, আর জন্ম নিচ্ছে এক নতুন শিক্ষা - যেখানে “শিশুরা বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এবং ভবিষ্যতের জন্য সেরা আশা।”

ধনুক-ভাঙা পণ – ২০০

“বাংলাদেশের না-বলা গল্প”

কিশোরগঞ্জ জেলার অজপাড়া গ্রাম - চারদিকে শুকনো মাঠ, বাতাসে ধুলার পর্দা, তালগাছের মাথায় কাকের ডাক যেন এক অদৃশ্য হাহাকার। দূরে গরু ঘাস খাচ্ছে স্কুলের মাঠে। চানমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দায় ঝুলছে একটি তালা - শুধু দরজায় নয়, যেন সময়ের উপরও। দুপুরে এসে দাঁড়ালেন প্রধান শিক্ষক সালাম স্যার। ছুটি নয়, কিন্তু ক্লাসে কেউ নেই - না ছাত্র, না শিক্ষক, না অভিভাবক। পাশের দোকানদার হেসে বলল, “স্যার, এখন আপনার স্কুলে ছাত্রের চেয়ে গরু বেশি আসে!” স্যার মাটিতে বসে পড়লেন। তাঁর মুখে হাসি নেই, তবে চোখে আছে একরাশ বিশ্বাস। তিনি জানেন - এই গ্রামের মানুষ গরিব, দিনমজুর, অশিক্ষিত। তাদের ধারণা, ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠালে কাজও নষ্ট হবে। তবু তিনি মনে মনে বলেন, “শিক্ষা দারিদ্র্য থেকে পালানোর পথ নয়, বরং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার হাতিয়ার।”

আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন, “গণতন্ত্র কাগজে না, মানুষের চোখে জন্ম নেয়। আর সেই চোখ খুলে দেয় শিক্ষা।” একদিন স্যার সিদ্ধান্ত নিলেন - অভিভাবকদের ডেকে লাভ নেই, বরং নিজেই যাবেন তাঁদের ঘরে। তিনি গেলেন ধানক্ষেতে, রিকশার গ্যারেজে, মজুরের আড্ডায়। সঙ্গে নিলেন তিনজন ছাত্র - রুবেল, সালমা ও রিনা। তারা প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে বলল, “আমাদের স্কুলে নতুন একটি দল হচ্ছে -‘অভিভাবক চক্র।’ সবাই সদস্য হতে পারবেন। কোনো ফি নেই, শুধু সপ্তাহে এক ঘণ্টা সময়।” স্যার বললেন, “শিক্ষার শিকড় তেতো, কিন্তু ফল মিষ্টি।” কিন্তু কেউ পাত্তা দিল না। কেউ বলল, “স্যার, সারাদিন খাটি, স্কুলে যাই কেমনে?” কেউ বলল, “আমার ছেলেমেয়ে বড় হইলে কাজে লাগবে, স্কুলে গেলে লাভ কী?” স্যার চুপ করে রইলেন, কিন্তু প্রতিটি কথাই লিখে রাখলেন নোটবুকে - শিরোনাম: “বাংলাদেশের না-বলা গল্প।” পরের শুক্রবার, স্কুলের মাঠে বড় গাছটার নিচে কয়েকটা চেয়ার রাখলেন স্যার। মাঝখানে একটি পুরোনো কেটলি, তাতে ধোঁয়া ওঠা চা। বাতাসে মিশে আছে মাটির গন্ধ ও সম্ভাবনার সুবাস। স্যার বললেন, “আজ চা আমার, গল্প আপনাদের।” ধীরে ধীরে এলেন ছয়জন অভিভাবক। চুপচাপ বসে শুনছেন স্যার। তাদের চোখে ক্লান্তি, কিন্তু মনে কৌতূহল। তারা বলল, “স্যার, আমাদের ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় না, কারণ লেখাপড়া আমাদের কাজে লাগে না।” স্যার চুপচাপ চা ঢেলে দিলেন কাপে, তারপর বললেন - “কাজে না লাগলেও আপনাদের নাম লাগবে, কারণ একদিন আপনার সন্তানের বইয়ে লেখা থাকবে, একজন কৃষকের ছেলে, একজন মজুরের মেয়ে, যাদের বাবা-মা স্কুলে ফিরিয়ে এনেছিলেন ভবিষ্যতকে।” স্যার শুনালেন অনুপ্রেরণার গল্প, ১. নাসরিনের গল্প – ঝিনাইদহের মেয়ে এখন নার্স। একজন দিনমজুরের মেয়ে, যাকে একসময় বাবা বলেছিলেন, “মেয়ে মানুষ, লেখাপড়া করে লাভ কী?” আজ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নার্স। যে হাত একসময় কাঁথা সেলাই করত, এখন সেই হাত ইনজেকশন দেয় - জীবন বাঁচায়। স্যার বললেন, “শিক্ষা মানে পরিবারকে গর্বিত করা, শুধু চাকরি নয়।” ২. মিজান মিস্ত্রির গল্প – কাঠের কাজ থেকে কারিগরি শিক্ষক। মিজান একসময় কাঠে মাপ দিত, আজ ছাত্রদের জীবনে মাপ শেখায়। একদিন স্যার বলেছিলেন, “তুমি যদি কাজ ভালোবাসো, তবুও পড়া দরকার - যাতে কাজের মর্যাদা বোঝো।” এখন মিজান পলিটেকনিকের শিক্ষক, বলে, “এই হাতুড়ি দিয়ে আমি ভবিষ্যৎ গড়ি।” ৩. আবদুল জলিল – দিনমজুর থেকে চেয়ারম্যান। জলিল সাহেব বাঁশ কেটে জীবিকা চালাতেন। মেয়ের সঙ্গে বসে অক্ষর শেখেন, এখন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, “যেদিন নাম লিখতে শিখলাম, সেদিন ভাগ্য বদলাল।” স্যার ব্যাখ্যা করলেন,

“শিক্ষা শুধু সন্তানের নয়, বাবা-মায়েরও পুনর্জন্ম।” ৪. জুবায়ের – কৃষকের ছেলে থেকে বিজ্ঞানী। ধানক্ষেতের ঘ্রাণে বড় হওয়া জুবায়ের আজ জার্মানিতে কৃষি প্রযুক্তি গবেষক। বাবা একসময় বলতেন, “বই পড়ে কি ধান ফলবে?” এখন বলেন, “আমার ছেলে ধান ফলানোর নতুন উপায় শেখাচ্ছে!” স্যার বললেন, “যে সন্তানকে মাঠে দেখতে চেয়েছিলেন, সে আজ বিশ্বমঞ্চে দেশের পতাকা তোলে।” ৫. “স্কুলে যেও না” থেকে “স্কুলে নিয়ে যাই”। নেত্রকোণার এক বাবা বলতেন, “ছেলে স্কুলে গেলে কাজ কে করবে?” স্যার দেখালেন, কিভাবে বিদ্যুৎ দিয়ে পানি তোলা যায়। ছেলেটা মুগ্ধ হলো, ভর্তি হলো স্কুলে। এখন সে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার - নিজ গ্রামে পানির মোটর বসায়। বাবা আজ গর্বে বলেন,

“ছেলে কাজে লাগে যদি সে শিক্ষা পায়।” চায়ের কাপ শেষ, কিন্তু গল্পের শেষ নেই।

স্যার বললেন, “আমাদের সন্তানদের পড়ানো মানে শুধু তাদের কপালে চাকরি লেখা নয়, বরং ঘরে আলো জ্বালানো। যার ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায়, সে শুধু পরিবারের নয়, জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে।” সেদিন সবাই একসাথে বলল, “স্যার, আমরা মাসে একবার আসব। আমার সন্তানের পাশে আমি থাকব।” তিন মাস পর, স্কুলের বারান্দায় ঝুলল একটি বোর্ড - “আমরা গর্বিত অভিভাবক: ৫৭ জন।” প্রতিটি নামের পাশে লেখা - “আমি আমার সন্তানের পাশে আছি।” প্রতি মাসে তারা আসে - কেউ ঘাস কাটে, কেউ বেঞ্চ মেরামত করে, কেউ ফুল লাগায়, কেউ শিশুদের ফল দেয়। একজন বৃদ্ধ বলেন, “স্যার, আমি পড়তে জানি না, কিন্তু আমি এই স্কুলের পাহারাদার হব।” অন্যজন বলেন, “আমার ছেলেটা পড়ুক, আমার মতো না হোক।” একদিন জেলা শিক্ষা অফিসার এলেন পরিদর্শনে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “স্যার, আপনার স্কুলে তো কোনো বিশেষ অনুদান পাইনি, তবু এত উন্নতি কেমন করে?” স্যার মৃদু হেসে বললেন, “স্যার, আমরা সমাজের ভাঙা বিশ্বাসটা মেরামত করেছি। আমরা শুধু শিশুদের শেখাইনি, অভিভাবকদেরও শিখিয়েছি - স্কুল শুধু দেয় না, নেয়ও ভালোবাসা।”

চানমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দায় আজ শুধু নাম লেখা হয়নি - লেখা হয়েছে এক জাতির প্রতিশ্রুতি। এই ৫৭ জন অভিভাবকই আজ বাংলাদেশের নতুন সংবিধান লিখছেন, যার প্রথম অনুচ্ছেদ - “শিক্ষা আমার অধিকার নয়, আমার দায়িত্ব।” “যেদিন সমাজের হাত স্কুলের হাতে মেলে, সেদিনই শুরু হয় জাতির নবজন্ম।”

ধনুক-ভাঙা পণ – ২০৩

“উন্মুক্ত বই, উন্মুক্ত মন”

বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার এক প্রাথমিক স্কুলে আজ এক বিশেষ সভা। সভায় প্রধান বক্তা সত্যজিৎ রায় স্যার - বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে স্নাতক, এখন ‘শিক্ষা-ই-শক্তি’ প্রকল্পের অধীনে এক বছরের জন্য আমতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন।

সত্যজিৎ স্যার রসায়নের ছাত্র, তার রসায়ন ভালো লাগে, ভালো লাগে বিভিন্ন elements (উপাদান) এর সঙ্গে বিভিন্ন elements এর বিক্রিয়া। তার চাইতেও ভালো লাগে, রসায়ন বিজ্ঞানের এক উক্তি, "পড়ে ভুল যাও, তারপর মন থেকে অন্য রূপে ফিরে আনো” অর্থ হল, রসায়নে বিষয়বস্তু এত বিস্তর যে বিপুল পরিমাণে তথ্য, প্রতিক্রিয়া এবং বিবরণ মুখস্থ করার প্রয়োজন হয়, ফলে তথ্যের অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিতে রাখা সম্ভব হয় না। মস্তিষ্ক তখন তথ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে, যাতে পরে প্রয়োজন হলে সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে জ্ঞানকে পুনর্গঠন করা যায়। তাই স্যার ভাবেন, বর্তমান ইন্টারনেট তথ্য এবং AI-এর যুগে শিক্ষা ব্যবস্থায় মুখস্থর কোন স্থান নেই।

সত্যজিৎ স্যার মনে করেন - শিক্ষার মূল্য সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা বোঝার মধ্যে নিহিত, মুখস্থ করার মধ্যে নয়। যেমন, আলবার্ট আইনস্টাইন এর উক্তি, “যা খুঁজে বের করতে পারো, কখনোই মুখস্থ করো না"। আমরা আজ এমন এক যুগে আছি যেখানে তথ্য এক ক্লিক দূরে। তাই মুখস্থের দিন শেষ; এখন দরকার বোঝার ক্ষমতা, বিশ্লেষণের শক্তি, আর সৃজনশীল চিন্তা। জ্ঞান মানে শুধু জানা নয়, জ্ঞান মানে সেই জানা দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করার ক্ষমতা। শিক্ষার আসল শক্তি হলো প্রশ্ন করা, আর প্রশ্ন থেকেই জন্ম নেয় সৃষ্টি।

ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাজ্য, কানাডা, হংকং, নেদারল্যান্ডস সহ বেশ কয়েকটি দেশ তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে “উন্মুক্ত বই” পরীক্ষা ব্যবহার করে। বোর্ডে বড় করে লেখা - “উন্মুক্ত বই, উন্মুক্ত মন” শিক্ষক সত্যজিৎ স্যার ধীর কণ্ঠে বললেন, “আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করছি যেখানে মুখস্থ নয়, বোঝা, বিশ্লেষণ, আর সৃজনশীলতাই হবে জয়ের চাবি। যেখানে খোলা বই নিয়ে ছাত্ররা পরীক্ষা দেবে।” কিন্তু শিক্ষকরা কিছুটা দ্বিধায়। রাজীব স্যার বললেন, “খোলা বই পরীক্ষায় যদি সবাই বই দেখে লিখে, তবে বুদ্ধি যাচাই হবে কীভাবে?” সত্যজিৎ স্যার - “ঠিক তাই তো, রাজীব। এজন্য প্রশ্নের ধরন পাল্টাতে হবে, যে প্রশ্নে বই নয়, মনের জানালা খুলতে হয়। যেখানে থাকবে প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সৃষ্টি।”

দশম শ্রেণির ক্লাসে গণিত পড়াচ্ছেন রাজীব স্যার। আজ তাঁর প্রথম উন্মুক্ত বই পরীক্ষা। প্রশ্ন ছিল, “একজন দোকানি দুইভাবে ছাড় দিয়ে ক্রেতাকে বেশি লাভ দেয়। বই থেকে সূত্র খুঁজে, বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করো।”

ইতিহাসের স্যারের প্রশ্ন - “‘স্বাধীনতার ইতিহাস’ অধ্যায়টি পড়ো। তৎকালীন একটি সামাজিক আন্দোলনের কারণ ও এর বর্তমান প্রভাব লিখো। বইয়ের তথ্য ও তোমার নিজের মত দুটোই উল্লেখ করো।”

আর একটা প্রশ্ন ছিলো - “দুটি ভিন্ন অধ্যায় বেছে নাও (যেমন বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান)। দেখাও কীভাবে এই দুটি বিষয়ের ধারণা বাস্তব জীবনের এক সমস্যার সমাধানে একসঙ্গে কাজ করতে পারে।”

• প্রশ্ন যেন বই না খুলে উত্তর দেওয়া সম্ভব না হয় । • তুলনা, ব্যাখ্যা, প্রয়োগ, ও সৃষ্টি - এই ধরণের ক্রিয়া-শব্দ ব্যবহার। • একাধিক সঠিক উত্তর থাকতে পারে। • ছাত্রকে বইয়ের তথ্য ও নিজের অভিজ্ঞতা - দুটোই মিলিয়ে লিখতে উৎসাহিত করা।

ছাত্ররা প্রথমে অবাক। কেউ বইয়ের পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে, কেউ চিন্তা করছে, কিন্তু সুমনা নামের এক ছাত্রী চোখ তুলল - “স্যার, বইয়ে এই প্রশ্নের উত্তর নেই। আমি কি নিজের যুক্তিতে লিখতে পারি?” রাজীব স্যার হেসে বললেন, “এই তো উন্মুক্ত বই পরীক্ষার আসল জায়গা - বইটা তোমার সহায়ক, উত্তরটা তোমার মস্তিষ্কের।”

পরীক্ষা শেষে শিক্ষক লাউঞ্জে আলোচনা, অনেকে বলছেন, “এটা বাচ্চাদের জন্য সহজ হয়ে গেল।” আর কেউ কেউ বলছেন, “ক্লাসে বই ঘেঁটে সময় নষ্ট করছে।” কেউ বলছেন, “শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার উদ্বেগ অনেকটাই কমে এসেছে। কারণ, সূত্র এবং সংজ্ঞার মতো তথ্য সম্বলিত 'ফ্যাক্ট শিট' পরীক্ষার সময় দেয়া হচ্ছে।”

সত্যজিৎ স্যার বললেন, “আমরা ভুলে যাচ্ছি, open book মানে open mind। বুদ্ধিমত্তার সাথে তথ্য খুঁজে বের করতে, ফিল্টার করতে এবং প্রয়োগ করতে শিখছে। যে ছাত্র নিজের অভিজ্ঞতা, বইয়ের তথ্য আর জীবনের যুক্তি মিলিয়ে উত্তর দেবে, সে-ই আগামী দিনের AI যুগের কর্ণধার হবে।”

তিনি প্রস্তাব দিলেন, প্রতি মাসে শিক্ষকরা মিলে “Open Question Workshop” করবে, যেখানে সবাই মিলে আলোচনা করবে - কীভাবে এমন প্রশ্ন তৈরি করা যায়, যাতে বই দেখা নয়, চিন্তা করাই হয় আসল পরীক্ষা।

পরীক্ষার পর ছাত্রী সুমনা ডায়েরিতে লিখল,

“আগে ভাবতাম পরীক্ষার মানে মুখস্থ করা। এখন বুঝছি, পরীক্ষা মানে ভাবা, বোঝা আর নিজের মত প্রকাশ করা। বইটা পাশে ছিল, কিন্তু আসল উত্তরটা খুঁজতে হয়েছে নিজের ভেতরে।”

খোলা বই পরীক্ষার পথ সহজ নয়। প্রথমে শিক্ষককে শিখতে হবে প্রশ্ন করা, তারপর ছাত্রকে শিখতে হবে চিন্তা করা। কিন্তু একবার এই সংস্কৃতি তৈরি হলে, স্কুল আর শুধু পরীক্ষার কেন্দ্র থাকবে না - তা হবে চিন্তার ল্যাবরেটরি।

কারণ শিক্ষা তখনই সত্যি মুক্ত হয়, যখন বই খোলার সঙ্গে সঙ্গে মনও খুলে যায়।

ধনুক-ভাঙা পণ – ২০২

“তুমি কোন যুগের যোদ্ধা?”

গাইবান্ধা জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ রোববার সকাল। শপ্তম ক্লাসে আসলেন নতুন শিক্ষক - আনিস স্যার। স্যার ইতিহাসের ছাত্র, ইতিহাসেই রয়েছে মানব জাতির পরিচয়। বিজ্ঞান ও মানব অগ্রগতির সূক্ষ্ম যোগসূত্র শুধু ইতিহাস থেকেই পাওয়া যায়। স্যার মনে করেন, ছাত্রদের সামনে ইতিহাসকে তুলে ধরা দরকার, যাতে তারা বুঝতে পারে, তাদের আরাম শুধু সৌভাগ্য নয়, বরং বিজ্ঞান ও মানুষের মেধার জয়ের ফল। আজ স্যারের হাতে কোনো বই নেই, বোর্ডে লিখলেন তিনটি বছর - ১৮২৫, ১৯৯৫, ২০২৫

স্যার বললেন, “আজ আমরা বই পড়ব না। আমরা সময়ের সঙ্গে দেখা করব।” ছাত্ররা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

স্যার শুরু করলেন ধীরে ধীরে, “১৮২৫ সালে পৃথিবীতে মানুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৩৫ বছর। শিশুদের এক তৃতীয়াংশ পাঁচ বছর পূর্ণ করার আগেই মারা যেত। একটি সাধারণ সংক্রমণ, একটি ক্ষত, বা এক ফোঁটা নোংরা পানি - এগুলোই তখন মৃত্যুর কারণ। বিদ্যুৎ ছিল না, টিকা ছিল না, স্যানিটেশনও না। মানুষ দিনে ১২ ঘণ্টা মাঠে কাজ করত, ঘর বানাত নিজের হাতে, খাবার পেতো ভাগ্য ভালো থাকলে।

তবুও তখনকার তরুণেরা সাহসী ছিল - তারা যুদ্ধ করত, চাষ করত, পরিবার গড়ত। তাদের জীবন ছিল ছোট, কিন্তু দায়িত্বে বড়।”

স্যার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। শ্রেণিকক্ষে এক নিস্তব্ধতা। “এবার ভাবো ১৯৯৫ সালের কথা,” স্যার বললেন। “তোমার বাবা-মা তখন স্কুলে। তখন মোবাইল ফোন ছিল বিরল, ইন্টারনেট মানে ছিল লাইব্রেরির ধুলো ঝাড়া এনসাইক্লোপিডিয়া আর বই। একটা প্রবন্ধ লিখতে পুরো বিকেল লেগে যেত, এক একটা তথ্য খুঁজতে সময় লাগত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু তখনও তারা শিখত, কারণ তাদের মধ্যে ছিল ধৈর্য, পরিশ্রম আর সময়ের প্রতি শ্রদ্ধা।” আরও বললেন, “১৯৯৫ থেকে শুরু হলো নতুন যুগ - বিজ্ঞানের, কম্পিউটারের, এবং যোগাযোগের বিস্ফোরণ। মানুষ চাঁদে পা রাখার পর এখন স্যাটেলাইট দিয়ে প্রতিদিন পৃথিবীকে ঘুরে দেখছে। তবুও মানুষের চ্যালেঞ্জ তখনও ছিল - জ্ঞান অর্জন করা।”

স্যার বোর্ডে লিখলেন বড় করে— ২০২৫। তারপর ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এবার তোমরা! তোমাদের হাতে আছে ইন্টারনেট, AI, ChatGPT, ভার্চুয়াল ল্যাব, ডিজিটাল লাইব্রেরি। তোমরা যে কোনো প্রশ্নের উত্তর কয়েক সেকেন্ডে পেয়ে যাও। তবুও অনেক সময় তোমরা বলো - স্যার, সময় পাই না, মন বসে না।” “দেখো, এই যুগে যুদ্ধটা আর শরীরের নয়, এটা মনোযোগের, চিন্তার, আর সত্যের। ১৮২৫ সালে মানুষ বাঁচতে লড়ত প্রকৃতির সঙ্গে, তোমরা লড়ছো নিজেদের ভেতরের বিভ্রান্তি, নেশা, আর অলসতার সঙ্গে। তোমাদের যুদ্ধটা হচ্ছে - তথ্যের পাহাড়ের নিচে সত্যকে খুঁজে পাওয়া।”

একজন ছাত্র চুপচাপ বলল, “স্যার, তাহলে আমাদের যুদ্ধ কিসের?” স্যার হাসলেন, ধীরে বললেন - “তোমাদের যুদ্ধ হলো মনোযোগের জন্য, মানবতার জন্য, আর সত্যের জন্য। তোমাদের হাতে এমন প্রযুক্তি আছে, যা আগের সব প্রজন্মের স্বপ্নেরও বাইরে। কিন্তু প্রযুক্তি শুধু হাতিয়ার, যোদ্ধা হতে হলে তোমাদের মনকে জাগাতে হবে।”

স্যার বোর্ডে লিখলেন—

“তুমি কোন যুগের যোদ্ধা?” তারপর বললেন, “প্রত্যেক যুগেই বীর ছিল। কেউ লড়েছে রোগের সঙ্গে, কেউ প্রকৃতির সঙ্গে, কেউ যুদ্ধের সঙ্গে। তোমরা যদি নিজের বুদ্ধি, কৌতূহল ও প্রযুক্তিকে মানবতার সেবায় ব্যবহার করো, তবে তোমরাই হবে এই যুগের বীর। তোমাদের অস্ত্র হলো জ্ঞান, আর যুদ্ধক্ষেত্র হলো তোমাদের মস্তিষ্ক।”

ক্লাস শেষে ছাত্ররা বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে – তাদের চোখে এখন কেবল বই নয়, একটা নতুন প্রশ্ন জ্বলছে – “আমি কি আমার যুগের যোদ্ধা?” বোর্ডে তখনও রয়ে গেছে স্যারের লেখা, “১৮২৫ সালে মানুষ লড়ত টিকে থাকার জন্য, ১৯৯৫ সালে লড়ত শেখার জন্য, ২০২৫ সালে লড়াই মনোযোগ আর সত্যের জন্য।” ছাত্ররা নিজেদের ইতিহাসের সঙ্গে নিজেদের বর্তমানকে ভাবলো। তাদের মনে হলো - “ইতিহাস মানে শুধু অতীত নয়, এটা আমাদের চিন্তার আয়না। আমরা যেমনভাবে চিন্তা করি, ঠিক তেমনি ভবিষ্যৎ তৈরি হয়।”

স্যার জানতেন, এই ভাবনাটাই হলো শিক্ষার মূল লক্ষ্য, ছাত্র যেন শুধু তথ্য মুখস্থ না করে, বরং ইতিহাস থেকে নিজের অবস্থানটা চিনে নেয়।

“দেখা ও অদেখার প্রতি শ্রদ্ধা”

মাদারীপুর জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ এক বিশেষ দিন - বিদ্যালয়ে চলছে “মানবিক শিক্ষা সপ্তাহ”।এই উদ্যোগের মূল উদ্যোক্তা ইসলাম স্যার, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজে ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি চান ছাত্ররা যেন ধর্মশিক্ষাকে শুধু বিধান বা তত্ত্ব হিসেবে না দেখে, বরং সেটিকে মানবিকতার বাস্তব প্রয়োগ হিসেবে বোঝে।

ইসলাম স্যার সবসময় বলেন, “মানবতার চেয়ে কোনো ধর্মই বড় নয়। তোমার ধর্মকে তত্ত্বের চেয়ে প্রেমের সম্পর্কে রূপ দাও - তবেই তা সত্যিকারের ধর্ম হবে।” মানবিক শিক্ষা সপ্তাহের আজ তৃতীয় দিন। আজকের বিষয়: “যাদের দেখি না, তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা।”

শিক্ষার্থীরা ভেবেছিল আজ হয়তো বক্তৃতা প্রতিযোগিতা বা ছবি আঁকার অনুষ্ঠান হবে। কিন্তু নয়।

ইসলাম স্যার বললেন, “আজ আমরা যাব স্কুলের পাশের সেই পুরনো কবরস্থানে - যেখানে আমাদের গ্রামের প্রথম দিককার শিক্ষক, কৃষক, মুক্তিযোদ্ধা, সাধারণ মানুষ, ডাক্তারদের কবর আছে।”

সবাই অবাক। একজন ছাত্র বলল, “স্যার, আমরা ওনাদেরকে তো চিনি না!” স্যার মৃদু হেসে বললেন,

“তোমরা চেনো না, কিন্তু যা জানো, যা শিখছো - তার প্রতিটি বীজ কোথাও না কোথাও তাঁদের হাতেই রোপিত।তোমরা জানো, ওনাদের লাগানো গাছের ছায়ায় আমরা বসে থাকি। তাই আমাদের উত্তরাধিকারদের শ্রদ্ধা জানানো শুধু পরিচয়ের জন্য নয়, মানবতার জন্য।”

ইসলাম স্যার, শিক্ষার্থীদের কবর জিয়ারত করার দোয়ার মানে বিশ্লেষণ করলেন, - ‘কবরবাসী! আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের ক্ষমা করুন। আপনারা আমাদের পূর্বসূরি, এবং আমরা আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী’, সবাই মিলে দরুদ শরীফ, সুরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি এবং সুরা ইখলাস পাঠ করলো।

কেউ নীরবে চোখ মুছলো। স্যার বললেন, “তোমরা জানো, আমরা যাদের দেখি না - তাদেরও কোনো না কোনো অবদান আছে আমাদের জীবনে। কেউ হয়তো এই স্কুলের পরিকল্পনা করেছিলেন, মাটি কেটেছিলেন, কেউ হয়তো প্রথম দাতাদের একজন, আমাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন।”

বাতাসে হালকা পাতা নড়ল, যেন অদৃশ্য কোনো স্পর্শ বলল - “আমরা এখানেই আছি।” একটি বিশেষ মুহূর্ত, একটি ছোট মেয়ে, শ্রেয়া, হঠাৎ মাটির ওপর বসে গেল। সে মাটিতে আঙুল দিয়ে লিখল - “ধন্যবাদ” স্যার কাছে গিয়ে বললেন, “কাকে ধন্যবাদ দিলে?” শ্রেয়া উত্তর দিল, “যাদের আমি চিনিনা, কিন্তু ওনারা না থাকলে আমি এখানে পড়তে পারতাম না।”

সেই দিনের পর থেকে স্কুলে একটা নতুন রীতি শুরু হলো। প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার সকালে, পুরো ক্লাস নীরবে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে - আর মনে মনে স্যারের শেখানো দোয়া পরে। “যাদের দেখি না, কিন্তু যাদের কারণে আমরা আছি”—তাদের সম্মানে।

ইসলাম স্যার বললেন, “সম্মান মানে শুধু নত হওয়া নয়, বোঝা। যে শিশু অদেখার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শেখে, সে একদিন দেখা দুনিয়াকেও আরও ভালো করে গড়বে।”

শিশু ছাত্রদের জন শিক্ষা হলো -

“নিজের থেকে এগিয়ে যাও এবং আন্তরিক ভালোবাসো, শ্রদ্ধা, যত্ন এবং অন্যের অবদান ও চাহিদা বোঝার মাধ্যমে অন্যদের কাছে পৌঁছাও। পৃথিবীকে আলিঙ্গান করো, সকলকে সম্মান করো এবং উপলব্ধি করো - তুমি যা জানো এবং যা জানো না, উভয়ই তোমার জগতের অংশ।”

শিশু-কিশোরদের মাঝে দরকার এক নীরব জ্ঞানের বিকিরণ - যা হবে নম্রতার আলো, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের সংযোগ, জ্ঞান ও রহস্যের সেতুবন্ধন, বিশ্বাস ও মানবতার মিলনস্থল।

যেখানে নৈতিক শিক্ষা ধর্মীয় মূল্যবোধকে অতিক্রম করে পৌঁছে যাবে সর্বজনীন মানবতার উচ্চতায়।

“গাছের পাতায় আলোর খেলা।”

ঝালকাঠি জেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলটির নাম - “নিশ্ছিদ্র শিক্ষা উদ্যান।”

এখানে কোনো তাড়া নেই, কোনো প্রতিযোগিতা নেই। এখানে শেখা মানে বৃদ্ধি পাওয়া, দৌড়ানো নয়। সোহাগ স্যার উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্র, গাছ নিয়ে যত গবেষণা, স্যারের উপলব্ধিতে চারা গাছ অনেক নাজুক হয়, চারা গাছের প্রয়জোন একটি নির্ভরযোগ্য পরিবেশ। যেখানে, নিরাপত্তা, আলো, পানি ও বাতাস থাকবে। এই পরিবেশই চারা গাছকে একদিন স্বাবলম্বী করবে ঝড়ের মুখোমুখি হবার জন্য। তাই সোহাগ স্যার বলেন, “একটি গাছের মতোই, একটি শিশুও বেড়ে ওঠে যত্নে, তাড়ায় নয়। আমি কোনো শিশুকে টেনে বড় করি না, আমি শুধু তাদের চারপাশে আলো, পানি আর ভালোবাসা ছড়িয়ে দিই।উদ্ভিদের মতোই শিশুর মনও সংবেদনশীল। আলো - বাতাসের অভাবে যেমন গাছ শুকিয়ে যায়, তেমনি তাড়াহুড়োর শিক্ষায় শিশুর মেধাও ম্লান হয়ে যায়।

তাঁর এই দর্শনেই এই স্কুলের বিশেষ নিয়ম - নতুন ক্লাসে প্রথম তিন মাস, ক্লাসের নতুন বই নিয়ে দেখা ও নাড়াচাড়া কিন্তু পড়া নয়, প্রথম তিন মাস পুরনো বইয়ের নতুন পাঠ। ক্লাস থ্রি, ফোর ও ফাইভ‘র এর ছাত্রছাত্রীরা জানে - ‘রিভিউ মানে পরীক্ষা নয়, আবার যাত্রা।’ তারা পুরনো অধ্যায়গুলো আবার খুলে পড়ে, কিন্তু এবার গল্পের মতো, হাসির মতো, জীবনের মতো।

স্যার বলেন, “বাচ্চারা যখন কোনো বিষয় তিন মাস ধরে পুনরায় আবিষ্কার করে, তখন সেটি হৃদস্থ হয়ে যায়। ভালোবাসার বিষয় হয়ে যায়।” বই এর কথা গুলো, গল্পের চরিত্র গুলো সব জীবন্ত হয়ে কাছে চলে আসে। “Good writing is essentially rewriting.” নিজের চিন্তাকে পরিমার্জিত করার ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার গুরুত্ব অনেক, এটি খুব ফলপ্রসূ।

একদিন এক অভিভাবক বললেন, “স্যার, এত সময় কেন? অন্য স্কুলগুলো তো ইতিমধ্যে নতুন বই শেষ করছে।”

সোহাগ স্যার হেসে বললেন, “আমি কোনো গাছের চারা টেনে দেখি না কতটা লম্বা হলো। আমি শুধু তার চারপাশে মাটি নরম করি, পানি দিই, স্নিগ্ধ রোদে রাখি। ও নিজে থেকেই বড় হয়।”

এই স্কুলে প্রতিদিন সকাল শুরু হয় এক ঘণ্টার “চিন্তার সময়” দিয়ে, ছাত্ররা গত ক্লাসের গল্প, সূত্র, বা পাঠ নিজে নিজে ব্যাখ্যা করে। কেউ চার্ট বানায়, কেউ নাটক করে, কেউ গান বানায়, কেউ রংতুলিতে আঁকে। তারা শেখে - শেখা মানে তাড়া নয়, উপলব্ধি।

তিন মাস শেষে স্কুলে হয় “Confidence Fair” - ছাত্ররা নিজেদের শেখার গল্প প্রদর্শন করে: “এই সূত্রটা বুঝতে আমার ৩ দিন লেগেছিল, “এই কবিতাটা এখন আমি নিজের মতো বলতে পারি।” এখানে সাফল্যের মানদণ্ড একটাই, তুমি নিজের গতিতে কতটা বেড়েছো।

স্যার বলেন, “যেমন একটি গাছের পাতায় আলাদা আলাদা রঙ থাকে, তেমনি প্রতিটি শিশুর শেখার রঙও আলাদা। আমাদের কাজ সেই রঙগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা।”

“শিক্ষার সবচেয়ে বড় শত্রু হলো তাড়াহুড়া। যে স্কুলে সময়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে, সেই স্কুলেই শিশুরা সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে।”

এক বৃষ্টির দিনে সোহাগ স্যার স্কুলের জানালায় তাকিয়ে দেখলেন, ছাত্ররা মাঠে গাছ লাগাচ্ছে, মাটির গন্ধ, বৃষ্টির ছোঁয়া, আর শেখার মৃদু আনন্দ - এই তিনই ‘নিশ্ছিদ্র শিক্ষা উদ্যান’ - এর পাঠ।

“দশম শ্রেণির শেষ ক্লাস”

(বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “আরণ্যক” থেকে অনুপ্রাণিত)

দিনাজপুর জেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজ দশম শ্রেণির শেষ ক্লাস, চূড়ান্ত HSC পরীক্ষার আগে শেষ দিন। সামনে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আর জীবনের নতুন অধ্যায়। পনেরো-ষোলো বছরের এই তরুণদের চোখে এখন স্বপ্ন, কৌতূহল, আর এক ধরনের অদেখা অস্থিরতা - নিজেকে চিনতে চায়, সমাজকে কিছু দিতে চায়, পৃথিবীতে নিজের অর্থ খুঁজে পেতে চায়।

বাংলা বিষয়ের মহিত স্যার আজ ওদের বইয়ের বাইরে এক অন্য পাঠ দিতে চান। তিনি জানেন, পড়াশোনার সীমা শুধু পরীক্ষার খাতায় নয়, জীবনের ভেতরেই তার প্রকৃত মানে লুকিয়ে আছে। আজ তিনি চান ছাত্ররা বুঝুক - জীবনের অর্থ নম্বর নয়, বরং মানুষ হওয়া।

স্যার জানালার দিকে তাকিয়ে ধীরে বললেন, “একজন মানুষ যতদিন নিজের ছোট স্বার্থের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর মানবতার দিকে পৌঁছাতে না পারে, ততদিন সে সত্যিকারের বাঁচতে শুরু করে না।”

স্যারের হাতে আজ কোনো বই নেই, কোনো নোটও নেই। শুধু একটা পুরনো বই -“আরণ্যক”, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি বাস্তবধর্মী উপন্যাস।

শ্রেণিকক্ষে নীরবতা। সবাই ভেবেছিল স্যার হয়তো পরীক্ষা বা নম্বরের কথা বলবেন। কিন্তু স্যার বোর্ডে বড় করে লিখলেন: “মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কটাই সভ্যতার প্রথম পাঠ।”

তারপর বললেন,

“আমরা আজ তোমাদের শেষ ক্লাসে বই পড়ব না, মানুষ হওয়ার গল্প পড়ব।”

স্যার ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন সত্যচরণের গল্প:-

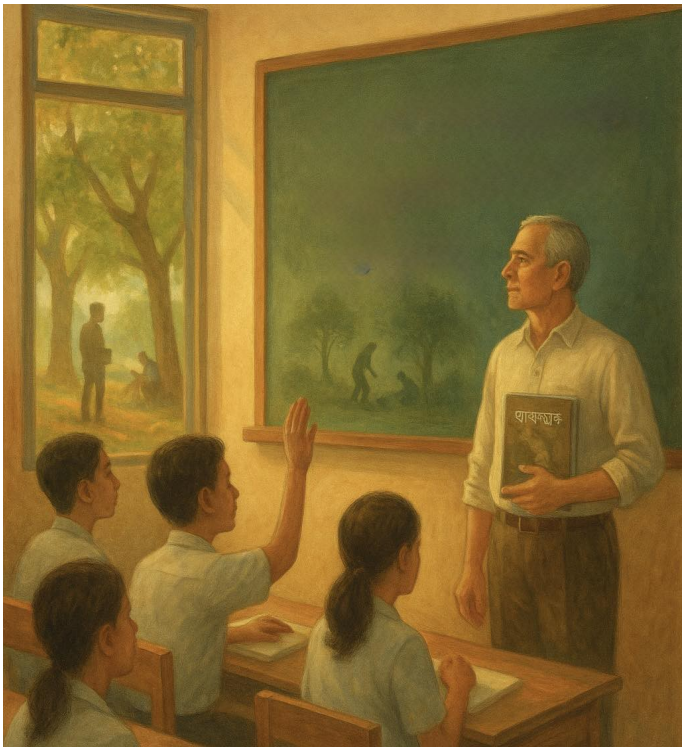

একজন শহুরে তরুণ, কাজের খোঁজে জঙ্গলে এসেছিল, যেখানে সভ্যতার কোলাহল নেই, আছে গাছের নিশ্বাস, পাখির ডাক, আর সরল মানুষের জীবন। সত্যচরণ জঙ্গলের মানুষের সাথে মিশতে পারেনি পুরোপুরি, কিন্তু তাদের দেখে শিখেছিল এক শিক্ষা - “সরলতার সৌন্দর্য।” স্যার বললেন,

“রাজু পাঁড়ে ক্ষুধায় থেকেও কবিতা হারায়নি, যুগলপ্রসাদ নিজের অর্থ ব্যয় করে ফুল গাছ রোপণ করেছে বনে, আর ধাওতাল সাহু - যে মহাজন হয়েও লোভী নয়, দয়ালু। এই মানুষগুলোর ভিতরেই লুকিয়ে আছে সেই প্রকৃত মানুষ হওয়ার পাঠ।”

ছাত্র ছাত্রীরা চুপচাপ শুনছে।

রিদয় নামের এক ছাত্র হাত তুলল, “স্যার, সত্যচরণ কি ব্যর্থ? সে তো জঙ্গলের কেউ না, চলে যায় শেষে...”

স্যার মৃদু হেসে বললেন,

“না রিদয়, সত্যচরণ ব্যর্থ নয়। সে আমাদের মতোই - যে প্রতিদিন কংক্রিটের ভেতর থেকেও প্রকৃতিকে খোঁজে, ভালো মানুষ হতে চায়। সে বুঝেছিল - মানুষের আসল পরিচয় তার পেশায় নয়, তার হৃদয়ের নির্মলতায়। তাই সে চলে গেলেও, বন তার ভেতরে রয়ে যায়।”

ক্লাসে নিস্তব্ধতা। জানলার বাইরে বাতাসে পাতা নড়ে উঠল, যেন জঙ্গলেরই কোনো অজানা ভাষা।

স্যার ধীরে বললেন, “তোমরা যদি জীবনে বড় কিছু হতে চাও - ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী - সব হতে পারো। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি মানুষটাও বড় হয়ে যাও, তাহলেই সফল হবে। ‘আরণ্যক’ আমাদের শেখায় - প্রকৃতি যেমন দেয়, তেমনি মানুষকেও দিতে জানতে হয়।” বেল বাজল।

ছাত্ররা উঠে দাঁড়াল। কেউ কথা বলছে না। স্যার শুধু বললেন, “তোমরা গাছ লাগাও, প্রাণীর প্রতি দয়া দেখাও, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা রাখো - এই হলো সত্যচরণের উত্তরাধিকার।”

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে স্যার দেখলেন,

প্রতিটি ছাত্র যেন একটু আলাদা আলোয় ভরে উঠেছে - কেউ সত্যচরণের মতো ভাবুক, কেউ রাজুর মতো নির্লোভ, কেউ হয়তো যুগলপ্রসাদের মতো জীবনভর ফুলের গাছ লাগাবে মাটিতে।

স্যারের তখন মনে হলো,

আজ তাঁর এই শেষ ক্লাসে আর একটি পাঠ নয় - একটি বীজ বোনা হলো। মানুষ হওয়ার বীজ।

ধনুক-ভাঙা পণ – ২০৬

“চড়ই পাখির ক্লাস”

পাবনা জেলার রামনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মিজান স্যার আজ সপ্তম শ্রেণির বিজ্ঞানের ক্লাস নিচ্ছেন। “শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পে এক বছরের জন্য এসেছেন, বিজ্ঞান স্যারের প্রিয় বিষয়, তার চেয়েও প্রিয় তাঁর ছাত্ররা। স্যার চান, বিজ্ঞানের মতো কৌতূহলদিপ্ত ও মনোমুগ্ধকর একটা বিষয় ছাত্ররা নিজে থেকেই শিখুক আগ্রহনিয়ে, যেখানে বিশ্বয় আছে সেখানে কৌতূহল তো থাকবেই। “আমি খুব বেশি চালাকও নই, আবার খুব বেশি প্রতিভাবানও নই। আমি কেবল খুব, খুব কৌতূহলী।” - আলবার্ট আইনস্টাইন।

তাই স্যার মনে করেন, “কৌতূহল হলো সাফল্যের চালিকাশক্তি”, আর সাফল্য অর্জন করতে হলে প্রশ্ন করা বন্ধ করা যাবে না, কৌতূহল থেকেই প্রশ্ন আসবে। স্যার মনে করেন, “শিক্ষা তখনই জীবন্ত হয়, যখন শিক্ষক কথা বলেন কম, আর ছাত্ররা প্রশ্ন করে বেশি। ক্লাসরুম তখনই প্রাণ পায়, যখন শেখা একধরনের খেলা হয়ে ওঠে - যেখানে প্রতিটি প্রশ্নই একেকটি জয়।”

আজ স্যার বোর্ডে কোনো লম্বা সূত্র লেখেননি, বইও খুললেন নি, কিন্তু সঙ্গে এনেছেন একটা সিরামিকের সুন্দর “চড়ই পাখি” আর কিছু “কার্ড”।

মিজান স্যার বললেন - “আজ ক্লাসটা তোমরা চালাবে, আমি শুধু পাশে থাকব।”

সবাই অবাক।

“স্যার, তাহলে পাঠ কে শুরু করবে?”

স্যার মৃদু হেসে বললেন, “যার কাছে এই চড়ই পাখি (Talking Piece) থাকবে সে শুধু কথা বলবে, অন্যরা শুনবে। তোমরা কি জানো, চুপচাপ ক্লাস সবসময় ভালো ক্লাস নয়?”

সবাই অবাক।

“স্যাররা তো সবসময় বলেন, চুপ করে থাকো!”

স্যার বললেন,

“আজ আমি চুপ থাকব, তোমরাই কথা বলবে।”

বোর্ডে লিখলেন: ‘কেন আকাশ নীল?’

তারপর প্রতিটি টেবিলে রাখলেন ছোট কার্ড, যেখানে লেখা -

- “আমি শুনেছি তুমি বললে _ ____”
- “আমি একমত কারণ _ _____”
- “আমি যোগ করতে চাই _ _____”

এরপর সবাইকে বৃত্তাকারে বসালেন। হাতে দিলেন সিরামিকের “চড়ই পাখি” (Talking Piece)। “

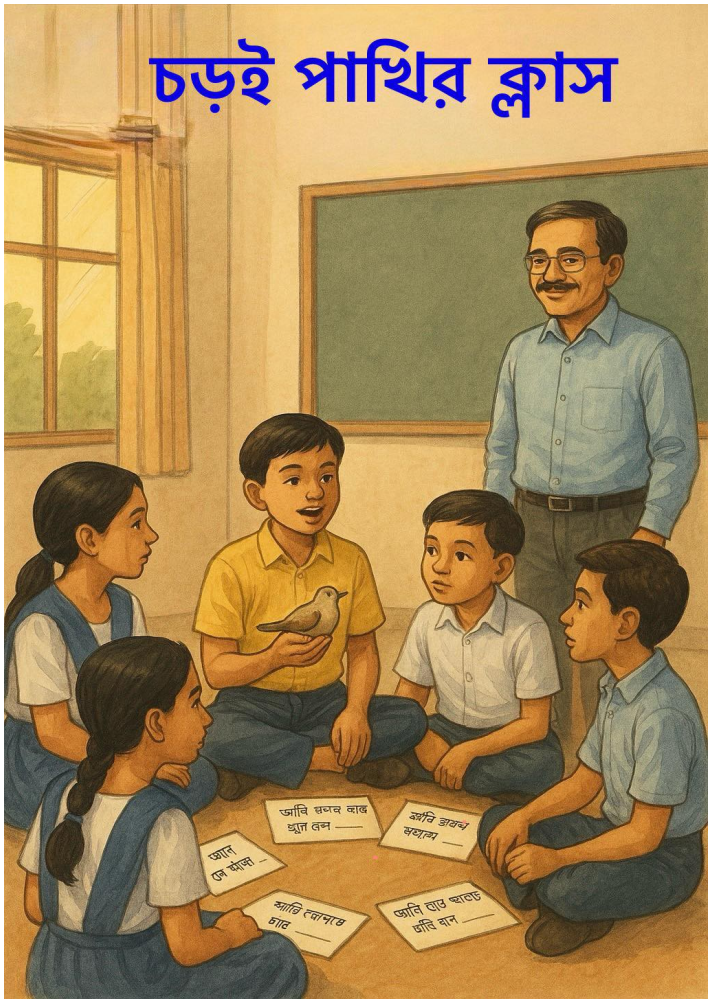

সবাই পালা করে বলল -

কেউ আলো আর রঙের কথা বলল, কেউ প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথা। ক্লাসরুমে এক মধুর শব্দের ঢেউ, যেখানে শেখা হচ্ছে শুনে, ভেবে, আর ভাগ করে।

স্যার ছাত্রদের মূল্যায়ন করতে চান, জানতে চান তাঁর এই ছাত্র-কেন্দ্রিক অধ্যায়নের উপকারিতা।

তাই শেষে স্যার বললেন,

“এখন তোমরা কার্ডগুলো পূরণ করবে, লিখবে এক লাইনে -

রনি লিখল –

- “আমি শুনেছি তুমি বললে, আলো যখন বাতাসের মধ্য দিয়ে যায়, নীল রঙ সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে।”
- “আমি একমত কারণ, আমি দেখেছি ভোরের আকাশও হালকা নীল, মানে সূর্যের আলোও এর কারণ।”
- “আমি যোগ করতে চাই, আমাদের চারপাশের বাতাসেও অদৃশ্য কণিকা থাকে, ওগুলো আলো ছড়িয়ে দেয়।”

একটি নীরব ক্লাসরুমে জ্ঞান থাকে,

কিন্তু একটি সক্রিয় ক্লাসরুমে বোধগম্যতা জন্ম নেয়। শিক্ষক শেখান না - আলাপের সেতু বানান। প্রশ্ন, যুক্তি, আলোচনাই হলো শেখার সত্যিকার শব্দ।

“মেঘের ডায়েরি”

পিরোজপুর জেলার এক শান্ত গ্রামীণ স্কুল - “সকালের আলো প্রাথমিক বিদ্যালয়।”, স্কুলের চারপাশে নারকেল গাছ, পুকুর, আর দূরে ধানক্ষেত। আজ বুধবার সকালে চতুর্থ শ্রেণীর শিশু ছাত্ররা মাঠে জড়ো হয়েছে। শরৎকাল আকাশে তুলোর মতো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, স্নিগ্ধ নরম হাওয়ার পরশ আর রোদ্দুর খেলছে তাদের সাথে। আজকের ক্লাসে ফারহানা ম্যাডাম বই নিয়ে আসেননি। তিনি আজ “প্রকৃতির রোজনামচা” ক্লাস নিবেন, আজকের চতুর্থ শ্রেণীর বিষয় - “মেঘের ডায়েরি।”

ম্যাডাম হাসিমুখে বললেন, “আজ আমরা মেঘের কথা লিখব। মেঘ কথা বলে না, কিন্তু আমরা শুনব তার গল্প। আকাশের বিশালতা অনুভব করবো, মনে রেখো, আকাশ দেখা একধরনের ইবাদত - যা আমাদের স্রষ্টার মহিমা ও শক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়।”

ছাত্ররা অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকায়। কেউ বলে, “ওই মেঘটা হাতির মতো।” আরেকজন বলে, “ম্যাডাম, ওইটা মাছের মতো!” সবাই হেসে ওঠে।

ম্যাডাম খাতায় প্রথম পাতায় লিখলেন - আজকের তারিখ, আজকের মেঘ, আজকের অনুভূতি। তারপর বললেন, “তোমরা আকাশের দিকে তাকাও, দেখো মেঘের রং কী, চলাফেরা কেমন, সূর্যের আলোয় কেমন দেখায়। তারপর ১০টা বাক্যে লিখবে - তোমার চোখে আজকের আকাশ।”

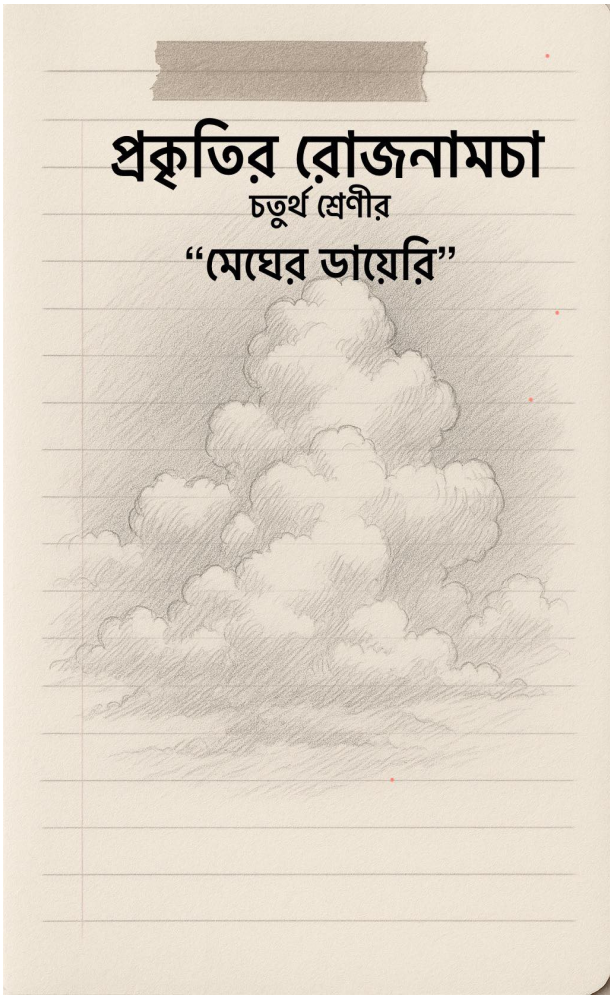

শিশুরা মাঠে বসে, কিছু ছেলে মেয়ে সবুজ ঘাসে শুয়ে দেখছে, কেউ মেঘ আঁকছে, কেউ লিখছে - “মেঘটা সাদা, কিন্তু মাঝে কালো দাগ।” “হাওয়া এলে মেঘ দৌড়ায়।” “সূর্য লুকোচুরি খেলে।” “পুকুরে মেঘের ছায়া পড়ে।”

ফারহানা ম্যাডাম ঘুরে ঘুরে তাদের খাতা দেখছেন। তিনি বললেন, “তোমরা শুধু মেঘ দেখো না, তোমরা সময়ও দেখছ - মেঘ যেমন বদলায়, সময়ও তেমনি বদলায়।”

শিক্ষকের নোট

• উদ্দেশ্য: প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রূপ পর্যবেক্ষণ করে সময়, রঙ ও আবহাওয়া বোঝার প্রাথমিক ধারণা তৈরি।

• কাজ: প্রতিদিন বা সপ্তাহে একদিন আকাশের মেঘ পর্যবেক্ষণ করে ৫–১০টি বাক্যে লেখা ও একটি ছবি আঁকা। কিছু আলোচনার প্রশ্ন: আজকের আকাশ কেমন লাগল? মেঘের রং কী ছিল? তুমি কী ভাবলে মেঘ দেখে? মেঘের পরিবর্তনে কী শিখলে?

ফারহানা ম্যাডাম, ছাত্রদের উৎসাহিত করবার জন্য, তিনিও বসে বসে প্রশ্ন গুলোর উত্তর লিখলেন, অনুভূতি + পর্যবেক্ষণ + রূপক মিশিয়ে। ছাত্রদের পরে শুনালেন ও বুঝালেন।

১. আজকের আকাশ কেমন লাগল?

“আজকের আকাশটা অনেক বড় লাগল। মনে হলো পুরো পৃথিবীকে জড়িয়ে রেখেছে। নরম হাওয়া বইছে, রোদ আর ছায়া খেলছে একসঙ্গে।”

২. মেঘের রং কী ছিল?

“মেঘটা সাদা, কিন্তু মাঝে একটু ধূসর। যেন তুলোর মতো সাদা তুলায় একটু ছায়া মিশেছে। সূর্যের আলো পড়লে আবার সোনালি হয়ে যাচ্ছিল।”

৩. তুমি কী ভাবলে মেঘ দেখে?

“মেঘ দেখে মনে হলো ওরা ভ্রমণ করে - এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায়। হয়তো আমাদের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে বৃষ্টি নামানোর প্রস্তুতি নিয়ে। মেঘ যেন ভাসমান চিঠি, আকাশে লেখা গল্প।”

৪. মেঘের পরিবর্তনে কী শিখলে?

“মেঘের মতোই সময়ও বদলায়। রোদ আসে, আবার চলে যায়। তাই বুঝলাম, পরিবর্তন মানেই ভয় নয় - বদলেই নতুন কিছু আসে।”

চতুর্থ শ্রেণীর শিশু ছাত্রদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য, ম্যাডাম তাদের লেখা থেকে নিজেদের প্রিয় লাইন বেছে পড়ে শোনাতে বললেন। ম্যাডাম বললেন, আজকের আকাশ আমাদের শেখাল - যা ভেসে যায়, তা হারায় না; মেঘের মতোই, চিন্তাও একদিন বৃষ্টি হয়ে ফেরে পৃথিবীতে।

“মেঘের ডায়েরি” শিশুদের শেখায় - প্রকৃতি সব সময় বদলায়, কিন্তু সেই বদলের মাঝেই আছে ছন্দ, গল্প আর জ্ঞানের স্রোত।

মেঘ দেখা মানে সময় দেখা; বিশালতা কে নিজের চিন্তায় আনা, আর সময় দেখা মানেই পৃথিবীকে নতুনভাবে বোঝা।

ধনুক-ভাঙা পণ – ২০৮

“পাতার দিনলিপি”

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ভারতের সীমান্তবর্তী একটি ছোট প্রাথমিক বিদ্যালয় - “গোধূলি প্রাথমিক বিদ্যালয়।” সকালবেলা শিশিরভেজা ঘাস, বাতাসে আমের মুকুলের হালকা ঘ্রাণ, দূরে ছোট সোনা মসজিদের মাথা দেখা যায়। আজ মঙ্গলবার সকালে তৃতীয় শ্রেণির ক্লাসে এলেন রুবিনা ম্যাডাম।

রুবিনা ম্যাডাম স্কুলের বোর্ড মিটিং-এ “প্রকৃতির রোজনামচা” বা Nature Journaling চালুর প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন।

তিনি যুক্তি দিলেন - এই পদ্ধতি ছাত্রদের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ককে আরও গভীর করবে, তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সৃজনশীলতা ও কৌতূহল বিকশিত করবে।

ম্যাডাম আরও বললেন, “প্রকৃতির রোজনামচা” ছাত্রদের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করবে, কারণ এখানে তারা পড়ার বদলে দেখবে, অনুভব করবে, ভাববে - আর সেই অনুভূতি শব্দ ও ছবিতে প্রকাশ করবে। এভাবে খেলার ছলে শেখা হবে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে, আর শেখার আনন্দ ফিরে আসবে প্রতিদিনের ক্লাসে। প্রকৃতির রোজনামচার:-

- উদ্দেশ্য: শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
- কাজ: প্রতিদিন একটি প্রকৃতির জিনিস (পাতা, ফুল, পিঁপড়া ...) পর্যবেক্ষণ করে লিখবে ৫–১০টি বাক্য।
- উপকরণ: শুধুমাত্র একটি খাতা ও পেন্সিল।
- আলোচনার কিছু প্রশ্ন থাকবে, যেমন, তুমি কী দেখলে? কী শুনলে? কোনটা সবচেয়ে মজার লাগল? প্রকৃতি তোমাকে কী শেখাল?

ম্যাডাম আজ কোনো বই খুললেন না। টেবিলের ওপর রাখা একটা খাতা তুলে দেখালেন, “এটাই আজকের বই - আমাদের প্রকৃতি ডায়েরি।”

ছাত্রছাত্রীরা অবাক। বই নয়, ডায়েরি?

ম্যাডাম বললেন,

“আজ আমরা প্রকৃতিকে লিখব।

আজকের কাজ - একটা পাতা খুঁজে আনবে, আর ১০টা বাক্যে লিখবে সে পাতাটার সম্পর্কে।”

সবাই দৌড়ে গেল স্কুলের মাঠে। কেউ পেয়েছে আমপাতা, জাম পাতা, শিমুল পাতা, কেউ পেয়েছে কদমপাতা, কেউ পুকুরের ধারে কলাপাতা।

একটু পর ফিরে এসে খাতায় লিখছে -

“পাতাটা নরম।”

“পাতার গায়ে ছোট ছোট দাগ।”

“রোদে পাতাটা চকচক করছে।”

“এই পাতায় গাছের প্রাণ।”

রুবিনা ম্যাডাম ধীরে ধীরে ক্লাসে ঘুরে ঘুরে পড়ছেন তাদের লেখা। তিনি বললেন,

“তোমরা আজ লিখছ পাতা, কিন্তু শিখছো দেখা, ভাবা, বোঝা। এটাই জ্ঞানের শুরু।”

একটু পর এক ছাত্র বলল,

“ম্যাডাম, পাতা তো চুপচাপ, কিন্তু বাতাস এলে সে নাচে।”

রুবিনা ম্যাডাম হাসলেন -

“তুমি আজ প্রকৃতিকে কথা বলতে শুনেছ, এটাই আমাদের শিক্ষার প্রথম পাঠ।”

প্রকৃতির রোজনামচা শুধু একটা খাতা নয় - এটা এক শিশুর চোখে প্রথম পৃথিবী দেখা। সেই দেখা থেকেই শুরু হয় শিক্ষা, কল্পনা, আর মানবিকতার যাত্রা - যেখানে প্রতিটি পাতা একেকটা জীবন্ত বই।

ধনুক-ভাঙা পণ – ২১১

“বৃষ্টির রোজনামচা”

“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের “প্রকৃতির রোজনামচা” অধ্যায়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে সংযুক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীরা যেন পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জগতকে বুঝতে শেখে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এই অংশে শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণ ও পরীক্ষাযোগ্য অনুমান ব্যবহার করে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যা করবে। অর্থাৎ, দেখা →প্রশ্ন করা →পরীক্ষা করা →সিদ্ধান্তে পৌঁছানো - এই প্রক্রিয়াই মাধ্যমিক স্তরের “প্রকৃতির রোজনামচা” - এর মূল ভিত্তি।

সিরাজগঞ্জ জেলার নদীপাড়ের এক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, “নীলচর উচ্চ বিদ্যালয়।” স্কুলের পেছনে আছে ধানক্ষেত, সামনে বড় পুকুর, আর পাশে যমুনার শাখা নদী। আজ সকাল থেকেই আকাশ ভারী, ঘন মেঘ জমেছে। ক্লাস সিক্সের ছাত্রছাত্রীরা জানালার পাশে বসে আছে - কেউ হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা ধরছে, কেউ চুপচাপ নদীর দিকে তাকিয়ে।

আজকের ক্লাসে আসলেন মাহিন স্যার, বিজ্ঞান শিক্ষক, কিন্তু প্রকৃতিপ্রেমীও বটে। স্যার টেবিলে একটা পুরনো খাতা রাখলেন - তাতে লেখা আছে “বৃষ্টির রোজনামচা।” স্যার বললেন, “আজ আমরা বই খুলব না, আকাশ দেখবো। আজকের পাঠ – বৃষ্টি।” স্যার বললেন, সাহিত্যের ভাষায়, "যদি তুমি রংধনু চাও, তাহলে তোমাকে বৃষ্টি সহ্য করতে হবে।” অতীব প্রয়জনীয় কথা বললেন, "বৃষ্টি হলো অনুগ্রহ; বৃষ্টি হলো আকাশ যা পৃথিবীতে নেমে আসে; বৃষ্টি ছাড়া জীবন থাকত না।“ এবার বললেন, "বৃষ্টির পরে, সূর্য আবার দেখা দেবে।” স্যার চান, ছাত্রদের দৃটিভঙ্গির উদারতা, দেখাতে চান প্রকৃতির মাঝেই আমাদের জীবন, যাতে আছে সাহিত্য, সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি ও সময়ের ডাক। প্রকৃতি এক অন্য ধরনের বোধগম্যতা।

বাচ্চারা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। স্যার জানালার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, “বৃষ্টিকে শুধু ভেজা ভাবো না, বৃষ্টির ভেতর আছে গল্প, বিজ্ঞান আর অনুভূতি।” তারপর সবাইকে বললেন, “আজ তোমরা বৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করবে - বৃষ্টির শব্দ কেমন, গন্ধ কেমন, বাতাসের দিক কোনটা, মাটি কেমন হয়ে যাচ্ছে, গাছেরা কেমন প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে। আর বিজ্ঞানের কথা ভাববো, কোথা থেকে এলো এতো পানি?”

সবাই চুপচাপ শুনছে, তারপর খাতায় লিখছে - “বৃষ্টির ফোঁটা ছাদের টিনে ঢং ঢং শব্দ করে, কেননা ফোটায় ফোটায় বৃষ্টি পরে। কেন এক বারে পরে না, ফোটায় ফোটায় পরে?” “গাছের পাতায় পানি ঝুলে আছে। গাছরা যে বৃষ্টিতে আনন্দ পাচ্ছে, টা বুঝা যায়।” “মাটির গন্ধে মনে হচ্ছে পৃথিবী হাসছে।” “ব্যাঙ ডাকছে মাঠে।”

স্যার তাদের লেখা পড়ে মৃদু হেসে বললেন, “তোমরা বৃষ্টি লিখছো, কিন্তু শিখছো জলচক্র। জলচক্র হল একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং বৃষ্টি, তুষার বা বরফ রূপে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। এটি পানির ক্রমাগত সঞ্চালন, যা প্রকৃতিতে পানির ভারসাম্য বজায় রাখে।”

একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করল, “স্যার, বৃষ্টি কোথা থেকে আসে?” স্যার উত্তর দিলেন, - প্রথমত, সূর্যের তাপে নদ-নদী, সমুদ্র, ও জলাশয় থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসে মেশে। (স্যারের সঙ্গে আনা, ফ্লাক্স থেকে বরফ পানি একটি কাঁচের গ্লাসে ঢাললেন)। - দ্বিতীয়ত, এই জলীয় বাষ্প মেঘে পরিণত হয়। - তৃতীয়ত, জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি, তুষার বা বরফ হিসাবে পৃথিবীতে ফিরে আসে।

এবার স্যার, ঠান্ডা পানির গ্লাস টি হাতে নিলেন, গ্লাসের গায়ে ইতিমধ্যে জলীয় বাষ্প জমেছে। ছাত্ররা দেখলো বাষ্পীভূত পানি ঠান্ডায় ঘুনীভূত হয়ে আবার পানি হয়েছে। স্যার গ্লাসটাকে টেবিল থেকে উঁচু করে ধরে রাখলেন কিছুক্ষন। (বৃষ্টির দিন বাতাসে অনেক জলীয় বাষ্প (আর্দ্রতা) স্যাঁতসেঁতে ভাব, স্যার ছাত্রদের তাঁর মোবাইলে স্কুল এলাকার আবহাওয়ার তথ্য দেখালেন, যেখানে আর্দ্রতা অনুপাত ৯৬%।) তাই গ্লাস এ জমে থাকা জলীয় বাষ্প একে অন্যের সঙ্গে লেগে বড় বড় ফোটা হয়ে গ্লাস থেকে টেবিল এ বৃষ্টির মতো পড়তে থাকলো। ছাত্রদের কে স্যার, গ্লাস আর বরফ পানি দিয়ে বললেন, দেখি কে কতো বৃষ্টি আনতে পারো। এই খেলার ভিতরদিয়ে তারা দেখলো ম্যাজিকের মতো পানি এসে জমে আবার বৃষ্টিও হয়। তারা জানলো, বৃষ্টি মানে শুধু পানি নয়, এটা পৃথিবীর শ্বাস-প্রশ্বাস।

শিক্ষকের নোট

• উদ্দেশ্য: প্রকৃতির প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া (জলচক্র) বুঝে তার সৌন্দর্য ও বিজ্ঞানের সংযোগ বোঝানো।

• কাজ: বৃষ্টির সময় বা পরে পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লেখা, শব্দ, গন্ধ ও পরিবর্তন বর্ণনা করা। বৃষ্টির সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র আঁকা বা লিখা।

• আলোচনার প্রশ্ন: বৃষ্টির আগে ও পরে প্রকৃতিতে কী পরিবর্তন ঘটে? মাটির গন্ধ কেন আসে? বৃষ্টি না হলে কী হতো? বৃষ্টি তোমার মনে কী অনুভূতি জাগায়? বৃষ্টির পানি ঠান্ডা হয় কেন? সূর্যের তাপে গরম হয়ে ওঠা পানি যখন মেঘে উঠে ঠান্ডা স্তরে পৌঁছায়, তখন ঘনীভবনের সময় তাপ শক্তি হারায় - তাই বৃষ্টির পানি ঠান্ডা মনে হয়। (এই ঘনীভবন ও তাপ শক্তি নিয়ে একটু ভাবুক ক্লাস সিক্সের ছাত্রছাত্রীরা)।

“বৃষ্টির রোজনামচা” শেখায় - প্রকৃতির প্রতিটি ফোঁটাই একটি পাঠ। যেখানে বিজ্ঞান, কবিতা আর অনুভূতি মিলেমিশে যায় একসঙ্গে।

বৃষ্টি পড়লে পৃথিবী যেমন ভিজে ওঠে,
তেমনি শেখার মনও সিক্ত হয় নতুন জ্ঞানে, নতুন ভাবনায়।

“ফুলের হাসি”

“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের অধীনে “প্রকৃতির রোজনামচা” এখন প্রতিটি শ্রেণির জন্য বাধ্যতামূলক কার্যক্রম হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষকদের নিজ নিজ শ্রেণির “প্রকৃতির রোজনামচা”-এর বিষয়বস্তু, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে, যা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হবে।

নেত্রকোণা জেলার এক ছোট্ট গ্রামীণ স্কুল - “প্রভাতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।” সকালবেলা স্কুলের সামনে গন্ধরাজ, টগর আর রঙিন বেলি ফুলে ভরে গেছে চারপাশ। পুকুরপাড়ে মৌমাছির গুঞ্জন, বাতাসে মিষ্টি গন্ধ।

আজ বৃহস্পতিবার, পঞ্চম শ্রেণির “প্রকৃতির রোজনামচা” পাঠে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে বসেছে নতুন এক কাজ নিয়ে - “ফুলের রোজনামচা।”

পঞ্চম শ্রেণির ১০–১২ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, সমবয়সীদের প্রতি আগ্রহ, এবং কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করার সাহস - যা তাদের নিজস্ব পরিচয় গঠনের স্বাভাবিক ধাপ। এই বয়সেই সময় এসেছে তাদের “প্রকৃতির রোজনামচা”-র মাধ্যমে পৃথিবীকে চেনার। রূপে, রসে ও রহস্যে ভরা এই পৃথিবী যেন অপেক্ষায় আছে - তাদের ভালোবাসা, কৌতূহল আর আবিষ্কারের দৃষ্টির জন্য।

আজকের পাঠ শুরু করার আগে সায়মা ম্যাডাম সবাইকে বাইরে নিয়ে গেলেন। “আজ তোমরা বই খুলবে না,” তিনি বললেন, “আজ আমরা ফুলের ভাষা পড়ব।”

বাচ্চারা মাঠে নেমে খুঁজে বেড়ায় - কেউ পেয়েছে বেলি ফুল, কেউ পেয়েছে টগর, কেউ লাল জবা ও ঘাস ফুল, গন্ধরাজ, আর রঙিন বেলি ফুল। ম্যাডাম বললেন, “তোমরা ফুলটাকে শুধু দেখো না, তাকে চিনো, তার গন্ধ কেমন, রং কেমন, পাপড়ি কয়টা, মৌমাছি আসে কি না, পাতায় পানি জমে কি না।”

এরপর তিনি ব্যাগ থেকে বের করলেন একটি ছোট ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ। মোবাইলের পর্দায় ফুলের পাপড়ির বিস্তৃত সৌন্দর্য বড় করে দেখালেন সবাইকে।

শিশুরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইল - ফুলের সেই অদেখা রূপে তারা দেখল রঙ, রেখা আর জীবনের এক নতুন জগৎ।

ম্যাডাম বললেন, “বিজ্ঞান আর সৌন্দর্য - দুটো একসাথে দেখা যায়, যদি মন দিয়ে তাকানো যায়।”

ছাত্রীদের উৎসাহিত করে ম্যাডাম হাসিমুখে বললেন, “ফুলের হাসিই পৃথিবীর হাসি। যেখানে ফুল ফোটে, সেখানেই থাকে আশা - ঠিক যেমন আমাদের এই ক্লাসে।

তোমরা জানো, একটা কথা আছে - ‘Flower Power’ বা ‘ফুলের শক্তি’। ফুল শক্তির প্রতীক, কারণ সে সৌন্দর্য দিয়ে হৃদয় জয় করে।”

সবাই তাদের ফুলের রোজনামচা নিয়ে খাতায় লিখছে ও আঁকছে - “আমার ফুলের গায়ে সকালবেলার শিশির।” “ফুলের গন্ধে মৌমাছি এসেছে।” “একটা পাপড়ি পড়ে গেছে মাটিতে।” “সূর্য উঠলে ফুলটা হাসে।” সায়মা ম্যাডাম ধীরে ধীরে প্রতিটি খাতা দেখলেন।

তিনি বললেন, “তোমরা শুধু ফুল লিখছো না, তোমরা জীবনও লিখছো। ফুলের মতো মানুষেরও দিন আছে, রাত আছে, ফুটে ওঠার সময় আছে, ঝরে পড়ার সময়ও আছে।” একটা শিশু চুপ করে বলল, “ম্যাডাম, ফুল তো ঝরে যায়, তাই না?”

ম্যাডাম বললেন, “হ্যাঁ, কিন্তু প্রতিবার ঝরে পড়া মানেই নতুন ফুলের প্রতিশ্রুতি। প্রকৃতি শেখায় - শেষ মানে শুরু।”

শিক্ষকের নোট

- উদ্দেশ্য: শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সংবেদনশীলতা ও প্রাকৃতিক জীবনচক্র সম্পর্কে বোঝাপড়া বৃদ্ধি করা।
- কাজ: প্রতিদিন বা সপ্তাহে একদিন একটি ফুল পর্যবেক্ষণ করে লেখা ও ছবি আঁকা।
- আলোচনার প্রশ্ন: ফুল কখন ফুটেছে? সূর্যের আলো বা বৃষ্টি এলে ফুলের পরিবর্তন কী হয়? ফুলে পোকা বা মৌমাছি এসেছে কি?এই ফুল তোমাকে কী মনে করিয়ে দেয়?

“ফুলের রোজনামচা” শিশুদের শেখায়,

সৌন্দর্যও একটি শিক্ষা। প্রকৃতির প্রতিটি ফুল আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বৃদ্ধি মানে শুধু বড় হওয়া নয়, বরং আলো, গন্ধ, রং আর স্নিগ্ধতার মধ্যে বেঁচে থাকা।

“গাছের জার্নাল”

“শিক্ষা-ই-শক্তি” প্রকল্পের অধীনে “প্রকৃতির রোজনামচা” অধ্যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সমাদৃত হয়েছে, এর করণ হলো, ছাত্র, শিক্ষক ও প্রকৃতির একই মঞ্চে উপস্থিতি। এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় চান, ক্লাস ৮, ৯ ও ১০ যেন “প্রকৃতি বিজ্ঞান” কে এই “প্রকৃতির রোজনামচা”য় অন্তর্ভুক্ত করেন। কারণ “বিজ্ঞান” হলো পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং যুক্তির মাধ্যমে ভৌত জগৎ এবং এর ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও সংগঠিত করার একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীদের আধুনিক কৌশল এবং প্রযুক্তির প্রাকৃতিক-বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে শেখায়, তার মাঝে পদার্থবিদ্যাকে মৌলিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা দরকার। কারণ অন্যান্য সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এই ক্ষেত্রের নীতি এবং আইন ব্যবহার করে এবং মেনে চলে। পদার্থবিদ্যা নীতি প্রণয়ন এবং পরিমাণ নির্ধারণের জন্য যৌক্তিক কাঠামো হিসাবে গণিতের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর। প্রকৃতি বিজ্ঞান ছাত্রদের ব্যাবহারিক গনিত সেখানো বা উপলব্ধির জন্য সহায়ক।

খুলনা জেলার এক গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় - “সবুজ ছায়া বিদ্যালয়।” বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিশাল এক কাঁঠালগাছ, পাশেই তাল, বট আর কৃষ্ণচূড়া। আজ সোমবার সকালে অষ্টম ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা গাছতলায় বসে আছে। গ্রীষ্মের রোদ একটু নরম, বাতাসে কাঁঠালের গন্ধ। আজকের ক্লাসে এলেন সুমন স্যার - জীববিজ্ঞানের শিক্ষক, কিন্তু তাঁর চোখে বিজ্ঞান মানে শুধু সূত্র নয়, জীবনের সংলাপ। স্যার হাতে ধরে আছেন একটি মোটা খাতা - তাতে লেখা আছে বড় অক্ষরে “গাছের জার্নাল।”

স্যার হাসিমুখে বললেন, “আজ আমরা বইয়ের পাতায় নয়, গাছের পাতায় পড়ব।” ছাত্ররা অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকাল। স্যার বললেন, “তোমাদের কাজ - একটি গাছকে বন্ধু বানানো। তার ছায়ায় বসবে, তার পাতা দেখবে, তার শিকড়, ফুল, ফল, পাখি - সবকিছু পর্যবেক্ষণ করবে, আর লিখবে, কেমন সে বেঁচে আছে, কেমন বদলাচ্ছে।” ছাত্রদের উৎসাহ দিলেন, বললেন, “গাছের প্রাণ আছে” বাঙালী বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রথম প্রমাণ করেন ১৯০১ সালে। তিনি, উদ্ভিদের জীবনচক্র, প্রজনন ব্যবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সচেতন থেকে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে শারীরিক মিল খুঁজে বের করেন এবং এর জন্য একটি যন্ত্র (ক্রেসকোগ্রাফ) আবিষ্কার করেন।” সবাই ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যালয় চত্বরে। কেউ বটগাছের নিচে, কেউ কাঁঠালগাছের পাশে, কেউ গাছের পিঁপড়ার চলাফেরা দেখছে। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের অন্তর্দৃষ্টি থেকে কেউ দেখলো প্রকৃতির রুপ আবার কেউ দেখলো বিজ্ঞান। একজন লিখছে— “ আমার গাছের পাতায় রোদ পড়লে সোনালি হয়ে যায়।” আরেকজন লিখছে— “ একটা কাঠবিড়ালি এসে গাছের ডালে উঠল।” আর কেউ আঁকছে গাছের মূলপাশে শামুকের খোল। কেউ ভাবলো গাছের জীবন চক্র দেখতে একটা মাইক্রোস্কোপ হলে ভালো হতো।

সুমন স্যার হাঁটতে হাঁটতে বললেন, “তোমরা গাছকে দেখছো, কিন্তু শিখছো জীবনচক্র। গাছ যেমন নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেও প্রতিনিয়ত বদলায়, তেমনি মানুষও প্রতিদিন বদলায় নিজের ভেতর দিয়ে।” একজন ছাত্রী জিজ্ঞেস করল, “স্যার, গাছ তো কথা বলে না, তাহলে আমরা কীভাবে তার গল্প লিখব?” স্যার হেসে বললেন, “গাছ কথা বলে ছায়ায়, পাতার শব্দে, বাতাসে। শুধু শুনতে জানতে হয়। যে শুনতে পারে, সেই শেখে।” স্যার একটা ছোট্ট পলি ব্যাগে শিমের বিচ দিলেন সবাইকে, বাসায় নিয়ে জানালার পাশে রোদে রেখে পানি দিয়ে বিচ থেকে অঙ্কুরোদগম পর্যবেক্ষণ করবার জন্য। স্যার, বুঝালেন, গাছের প্রতিটি অংশে রয়েছে ভর, ওজন, এবং মাধ্যাকর্ষণ এর প্রভাব। “তোমরা জানো, এই গাছ দাঁড়িয়ে আছে কারণ পৃথিবী তাকে টানে - এটাই মাধ্যাকর্ষণ। কিন্তু গাছের রস ওঠে উপরের দিকে - তাহলে সে টানকে কীভাবে হারায়?” ছাত্রছাত্রীরা অবাক! স্যার বোঝালেন - গাছের ভেতরে ক্ষুদ্র নালী আছে; সূর্যের তাপে পাতার জল বাষ্প হয়ে গেলে নিচের পানি ওপরে টানে। এই প্রক্রিয়ায় পদার্থবিজ্ঞানের Capillary Action, Evaporation, এবং Gravity একসাথে কাজ করে।

“গাছের জার্নাল” শেখায় - বৃদ্ধি মানে শুধু লম্বা হওয়া নয়, গভীর হওয়াও। গাছ আমাদের শেখায় নীরবতা, সহনশীলতা ও স্থিরতার শক্তি। প্রকৃতির স্থিরতা আসলে গতির ভারসাম্য। যে শিশু গাছকে ভালোবাসতে শেখে, সে একদিন পৃথিবীকেও ভালোবাসবে - কারণ তার হৃদয়ে তখন রোপিত হবে মানবতার বীজ।

“নদীর দিনলিপি”

গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জের পাশে, ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় - “নদীপাড় উচ্চ বিদ্যালয়।”

সকালের ক্লাসের আগে থেকেই নদীর হাওয়া মন ছুঁয়ে যায়। নদীমাতৃক এই দেশে মাঝিদের ভাটিয়ালি গান ভেসে আসে - “নাও ছাড়িয়া দে, পাল উড়াইয়া দে...”

আজ সপ্তম শ্রেণির ক্লাসে এলেন শফিকুল স্যার - বিজ্ঞান ও ভূগোলের শিক্ষক।

ক্লাসে ঢুকেই বললেন, “আজ আমরা নদী পড়ব না, নদীকে শুনব। কারণ নদী শুধু পানি নয় - নদী একটি জীবন্ত বই। যার জন্ম হয় উৎসমুখে, আর সমাপ্তি মোহনাতে।”

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্যার হাঁটতে হাঁটতে গেলেন ব্রহ্মপুত্রের তীরে। হাঁটার সময় স্যার বললেন, “বাংলায় যে নদীর নাম ‘অ’-কারান্ত, তারা নদ; আর ‘আ’ বা ‘ই’-কারান্ত হলে নদী। তাই ব্রহ্মপুত্র নদ, কিন্তু বুড়িগঙ্গা নদী।”

ছাত্রদের চোখ উজ্জ্বল - তারা যেন নতুনভাবে নদীকে চিনতে শুরু করল।

নদীর বালিতে কেউ পায়ের ছাপ রাখছে, কেউ ঢেউ গুনছে, কেউ দেখছে নদীর বাঁক কীভাবে দিক বদলায়। হঠাৎ নদীর বাতাসে শফিকুল স্যারের মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের গান - “ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা...” স্যার তাঁর মোবাইলে গানটি চালালেন।

নৌভ্রমণ শুরু হতেই ছাত্রদের চোখে আলো; তারা গান শুনছে, নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে।

গান থামিয়ে স্যার বললেন, “এই গানে আছে প্রকৃতির দুই রূপ - চলমানতা ও স্থিরতা। নদীর প্রবাহ যেমন থেমে থাকে না, তেমনি মানুষের জীবনও চলতে থাকে গভীর ছন্দে।”

নৌভ্রমণ শেষে স্যার বললেন, “আজ থেকে শুরু করবে তোমাদের নদীর দিনলিপি। নদীর রঙ, গতি, পাড়ের গাছ, নৌকা, মানুষ, পাখি - সব লিখবে।” তারপর ব্যাখ্যা করলেন ব্রহ্মপুত্রের উৎস ও যাত্রা - তিব্বতের কৈলাস হিমবাহ থেকে শুরু হয়ে ২,৮৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে এসে যমুনা ও মেঘনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার গল্প।

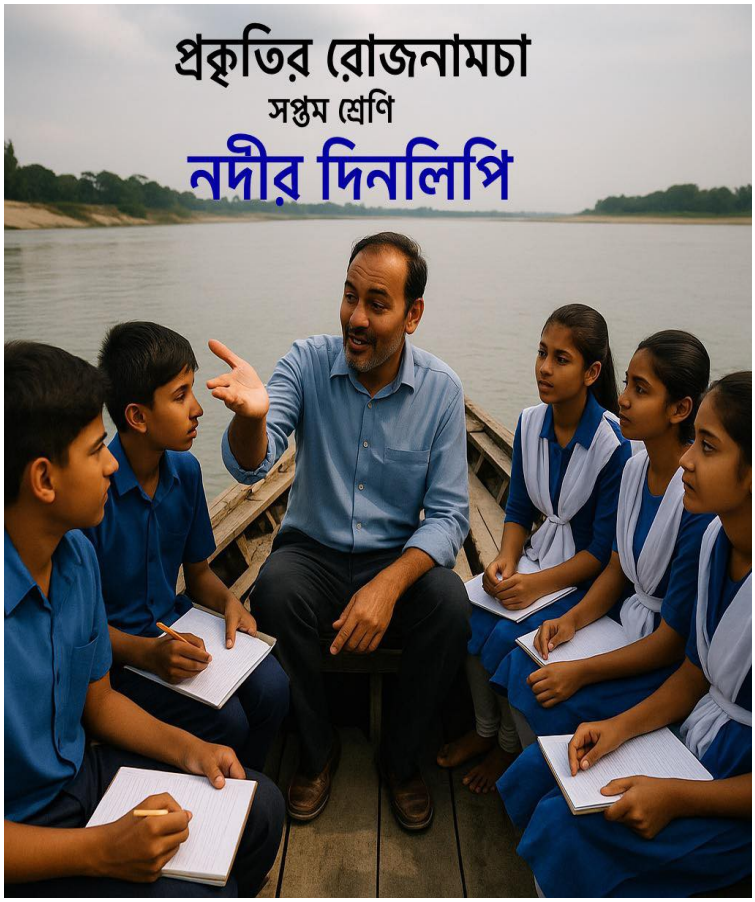

বললেন, “নদী মানে অর্থনীতি, কৃষি, জীবন, পরিবেশ - সবকিছুর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক।”

ছাত্ররা চুপ হয়ে গেল। তারা নদীর দিকে তাকিয়ে যেন নিজেরাই নদীর মতো অনুভব করল - চঞ্চল, গভীর, আর পথের মধ্যে পূর্ণ।

কেউ লিখল - “নদী মনে হয় পৃথিবীর গোপন কথা জানে।”

আরেকজন - “বাতাস আর ঢেউ - নদীর দুই খেলা।”

আর কেউ আঁকল - নদীর পারের ছবি।

স্যার বললেন, “তোমরা যখন নদীর রঙ, ঢেউ আর দিক বুঝবে, তখন ভূগোলও বুঝবে। নদী শেখায় চলমানতা - জীবনও তেমনি চলে।”

এক ছাত্র জিজ্ঞেস করল, “স্যার, নদী কেন জায়গা বদলায়?”

স্যার বললেন, “কারণ পানি শক্তি ধরে রাখে না - সে বয়ে যায়। বয়ে যাওয়াই তার জীবন।

তোমরা নদীর মতো হও - বাধা এলে ঘুরে দাঁড়াও, কিন্তু থেমো না।”

শিক্ষকের নোট

• উদ্দেশ্য: নদীর প্রবাহ, ভূমিক্ষয়, পলি জমা ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা তৈরি।

• মানব–নদী সম্পর্ক: নদী কীভাবে কৃষি, অর্থনীতি, পরিবেশ ও জীবনে প্রভাব ফেলে তা বোঝানো।

• আলোচনার প্রশ্ন: নদী কখন ঘোলা, কখন স্বচ্ছ হয় কেন? নদীর ধারার দিক বোঝা যায় কীভাবে? নদী আমাদের কী শেখায়?

“নদীর দিনলিপি” শেখায় - প্রকৃতি শুধু বইয়ের বিষয় নয়, সে আমাদের শিক্ষক। নদী যেমন নিজের পথে চলে, তেমনি মানুষকেও চলতে হয়, কখনো শান্ত, কখনো প্রবল, কিন্তু সর্বদা জীবন্ত, সর্বদা শিক্ষার স্রোতে।

“পৃথিবীর জার্নাল”

সুনামগঞ্জ জেলার হাওরপাড়ের এক মাধ্যমিক বিদ্যালয় - “জলছায়া উচ্চ বিদ্যালয়।”

স্কুলের চারপাশে শুধু পানি আর আকাশের প্রতিফলন। দূরে দেখা যায় নৌকা, জেলে, আর দিগন্তে সূর্য উঠছে ধীরে ধীরে। আজকের দিনটা বিশেষ - কারণ আজ “প্রকৃতির রোজনামচা” (Nature Journaling) -এর শেষ অধ্যায়: “পৃথিবীর জার্নাল।”

দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের মাঠে এক বৃত্তে বসেছে, হাতে তাদের খাতা - যেগুলোতে পাতার দিনলিপি, মেঘের ডায়েরি, বৃষ্টির জার্নাল, গাছের গল্প, নদীর ছন্দ, তারার আলো - সব জমা আছে। আজ তারা লিখবে পৃথিবীকে নিয়ে - নিজেদের ঠিকানাকে নিয়ে।

সাজ্জাদ স্যার, সমাজবিজ্ঞান ও পরিবেশবিদ্যার শিক্ষক, ধীরে ধীরে বললেন, “আজ তোমরা শুধু পর্যবেক্ষক নও, তোমরাই পৃথিবীর লেখক। তোমাদের কলমে লেখা হবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।”

ছাত্ররা তাকিয়ে আছে চারপাশে - কেউ লিখছে পানির গন্ধ, কেউ ঘাসের রং, কেউ পাখির ডাকে সময়ের ছন্দ। এক কাব্যিক ছাত্র বলল, “স্যার, পৃথিবী এখন ক্লান্ত মনে হয়, সবসময় ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।”

স্যার বললেন, “তুমি যা দেখছো, তা শুধু প্রকৃতি নয়, আমাদের প্রতিচ্ছবি। আমরা যেমন বাঁচি, পৃথিবীও তেমনি শ্বাস নেয়।”

স্যার সবাইকে বললেন, “আজ তোমাদের কাজ হলো - তোমার প্রিয় প্রাকৃতিক জায়গা বেছে নাও, তার ভালো দিক আর কষ্টের দিক লিখো, আর শেষে লেখো, তুমি পৃথিবীর জন্য কী করতে চাও।”

ছাত্ররা লিখতে শুরু করল - “আমি গাছ লাগাব।”, “আমি নদীতে ময়লা ফেলব না।”, “আমি আলো নিভিয়ে আকাশে তারা দেখব।”, “আমি পৃথিবীর বন্ধু হব।”, “আমি পৃথিবীর প্রেমে কবিতা লিখবো।”

স্যার বললেন,

“তোমরা আজ শুধু পৃথিবী লিখছো না, তোমরা প্রতিজ্ঞা লিখছো - ‘আমি পৃথিবীর প্রতি দায়িত্ববান হবো।’”,

একটি মেয়ে ধীরে বলে উঠল, “স্যার, পৃথিবীও কি আমাদের ভালোবাসে?”

স্যার মৃদু হেসে বললেন, “ভালোবাসে, যদি আমরা তাকে শুনি। বাতাসে, পানিতে, মাটিতে, গাছের পাতায়, মেঘের রঙধনুতে আর বৃষ্টির অবগাহনে - তার প্রতিটি নিঃশ্বাসে আমাদের জন্য ভালোবাসা আছে।” মনে রেখো, “সভ্যতা আমাদের অনেক কিছুই দিয়েছে কিন্তু তা পৃথিবীকে কষ্ট দিয়ে, এই যে অট্টালিকা, পিচ ঢালা পথ সবই প্রকৃতির বিরুদ্ধে। নিজস্ব পণ্য মনে করে জমির অপব্যবহার করি, কিন্তু এই পৃথিবীর জমির সঙ্গে আমরা জড়িত, আমাদের এটিকে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করতে হবে। একটা আদিবাসিদের উক্তি আছে ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পৃথিবী উত্তরাধিকার সূত্রে পাই না; আমরা আমাদের সন্তানদের কাছ থেকে এটি ধার করি (We do not inherit the Earth from our ancestors; we borrow it from our children).”

তারপর বললেন, “আমাদের শরীরও এক ছোট পৃথিবী। হৃদপিন্ড একটি পাম্প, ফুসফুস একটি বন, মস্তিষ্ক একটি আকাশ - যেখানে চিন্তা বজ্রপাতের মতো বিকিরণ হয়।”

শিক্ষকের নোট

- উদ্দেশ্য: পরিবেশ সচেতনতা, নাগরিক দায়িত্ববোধ, ও পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা।
- ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্থানীয় পরিবেশ (নদী, হাওর, পাহাড়, গাছ, বাতাস, পাখি) পর্যবেক্ষণ করে লেখা ও আঁকা তৈরি করবে।
- একটি প্রতিজ্ঞা লিখবে - নিজের ভূমিকা কীভাবে পৃথিবীকে সুন্দর রাখতে সাহায্য করতে পারে।
- আলোচনায় পরিবেশ পরিবর্তন, জলবায়ু, দূষণ ও সংরক্ষণের বিষয় থাকবে।
- প্রশ্ন: পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জিনিস তোমার চোখে কী? পৃথিবী কেন এখন বিপদে? তুমি পৃথিবীর জন্য কী করতে পারো? প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক কীভাবে বদলেছে?

“পৃথিবীর জার্নাল” হলো Nature Journaling-এর শেষ পাঠ, কিন্তু জীবনের প্রথম পাঠের শুরু, নিজেকে পৃথিবীর অংশ হিসেবে চিনে নেওয়া। যে শিশু পাতার নড়াচড়া, মেঘের ছায়া, নদীর ঢেউ, গাছের ছায়া আর তারার আলো দেখে বড় হয়, সে একদিন মানুষ হবে - সে জানে, ভালোবাসা মানে শুধু পাওয়া নয়, বরং রক্ষা করা।

ধনুক-ভাঙা পণ – ২১৪

“রাত্রির রোজনামচা”

রাঙামাটি জেলার পাহাড় ঘেরা এক মাধ্যমিক বিদ্যালয় - “তারামণি উচ্চ বিদ্যালয়।” স্কুলটি পাহাড়ের ঢালে, নিচে ছোট নদী বয়ে যায়, উপরে অসীম আকাশ। দিনভর গরম শেষে সন্ধ্যার হাওয়ায় হালকা ঠান্ডা পড়েছে। আজকের ক্লাস হবে অন্যরকম - রাতের ক্লাস। “প্রকৃতির রোজনামচা”-য় মহাবিশ্বের ছন্দ - চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবীর এই ঘূর্ণন ও গতিকে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করতে তৈরি হয়েছে “রাত্রির রোজনামচা”। এর লক্ষ্য, রাতের আকাশ দেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে মহাজগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যেমন উন্মোচিত হবে, তেমনি তারা অনুভব করবে এর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা ও বিস্ময়।

মাঠে সবাই বসে আছে, হাতে খাতা, পাশে টর্চলাইট। উপরে অসংখ্য তারা, এক পাশে চাঁদ। নবম শ্রেণীর, নাসিমা ম্যাডাম বললেন, “তোমরা চোখ মেলে দেখো, তারারা কীভাবে জ্বলছে, চাঁদের চারপাশে কেমন আলোয় বৃত্ত তৈরি হচ্ছে, রাতের শব্দ কেমন - ঝিঁঝিঁ, ব্যাঙ, বাতাস।” রাঙামাটির পাহাড়ে তারার নিচে বসে, “আজ আমরা আলো ও শব্দের তরঙ্গ শুনব। যে তারা আজ জ্বলছে, তার আলো হয়তো হাজার বছর আগে রওনা দিয়েছে। আলোর গতি এত দ্রুত - প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার!”

ম্যাডাম একটু থামলেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন - “সূর্য থেকে যত আলো বের হয়, তার মাত্র দুই বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছায়। শুনতে খুবই কম মনে হয়, কিন্তু এই ০.০০০০০০৫% আলো ও তাপই পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে, সমুদ্রকে তরল রাখে, গাছকে সবুজ রাখে, আর জীবনকে সম্ভব করে তোলে।” ছাত্ররা বিস্ময় নিয়ে তাকালো।

ম্যাডাম বললেন - “এখন কল্পনা করো - মহাবিশ্বে রয়েছে প্রায় ২ ট্রিলিয়ন গ্যালাক্সি। যেমন একটি গ্যালাক্সি হলো আমাদের মিল্কিওয়ে। আর প্রতিটি গ্যালাক্সিতে আছে ১০০ থেকে ৪০০ বিলিয়ন নক্ষত্র - মানে, সূর্যের মতো কোটি কোটি ‘সূর্য’।” তিনি একটু হাসলেন এবং বললেন - “ভাবতে অবাক লাগলেও সত্যি, পৃথিবীর সব সৈকতের সব বালিকণার সংখ্যার চেয়েও মহাবিশ্বে রয়েছে বেশি নক্ষত্র - আমাদের সূর্যের মতো অসংখ্য সূর্য।” ম্যাডাম ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমরা যত বড়ই কল্পনা করো না কেন, মহাবিশ্বের প্রকৃত আকার কখনোই আমাদের মস্তিষ্ক পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। কারণ মহাবিশ্ব স্থির নয় - এটি এক অনন্ত গতিশীল স্রোত।”

তিনি ব্যাখ্যা করলেন - “মহাকাশে সবকিছুই চলমান। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, সূর্য পুরো গ্যালাক্সিকে প্রদক্ষিণ করছে, আর গ্যালাক্সিগুলোও ঘুরছে, সরছে এবং আলোর গতির কাছাকাছি ভঙ্গিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই চলার পেছনে আছে মাধ্যাকর্ষণের বাঁধন,

এবং মহাবিশ্বের বিস্তার থেকে জন্ম নেওয়া কৌণিক ভরবেগ - যা সমগ্র মহাবিশ্বকে অবিরাম গতির একটি নৃত্যে বেঁধে রেখেছে।” ম্যাডাম ধীরে বললেন - “এই বিশালতার উপলব্ধি, তোমরা ধর্মীয় চোখে দেখো বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখো - যেভাবেই দেখ না কেন, এই সৃষ্টি আমাদের বিনয়ী করে, চিন্তাকে প্রসারিত করে, আর মনে করিয়ে দেয়, আমরা মহাবিশ্বের এক ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান অংশ।”

শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে বলল, “ম্যাডাম! অসম্ভব বড়!” ম্যাডাম বললেন - “হ্যাঁ, অসম্ভব বড়। আর তবুও সেই অসীমের মধ্যে আমরা আছি একটি ছোট নীল গ্রহে।”

ছাত্ররা লিখছে - “আমি এখন জানি, তারার আলো মানে অতীত দেখা।” “চাঁদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে লাগে মাত্র ১.৩ সেকেন্ড, আর সূর্যের লাগে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড।” “তারারা ঝিলমিল করছে, মনে হচ্ছে গল্প বলছে।”

“আকাশে দূরে একটা তারা অন্যদের চেয়ে উজ্জ্বল।”

এক ছাত্রের উত্তরে ম্যাডাম বললেন, “রাতের আকাশের তারা মিটমিট করে জ্বলে, কারণ তারার আলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর প্রতিসরণ হয়, তাপমাত্রা ও ঘনত্বর কারণে, আলোর রশ্মিকে বিভিন্ন দিকে বিচ্যুত করে, ফলে তারাগুলো মিটমিট করতে দেখা যায়।

নাসিমা ম্যাডাম খাতায় তাকিয়ে বললেন, “তোমরা জানো, ওই উজ্জ্বল তারা হয়তো হাজার বছর পুরনো আলো! আমরা যা দেখছি, সেটা এই মুহূর্তের নয় - অতীতের প্রতিফলন। রাত্রি শেখায়, সময়ও আলো হয়ে ফিরে আসে।”

ম্যাডাম দেখালেন কীভাবে পানিতে চাঁদের প্রতিসরণ (Refraction) হয় - “এটাই আলো ফেরার পথ। তুমি যখন আয়নায় নিজেকে দেখো, তোমার চোখে ফিরে আসে আলোর তরঙ্গ।” রাতের নীরবতায় দূর থেকে ঝিঁঝিঁর ডাক - ম্যাডাম বললেন, “এটাও এক ধরনের তরঙ্গ - (Sound Wave)। তরঙ্গ মানে গতিআর গতি মানেই জীবন।”

শিক্ষক নোট

• বৈজ্ঞানিক ধারণা: আলোর গতি, Reflection, Refraction, Sound wave and Frequency, রাতের তাপমাত্রা ও আলোর রঙের পরিবর্তন।

• উপসংহার: আলো ও শব্দ দুই - পৃথিবীর সংলাপের দুটি ভাষা।

“রাত্রির রোজনামচা” শেখায় - অন্ধকার মানে শূন্যতা নয়, বরং আলো দেখার সুযোগ।

তারারা আমাদের বলে, যত দূরেই থাকো, আলো ছড়াতে পারো।

যে ছাত্র আকাশের দিকে তাকাতে শেখে,

সে একদিন নিজের ভেতরও নক্ষত্র খুঁজে পায়।

ধনুক-ভাঙা পণ ২১৭

"প্রশ্নের দরজা"

নেত্রকোনা জেলার এক গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় - "আলোবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়।" শীতের সকাল। কুয়াশার ভেতর দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে এসেছে। আজ বিশেষ দিন - "স্বপ্ন বলার দিন"। ক্লাস নাইন। বাংলা শিক্ষক মায়া ম্যাডাম বোর্ডে একটি দরজার ছবি আঁকলেন। তার নিচে লিখলেন তিনটি লাইন:

১) না এগোলে - দরজায় পৌঁছানো যায় না। ২) না জিজ্ঞেস করলে - দরজা খোলে না। ৩) দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে - ভেতরে ঢোকা যায় না। তারপর ম্যাডাম বললেন, "আজ তোমরা প্রত্যেকে একটি স্বপ্ন বলবে। কিন্তু সাহস না করলে তোমার স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে, পূরণ হবে না।"

ক্লাস চুপ। পেছন থেকে ছোট্ট মেয়ে ঝর্ণা দাঁড়াল। "ম্যাডাম, আমি বিজ্ঞানী হতে চাই। কিন্তু আমাদের গ্রামে কেউ বিজ্ঞানী হয়নি।" ম্যাডাম এগিয়ে এসে বললেন, "তুমি তোমার স্বপ্নের পেছনে গেলে - নতুন পথ তৈরি হবে। তুমি যদি প্রশ্ন না করো - কেউ তোমাকে সাহায্য করার সুযোগ পাবে না।

আর সামনে না এগোলে - দরজাও খুলবে না। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর জগৎ তোমার কাছে অচেনাই থেকে যাবে।" ঝর্ণা মুচকি হাসল। "তাহলে আজই শুরু করি, ম্যাডাম।" ম্যাডাম তার হাতে একটি কাগজ দিলেন - একটি ছোট্ট তালিকা:

- ✔ আজ প্রশ্ন করো
- ✔ আজ সামনে বসো
- ✔ আজ প্রথম ধাপ নাও

ক্লাসে হাততালি। বাইরে সূর্য উঠেছে। কুয়াশা সরে গেছে। ঝর্ণার চোখে নতুন দিগন্ত। ম্যাডাম শিক্ষার্থীদের তাদের স্ব-কার্যকারিতার বাস্তব পরিমাপের জন্য এক পদ্ধতি তৈরি করতে উৎসাহিত করলেন। ছাত্রদের প্রতিটি বিষয়ের খাতার প্রথম পাতায় আঠা দিয়ে লাগলোর জন্য একটি পাতা দিলেন। যাতে লেখা আছে,

--- স্ব-কার্যকারিতা অনুশীলন – আমার প্রতিদিনের এক ধাপ ---

স্বপ্নের দরজা – আমার অগ্রযাত্রা

নাম: _____ শ্রেণি: _____ তারিখ: _____

১. আমার স্বপ্ন:

আমি হতে চাই: _____

২. আজ আমি যে প্রথম ধাপ নেব:

(ছোট হলেও বাস্তব হতে হবে)

☐ আজ একটি প্রশ্ন করব ☐ আজ সামনে বসব ☐ আজ শিক্ষক/বন্ধুর কাছে সাহায্য চাইব ☐ আজ ৩০ মিনিট অতিরিক্ত পড়ব

☐ অন্য কিছু: _____

৩. আজ আমি কী প্রশ্ন করেছি? ——

৪. আজ আমি কী নতুন শিখলাম? ——

৫. আজ আমি এক ধাপ এগোলাম কি? ☐ হ্যাঁ ☐ চেষ্টা করেছি ☐ কাল আবার চেষ্টা করব ☐ আজ কোন বাধা পেলাম? কাল তা কীভাবে পার হব?"

৬. নিজের প্রতি আজকের বার্তা: "আমি যদি প্রতিদিন এক ধাপ এগোই, আমার দরজা একদিন খুলবেই।"

শিক্ষকের নোট:

শুধু বড় স্বপ্ন নয় - প্রতিদিনের ছোট পদক্ষেপই ভবিষ্যৎ গড়ে।

ধনুক-ভাঙা পণ – ২১৬

“ভয়ের চিন্তাভাবনাকে চ্যালেঞ্জ করা”

কুড়িগ্রাম জেলার এক প্রত্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়। অষ্টম শ্রেণির ক্লাস। বাইরে বৃষ্টি, টিনের চালের উপর টুপটাপ শব্দ। ভেতরে ছাত্রদের মনেও একধরনের চাপ - “আমি পারি না”, “এটা আমার দ্বারা হবে না” - এই বাক্যগুলো যেন অদৃশ্য বোর্ডে লেখা।

বাংলাদেশ সরকারের “শিক্ষাই শক্তি” প্রকল্পের অধীনে শফিক স্যার এসেছেন এই স্কুলে। তিনি গণিতের ছাত্র, তাঁর কাছে জগৎ টা গণিতের সংখ্যায় আর আলগোরিথমে সাজানো। যেখানে, সব কিছুই সম্ভব অংক দিয়ে প্রমান করা। আলোর গতি, সূর্যের তাপমাত্রা আর গ্রহ নক্ষত্রের আলোকবর্ষের পরিমাপ সবই গণিত। শফিক স্যার আজ খাতা খুলতে বললেন না।

শুধু একটি প্রশ্ন করলেন - “তোমরা কি জানো, মানুষ আসলে কোথায় সবচেয়ে বেশি দুর্বল?” কেউ বলল, শরীরে। কেউ বলল, টাকায়। কেউ বলল, মেধায়। স্যার হেসে বললেন, “না। মানুষ সবচেয়ে দুর্বল হয় নিজের মনে শেখানো সীমায়।”

তারপর তিনি একটি গল্প বললেন। কোনো নাম বললেন না, কোনো দেশ বললেন না। শুধু বললেন - একজন মানুষ, যাকে সবাই বলেছিল: “এটা অসম্ভব।” “তোমার শরীর পারবে না।” “তোমার হাড় ভেঙে যাবে।” কিন্তু সেই মানুষটা, লড়াই করেছিল শরীরের সঙ্গে নয় - মনের সঙ্গে। লড়াইয়ের মুহূর্তে সে ভাবেনি রেকর্ড, মেডেল, বা বাহবা। সে শুধু কল্পনা করেছিল - তার সন্তানের জীবন ঝুঁকিতে। আর সেই কল্পনাই তার মস্তিষ্ককে বলেছিল, “এখন আর ভয় পাওয়ার সময় নেই।”

শফিক স্যার বোর্ডে একটি লাইন লিখলেন - “মস্তিষ্ক আমাদের রক্ষা করার জন্য সীমা বসায়, কিন্তু সেই সীমাগুলো সব সময় সত্য নয়।”

তিনি বললেন, “তোমাদের পরীক্ষার ভয়, গণিতের ভয়, ইংরেজির ভয় - এসবের অনেকটাই বাস্তব নয়। এগুলো শেখানো ভয়। কেউ একদিন তোমাদের বলেছে - ‘তুমি পারবে না।’ আর তোমরা সেটা বিশ্বাস করে ফেলেছ।”

পেছনের বেঞ্চে বসা রাশেদ, যে কখনো হাত তোলে না, আজ ধীরে হাত তুলল।, বলল, “স্যার, তাহলে কি ভয় মানেই ভুল?” স্যার উত্তর দিলেন, “ভয় ভুল নয়। কিন্তু ভয়কে শেষ কথা বানানো ভুল।”

ক্লাস শেষ হওয়ার আগে তিনি একটি কাজ দিলেন। কোনো হোমওয়ার্ক না। শুধু একটি প্রশ্ন - “আজ থেকে যখনই বলবে ‘আমি পারব না’, একবার ভাববে - এই সীমাটা কি সত্যি, নাকি শেখানো?”

বৃষ্টি থেমে গেছে। ক্লাসরুম থেকে বেরোনোর সময় ছাত্রদের মুখে আজ অন্য রকম ভাব। কারণ আজ তারা শিখেছে - সব ধনুক ভাঙতে শক্তি লাগে না, কিছু ধনুক ভাঙতে লাগে সাহস, আর কিছু ধনুক ভাঙে - শুধু মনের ভেতরে।